উপন্যাস সমগ্র
রমাপদ চৌধুরী

উপন্যাস সমগ্র

রমাপদ চৌধুরী

১

সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬

স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক সপ্তর্ষি প্রকাশন , ৪৪এ চক্রবর্তী লেন , শ্রীরামপুর হুগলী থেকে
প্রকাশিত এবং কালি প্রেস, ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ।

সমুদ্রতটে দু'জন মানুষ বালির ওপর পাশাপাশি বসে আছে। একজন দৃশ্যমান। তার শরীরী অস্তিত্ব নিয়ে সে শুধু তাকিয়ে দেখছে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠা লোকটিকে। আরে, ও তো ডুবে যাচ্ছে! উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে সে তাকালো তীরের দিকে, লোকটির আপনজনের দিকে। হ্যাঁ, তারও চোখে পড়েছে। কিন্তু সেই আপনজন নির্বিকার কেন? একটা দুর্বোধ্য ক্রুর হাসি কি দেখা গেল তার চোখে? না, এবার সে পাগলের মত ছুটে চলেছে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

সেই বালির ওপর বসে থাকা দৃশ্যমান মানুষটি উঠে দাঁড়ালো ফিরে চলে গেল আপন গৃহে।

তার পাশেই কিন্তু বসে ছিল একজন অদৃশ্য মানুষ। সে মনে মনে বললে, জানি, তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু এবার আমার কাজ শুরু।

ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠা লোকটি জীবন ফিরে পেয়ে তীরে এসে উঠেছে, তার আপনজনের সঙ্গে চলেছে।

অদৃশ্য মানুষটির কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। কোন বাধাই বাধা নয়। সে ঐ দু'জনকে অনুসরণ করে চলে গেল তার অন্দরমহলে। হেঁসেলে, শয্যায়, গৃহকোণে, বারান্দায়—নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অদৃশ্য মানুষটি তাদের দেখল, কথা শুনলো। কে একজন খবর শুনে ছুটে এসেছিল, অদৃশ্য মানুষটি মনে মনে বললো, চলো তোমার সঙ্গেও যাই, তোমার চোখ দিয়ে ওদের দেখবো। কিন্তু তোমার চোখে সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে কেন? কে একজন সমবেদনা জানাতে এসেছিল। কেউ একজন কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় তার মুখে কৌতুকের হাসি কেন? অদৃশ্য মানুষ তাদের সকলকে অনুসরণ করলো, তাদের দেখলো, এবং তাদের চোখ দিয়ে ঐ দু'জনকে। একটা ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে অনেকগুলি মানুষ। তাদের ভিতরের চরিত্র দেখতে পেল সেই অদৃশ্য মানুষ, আর তাদের চোখ দিয়ে দেখতে দেখতে ঐ দু'জনকে সে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেল। ডুবুরির মত সমুদ্রে ডুব দিয়ে রহস্যময় ভিতরের মানুষগুলোকে সে বের করে আনলো অতল অন্ধকার থেকে।

এই অদৃশ্য মানুষটি হলেন ঔপন্যাসিক। তাঁর দৃষ্টি চতুর্দিকে, এবং চতুর্দিক থেকে তিনি একজনকেই দেখেন। তুমি গল্পলেখক, কারও আপনজনের নির্বিকার দৃষ্টি কিংবা ক্রুর হাসি, অথবা উন্মাদের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যই তোমার শিল্পকর্মের সম্বল। আমি সর্বত্রগামী। আমি ভিতরের মানুষকে বের করে আনতে চাই। গোটা মানুষটাকে।

উপন্যাসের মূল প্রকৃতিও এখানেই। দর্জির ফিতে দিয়ে দৈর্ঘ্য মেপে তার পরিচয় পাওয়া যায় না, চরিত্রের সংখ্যা গুনে তার হদিস মেলে না, পটভূমির পরিধি দেখে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। যিনি রাজ্য ছেড়ে আসেন, যাঁর সঙ্গে নেই কোন সৈন্যসামন্ত, যাঁর অঙ্গে নেই রাজপোশাক, মানুষের মনের জগতে তিনিই তো হয়ে আছেন রাজার মত রাজা। সিংহাসন বা রাজ্যের বিস্তৃতি তাঁর পরিচয় নয়।

খারিজ

এমনিতেই আমি শুয়ে পড়ি চটপট, উঠি দেরিতে। শীতকালে রাত দীর্ঘ হওয়ার ফলে যদিবা একটু সকাল সকাল ঘুম ভাঙে, তবু লেপের তলার আমেজটুকু ছেড়ে উঠতে মন চায় না। সেদিক থেকে মেয়েদের বাহাদুরি আছে। অদিতি আমার অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে যায়। বিশেষ করে টুকাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে অদিতির কাজ বেড়েছে, সবদিক সামলাতে পারে না। কারণ মাসে পনেরো দিন করে স্কুলবাসের ফার্স্ট ট্রিপে টুকাইকে যেতে হয়, আর ওদের কি ব্যবস্থা জানি না, ঠিক সোয়া আটটার সময় রাস্তার মোড়ে ওকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে বাস চলে যায়। তখন মহা ঝঞ্ঝাট, হয় আমাদেরই কাউকে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, আর নয়তো সেদিন ওর স্কুলে যাওয়াই হবে না। তখন ওর সঙ্গে যারা পড়ে তাদেরই কারো বাড়ি গিয়ে সেদিনের নতুন পড়া এবং কি কি টাস্ক দিয়েছে জেনে আসতে হবে। ওদের ইস্কুলটা ভালো, কিন্তু বড় বেশী কড়া। অদিতিকে সেজন্যেই খুব তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়। কারণ সোয়া আটটার মধ্যে টুকাইকে তৈরী করে দেওয়া এবং তার টিফিন সাজিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর ফাঁকেই যখন আবার টুকাইয়ের ছেলেমানুষি আবদার ও অভিমান কিছুটা সময় নষ্ট করে দেয়।

আমাকেও অবশ্য এখন আর বেশীক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতে দেয় না অদিতি। ওদিকে টুকটাক কাজকর্ম সারতে সারতে মাঝে মাঝেই এসে তাড়া দেয় বাজারে যাবার জন্যে। বাজারে যেতে দেরি হয়ে গেলে তখন আর ভাল মাছ পাওয়া যায় না। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, মানুষের যত অভাব বাড়ছে, জিনিসপত্রের অভাবও ততই বাড়ছে। একটু দেরিতে গেলে বাজার খাঁ খাঁ করে। তবু আমি এক-একদিন রেগে যাই। বলি, তোমাকে সকালে উঠেই উনোন ধরাতে হয়, তুমি তাই সকালে ওঠো, ঘুমটা পুষিয়ে নাও দুপুরবেলা। আমি কেন উঠতে যাবো এত সকালে! ফল হলো এই, একথা শুনে অদিতি কোন জবাব দিলো না, পরের দিন আমার ঘুমও ভাঙালো না, কিন্তু নিজেরই হাঁচিতে নিজের ঘুম ভেঙে গেল। একে তখন বেজায় শীত পড়েছে, তার ওপর ও করেছে কি, সকালবেলাতেই সব জানালাগুলো খুলে দিয়ে গেছে। আমি রাগারাগি করাতে শান্ত নিরীহ গলায় জবাব দিলো, ঘরে গুমোট গন্ধ হয়েছে, একটু বাইরের হাওয়া না ঢুকলে ঘরে আসা যাচ্ছে না। যেন ফ্রেশ এয়ারকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনার জন্যে উত্তর দিকের জানালা দুটো না খুলে দিলেই নয়।

আশ্চর্য এই, পালান্ ছেলেটা আসার পর দেখা গেল, অদিতির আমাকে আর ডেকে তোলার প্রয়োজন হচ্ছে না। কারণ ঐ বাচ্চা ছেলেটা অত্যন্ত ঘুম-কাতুরে, তাকে ঠেলাঠেলি করে এবং চিৎকার করে ডেকে ডেকেও তোলা যায় না। সে একবার করে উঠে বসে চোখ রগড়ায়, আবার শুয়ে পড়ে। আর তখন অদিতি আবার চেঁচামেচি শুরু করে। সেই ডাকাডাকি চিৎকারে আমারও ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম তো ভাঙেই, বিছানায় শুয়ে থাকতেও ইচ্ছে করে না।

প্রথমটা আমি তাই বুঝতে পারিনি।

কলকাতায় শীত সাধারণত বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু এবার একটু জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছিল। পাড়ার অখিলবাবু সেদিন অফিস যাবার সময় গরম কোটের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, এবার শীতটা তবু বেশ কিছুদিন পাওয়া গেল। অফিসে এবং বাজারেও পরিচিত লোকের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই শীত, যা কিনা কলকাতায় সবচেয়ে দুর্লভ। কিন্তু এই দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু অন্তর্হিত হয়েছিল আগের দিন বিকেল থেকেই, যখন কিনা হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড একটা উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। অফিস থেকে ফিরেছিলাম রীতিমত কাঁপতে কাঁপতে। তাই অন্যদিনের তুলনায় অনেক আগে, ন'টা না বাজতে বাজতে রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলাম। সেজন্যেই সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল, নাকি অদিতির চিৎকার শুনে, ঠিক জানি না।

লেপের তলায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পাচ্ছিলাম অদিতি ডাকছে, পালান্, এই পালান্ ওঠ।

টুকাই বোধহয় তার টুথব্রাশটা খুঁজে পাচ্ছিল না, তার মাকে কয়েকবার জিগ্যেস করলো। কিন্তু অদিতি তার কথার জবাব দিলো না দেখে আমি একটু বিরক্ত হলাম। ও বেচারাকে স্কুলবাসের জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে সে-কথাটা যেন অদিতি ভুলেই গেছে। অদিতি তখন ক্রমাগত ডাকছে, পালান, এই পালান ওঠ। দড়াম দড়াম করে দরজায় বার কয়েক ধাক্কা দিলো, তাও শুনতে পেলাম। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না, তা হলে কি পালান কাল রাতে যথারীতি বারান্দায় শোয়নি নাকি?

এরপর দরজায় আরো জোরে জোরে ধাক্কা পড়লো, মনে হলো অদিতি যেন কপাটে লাথি মারছে। ঠিক সেই সময়েই দোতলা থেকে বাড়িওয়ালার রুক্ষ গলা শোনা গেল, দরজাটা যে ভেঙে যাবে। এরপরই বাড়িওয়ালার স্বগতোক্তি, আচ্ছা লোককে ভাড়া দিয়েছি!

বাড়িওয়ালাকে আমরা নিজেদের মধ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলি নটবর। নটবরবাবুও বলি না। কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই লোকটি, আমাদের ধারণা, ইচ্ছাকৃতভাবে নানান অসুবিধে সৃষ্টি করছে। আমাদের উঠিয়ে দিয়ে অন্য ভাড়াটে বসাতে পারবে এবং তখন অনেক বেশী ভাড়া পাবে বলেই হয়তো। একবার তো আমার মুখের ওপরই বলেছিল, 'এত যখন অসুবিধে, বাড়িটা ছেড়ে দিলেই তো পারেন জয়দীপবাবু।' অথচ দু'শো টাকা ভাড়ার দেড়খানা ঘরের এই আস্তানাটুকুকে বাড়ি বলা যায় কিনা সন্দেহ। একতলার অন্য ঘরগুলোয় কিসব মালপত্র রেখেছে বাড়িওয়ালা। সেগুলো সব সময়ই তালাবন্ধ। আর নিজে থাকে দোতলায় বড়সড়ো একটা পরিবার নিয়ে। এবং এই বাড়িটা যেন তার রক্তমাংস দিয়ে তৈরী। একদিন দেয়ালে একটা ছবি টাঙানোর জন্যে পেরেক পুঁতছিলাম, 'করছেন কি' 'করছেন কি' বলে ছুটে এসেছিল। মুখে যতই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি না কেন, বাড়িওয়ালাকে ভিতরে ভিতরে কিন্তু আমি একটু ভয় পাই। ভয় পাই এই কারণে যে, ইচ্ছে করলেই নটবরবাবু একটা কোন কথা ছুঁড়ে দিয়ে মনের শান্তি কেড়ে নিতে পারেন।

'দরজাটা যে ভেঙে যাবে' এই কথা ক'টি শুনেই আমি হয়তো লেপটা ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলাম বিছানা থেকে। কিন্তু না, তা নয়। তার আগেই বোধহয় দরজায় দু'বার লাথি মেরে প্রায় কান্নার গলায় ভয়ার্ত চিৎকার করে অদিতি ডেকে উঠেছিল, এই, শীর্গাগর এসো, পালান উঠছে না।' অদিতির গলার

স্বরে এমন কিছু ছিল, যা শুনে আমি যতটা না বিস্মিত হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিলাম।

আমি ছুটে গিয়ে অদিতির মুখের দিকে তাকিয়ে আরো ভয় পেয়ে গেলাম। অবসন্ন ক্লান্ত ভীত এবং বিস্মিত অদিতির মুখেচোখে তখন একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। ও তখন রান্নাঘরের কপাটে হাত রেখে কোন রকমে যেন নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, এখানে? রান্নাঘরে?

রান্নাঘরের কপাটে ধাক্কা দিতে দিতে অদিতিকে প্রশ্ন করলাম, ও কি এখানে শোয় নাকি?

অদিতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারলো না। তারপর থেমে থেমে বললে, ও তো বারান্দায় শুতো, ওর বিছানা নেই দেখে...

রান্নাঘরটা আমাদের খুবই ছোট, এক চিলতে। একটা ছোট্ট জানলা আছে। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে সেটাও খোলা গেল না। 'পালান, এই পালান', বলে আমিও বার কয়েক ডাক দিলাম।

মাত্র কয়েকদিন আগে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে আমরা নিজের খরচেই বাড়িটা হোয়াইটওয়াশ করিয়েছিলাম, দরজা জানলায় রঙ ফিরিয়েছিলাম। আমার একটা কেমন ক্ষীণ আশা হচ্ছিল, কাঁচা রঙ থাকলে যেমন মাঝে মাঝে দরজা-জানালা সেঁটে যায়, চট করে খোলা যায় না, তেমন কিছু ঘটেছে, পালান চেষ্টা করেও খুলতে পারছে না। কিন্তু বারবার ডাকা সত্ত্বেও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন আমি সজোরে দু'দুটো লাথি কষিয়ে দিলাম কপাটে, আর ঠিক তখনই একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস সম্ভাবনা আমার সমস্ত শরীরকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

পালানের বয়স কত, ওর পক্ষে তেমন কিছু সম্ভব কিনা, কিংবা তেমন কিছু ঘটানোর কিই বা কারণ থাকতে পারে, এ-সব প্রশ্ন উঁকি দেবার মত মানসিক অবস্থা তখন আমার নয়। আমি তখন কিছু ভাবতেই পারছি না। শুধু অনুভব করছি, আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

এক মুহূর্তের জন্যে কে যেন আমার বুকের ভেতর থেকে বলে উঠলো, সাবধান সাবধান! থানা-পুলিশ, কোর্টঘর, আইন, পাড়াপড়শির মন্তব্য—হয়তো সবকিছুই একটা তালগোল পাকিয়ে আমাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম, সমূহ বিপদ একটা বিকট চেহারা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু তার আগেই দেখি বাড়িওয়ালা চটির শব্দ করতে করতে আমাদের সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন। আর তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি যেন অনেকখানি ভরসা পেলাম। তাঁকে দেখেই আমি বলে উঠলাম, এই যে রায়বাবু, পালান, আমাদের সেই বাচ্চা চাকরটা .

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না, কিংবা কিছু হয়তো বলেছিলাম, ঠিক মনে নেই। আর আশ্চর্য, যাকে আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় স্রেফ নটবর বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতাম, তাকেই আমি একান্ত ভরসার স্থল মনে করে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম।

রায়বাবু সটান ভিতরে ঢুকে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে বলে উঠলেন, করছেন কি, দরজাটা ভেঙে ফেলুন, এখনো হয়তো...

বলে নিজেই কপাটে লাথির পর লাথি বসাতে শুরু করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কপাটের ভিতর দিকের খিলটা ছেড়ে গেল।

আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকলাম। রায়বাবু বোধহয় জানলাটা খুলে দিলেন, আরো খানিকটা আলো ঢুকলো ঘরে। আমি ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে পালানের বুকে পিঠে হাত দিয়ে ও বেঁচে আছে কি না জানতে চাইলাম। ওর শরীরটা উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। বাঁ হাতটা ওর বুকের নীচে গলিয়ে দিয়ে ওকে স্পর্শ করতেই একটু যেন শরীরে তাপ আছে মনে হলো। তা হলে বোধ-হয় এখনো বেঁচে আছে। ওকে এখনো বাঁচানো যাবে।

আমি রায়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, বোধহয় বেঁচে আছে, আপনি দেখুন না, নাড়ি পাওয়া যায় কি না। বললাম, আমি বরং ডাক্তার পাই কিনা...

আমি দ্রুত পায়ে, প্রায় ছুটতে ছুটতে ডাক্তার বাগচির বাড়িতে গিয়ে পেঁছিলাম। তাঁর মেয়ে এসে দরজা খুলে দিতেই বললাম, ডাক্তারবাবুকে শীগগির একবার আসতে বলো।

মেয়েটি ভিতরে ঢুকে গেল, আর আমি তখন অস্থির হয়ে পায়চারি করছি, মনে মনে সময়ের হিসেব কষছি। ঘড়ি দেখতে গিয়ে সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম, ঘড়ি পরা তো দূরের কথা, আমি স্রেফ একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়েই চলে এসেছি-জামা পরার কথা মনেই হয়নি। আঃ, কত সময় চলে যাচ্ছে, ডাক্তার বাগচি এখনো নামছেন না কেন! আমি আন্দাজ করতে চাইলাম, বাড়ি থেকে এখান অবধি আসতে কত সময় লেগেছে, ডাক্তার বাগচির যেতে কত সময় লাগতে পারে। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, পালানকে বাঁচানো যাবে, বাঁচানো যেত, ডাক্তার বাগচি যদি দেরি না করতেন।

আসলে কতক্ষণ পরে জানি না, আমার মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎ ডাক্তার বাগচির গলা শুনে আমি দরজা থেকে পিছিয়ে এসে দোতলার বারান্দার দিকে তাকালাম। দেখলাম একখানা শাল গায়ে দিয়ে এসে ডাক্তার বাগচি দাঁড়িয়েছেন। জিগ্যেস করলেন, কার অসুখ?

আমি সমস্ত ঘটনাটা যত কম কথায় বোঝানো সম্ভব বোঝাবার চেষ্টা করলাম, অনুনয়ের গলায় বললাম, একবারটি আসুন, ডাক্তার বাগচি!

ডাক্তার বাগচি শুনে বললেন, চাকরটা!

উনি হয়তো সেভাবে বলেননি, শুধু ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এ কথাটা জানাবার জন্যে কিছু বলতে হয়, তাই বললেন। অথচ আমার কানে 'চাকরটা' ওই ক্ষুদ্র শব্দটি খট্‌ করে লাগলো।

আমি বলে উঠলাম, পালান, পালান, আপনি তো দেখেছেন তাকে! যেন বোঝাতে চাইলাম 'চাকরটা' নয়।

উনি বললেন, ঠিক আছে, যাচ্ছি। আপনি ততক্ষণ অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করুন। নীচের ঘরে। ব'লে দোতলার বারান্দা থেকে আঙুল দিয়ে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন।

ডাক্তার বাগচির নীচের ঘরখানাই চেম্বার। তাঁর মেয়ে যাবার সময় দরজা খুলে রেখেই গিয়েছিল, আমি চেম্বারে ঢুকে টেলিফোনটা কোথায় খুঁজছিলাম। ও'র মেয়ে সেই সময় রিসিভারটা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে প্লাগপয়েন্টে লাগিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, আমি ডিরেকটরিটা চাইলাম, সে দূরে দাঁড়িয়ে বললে, থ্রি-ফোর ডাবল টু ডাবল থ্রি। বলে চলে গেল। আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই, টেলিফোন রাখার মত পয়সাও আমার নেই। কখনো-সখনো দরকার হলে অফিস থেকেই ফোন করি। সেখানেও আমার নিজের টেবিলে কোন রিসিভার নেই। কিন্তু অনভ্যস্ত তো নই, তা হলে আমি নম্বরটা ডায়াল

করে রিসিভারটা উল্টে ধরতে যাচ্ছিলাম কেন। মাউথপীসটা কানে দিতে গিয়ে ভুলটা ধরে ফেললাম। ডাক্তার বাগচির মেয়ে দেখলে হয়তো হেসে ফেলতো। আসলে আমার বুক জুড়ে তখন শুধুই একটা উদ্বেগ। তাই হয়তো অদ্ভুত অদ্ভুত ভুল করছিলাম। এই উদ্বেগের জন্যে আমার বোধহয় এতক্ষণ শীতও করেনি। আমি তো শুধু একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এই ঠান্ডায় বেরিয়ে এসেছি। এখন হঠাৎ খুব শীত ক'রে উঠলো।

পর পর অনেকবার চেষ্টা করে তবে লাইন পেলাম। প্রথম যে লোকটা ধরেছিল, সে যেন গ্রাহ্যই করলো না। বললে, দেরি হবে, অ্যাম্বুলেন্স সব বেরিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজেদের মধ্যে তারা কি সব বলাবলি করছিল, স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। তারপর আরেকজন মোটা গলায় বললো, হ্যালো—আমি কাতর অনুনয়ে তাকে বাড়ির ঠিকানা দিলাম, তাড়াতাড়ি আসতে বললাম। সে নির্বিকার গলায় বললে, মোড়ের মাথায় লোক রাখুন, বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে। বলেই রিসিভার নামিয়ে দিলো। ঠিকানাটা ঠিকমত লিখে নিলো কিনা বুঝতে পারলাম না।

ততক্ষণে ডাক্তার বাগচি নেমে এসেছেন হাতে ব্যাগ নিয়ে। বললেন, চলুন, আমি একটা ফোন করেই যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাঁর ব্যাগটা নিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

বাড়ির কাছাকাছি এসেই পাড়াপড়শির একটা জটলা দেখতে পেলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে। অখিলবাবু গরম প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এলেন, কি ব্যাপার বলুন তো। নিশীথবাবু উৎকণ্ঠার মুখখানা এগিয়ে দিয়ে কি যেন জানতে চাইলেন, তারপর উপদেশের ভঙ্গিতেই যেন বললেন, এত বাচ্চা ছেলে কখনো রাখে মশাই! তাঁর কথাটা শুনে আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। চাকরিবাকরির ব্যাপারে কোথায় কি যেন একটা বয়স সম্পর্কিত আইন আছে অস্পষ্ট ভাবে আমাব মনে পড়লো। তার মধ্যে বাড়ির চাকরও পড়ে কিনা আমি জানতাম না। কিন্তু সে দুশ্চিন্তাটাও স্থায়ী হলো না, কারণ তখনো আমি আশা করছি পালানকে বাঁচানো যাবে।

সত্যি কি তাই! আমার হঠাৎ মনে হলো আমি বোধহয় অভিনয় করছি। ডাক্তার ডেকে এনে নিরপরাধ সাজতে চাইছি। কাল রাত পর্যন্ত ওর ওপর আমার মায়ামমতা ছিল ঠিকই, ওকে একটা সোয়েটার কিনে দিতে হ'বে বলে অদিতির সঙ্গে পরামর্শ করেছি। কিন্তু আজ ও আমাকে বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলেই সত্যিকারের কোন মায়ামমতা আজ আর নেই। ওকে বাঁচানোর জন্যে আমার যদি প্রবল আগ্রহ থাকতো তা হলে প্রথমেই দরজাটা ভেঙে ফেলিনি কেন! আসলে আমি বোধহয় সাক্ষী চাইছিলাম একজন। কারণ নিজেকে বাঁচানোর কথা ভেবেছিলাম।

আমি জটলার মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েও আবার ফিরে এলাম, ডাক্তার বাগচি আসছেন কিনা দেখবার জন্যে।

বাড়ির সামনে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা কেউ সমবেদনা জানাচ্ছিল, কেউ উপদেশ দিচ্ছিল। আমি ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম, অথচ সযত্নে সেই বিরক্তি চেপে রাখছিলাম। কারণ আমার মনে হচ্ছিল, এরা যে কেউ আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। তাই যথাসম্ভব তাদের কৌতূহল মেটাতে হচ্ছিল। এদিকে ডাক্তার বাগচির তখনো দেখা নেই। ও'র টেলিফোনটা কি ফিরে গিয়ে করা চলতো না, আমি মনে মনে প্রশ্ন করলাম। মনে মনে বললাম,

লোকটার এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই।

ঠিক এই সময়ে কে বললে, অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে!

আমার মনে নেই কার হাতে যেন ব্যাগটা দিয়ে আমি অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটে গেলাম।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পানওয়ালাটাকে কি যেন জিগ্যেস করছিল। পানওয়ালা তখন সবে ঝাঁপি খুলে পিতলের ঘটিটা সাফসুফ করছিল। সে আঙুল দিয়ে গলিটা দেখিয়ে দিলো। আর তখনই জড়ানো স্ট্রেচার নিয়ে দুটি লোক নামলো ভিতর থেকে।

হিন্দুস্থানী দেখে আমি ছুটে গিয়েই বললাম, আইয়ে। লোক দুটো আমার পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করলো। আর আমি মাঝে মাঝে ফিরে তাকিয়ে তারা ঠিক আসছে কিনা দেখে তোয়াজের ভঙ্গিতে বলছি, আইয়ে। আমি নিশ্চিত জানি, এটা যদি আমার নিজের ব্যাপার না হতো, যদি অন্য কারো বাড়ি দেখানোর ব্যাপার হতো, তা হলে, ঐ স্ট্রেচারবহনকারী লোক দুটিকে আমি নির্ঘাত বলতাম 'আও'। 'আইয়ে' বলে নিশ্চয়ই তোয়াজ করতাম না।

আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই অদিতি ঘর থেকে গরমের শার্টখানা এগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললে, জামা না পরেই চলে গেলে, কি আক্কেল, অসুখে পড়বে।

তাড়াতাড়ি শার্টে মাথা গলিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ডাক্তার বাগচি কখন এসে গেছেন, আমি লক্ষ্যই করিনি। আমি হয়তো কারো সঙ্গে কথা বলছিলাম, কিংবা অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারের সঙ্গে। লোক দু'টিকে দেখেই ডাক্তার বাগচি উঠে এলেন, কোন কথাই বললেন না। আর লোক দুটোর মধ্যে একজন গিয়ে পালানের হাতটা তুলে ধরলো, একবার নাকের কাছে হাত রাখলো, তারপর, বাজে জিনিস ফেলে দেওয়ার মত করে হাতটা আস্তে আস্তে নামিয়ে না রেখে ঝট্ করে ফেলে দিলো।

অদ্ভুত হাসি হেসে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, এ তো মুর্দা হ্যায়।

আমি অসহায়ের মত একবার লোকটির মুখের দিকে তাকালাম, একবার ডাক্তার বাগচির মুখের দিকে। আমি কাউকে উদ্দেশ্য না করেই স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললাম, তবু একবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে হতো না? হয়তো বেঁচে আছে।

লোক দুটো রাজী হলো না, তারা স্ট্রেচার গুটিয়ে নিয়েই চলে গেল।

আমি অসহায়ের মত ডাক্তার বাগচির মুখের দিকে তাকালাম।

অদিতি তখনই, ওর সব ঠিকঠিক মনে থাকে, চারখানা এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিলো ডাক্তার বাগচির দিকে। তিনি কেমন যন্ত্রের মত অভ্যস্ত হাতে টাকাটা নিলেন, কিন্তু মনে হলো উনি কি যেন ভাবছেন, টাকাটা যে হাত বাড়িয়ে নিলেন তা উনি নিজেও টের পাননি।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আপনি একবার থানায় যান, থানায় জানাতে হবে, ডেডবডি ওরাই নিয়ে যাবে।

'ডেডবডি ওরাই নিয়ে যাবে।' তারপর কি হবে, কি করবে ওরা কিংবা আমার তখন কি করা উচিত সে-সব চিন্তা আমার মাথায় এল না। আমি তো এতক্ষণ আশা করছিলাম পালান বেঁচে আছে, কিংবা ওকে বাঁচানো যাবে। তাই কি! শেষবারের মত আমি যখন অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটোকে অনুনয় করছিলাম, একবারটি হাসপাতালে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে, তখন ডাক্তার বাগচির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে পালান বেঁচে নেই। আসলে আমি তখন বোধহয়

চাইছিলাম, ঐ মৃতদেহ আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাক্, আমার বাড়ি থেকে ওটা সরিয়ে নিয়ে গেলেও শান্তি। আমি তা হলে হয়তো অনেকখানি হাল্কা বোধ করব।

থানায় যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিলাম, অদিতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি যাবো? ও বোধহয় বুঝতে পারলো থানার নাম শুনে আমি খুব অসহায় বোধ করছি।

ঠিক তখনই টুকাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সরল ভাবে প্রশ্ন করলো, পালানের কি হয়েছে বাবা?

আমরা কেউই ওর কথার উত্তর দিলাম না। অদিতি শুধু বললে, একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

আমি নিজেও একা যেতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো! রায়বাবু কোন ফাঁকে চলে গেছেন আমি লক্ষ্যও করিনি। অথচ ওঁকে নিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হতো। কোলকাতায় বাড়িওয়ালাদের সবাই খুব সমীহ করে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম কখন ভিড় ফিকে হয়ে গেছে। হবারই কথা। সবারই অফিস আছে, কারো বা ব্যবসাপত্র, দোকানটোকান খোলার ব্যাপার আছে। আমি অখিলবাবুকে খুঁজলাম, নিশীথবাবুকে খুঁজলাম। পেলাম না। ও'রা সবাই বোধহয় শুধু কৌতূহল মেটাতে এসেছিলেন।

দু'পা এগিয়েছি, দেখি নিশীথবাবু হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর বাড়ি থেকে। এগিয়ে এসে বললেন, থানায় যাচ্ছেন তো? বলেন তো আমিও যেতে পারি।

আমি বলে উঠলাম, না-না, আমি একাই যেতে পারবো। কারণ নিশীথবাবু লোকটিকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। লোকটি একটু জটিল প্রকৃতির, এবং তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই। সব সময়ে সব কিছুতে একটা গোয়েন্দাগিরির চোখ রাখেন। নিশীথবাবু এবং নিশীথবাবুর স্ত্রী—দু'জনেই। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে নেই, দিবারাত্রি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, চেঁচামেচি। অথচ তারই ফাঁকে এবাড়ির ঠিকে ঝিকে ডেকে, ওবাড়ির রাঁধুনিকে ডেকে পাড়ার সকলের হাঁড়ির খবর জানা চাই। আবার খুব অন্তরঙ্গ সেজে এক-একজনকে গোপনে সে-খবর জানানোও চাই। আমার কাছেও এমনি কি একটা বলতে এসেছিলেন, আমি পাত্তা দিইনি। কিন্তু আসল রাগ আমার অন্য কারণে। অনেকদিন আগে 'সিধু' বলে একটা বাচ্চা চাকর ছিল, অদিতি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল, নিশীথবাবু লোকটা এত ছোটলোক, দু'টাকা বেশী মাইনের লোভ দেখিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

আমি বললাম, না না, আমি একাই যেতে পারবো। কারণ আমার ভয় হলো, নিশীথবাবু সঙ্গে থাকলে থানায় গিয়ে উনি হয়তো উল্টোপাল্টা কিছু বলে ফেলতে পারেন।

আমি তাঁকে এড়িয়ে হনহন্ করে বাসস্টপের দিকে এগিয়ে গেলাম। অফিসে একটা ফোন করে দিতে হবে, কিন্তু এখনো দশটা বাজতে বাকি। সুখেনের কথা মনে পড়লো। আমার সঙ্গে এক সময় খুব বন্ধুত্ব ছিল, ও বিয়ে করার পর দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। সুখেন উকিল, আইনটাইন জানে। ওকে সঙ্গে পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

'দরওয়াজা!' ও সি এমন চিৎকার করে ডাকলেন, আমার ভিতরটা চমকে উঠলো। কিংবা আমি হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্যমনস্কভাবেই কখন থানায় এসে পৌঁছেছি, ও সি-র সামনে বসে কথা বলছি, খেয়ালই করিনি। আমি যন্ত্রচালিতের মত কখন এস-আই ভদ্রলোকের পাশে এসে কালো ভ্যানটার সামনের সীটে বসেছি, তাও স্পষ্ট মনে পড়লো না। অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতেই কেমন একটা সংকোচ বোধ করছিলাম। পুলিসের গাড়িতে পুলিসের পাশে বসে থাকতে দেখলে কেউ আমাকে প্লেন ড্রেস পুলিস ভাববে না তো! চেনাজানা সকলেই তো আর খবরটা জানবে না। হয়তো আই-বি টাই-বি ভেবে বসবে। আমিও তো কাউকে কাউকে সে-রকম ভেবে বসেছি।

পুলিস-ভ্যানে যেতে যেতে এস-আই ভদ্রলোক নানারকম গল্প করছিলেন। বাজারে জিনিসপত্তরের দাম কি রকম হু হু করে বাড়ছে, আজকালকার মেয়েদের চরিত্র, হিন্দি সিনেমা। হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, দরজাটা কে ভাঙলো, আপনি?

আমি সচকিত হয়ে বলে উঠলাম, না না, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, রায়বাবু। কিন্তু আমার খুব রাগ হলো। এই কথাটা আমি তো ওঁকে এর আগেও দু'বার বলেছি। তবু উনি আবার জিগ্যেস করছেন কেন!

'বাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে ডাকুন একবার', এস-আই নামতে নামতে বললেন। তাঁর পিছনে পিছনে দু'জন সিপাহী নামল। দু'জন মুদ্দোফরাস।

আমি রায়বাবুকে চিৎকার করে ডাকলাম। উনি ওপরতলা থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিতেই বললাম, আপনাকে ডাকছেন একবার। উনি যেন বুঝতেই পারছেন না এমন মুখভাব করে বললেন, আমাকে কেন আবার। বললেন বটে—কিন্তু বোঝা গেল উনি নেমে আসছেন।

আমরা যখন ভিতরে ঢুকছি, পাশের বাড়ির মিলি, কলেজে পড়ে, টুকাইকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে বললে, বাবা তখন বাজারে গিয়েছিল, ডেকে দেবো? বললাম, না না। পুলিসটুলিস দেখে মিলি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বললে, মা আপনাদের জন্যে রান্না করছে, আজ আমাদের ওখানে খাবেন।

আমি ঘাড় নেড়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। পিছনে পিছনে ওরা সকলে। ঐটুকুন তো জায়গা, সরু বারান্দা, সব যেন ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। এস-আই ভদ্রলোক হঠাৎ বাড়িওয়ালাকে জিগ্যেস করলেন, খিল দেওয়া ছিল ভিতর থেকে, ইউ আর সিওর? বাড়িওয়ালা অবাক হয়ে তাকালো, কোনো কথা বললো না। এস-আই বললেন, আই মীন দরজাটা যখন ভাঙলেন আপনি?

বাড়িওয়ালা নির্বিকার ভাবে বললেন, মানে, সবাই তো ধাক্কাধাক্কি করছিলেন, ঠিক মনে নেই, হ্যাঁ এসেছিলাম আমি, বোধহয় লাথিও মেরেছি দরজায়। তারপর অমায়িক হেসে বললেন, বুঝতেই পারছেন, ওসময় কে কি করেছি ঠিকঠিক মনে রাখা...

দেখেছো, দেখেছো, লোকটা এখন কেমন কেটে পড়তে চাইছে, মনে মনে নিজেকে বললাম। রাগ চেপে মুখে হাসি এনে বললাম, রায়বাবু, আপনিই তো দরজা ভাঙলেন,—আমার স্ত্রীকে জিগ্যেস করুন না, ও তো দেখেছে...

এস-আই হেসে হেসে হাতের ইশারায় আমাদের দু'জনকেই থামতে বললেন,

আর তাঁর মুখে হাসি দেখে আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম।

তিনি এবার রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, অদিতি দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর এস-আই ভদ্রলোক জুতো খুলতে যাচ্ছিলেন ভিতরে ঢোকার জন্যে, অদিতি বলে উঠলো, 'জুতো খুলতে হবে না আপনাকে', বেশ নরম করে বললো, এস-আই হাসলেন, বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক, সবই তো ধোয়াধুয়ি করতে হবে,' বলে জুতো পরেই ভিতরে ঢুকলেন। মৃতদেহটা বোধহয় ততক্ষণে ভারী হয়ে গিয়েছিল, উপুড় হওয়া ডেড বডিটাকে চিত করতে বেশ কসরত করতে হলো তাঁকে, তারপর একবার উনোনটার কাছে গিয়ে কি দেখলেন, কোণে কিছু কয়লা কাঠকয়লা ছিল, জিগ্যেস করলেন, কাঠ-কয়লা তো? অদিতি পিছন থেকে বলে উঠলো, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি থাকলে, যেদিন আঁচ নেমে যায়, কয়লা তো ধরাতে দেরি হয়...এস-আই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে দরজার খিল লাগানোর ওপরের যে আংটাটা ছেড়ে গিয়ে ঝুলছিল সেটা দেখলেন, বললেন, দরজা জানলা বন্ধ ছিল? আই সী, ভেন্টিলেটর নেই? তারপর হঠাৎ একসময় ডেড বডির উপর ঝুঁকে পড়ে বিস্ময়ের সংগে বললেন, এ কি, ইনজুরি রয়েছে যে!

'এ কি, ইনজুরি রয়েছে যে!'

কথাটা একটা ধাক্কা দিলো আমার বুকে। আমি একবার অদিতির মুখের দিকে তাকালাম, অদিতি আমার মুখের দিকে তাকালো। দু'জনের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

আমরা তো ঢুকতে পাচ্ছিলাম না। ঐ ছোট্ট এক চিলতে ঘরে কি করেই বা ঢুকবো। তাছাড়া এস-আই হয়তো আমাদের ঢুকতে নিষেধ করতেন। কিন্তু উঁকি মেরে আমি দেখতে পেলাম, ছেলেটার কনুইয়ে হাঁটুতে, আরো কোথায় কোথায় যেন ছড়ে যাওয়ার, রক্ত জমে যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে। সকাল থেকে এতবার দেখেছি, একবারও চোখে পড়েনি।

এস-আই বললেন, চলুন, কোথাও একটু বসতে হবে। বলে এদিক ওদিক তাকালেন। নিজেই ঘর দু'খানা, বারান্দা, বাথরুম সব দেখলেন, তারপর আমি তাঁকে নিয়ে এসে বসার ঘরে বসতে বললাম। বসার ঘর সেটাকে বলা যায় না অবশ্য। আলমারী, বুক-কেস, টেবিল, টুকিটাকি আরো সব জিনিস রেখে যেটুকু জায়গা ছিল, তিনখানা চেয়ার রেখেই সেটুকু টইটুম্বুর। আর আলমারী টেবিল না রেখেই বা কি উপায়, শোবার ঘরখানাও এতই ছোট যে খাট আর আলনা আর একখানা বড় আয়না রেখেই সব দেয়ালগুলো জোড়া হয়ে গেছে। তারও ভাড়া কিনা দুশো টাকা। এস-আই বসে টুকটাক প্রশ্ন করতে করতে খসখস করে কি সব লিখে গেলেন। পড়ে শোনালেন। তারপর বললেন, দিন, সই করে দিন একটা। রায়বাবুকেও সই করতে বললেন। 'আমাকে আবার কেন?' অস্ফুটে এ-কথাটা বলে রায়বাবুও সই করে দিলেন। মুদ্দোফরাস দু'জনকে ঘাড় ঝাঁকিয়ে ইশারা করতেই তারা মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর এস-আই আবার

একবার রান্নাঘরে এলেন, তারপর ঘেন্নার সঙ্গেই যেন পালানের বিছানাটা দু' আঙুলে ধরে তুলতে গিয়ে বলে উঠলেন, কি ডার্টি রে বাবা! বলেই সিপাহীদের ইশারায় বিছানাগুলোও নিয়ে যেতে বললেন। দরজার খিল আঁটার যে আংটাটা ছেড়ে গিয়েছিল সেটা দেখিয়ে বললেন, এটা এখন সারাবেন না।

চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, আপনি বিকেলের দিকে একবার আসবেন থানায়।

'এখন রান্নাঘরটা ভাল করে ধুয়ে মুছে নেবো?' অদিতি প্রশ্ন করলো ওঁকে। উনি বললেন, হ্যাঁ, ফিনাইল কিংবা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে দেবেন।

ওঁরা চলে যাবার পর সমস্ত বাড়িটা কেমন খাঁ খাঁ করতে লাগলো। বুকের ভেতরটাও। আমার তখন নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হচ্ছে। বুকের মধ্যে কেমন একটা দুঃসহ শূন্যতা।

অদিতি কখন এসে মোড়াটার ওপর বসেছে আমি লক্ষ্যই করিনি। দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিলাম, মুখ তুলতেই দেখলাম অদিতি থমথমে মুখে চুপচাপ বসে আছে। ধীরে ধীরে বললে, পুলিসের লোকটা কি বললে? বললে কিছু? *কিছু হবে না তো?*

আমি সাহস দেবার জন্যে বললাম, কি আবার হবে! আমরা তো আর দায়ী নই।

দায়ী নই, দায়ী নই। একথাটা আমি বারবার নিজেকে বলেছি সকাল থেকে। কিন্তু তা হলে কে দায়ী? এস-আইয়ের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'আই সী, ভেন্টিলেটর নেই?' আমি হঠাৎ দুম করে বলে উঠলাম, দায়ী তো ঐ ব্যাটা নটবর। রান্নাঘরে একটাও ভেন্টিলেটর রাখেনি। কথাটা বলার পর আমার কেমন যেন অস্পষ্টভাবে মনে হলো আমি একটা পরম সত্য উচ্চারণ করে ফেলেছি। কোথাও কোন ভেন্টিলেটর নেই। কোথাও নেই।

আবার সমাজ-টমাজ এর মধ্যে আনছি কেন। কথায় কথায় সমাজের কথা তো মানুষ টেনে আনে নিজের অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

'কি ডার্টি রে বাবা!' এস-আইয়ের কথাটা যেন সপাং করে আমার মুখের ওপর চাবুকের মত পড়েছিল। আমি অপ্রতিভ বোধ করেছিলাম। আমার নিজেরও তখন বিছানাটা খুব নোংরা লেগেছিল। তেলচিটে তুলো বেরোনো তোষকটা ব্যবহারে ব্যবহারে শতরঞ্জির মত পাতলা হয়ে গেছে। বালিশটায় দুর্গন্ধ। অথচ কোনদিন ওদিকে আমার চোখ যায়নি। যাবার কথাও না। এসব তো অদিতির এলাকা। ও কেন দেখেনি। আজ সেজন্যেই তো বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ হতে হলো। যেন ঐ কথাটার আড়ালে এস-আই বলতে চেয়েছেন, আপনার মধ্যে মশাই মনুষ্যত্ব নেই। নিঃশব্দে অপমান হজম করতে হয়েছে বলেই অদিতির ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল।

আমি তাকে রুক্ষ গলায় বললাম, ঐ বিছানায় ও শুতো?

অদিতি চুপ করে রইলো। কিছুক্ষণ পরে বললে, একটার পর একটা এসেছে আর পালিয়েছে। ওরা সবাই তো অমন নোংরা করে রাখে। রোজ রোজ কত আর নতুন বিছানা দেওয়া যায়।

আমি বললাম, কাল তো দারুণ শীত গেছে, বেচারা বোধহয় সেজন্যেই

বারান্দায় ঘুমোতে পারেনি, দরজা জানালা বন্ধ করে আরামে ঘুমোতে চেয়েছিল। একেবারে ঘুমিয়ে পড়লো। বলে দুঃখের হাসি হেসে আমি তাকালাম অদিতির দিকে।

অদিতি মুখ নীচু করে ছিল, ওর চোখ থেকে টপ করে এক ফোঁটা জল ওর কোলের ওপর পড়ল।

অদিতি হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।—ওর বাবাকে আমি কি বলব, কি বলব বলো তো!

আমি নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ওর বাবাকে একটা খবর দিতে হবে। কি ভাবে দেবো! আমি তো তার ঠিকানা জানি না। বুড়োটা মাঝে মাঝে এসে ছেলেকে দেখে যেত, মাসের মাইনেটা নিয়ে যেত। পালান যদি বলতো, দেশে যাবো, বড় মন-কেমন করে, তা হলে ওকে বোঝাতো, বলতো,—যাবি যাবি। নিয়ে যাবো আমি, পুজোর পর নিয়ে যাবো। আমরা অবশ্য ওকে বোঝাতে বলতাম, যাতে ও দিনকয়েকের জন্যেও না আমাদের অসুবিধে ঘটায়।

বুড়োর ঠিকানা একজনই জানতো। মিলিদের সেই চাকরটা কোন দোকানে কাজ পেয়ে চলে গেছে। একবার গিয়ে খোঁজ করে দেখতে হবে। র‍্যাশন দোকান-টার কাছে কোথায় যেন। পালানের বাবাকে যে করে হোক খবরটা জানাতে হবে।

এই তো ক'মাস আগের কথা। রোগা রোগা চেহারা লাজুক লাজুক মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ালো। অজ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, চোখে তখনো দাম-শ্যাওলার আভা, মুখে নিকোনো উঠোনের ঠান্ডা প্রলেপ। এই তো সেদিন ওর বাপের পায়ে গা সেঁটে দিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক অবাক চোখ মেলে সব দেখছিল। এল আর মরে গেল।

পালান ছেলেটাই প্রথম নয়। তারও আগে তিন-চারটে এসেছে গেছে। রামু, বিশ্বনাথ। তখন টুকাই বোধহয় দু'বছরের। তখন আমাদের নতুন সংসার, এত তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠতাম না। না আমি, না অদিতি। ঐ আলমারী বাক্স মালপত্রে ঠাসা বসার ঘরখানায় ওদের শুতে দেওয়া হতো। তখনো আমরা সংসারে কিছুটা অনভিজ্ঞ, তখনো আমাদের শরীরে মায়াদয়া ছিল। কিন্তু বিশ্বনাথ, বিশ্বনাথই বোধহয় প্রথম সেটুকু কেড়ে নিয়ে চলে গেল। রাত্রে কখন আলমারীর তালা ভেঙে জামাকাপড় ঘড়ি আংটি নিয়ে পালালো। সামান্য কিছু টাকাও। আলমারীটা আমাদের শোবার ঘরে এনে রাখার জায়গা নেই, জানালা খোলা যাবে না, আর শুধু আলমারীটা আনলেই তো হবে না, আরো তো জিনিস আছে। তখন থেকেই তো ঐ ঘরখানা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল, রাত্রে তালা দিয়ে রাখা শুরু হলো। আর ওদের শোবার জায়গা হলো ঐ মাঝখানের প্যাসেজটা, যাকে বারান্দা বলেছি। একতলায় এছাড়া আবার বারান্দা কোথায়।

মধ্যবিত্ত মানুষগুলো কি ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল। বড়লোকদের মতই। বিশ্ব-চরাচরে কোথায় কি অনাচার অবিচার চলছে সে বিষয়ে সব সময়ে সচেতন, শুধু নিজের গৃহকোণটির বেলায় একেবারে অন্ধ। আহা বেচারা পালান, ঐটুকুন বাচ্চা, শুধু একটা পুরোনো শতরঞ্জির মত পাতলা তোষক পেতে আর একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়ে ঠান্ডা মেঝেতে শুতে হয়েছে ওকে। কাল যা হাড়-কাঁপানো শীত গেছে, বেচারা পারেনি, সেজন্যেই হয়তো রান্নাঘরে শুতে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেই গিয়েছিল তো? না কি ও শীতে কাঁপছে দেখে অদিতি ওকে পরামর্শ

দিয়েছিল!

আমার হঠাৎ মনে হলো আমি অযথা সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি। শীত কি সকলের কাছে এক রকম নাকি। ওরা পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। হোক্ নোংরা, হোক্ না পুরোনো, চাদর কিংবা কম্বল কি গরীবদের জোটে নাকি!

পালান তো প্রথম নয়। তার আগেও তো অনেকেই এসেছে গেছে। সেজন্যই তো র‍্যাশন কার্ডে আর নাম বদলানো হয় না। রামু, রামেশ্বর নামটাই চলে আসছে।

একটা কথা মনে পড়ে যেতে আমি হেসে ফেলতে গিয়েও হাসিটা চেপে দিলাম। অদিতি হয়তো বলবে, এ সময়েও তোমার হাসতে ইচ্ছে করছে! আর কি মনে পড়ে যেতে হেসেছি, জানলে ও আরো অবাক হবে। ব্যাপারটা হলো একজনের নাম বদলানো নিয়ে। মা বেঁচে থাকতে, মনে আছে, চাকর-ঠাকুরের নামের সঙ্গে শ্বশুর ভাশুর কারো নামের সামান্য মিল থাকলে মা তার নামটা বদলে দিতো। কিন্তু অদিতি তো একালের মেয়ে, গ্র্যাজুয়েট, তাই ওর ওসব বালাই নেই। তাছাড়া সেই বাচ্চাটার নামটা বেশ ভালই ছিল, আর ও নামের কোন আত্মীয়স্বজনও আমাদের নেই।

তবু অদিতি তাকে বলেছিল, তোকে হরি বলে ডাকবো।

আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, কেন, সন্দীপ তোমার ফরমার লাভারের নাম বুঝি?

দু' পক্ষেরই মেজাজ ভাল থাকলে কোন্ স্বামী না এমন দু'একটা রসিকতা করে! অদিতি অবশ্য গায়ে মাখতো না, বরং সমান তালে তাল দিতো। ও হেসে উঠে বলেছিল, আরেকজনের সঙ্গে যে তুলনা করে দেখবো, সে সময়টুকুও তো দাওনি, কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে ছায়ার মত পিছু নিয়েছো।

এটা অবশ্য ওর বাড়িয়ে বলা। কারণ ও তো তখন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যেতে শুরু করেছে। আমিও যেতাম।

তারপর প্রেমফ্রেম শেষ করে বিয়ের পর একতলার এই সংক্ষিপ্ত আশ্রয়টুকুতে এসে যখন দু'জনে সংসার পাতলাম তখন তো জমাখরচ মেলাতেই অস্থির। ঝি-চাকর রান্নার লোক রাখার মত বিলাসিতার কথা ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতে দু'দুটো লিফট হলো। একটা অফিসে, আরেকটা সংসারে। অদিতি মা হলো।

কাজ বাড়লো তখন থেকে। আরো বাড়লো টুকাইকে স্কুলে ভর্তি করার পর।

অদিতির তখন একটাই বায়না। রসিকতা করে বলেছিলাম, তুমি সোনা চাও না, রুপো চাও না, তুমি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার চাও না, তুমি লাক্সারি ফ্ল্যাট চাও না, জড়োয়া গহনা চাও না, মোটরযান চাও না, ফ্রীজ চাও না, রেডিওগ্রাম চাও না, বেনারসী শাড়ি কিংবা কাশ্মীরী ক্লোক চাও না, কালো টাকা রাখার জন্যে ব্যাঙ্কের লকার চাও না...

অদিতি হাসতে হাসতে বললে, জাগতিক কোন সম্পদে আমার প্রয়োজন নাই, আমি কেবল তোমাকে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে কোন খুশির আভাস ফুটে উঠেছিল কিনা জানি না, ও বলে উঠেছিল, খুব হয়েছে, খুব হয়েছে, অত গর্বে নাক ফোলাতে হবে না।

বলেই মৃদু হেসে আমার বলার ভঙ্গি নকল করে টেনে টেনে বলেছিল, আমি সোনা চাই না, রূপা চাই না, আমি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার চাই না, লাক্সারি ফ্ল্যাট চাই না, আমি শাড়ি, গাড়ি, ফ্রীজ, রেডিওগ্রাম চাই না, কালো টাকা রাখার জন্যে ব্যাঙ্কের লকার চাই না, আমি শুধু একটি বালক ভৃত্য চাই।

আসলে বিয়েতে উপহার পাওয়া বইগুলোর মধ্যে একখানা বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ছিল, সেটা দুজনেই তখন একটু একটু করে পড়ছি।

এখন আর বইটই ছুঁয়ে দেখার সময় পাই না। কারণ অদিতি যা যা চাই না বলেছিল, এখন তার সবই একে একে পেতে চায়। তাছাড়া সংসারে সুখ স্থায়ী হতে পারে, একমাত্র বালক ভৃত্যটি যদি স্থায়ী হয় তবেই। কিন্তু সেটাই সবচেয়ে দুর্লভ। সেই সরল স্নিগ্ধ বালিকাটি, যাকে একদা ছায়ার মত দিনের পর দিন অনুসরণ করেছি, যার মুখের দিকে তাকিয়ে এবং মুখের কথায় মুগ্ধ হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গাছের তলায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, লেকে, আউটরামে অফুরন্ত সব স্বপ্নের বুদ্বুদ উড়িয়েছি, সেই শান্তস্বভাব সুন্দর মেয়েটি বিনা নোটিসে বাচ্চা চাকরটি পালালেই এখন কেমন রুক্ষ রূঢ় এবং খিটখিটে হয়ে ওঠে।

আমার নিজের মেজাজও যে বিগড়ে যায় না এমন নয়। সকালে খবরের কাগজ এবং চায়ের কাপ টেনে নিয়ে আনমনে যখন সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখি প্যাকেট শূন্য, তখন নাকি আমার নিজেরও মুখের চেহারা বদলে যায়। অদিতি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল। বৃষ্টির দিনে বাজার, থলে হাতে র‍্যাশন, কিংবা হঠাৎ প্রয়োজনে কোডোপাইরিন কিংবা নোভালজিন আনতে হলে জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবারই কথা।

একবার তো নিরুপায় হয়ে পাড়ার মিষ্টির দোকানে বলেছিলাম, একটা লোক দেখে দিন না, কাজের লোক, একটু বাচ্চা দেখে। আসলে বাচ্চাগুলো খুব চটপটে হয়, ফাইফরমাশ করা যায় তাদের, মুখে হাসি লেগে থাকে।

মিষ্টির দোকানদার বলেছিল, দোব, আছে হাতে, পাঠিয়ে দোব।

পরের দিনই একজন এসে হাজির। দরজা খুলে তাকে দেখেই অদিতি ভিরমি খায় আর কি। ভিতরে ভিতরে ভয় পেয়ে হাত নেড়ে 'না না, চাই না' বলে তাকে বিদেয় করে দিয়েছিল। আর আমি অফিস থেকে ফিরতেই হেসে লুটোপুটি।

দু'হাতে গোঁফ পাকাবার ভঙ্গি করে বলেছিল, তোমার কাণ্ড, ইয়া গুণ্ডার মত চেহারা, তাকে বাড়িতে রেখে খুন হই আর কি!

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও কোন লোক জোটাতে পারছিলাম না। ঠিকে ঝি ছিল একটা, সে এসে ঘর মুছে দিয়ে যেত, বাসনটাসন মেজে দিয়ে যেত। একটাই বায়নাক্কা ছিল তার, কাপড় কাচবে না। তবু তাকে দিয়ে কাজ চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেও আসা বন্ধ করলো। জানা গেল, স্বামীটা তার বেধড়ক মেরেছে নাকি তাকে, রাস্তায় কার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে দেখে। তাছাড়া মাসমাইনে সবই তো স্বামীটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মদ গিলে আসে, কাজ করে তার কি লাভ!

অদিতি তখন চোখে অন্ধকার দেখছে। টুকাইয়ের স্কুল খুলে গিয়ে আরো বিভ্রাট। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন সোয়া আটটার মধ্যে স্নান করে খেয়েদেয়ে ইউনিফর্ম পরে ওকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বড় রাস্তার মোড়ে। স্কুলবাস অ্যাদ্দুর অবধি আসতে নারাজ, আবার ঐটুকুন ছেলে, ওকে তো একা ছেড়ে দেওয়া যায়

না। তাই অদিতিকে কিংবা আমাকে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসতে হতো। বাসগুলোও আবার নিজের মর্জিতে চলে, এক একদিন অপেক্ষা করে করে পায়ে ব্যথা হয়ে যেত, টুকাই শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে স্কুলব্যাগটার ওপরই বসে পড়তো। অথচ সেই সময়টাই সবচেয়ে তাড়াহুড়োর, বাজার থেকে ফিরে আমাকেও অফিসের জন্যে তৈরী হতে হয়। অদিতি তখন রান্নায় ব্যস্ত, কোনদিকে চোখ দেবার সময় পেত না। এদিকে দেরি হলেই কলের জল চলে যাবে, বাসি কাপড় সব ডাঁই হয়ে পড়ে থাকবে, আধ বালতি জলে স্নান সারতে হবে অদিতিকে।

এই জল নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া। ও'র ওদিকে একটা বড় চৌবাচ্চা আছে, সেটা ভর্তি হয়ে জল উপচে পড়ে যাবে, তবু কল বন্ধ করবেন না ভদ্রলোক। অথচ ঐ কলটা বন্ধ না করলে আমাদের এপাশে জল আসে চুরচুর করে, বালতি ভর্তি হতে আধ ঘন্টা। দোতলায় ও'র চব্বিশ ঘন্টা পাম্পের জল, তবু আমাদের বাঁধা সময়ের কর্পোরেশনের জলেও ভাগ বসানো চাই। এটুকুই ও'র বিলাস।

মিলির মা লোকটি ভাল। অদিতির সঙ্গে তাঁর জানালায় জানালায় কথাবার্তা। তিনি অদিতির অবস্থা দেখে সমবেদনা জানাতেন। মোটাসোটা বয়স্ক মানুষ, দু'একটা উপদেশও দিতেন, আবার সহানুভূতির গলায় জিগ্যেস করতেন, লোক পেলে না বউমা? অদিতিকে মিলির মা বউমা বলেই ডাকতেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টাতেই লোক জুটলো। তাঁদের চাকরটাই তার দেশ থেকে চিঠি লিখে আনালো।

রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমি একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। ঠুং ঠাং বাসনের শব্দে বুঝতে পারছিলাম অদিতি এঁটো থালাবাসন নিয়ে গিয়ে কলঘরে রাখছে। আর তখনই কে দরজায় কড়া নাড়লো।

আমি উঠে যাওয়ার আগেই অদিতি গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে খিল খুলেছে, ডান হাতটা পিছনে রেখে, ডান হাত ছাইমাখা, বোধহয় বাসন মেজে রাখছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে অদিতির মুখে উজ্জ্বল খুশি উপচে পড়লো। ভাবলাম আমার মেজবউদি কিংবা অদিতির দাদা এসেছে হয়তো, তা না হলে ওর সারা-মুখ হাসি হয়ে যাবে কেন। না, সে-সব কিছু নয়। মিলিদের চাকর, তার পিছনে বুড়ো গোছের একটা গ্রাম্য মানুষ, আর তার গা ঘেঁষে তার পায়ে ঠেস দিয়ে বছর বারো বয়সের শান্তশিষ্ট একটি ছেলে। রোগা রোগা চেহারা, লাজুক লাজুক মুখ। অজ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, চোখে তখনো দাম-শ্যাওলার আভা, মুখে নিকোনো উঠোনের ঠান্ডা প্রলেপ।

—আপনি লোক চেয়েছিলেন, মা বলেছিল আমাকে দেশ থেকে আনাতে। মিলিদের চাকরটা অদিতিকে বললে, আমার জানা, খুব বিশ্বাসী লোক। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আমি যাই দাদাবাবু, আপনারা কথাবার্তা বলে নিন।

অদিতি বুড়োটাকে ভাল করে দেখলো, মুখচোখ দেখে ঠিক বিশ্বাসী মনে হয় কিনা। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল, বাচ্চা ছেলেটাকে ওর বিষম ভাল লেগে গেছে। আমারও। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল ও।

ছেলেটা একটু লাজুক ভাবে, কিংবা অপরিচিত জায়গায় ভয় পেয়ে বুড়োটার পায়ে গা সেঁটে দিয়ে অবাক চোখে এদিক ওদিক দেখছিল।

অদিতি বুড়োটাকে প্রশ্ন করলে, তোমার ছেলে? তারপর হেসে উঠে বললে, এইটুকুন বাচ্চা, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে তো?

বুড়ো স্নেহের ও আদরের হাড় জিরজিরে হাতখানা ছেলের পিঠের ওপর

চাপিয়ে বললে, পারবে মা ঠাকরুন, পারবে। বাবুদের বাড়ি থাকবে, তার কষ্ট কি!

তারপর একটু থেমে বললে, বড় আকাল যাচ্ছে মা, ঘরে ভাত নাই। আপনার ইখানে চাট্টি খেতে পাবে, মাইনা পাবে। এই বাজারে পাঁচ পাঁচটা হাঁ, নিজেরই ভাত মেলে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ির মুখখানা হাসলো।

আমি বললাম, কত মাইনে নেবে? ও তো বাড়িতে কাজ করেনি আগে, কিছুই জানে না, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

বুড়োটা মাথা নীচু করে শুধু হাসলো। তারপর বললে, আপনিই বলেন।

ছেলেটা কোন কথাই বলছিল না, আমাদের কোন কথাবার্তায় ওর কানই ছিল না। যতবার ছেলেটার দিকে তাকাচ্ছি, ততবারই ও মুখ ঘোরাচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিচ্ছে লজ্জায়।

আমি বললাম, কি রে, পারবি তো থাকতে?

ও মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো। তারপর বাপের খোঁচা খেয়ে ঘাড় নাড়ালো পায়ের দিকে তাকিয়ে।

—কত নেবে, বল ঠিক করে। আমি বুড়োটাকে বললাম।

বুড়োটা আবার হাসলো।—আপনি বলেন। টাকার নেগেই তো আসা বাবু। মা নাই, একফোঁটা ছেলে, টাকার নেগেই তো আনলাম।

অদিতি বলে উঠলো, মা নেই? আহা! তারপর মৃদু হেসে গলার স্বর খুব নরম করে জিগ্যেস করলো, তোর নাম কি?

ছেলেটা নাম বললো না, বাপের কোমরে মুখ গুঁজে দিল।

বুড়োটাই নাম বলে দিলো তার।—আজ্ঞে পালান।

অদিতি বুঝতে না পেরে আবার প্রশ্ন করলো, কি নাম? এমন নাম তো কখনো শুনিনি, তাই আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি।

বুড়োটা না-কামানো সাদা দাড়িতে হাত ঘষতে ঘষতে বললে, আজ্ঞে পালান্। তারপর কেমন যেন অদ্ভুত হেসে উঠে বললে, ছেলে ঐ একটাই। দু-দুটো হয়ে মরে গেল, ওর ঠাক্‌মা বললে, নাম রাখ পালান্। তবে যদি ভগমান রাখে। তা জন্মের পর ওর মা'টাই পালালো।

মনে হলো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো লোকটা, অস্ফুটে বললে, মা নাই।

অদিতি যেন তার দুঃখের ভাগ নিচ্ছে এমন মুখভাব করলো। কিংবা সত্যি হয়তো একটু দুঃখ হলো ওর বুড়োটার জন্যে, কিংবা মা-মরা ছেলেটার জন্যে।

কুড়ি টাকায় রফা হয়ে গেল, পুজোর সময় জামা-প্যান্ট।

বুড়োটা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ওর মাথায় হাত দিয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক কিছু বোঝালে। সুস্থির হয়ে থাকবি, মন দিয়ে কাজ করবি। কথা শুনবি বাবুদের।

তারপর বললে, আমি আসবো মাসের মাস, মাইনা নিয়ে যাবো। ঐটুকুন ছেলে, ওর হাতে টাকাপয়সা দিবেন না।

আরো কিছুক্ষণ ছেলেকে আদর করে ধুতির কোচড় খুলে শালপাতায় মোড়া দুটো জিলিপি দিলো ছেলেকে—নে খা।

ছেলেটা হাতে করে নিলো শালপাতাটা, কিন্তু খেলো না।

বাপ চলে যাচ্ছে দেখে উঠোন অবধি এসে দাঁড়িয়ে রইলো, বাপের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

২

মিলির বাবা শিবশঙ্করবাবু স্পষ্টবক্তা মানুষ। দীর্ঘ ঋজু চেহারা, ছোট করে চুল ছাঁটেন, সোজা হয়ে হাঁটেন, জোরে জোরে কথা বলেন। ঘাড়ের অর্ধেক চুল পাকা। বয়সে আমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড়। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, লোকটার ভিতরে একটা লুকোনো শক্তি আছে।

এসে একেবারে আমাদের খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। বললেন, বাজার থেকে ফিরে শুনলাম এত সব কান্ড হয়ে গেছে। আরে মশাই, আপনি ইয়ং ম্যান, এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে। দিন কয়েকের ঝামেলা, এই যা।

ওঁকে পেয়ে, ওঁর কথা শুনে আমি যেন অনেকখানি সাহস পেলাম। নার্ভাস হাসি হেসে বললাম, কি জানি, পুলিসে ছুঁলে তো আঠারো ঘা। শুনেছি তো পোস্টমর্টেম হবে। এস-আই—কি মুখার্জি যেন—যিনি এসেছিলেন, বিকেলে একবার যেতে বলে গেছেন, কি জানি কেন।

শিবশঙ্করবাবু হাসলেন, আরে না না, ও কিচ্ছু না। তবে লোক বলিহারি আপনার ল্যান্ডলর্ড, উনি নাকি এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন!

আমি হাসলাম, আপনাকে কে বললো?

—কে আবার বলবে, জানলায় জানলায়। বলে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিয়ে হাসলেন আবার।

আর আমার মনে হলো অদিতি এটা অন্যায় করেছে। অন্যায় কিংবা বোকামি। এ সব কথা এখন বাইরে রাষ্ট্র করা উচিত নয়। কার মনে কি আছে কে জানে। গুজব ছড়াবে. কিংবা ফাঁসিয়ে দিতে চাইবে। কি বলবে কে জানে। অনেকদিন আগে, যে-পাড়ায় থাকতাম, একটা বাড়ির গ্যারেজে, আগেকার দিনের সেই উঁচু গ্যারেজে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ড্রাইভারটা। সঙ্গে সঙ্গে পাড়াময় কি সব কুৎসা ভদ্রলোকের মেয়েদের নামে। এই যে বাইরে আমরা যাদের ভদ্রলোক বলি, তাদের মত নোংরা মন আর বোধহয় নেই। একটা সহজ জিনিসকে সহজ ভাবে নিতে জানে না। লোকে বলতে শুরু করলো, ভদ্রলোক হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে রেগে গিয়ে ড্রাইভারকে গলা টিপে মেরে ফেলে, তারপর গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। একজন তো ঠাট্টা করে বলেছিল, সুইসাইড করার কি আর জায়গা নেই। কুৎসিত। কুৎসিত। এদের বাইরের পোশাক যত ধোপদুরস্ত, ভিতরটা ততই নোংরা।

কিন্তু তার চেয়েও বড় আশঙ্কা, অদিতির কথাটা না বাড়িওয়ালার কানে যায়। লোকটার সঙ্গে তো এতকাল অহি-নকুল সম্পর্ক। শুধু তুলে দিয়ে বেশী ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে আনার তাল করেছে। কখনো কখনো একখানা থান ইঁট ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হয়েছে আমার। কিন্তু এখন আমি ঐ লোকটার সঙ্গে তোষামোদের ভঙ্গিতে কথা বলছি। কারণ রায়বাবুই এখন আমার প্রধান সাক্ষী। উনি বিগড়ে গেলে, জানি না, হয়তো ক্ষতি করতে পারেন।

আর এই শিবশঙ্করবাবু মানুষটি ভাল হলে কি হবে, ওঁর প্রধান দোষ চেঁচিয়ে কথা বলেন। আমার এই ঘর থেকে চেঁচিয়ে কথা বললেই দোতলায় ওঁর কানে পৌঁছে যেতে পারে। এস-আই মুখার্জি তখন কি সব লিখলেন, সই করালেন, তখন আমার মাথায় ভাল করে ঢোকেইনি। তখন তো আমি নার্ভাস

হয়ে গিয়ে চতুর্দিক অন্ধকার দেখছি। অ্যাম্বুলেন্সের নম্বর লিখে রাখিনি, ডাক্তার বাগচি এতদিনের পরিচিত, অথচ ওঁর নামটাও তখন বলতে পারছিলাম না।

আমার মনের মধ্যে সকাল থেকেই একটা প্রশ্ন জাগছে। এস-আই মুখার্জি বলে উঠেছিলেন, এ কি, ইনজুরি রয়েছে যে। আমি নিজেও দেখেছিলাম। ঐ ব্যাপারটা নিয়ে কোন ঝামেলা বাধবে না তো। ওটার গুরুত্ব কতখানি, বুঝতে পারছি না। অথচ শিবশঙ্করবাবুকে জিগ্যেস করতেও সাহস হচ্ছে না।

কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, পালানের বাবাকে খবরটা তো জানাতে হবে, অথচ কোথায় ঠিকানা লিখে রেখেছিলাম মনে পড়ছে না। আপনাদের গণেশ চাকরটাও তো চলে গেছে।

শিবশংকরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, ক্রিমিনাল!

আমার কথাগুলো বোধহয় উনি শোনেননি, অন্য কিছু ভাবছিলেন। কিন্তু উনি 'ক্রিমিনাল' বলে চিৎকার করে উঠতেই আমার বুকে এসে জোরে ধাক্কা লাগলো। উনিও কি আমাকেই অপরাধী ভাবছেন নাকি। আর কেউ ভাবুক না ভাবুক, আমি তো নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। শিবশঙ্করবাবু পালানের বুড়ো বাপটাকেই ক্রিমিনাল ভাবছেন হয়তো। মেজবউদি একবার বেড়াতে এসে পালানের চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিল, কি নির্দয় বাপ রে বাবা!

শিবশঙ্করবাবু আবার বললেন, আপনি যাই বলুন, আপনার ল্যান্ডলর্ড আসল কালপ্রিট। একটিও ভেন্টিলেটর রাখেনি মশাই? ক'টা টাকা খরচ হতো? বলুন।

আমি দোতলার দিকে আঙুল দেখিয়ে মৃদু হেসে বললাম, থাক্ থাক্। একটু চাপা গলায় বললাম, শুনতে পাবে।

শিবশঙ্করবাবু হঠাৎ যেন রেগে গেলেন, চুপ করবো কেন, স্পষ্ট কথা বলতে আমি ভয় পাই না। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। আপনিই বলুন না, যদি ভেন্টিলেটর থাকতো, মরতো ঐ বাচ্চা ছেলেটা?

কি আশ্চর্য. আমি ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে উঠছি। এই লোকটিকে এতদিন আমি পরম শুভানুধ্যায়ী মনে করে এসেছি। পরম বন্ধু। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে অদিতির এত অন্তরঙ্গতা। টুকাই তো বেশীর ভাগ সময় মিলির কাছে থাকে। অথচ এখন আমি ওঁকে সহ্য করতে পারছি না। বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা রাগ যেন ছিপি খুলে ছিটকে বেরিয়ে এসে বলতে চাইছে, বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে। আপনি আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। বাড়িওয়ালাকে এখন আমার তোয়াজ করে রাখা দরকার।

আমাকে জড়িয়ে দেবার জন্যেই উনি দরজাটা ভাঙলেন কিনা কে জানে। আমি না হয় তখন উদ্‌ভ্রান্ত, মাথার ঠিক ছিল না। কারণ ব্যাপারটা ঘটেছে আমারই বাড়িতে। বাড়িওয়ালা তো বলতে পারতো, ভাঙবেন না, ভাঙবেন না, পুলিশে খবর দিন বরং।

রায়বাবুকে আমি কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ লোকটা বাড়িওয়ালা। মালিক আর কর্মচারী, জমিদার আর প্রজা, বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে—ওরা দুটো পৃথক শ্রেণী. এদের স্বার্থ ভিন্ন, এরা কখনো এক হতে পারে না, একথাই তো জেনে এসেছি। অথচ শিবশঙ্করবাবু, তিনিও তো ভাড়াটে, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তবু মনে হচ্ছে কেন. তিনি এখন সরে পড়লেই আমি নিশ্চিন্ত।

আমি কোন একটা অজুহাতে শিবশঙ্করবাবুকে বিদায় করবার চেষ্টা করছিলাম, তখনই মিলি এসে হাজির হলো। বললে, দাদা, আপনি আজ আর আপিস যাবেন কিনা মা জিগ্যেস করলো। তারপর তার বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, বাবা, তোমার দেরি হয়ে যাবে না?

শিবশঙ্করবাবু খাটের ওপর পদ্মাসন হয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ, উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, চলি। আপনি তো এখনো স্নানটান করেননি।

আমি বললাম, না, কোথাও থেকে বরং অফিসে একটা ফোন করে দেবো।

শিবশঙ্করবাবু চলে গেলেন। আর মিলি বোধহয় অদিতিকে কিছু বলতে গেল। হয়তো খাওয়ার কথা।

এই কয়েকটা ঘন্টা যেন আমাদের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। প্রচন্ড একটা ঝড় বয়ে যাওয়ার পর গ্রামের চেহারা যেমন হয়, কোথাও খড়ের চাল উড়ে গেছে, গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে, শিকড় উপড়ে হেলে পড়ে আছে তাল গাছ, দূরে ছিট্‌কে পড়া পাখির বাসা, থেঁতলে যাওয়া পাখির ডিম...ছেলেবেলায় দেখা একটা ঝড় বয়ে যাওয়া গ্রামের মতই যেন আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের চেহারা, অদিতির, আমার নিজেরও। এতক্ষণে টুকাইয়ের কথা আমার মনে পড়লো। সকাল থেকে তার কোন খবরই রাখিনি, একবার শুধু মিলির সঙ্গে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম।

আমি মিলিকে ডাকলাম, ওর গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম, অদিতির সঙ্গে কথা বলছিল। বললাম, টুকাই তোমাদের বাড়ি আছে তো!

মিলি ওখান থেকেই জবাব দিলো, হ্যাঁ, মায়ের কাছে আছে ও। বলতে বলতে অদিতি আর ও এসে হাজির হলো। আর অদিতি বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, জানো, টুকাই না কিছু বুঝতে পারেনি, ওদের জিগ্যেস করছে পালানের কি অসুখ হয়েছে, ওকে কোথায় নিয়ে গেল!

মিলি একটুখানি চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে, মা বলছিল ওর খুব মন খারাপ হবে, মা খাইয়ে দিতে গেল—কিচ্ছু খেলো না।

ওর কথা শুনে টুকাইয়ের জন্যে আমার কষ্ট হলো। অদিতিরও সেই ভাবনা। বললে, ও বেচারী না অসুখে পড়ে!

আর আমার মনে হলো, শিশুদের মত নির্মল মন আমরা কেন ফিরে পাই না। কই, পালানের মৃত্যুর জন্যে আমার বুকের মধ্যে তো কোন কষ্ট নেই। কোন দুঃখ নেই। এখন আমার সমস্ত মন জুড়ে আছে একটা প্রবল দুশ্চিন্তা। সেখানে শোক একবারের জন্যেও উঁকি দিতে পারছে না।

সেই প্রথম দিনের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। পালান উঠোনে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, যে পথ দিয়ে তার বাবা চলে গেল সেই-দিকে চোখ মেলে। ওর হাতে শালপাতায় মোড়া দুটো জিলিপি। খেতে ভুলে গেছে, কিংবা খাবার ইচ্ছে মরে গেছে।

অদিতি ওকে ডাকলো, আয়, পালান, এদিকে আয়।

ও কোন জবাব দিলো না। ফিরে তাকালো না। তা দেখে টুকাই আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। টুকাই কখন আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমরা দেখিনি। কাছে গিয়ে টুকাই তখন ওর জামা ধরে টানছে। বারকয়েক টান দিতেই পালান ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। তারপর দুটিতে কি ভাব! দিনরাত এক সঙ্গে। তখনই গল্প করছে, তখনই ঝগড়া। পাঁচ বছরের টুকাই

কথায় কথায় শাসন করতো ওকে, আর সে শাসন হাসিমুখে মেনে নিত বারো বছরের ছেলেটা। এখন মৃত্যুর ওপারে দাঁড়িয়ে ওই যেন আমাদের শাসন করছে, ভয় দেখাচ্ছে।

বাপের বিরুদ্ধে ওর বোধহয় একটা প্রচণ্ড অভিমান ছিল। সেটা একটা ছোট্ট ঘটনায় বুঝতে পেরেছিলাম। পরের দিন সকালে, অদিতি তখন খুশি-খুশি, আমাকে হাসতে হাসতে এসে ডেকে নিয়ে গেল।—এই শীগগির এসো, দেখবে এসো। রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালো। দেখলাম। এক কোণে কুলুঙ্গির ওপর রাখা শালপাতায় মোড়া দুটো জিলিপি যেমনকার তেমনি রাখা আছে, খায়নি। একরাশ পিঁপড়ে তার চতুর্দিকে ব্যূহ রচনা করেছে।

বুড়ো বাপটাকে আমরা সে-কথা কোনদিন বলিনি। সে এসেছে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছে, একবার ওর দিদিটাকে নিয়ে এসেছিল, পালান ওর দিদির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিল। ওর বাবা যাবার সময় ওকে নানান উপদেশ দিয়ে মাইনের টাকাটা নিয়ে যেত। একবার মনে আছে, নাচতে নাচতে পালান ওর নতুন জামাটা বাপকে এনে দেখিয়েছিল। জামাটা পেয়ে ছেলেটা কি খুশি না কি খুশি!

অথচ এখন আর সেই ছেলেটার জন্যে কষ্ট নয়। এখন আমরা ভাবছি টুকাইয়ের কথা, ভেবে ভেবে সে না অসুখে পড়ে। এখন ভাবছি নিজের কথা, এস-আই মুখার্জি বিকেলে কেন দেখা করতে বললো। অদিতি নিজেও নিশ্চয় ভয় পাচ্ছে। যদিও মুখে সেটা প্রকাশ করছে না। সকাল থেকে রান্নাবান্নার কথা, খাওয়ার কথা ওর তো মনেই ছিল না। মিলির মা নিজে থেকে না বললে, আজ হয়তো খাওয়াই হতো না। অবশ্য খাওয়ার ইচ্ছেটিচ্ছেও বিশেষ নেই।

মিলি চলে যাওয়ার পর আমি অদিতিকে বললাম, একজন উকিলের সঙ্গে, অন্তত সুখেনের সঙ্গে, একটু পরামর্শ করলে হতো। বিকেলে আবার একবার থানায় যেতে বলে গেল, কি বলতে কি বলে ফেলবো...

অদিতি হয়তো ভাবলো কিছু, তারপর বললে, বাবার বন্ধু ছিলেন কে যেন, সেই বড় অ্যাডভোকেট, কেয়াতলায় থাকতেন।

বাবা মানে আমার বাবা। আসলে ও পরমেশ্বরবাবুর কথা বললো। তাঁর কাছে যাওয়ার কথা আমিও ভেবেছি। সৎপরামর্শই দেবেন নিশ্চয়। কিন্তু বড় ব্যস্ত মানুষ, মক্কেলরা সব সময় ঘিরে বসে থাকে। তাছাড়া সন্ধ্যের আগে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। অথচ থানায় যেতে হবে তার আগেই। এস-আই মুখার্জিকে অবশ্য খারাপ মনে হয়নি। রীতিমত ভদ্রলোক। কিন্তু পুলিসকে তো ঠিক বিশ্বাস নেই, ওরা নাকি সরল ব্যাপারকেও জটিল করে তুলতে ওস্তাদ। সবাই তো তাই বলে।

খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোন কাজটা আগে করবো! আপিসে একটা ফোন করতে হবে। অবশ্য এখন ব্যাপারটা জানানো চলবে না। সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কেউ কি আর বিশ্বাস করবে যে আমার কোন দোষ নেই। বিশেষ করে অফিসে আমার একটা লিফ্‌ট হওয়ার পর থেকে যতীন আমার ওপর খুব খাপ্পা। কিন্তু শুধু কি যতীনের ভয়? তা নয়, আমি নিজেই লজ্জিত বোধ করছি, নিজেই নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছি।

মিলিদের সেই চাকরটা, গণেশ, গণেশের খোঁজ করতে হবে পালানের বুড়ো বাপটাকে খবর দেবার জন্যে। কিন্তু এখনই খবর দেবো কিনা ভেবে ঠিক করতে পারছি না, সে যদি এসে আবার গোলমাল পাকায়। বলা তো যায় না। কিছু টাকা তাকে দিতে পারি, কিন্তু টাকা পেয়েই যে সে চুপ করে থাকবে তার স্থিরতা

কোথায়। হয়তো ডেডবডি দেখতে চাইবে, হয়তো থানায় যাবে। আর ঐ যে ইনজুরির কথা বললেন এস-আই মুখার্জি, যদি বুড়োকেও সে-কথা বলেন, তা হলে তো ভাবে আমরা ঠেঙিয়ে মেরেছি। আমার তো মনে হচ্ছে আগের রাত্রে ও কোথাও পড়ে গিয়েছিল, তা না হলে ঐ ছড়ে যাওয়ার, রক্ত জমে যাওয়ার দাগ-গুলো এল কোত্থেকে? না, আজ আর গণেশের খোঁজ করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং বলা যাবে খুঁজে পাইনি।

অদিতি তন্ন তন্ন করে লিখে রাখা সেই ঠিকানাটা খুঁজেছিল। পায়নি। তাই একবার বলেছিল, ওদের গণেশটার একবার খোঁজ নিয়ে দেখো। বাপ অন্তত মরা ছেলেকেও দেখে যাক্, তা না হলে বাপটা মরে যাবে, আহা বেচারী।

অদিতির আর কি! ওর তো শরীরে শুধু মায়াদয়া। কি থেকে কি হতে পারে সে-সব তো ভাবে না। অথচ ওকে বলাও যাবে না যে আমি ভয় পাচ্ছি, পালানের বাপটাকেও। যদি বা বুঝিয়ে বলি, এখন বুঝবে ঠিকই। কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর একদিন না একদিন ও আমাকে ভীষণ ছোট ভাববে। আর সকলের কাছে ছোট হওয়া যায়, অদিতির কাছে ছোট হবো কি করে।

ওর কাছে আমি কোনদিনই ছোট হতে পারিনি। সেই প্রথম দিকেও না। সে জন্যেই তো ও ঠাট্টা করে বলেছিল, আরেকজনের সঙ্গে যে তোমাকে তুলনা করে দেখবো সে সুযোগ দিলে কই, কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে ছায়ার মত পিছু নিয়েছো।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আমার যাওয়ার দরকার ছিল মাত্র কয়েকদিনের। কিন্তু অদিতি নেশা ধরিয়ে দিলো। কাজ শেষ হওয়ার পরও যেতে শুরু করলাম। একটা না একটা বই নিয়ে বসে থাকতাম। অদিতি কখন আসে, কখন আসে।

অদিতি তখন একা আসতো না, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে। প্রায়ই চোখাচোখি হতো, এমন ভান করতো যেন হঠাৎ চোখ পড়েছে। অথচ ওর সঙ্গে আরেকজন থাকতো বলেই আমার খুব সংকোচ হতো। যেচে কথা বলতে পারতাম না। বিশেষ করে কয়েকবারই দেখেছি, ও ওর বন্ধুটির সঙ্গে হাসাহাসি করছে। আমাকে উপলক্ষ করে কিনা বুঝতে পারতাম না। অথচ ওর চোখে চোখ রেখে তাকালেই আমি দেখতে পেতাম, ওর চোখে আমার জন্যে আসন পাতা রয়েছে।

আমি কোনদিনই হয়তো নিজের থেকে ওর সঙ্গে আলাপ করতে পারতাম না। এক-একদিন ও একা আসতো, তা সত্ত্বেও না।

অদিতি যখন লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্টপে এসে দাঁড়াতো, আমিও তখনই উঠে পড়তাম, বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে হেঁটে আসতাম। একদিন ও বাস পেয়েই চলে গিয়েছিল। সেদিন আমার নিজেকে বড় অপমানিত মনে হয়েছিল। আমার চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল। তাই পর পর কয়েকদিন ও চলে যাবার পরও আমি টেবিল ছেড়ে উঠিনি। অথচ বসে থাকতে গিয়ে বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে উঠেছে। তারপর আবার অভিমান ভুলে ওর পিছনে পিছনে আমিও হেঁটে এসেছি আগের মতই। একটু দূরত্ব রেখে। মনে মনে ঠিক করেছি, ওর সঙ্গে সেদিন আলাপ করবই। ও তো আর বাঘ ভালুক নয়, এত ভয় কিসের। আর সেদিনই দেখলাম আমি পেঁছনোর আগেই বাস এসে দাঁড়ালো। অদিতি একবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালো, কিন্তু বাসে উঠলো না। বাসটা চলে গেল।

ততক্ষণে আমি এসে পেঁছে গেছি।

বাসস্টপে দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছি না।

দুজনেই যেন পৃথক পৃথক ভাবে বাসের অপেক্ষা করছি। মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নিচ্ছি, কিভাবে আলাপ শুরু করবো। একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কত সহজেই তো আলাপ করা যায়। কিন্তু বুকের মধ্যে তার জন্যে একটুখানি জায়গা দিয়ে ফেললেই তখন আর কথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

—তুমি একটা কি বলো তো? সেদিন বাসে উঠেও কোন কথা বললে না। আমার এত রাগ হয়েছিল। অদিতি একদিন অনুযোগ করেছিল, আমার বোকামির কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে প্রাণ খুলে হেসেছিল। বলেছিল, আমি নিজে যেচে কথা না বললে, তুমি হয়তো কোনদিনই কথা বলতে না।

আমি হেসে বলেছিলাম, আহা, আমি কথা বলতে যাই, আর তুমি চিৎকার চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করো।

আমার কথা শুনে অদিতি সেদিন শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল। আর আমি খুব গর্বিত বোধ করেছিলাম। সে এক বিচিত্র গর্ব। যেন একটি পদ্মের কুঁড়িকে আমি ভোরের শিশির আর ঊষার আলো উপহার দিয়ে স্নিগ্ধ বাতাসের চামর দুলিয়ে একটু একটু করে তার পাপড়ি খুলে দিয়েছি।

, প্রথম আলাপের পর একদিন আমরা দুজনে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সামনের ঘাসে মোড়া একটি বৃক্ষছায়া বেছে নিয়ে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে বসেছিলাম। নিঃশব্দে ঘাসের শিস্ দাঁতে কাটতে কাটতে শুধুমাত্র উপস্থিতি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলাম। তারপর হঠাৎ কখন যেন অদিতি অনর্গল কথা বলতে শুরু করেছিল। তার নিজের কথা, বাড়ির কথা, পড়াশুনোর কথা। মনে হয়েছিল তার উনিশ-কুড়ি বছরের বুকের মধ্যে যত কথা জমা হয়ে ছিল তার সবটুকু যেন সে উজার করে দিতে চাইছে। আর সেই তুচ্ছ কথাগুলো গানের মুগ্ধ রেশের মত এমন এক বিশুদ্ধ পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল আমার চারপাশে যে, বাইরের সব শব্দ, দৃশ্য, ঘ্রাণ কোথায় হারিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র একটা স্নিগ্ধ অনুভূতি হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এক সময় আমরা খুব ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্টপের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। এইটুকু পথ পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার আনন্দকে আরো অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করার জন্যে আমরা দুজনেই পায়ের গতি ক্রমশ কমিয়ে আনছিলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই তো একটুখানি সময়, এখনি বাস আসবে, দুজনেই উঠে পড়বো, হয়তো ভিড়ের মধ্যে পরস্পর থেকে ছিটকে যাবো, নামার সময় কেউ কাউকে দেখতে পাবো না। এমনও তো হয় অনেক সময়। তখন আমাকে শুধু একটা মন-খারাপ মন-খারাপ অতৃপ্তি নিয়ে সারাটা বিকেল সন্ধ্যে কাটাতে হবে।

আমরা দুজনে এসে বাসস্টপে দাঁড়ালাম। কি যেন বলার ছিল, বলতে চাইছিলাম। সেই সময় একটা বাচ্চা ভিখিরি তার নোংরা শরীর কাছে এনে নোংরা হাত বাড়িয়ে কেবলই পয়সা চাইছিল। আমি খুব বিরক্তি বোধ করছিলাম। আমি নির্জনতা চাইছিলাম এবং একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ। ভিখিরিটা তার মধ্যে যেন একেবারে বেমানান। আমি শেষ পর্যন্ত বিরক্তি চেপে রাখতে পারলাম না, রেগে গিয়ে তাকে জোর ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। আমি হঠাৎ যে এতখানি রেগে যাবো ছেলেটা হয়তো ভাবেনি, সে ভয় পেয়ে কাঁচুমাচু মুখে চলে যাচ্ছিল।

অদিতি তাকে ডাকলো, এই শোন, এদিকে আয়।

ছেলেটার প্রথমে যেন বিশ্বাসই হলো না, অদিতিব মুখের দিকে তাকিয়ে তবে ভরসা পেল, কাছে এগিয়ে এল। অদিতি ওর ব্যাগ খুলে একটা কি খুচরো

পয়সা তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলো। ছেলেটা একমুখ হেসে উঠে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল।

আর অদিতি বললে, জয়, তুমি ভীষণ নির্দয়। দ্যাখো, সামান্য ক'টা পয়সা পেয়ে ছেলেটার কি আনন্দ!

আমার সেদিন নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল। ঠিক কি জন্যে তা মনে হয়েছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে নির্দয় বলার জন্যে নয়, ছেলেটাকে পাঁচটা পয়সা ভিক্ষে দিইনি বলে নয়। বোধহয় ভেবেছিলাম, অদিতির মধ্যে এমন কোন উদারতা আছে যার নাগাল পাওয়া আমার সাধ্য নয়। সেজন্যেই হয়তো ও আমাকে ফিরিয়ে দেয়নি। আমার ভিক্ষার হাত ভরিয়ে দিতে চেয়েছে।

পালান মারা যাওয়ায় আমি আবার তেমনি ছোট হয়ে গিয়েছি। পালানের জন্যে ওর দুঃখ, পালানের বুড়ো বাপটার জন্যে ওর দুঃখ তেমনি নিখাদ। অথচ আমি গণেশের খোঁজ করতে চাইছি না, পাছে বুড়োটা এসে কিছু গোলমাল পাকিয়ে তোলে, পুলিসের কাছে কিছু বলে বসে। বাবুদের হাতে আমি তাকে দিয়ে গিয়েছি, তার জীবনমরণের সব কিছু দায়দায়িত্ব বাবুদের।

যেন তার নিজের কোন দায়িত্ব নেই। আমি তো আমার প্রয়োজনের জন্যে একটা বালক ভৃত্য চেয়েছিলাম। কিন্তু বুড়োটাই তো আসলে দায়ী, মাসের মাস কুড়িটা টাকার লোভে সে কি বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে যায়নি? জিলিপি খাইয়ে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেনি? জানি না, জানি না। আমি তো বিচারক নই। সত্যিকারের বিচারক কোথাও নেই। থাকলে এই মৃত্যুটার প্রকৃত তদন্ত হতে পারতো। আমি হয়তো বেকসুর খালাস পেয়ে যেতাম।

হঠাৎ মনে পড়লো অফিসে ফোন করতে হবে। সামনে একটা ওষুধের দোকান দেখে গিয়ে বললাম, একটা ফোন করতে চাই।

লোকটা অভদ্রের মত হাত নাড়লো, মাথা নাড়লো।

তখন আর উপায় কি, আরো খানিকটা হেঁটে গিয়ে পোস্ট অফিস। 'কে বলছেন, আমি জয়দীপ বলছি, জয়দীপ। আজ ভাই একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি, যেতে পারছি না। ঘোষসাহেব? ঘোষসাহেব খোঁজ করেছিলেন? কেন?...হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁদিকের দেরাজে আছে, কাল তো যাবোই, নিশ্চয় যাবো, তুমি ভাই একটু ম্যানেজ করে নিও। আচ্ছা, রাখছি।'

ঘোষসাহেব আবার খোঁজ করলো কেন! শালা নতুন এসেছে, সক্কলের পিছনে লাগছে। অথচ কাজ কিচ্ছু জানে না। শুধু ছুরি আর কাঁটাচামচ ধরতে শিখে এসেছে। দেদার ঘুষ খাচ্ছে। আজকাল অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে—যে ঘুষ খায় সেই এফিসিয়েন্ট। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। আমি তো এখনো অনেস্ট। এখনো সৎ। যারা ঘুষ খায়, তাদের মনে মনে ঘৃণা করি। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে, শেষ অবধি আমিই গিয়ে কাউকে ঘুষ দিতে বাধ্য হবো কিনা কে জানে। এস-আই মুখার্জিকে অবশ্য খুবই ভদ্রলোক মনে হলো। কিন্তু লোকে তো বলে, সহজ কেসগুলোকেও ওরা জটিল করে দেয়। তাছাড়া, ঘুষ কি করে দিতে হয় তাই তো আমি জানি না। সরাসরি কাউকে টাকা দিতে চাইলাম, আর সে যদি সৎপ্রকৃতির লোক হয়, তখন তো আরো বিপদ। রেগে গিয়ে সে হয়তো আরো ক্ষতি করবে।

বিকেলের দিকে একবার থানায় যাবার কথা। কিন্তু হাতে এখন অনেক সময়। এখন তো দুপুর। এতটা সময় কি করে যে কাটাই! কোথাও যাবার জায়গা নেই। সন্ধ্যের আগে তো পরমেশ্বরবাবুকে পাবো না। মনে হচ্ছে ওঁর সঙ্গে দেখা

হলেই আমি যেন অনেকখানি শান্তি পাবো।

একবার ভাবলাম বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু সেখানে তো আরো অশান্তি, আরো অস্থিরতা। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা চায়ের দোকান পেয়ে বসলাম। এক কাপ চা দিতে বলে একটা সিগারেট ধরালাম। কি যেন ভাবতে ভাবতে দু' আঙুলে ধরা সিগারেটের দিকে, সিগারেট থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার ফিতেটার দিকে তাকিয়েছিলাম। বুকের মধ্যে একটা দম বন্ধ হওয়া ভাব। হঠাৎ লক্ষ করলাম সিগারেটের ধোঁয়াটা কেমন ভেঙে ভেঙে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর তখনই টের পেলাম আমার হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তা হলে তো আমি খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছি।

এস-আই মুখার্জির সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবো তখনো যদি হাতটা এই-রকম ভাবে কাঁপতে থাকে তা হলে তো আরো ভয় পাবার কথা। তিনি হয়তো ভাববেন, লোকটা যদি নির্দোষ তা হলে এত ভয় পাচ্ছে কেন। বরং আমাকে দেখাতে হবে যে, এই ব্যাপারটায় আমি একটুও ঘাবড়ে যাইনি। খুব স্মার্ট কথা-বার্তা চালচলন দেখলে উনি বুঝবেন যে এটা সত্যিই একটা অ্যাকসিডেন্ট। আর কিছু নয়। কিন্তু আরেকটা দিকও তো আছে। ছেলেটা মারা যাওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি এমন করুণ অসহায় মুখ দেখলে এবং আমি অকারণ নার্ভাস হচ্ছি দেখলে ওঁর তো আমার ওপর মায়া হতে পারে। হয়তো আমাকে সহজেই রেহাই দেবার চেষ্টা করবেন।

না, এত কিছু দুশ্চিন্তার ছিল না। থানা থেকে আমি খুব হাল্কা মন নিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। দিব্যি হাল্কা লাগছে নিজেকে। সামনে একটা ধীরগতি ট্রাম দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। পরমেশ্বরবাবুর বাড়ি যেতে হবে। কেয়াতলায়। উনি অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

থানায় যখন গিয়েছিলাম, এস-আই মুখার্জি ছিলেন না, কোথায় যেন এনকোয়ারিতে বেরিয়েছিলেন। ঘরখানা জুড়ে চার-পাঁচটা টেবিল, দুটো টেবিলে দুজন খসখস করে কি সব লিখে চলেছেন। দু'তিনবার কথা বলার পর একজন খাতা থেকে মাথা তুললেন, অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, বসুন, আসবেন। পাশের ঘর থেকে ও-সির কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম, বুক কাঁপানো ধমক দিচ্ছিলেন কাকে। দরজার সামনেই হাজতঘর, গরাদের ওপারে চার-পাঁচটা নোংরা পোশাকের লোক জড়াজড়ি করে শুয়ে-বসে আছে, বিভ্রান্ত চোখ মেলে লোকজনের যাতায়াত দেখছে। সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন মুষড়ে দেয়।

এস-আই এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরলেন। কি একটা মজার এনকোয়ারিতে গিয়েছিলেন, সেটাই সবিস্তারে বলতে শুরু করলেন ওদিকের টেবিলের সহ-কর্মীদের। তারপর কি সব কাগজপত্তর ঠিক করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পোস্টমর্টেমে চলে গেছে, একটা সৎকার-টৎকার কিছু করবেন তো? কাল গিয়ে একবার খোঁজ নেবেন। বলে ঠিকানা বলে দিলেন। একটু থেমে বললেন, আত্মীয়-টাত্মীয় কাউকে পেলেন বাচ্চাটার?

বললাম, খোঁজ করছি।

কিন্তু সত্যি সত্যি খোঁজ করার একটুও ইচ্ছে ছিল না। তার আগে বরং পরমেশ্বরবাবুর কাছে জেনে নিতে হবে বুড়ো বাপটা এলে আমার পক্ষে সুবিধে

হবে, না ঝামেলায় পড়বো।

আধুনিক ডিজাইনের সুন্দর বাড়ি পরমেশ্বরবাবুর। শান্ত ছিমছাম কেয়াতলার পরিবেশটিও সুন্দর। বাবা বেঁচে থাকতে কয়েকবারই এসেছি এ-বাড়িতে। ভদ্রলোক বাবাকে খুবই সমীহ করতেন, আবার বন্ধুও ছিলেন।

আশেপাশে আরো দু'একখানা ঐ ধরনেরই বাড়ি উঠেছে বলে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। একই রকম গ্যেট দু'তিনখানা বাড়ির। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ গজিয়ে উঠছে ওঁর বাড়ির পাশেই। সেটা বেশ একটু বড় হয়ে উঠেছে বলেই অন্যরকম লাগছিল। গ্যেটের পাশে নেমপ্লেট দেখে তবেই নিঃসন্দেহ হলাম। গ্যেটের ভেতর ঢুকেই ডান দিকে ওঁর ঘর, ওঁকে দেখতেও পেলাম। টেবল-লাইটের সামনে মাথা নীচু করে কি পড়ছেন, মাথার সব চুল সাদা এবং চুল অনেক ফিকে হয়ে গেছে। ঘরে ঝকঝকে ফ্লুরোসেন্ট আলো, সেই আলোয় তাঁর সাদা চুলের ফাঁকে ফাঁকে মাথার তালু দেখা যাচ্ছিল। অদ্ভুত ফরসা চেহারা, মাথার ত্বকেও গোলাপী আভা। ধোপদুরস্ত গলার বোতাম আঁটা সার্জের পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন, সামনে একরাশ মক্কেল।

গ্যেট খুলে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম, যাতে জুতোর শব্দে ওঁকে ডিস্টার্ব করা না হয়। হয়তো মনোযোগ দিয়ে আইনের অন্ধিসন্ধি খুঁজছেন।

গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালাম। উনি মাথা তুললেন না।

মক্কেলরা মোটা মোটা ব্রীফ কোলে নিয়ে বসে আছে। ওধারে ওঁর ক্লার্ক খটাখট টাইপ করে যাচ্ছে। ওঁর এক পাশে সার্টকলার সাদা ব্লাউজ আর কালো পাড় সাদা ধপধপে শাড়ি পরা একটি মেয়ে কি যেন লিখে চলেছে মাথা নীচু করে।

কেউই মুখ তুলে তাকালো না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি তাই দেয়াল ঘেঁষে রাখা একসারি চেয়ারের একটায় বসে পড়লাম নিঃশব্দে। সমস্ত ঘরখানা মোটামোটা চামড়ায় বাঁধানো বইয়ে বোঝাই। একটা আলমারীতে থরে থরে সাজানো ব্রীফ। তাঁর সামনের টেবিলেও।

আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। এমন সময় পরমেশ্বরবাবু চোখ বুজে ডিকটেশন দিতে শুরু করলেন। বোঝা গেল পাশের ঐ মেয়েটিকে ডিকটেশন দিতে দিতেই তিনি এতক্ষণ থেমেছিলেন। মেয়েটি কি ওঁর জুনিয়ার নাকি? আগে তো একজন বেঁটেখাটো ভদ্রলোককে দেখেছিলাম। এ হয়তো স্টেনোও হতে পারে।

উনি বলে যাচ্ছিলেন, আর মেয়েটি দ্রুত হাতে লিখে যাচ্ছিল। তার মুখ কিছুটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সামনে মক্কেলরা বসে থাকায়। আমি তখনো তার মুখ দেখতে পাইনি। সে কলম থামিয়ে মুখ তুলে পরমেশ্বরবাবুর দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে চিনতে পারলাম। আর তখনই সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

পরমেশ্বরবাবু বোধহয় সামনের দিকে তাকালেন কিছু চিন্তা করতে করতে। আমার দিকে তাঁর চোখ পড়লো, কিন্তু চিনতে পারলেন না। আমি তাই উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে। উনি ডিকটেশন দেবার সময় চশমাটা খুলে রেখেছিলেন টেবিলের ওপর। সেটা তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে আমার দিকে আবার তাকালেন, তারপর চিনতে পেরে বললেন, জয়দীপ!

হাতের ইশারায় বসতে বললেন শুধু।

বেশ বুঝতে পারলাম ও'র মাথার মধ্যে এখন উনি যুক্তির পর যুক্তি সাজাচ্ছেন। আইনের জটিল জালে ও'র মন আচ্ছন্ন। তবু আমি একটু আহত বোধ করলাম। আহত বোধ করলাম, ও'র ঐ জুনিয়ারের সামনে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা দেখালেন না বলে।

কিন্তু শ্যামলী কি আমাকে দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়ই। কারণ কেউ ওর কানের কাছে আজও 'জয়দীপ' নামটা উচ্চারণ করলে ওর চমকে ওঠারই কথা।

ডিকটেশন দেওয়া শেষ করে পরমেশ্বরবাবু একজন মক্কেলের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করতে শুরু করলেন। তারপর ক্লার্কের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, যান, ওখানে গিয়ে কত কি লাগবে জেনে নিন।

মক্কেল ক্লার্কের কাছে এসে বসলেন। সে টাইপ থামিয়ে খসখস করে বোধহয় একটা হিসাব দাখিল করলো। মক্কেল ভদ্রলোক টাকা বের করে দিলেন। চার-পাঁচশোর কম তো নয়ই।

আমি প্রথমে যখন ঘরটিতে ঢুকেছিলাম, তখন অস্বস্তি লেগেছিল অপরিচিত লোকগুলির সামনে আমার এখানে আসার কারণ ব্যক্ত করতে হবে বলে। আসলে আমি জানি না, সকাল থেকেই এই ছোট্ট ঘটনার জন্যে আমি কেন এত লজ্জিত বোধ করছি। অফিসে যখন ফোন করেছিলাম তখন বলতে পারিনি। এখন অপরিচিত লোকদের সামনেও আমার সঙ্কোচ। পরমেশ্বরবাবুকে বলতে গিয়েও। ও'কে অবশ্য না বলে উপায় নেই। কিন্তু শ্যামলীর সামনে? আমার ভয় পাওয়া মুখ, আমার অসহায় ভাব শ্যামলীর সামনে মেলে ধরতে হবে? শ্যামলী কি ও'র কাছে বলতে পারবে, জয়দীপকে আমি চিনতাম? আমি নিজেও কি বলতে পারবো? অথচ এখন এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছি যে পরমেশ্বরবাবু জিগ্যেস করলেই শ্যামলীর সামনেই অসহায় মুখে আমাকে সব কথা বলতে হবে।

কাজ শেষ করে ইতিমধ্যে শ্যামলী উঠে দাঁড়ালো। পরমেশ্বরবাবু ওকে টুকিটাকি কি সব নির্দেশ দিলেন, পরের দিনে কোর্টে গিয়ে কি কি করতে হবে। শ্যামলী ঘাড় নেড়ে নেড়ে শুনলো, তারপর আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে তন্বী শরীরের একটু মৃদু হিল্লোল ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একে একে মক্কেলরা বিদায় নিলো, আর তখন আমি তাঁর সামনের চেয়ারে উঠে গিয়ে হতাশার গলায় বলে উঠলাম, কাকাবাবু, মস্ত বড় একটা বিপদে পড়ে গেছি, আপনি আমাকে বাঁচান। আমার নার্ভাস ভাবটা চাপা দেবার জন্যেই আমি হাসতে হাসতে বললাম কথাটা।

—কি হয়েছে বলো জয়দীপ। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। কেমন আছো তোমরা। আমি তো গতমাসে মরতে মরতে বেঁচে গেছি। তিনি তাঁর অসুখের বিবরণ দিতে শুরু করলেন।

আমি উৎকণ্ঠার ভাব ফোটালাম মুখে, নানা কথা জিগ্যেস করলাম। যেন তাঁর অসুখের জন্যে আমার ভাবনার শেষ নেই। কিন্তু ওসব শুনতে আমার ভালই লাগছিল না। আমি শুধু চাইছিলাম, উনি আমাকে বলুন, তোমার কিছু ভয় নেই জয়দীপ। আমি মনে মনে এমন একজনকে খুঁজে পেতে চাইছি, যাঁর ওপর আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা নামিয়ে দিতে পারি। মানুষ বোধহয় সেজন্যেই ভগবানকে খোঁজে।

আমি তাই আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা তাঁকে সবিস্তারে বলে গেলাম।

উনি শুনলেন। তারপর দুমুখো লাল-নীল পেন্সিলটা টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, বাট্ নেগলিজেন্স ইজ অ্যান অফেন্স।

আমি চুপ করে গেলাম। আমি করুণভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

উনি ধীরে ধীরে জিগ্যেস করলেন, ছেলেটার বয়স কত? তারপর উত্তর শুনে আবার সেই লাল-নীল পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, মাইনর?

উনি এক একটি কথা বলছিলেন, আর আমার বুকের মধ্যে ভয় বেড়ে যাচ্ছিল।

আমি ভেঙে পড়া গলায় বলে উঠলাম, কিন্তু কাকাবাবু, দোষ কি শুধু আমার? আর কি কারো দোষ নেই?

পরমেশ্বরবাবু হেসে উঠলেন। বললেন, জানো জয়দীপ, এই যে আমরা আইন নিয়ে লড়াই করি, খুঁজতে গেলে দেখবে যে-কোনো ব্যাপারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবাই দায়ী। প্রথম যখন প্র্যাকটিস শুরু করি, আমার সিনিয়র বলে-ছিলেন, দ্য লিগ্যাল লাই মাস্ট প্রিভেল আপন দ্য মর‍্যাল ট্রুথ।

আমি বললাম, কিন্তু রান্নাঘরটায় তো কোন ভেন্টিলেটর রাখেনি বাড়ি-ওয়ালা।

পরমেশ্বরবাবু কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলে একবার এসো। তখন দেখা যাবে। আগে তো করোনারের কোর্টে যাক ব্যাপারটা।

আমি চমকে উঠে বললাম, করোনারের কোর্ট?

পরমেশ্বরবাবু হাসতে হাসতে বললেন, যে কোন আন্‌ন্যাচারেল ডেথ, তার এনকোয়ারি হবে না? একটা মানুষের মৃত্যু, আমাদের দেশে একটা মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব তার, বুঝলে?

আমি বুঝতে না পেরে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পরমেশ্বরবাবু হাসতে হাসতে বললেন, শোনো, একটা ঘটনার কথা বলি। তুমি তো জানো, রোজ ভোরবেলায় আমি বেড়াতে যাই লেকের দিকে। একদিন দেখি কি, দুটো ভিখিরি টাইপের ছেলে অন্যমনস্কভাবে রাস্তার উপর দিয়ে গল্প করতে করতে চলেছে। হঠাৎ সামনে গাড়ি আসছে দেখতে পেয়ে দুটো ছেলে দুদিকে ছুটে পালাতে গিয়ে পা স্লিপ করে পড়ে গেল একজন। গাড়িটাও তখন জোর ব্রেক কষেছে। ব্রেক করাব আওয়াজে দেখতে দেখতে একপাল লোক ছুটে এল। পড়ে গিয়ে ভিখিরি ছেলেটার হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর তা দেখে, তোমাদেব জনতা ড্রাইভারটাকে মারধোর করে আর কি। আমি গিয়ে পড়ে থামালাম। বললাম, আমি দেখেছি, ড্রাইভারের কোন দোষ নেই। তখন জনতা কি বললে জানো?

পরমেশ্বরবাবু হাসলেন।—ওরা বললে, রক্ত দেখলে মাথার ঠিক থাকে না, একটা ভিখিরি বাচ্চা ছেলের রক্ত!...গভর্নমেন্ট বলো, জনতা বলো, সব জায়গায় এই চলছে, জয়দীপ। ভিখিরি বাচ্চাটা কেন ভিখিরি হলো ওরা খোঁজ নেয়নি। ও ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরে পড়ে থাকলেও কারো মায়াদয়া হবে না, কিন্তু তার হাঁটুতে একটু রক্ত বের হলেই দেখবে জনতার মাথায় রক্ত উঠে গেছে।

পরমেশ্বরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সান্ত্বনার স্বরে বললেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলে তখন এসো। করোনারের কোর্টে যাবার আগে।

করোনারের কোর্ট ব্যাপারটা আমার কিছুই জানা নেই। তাই মনে হলো

যেন ওখানে ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করছে। কি, তা আমি নিজেও জানি না।

পরমেশ্বরবাবু চোখ থেকে চশমা খুলে কাচটা ধুতির খুঁটে পরিষ্কার করতে করতে বললেন, যে কোন আন্‌ন্যাচারেল ডেথ, তার তদন্ত হবে না?

একটু থেমে পরিহাসের গলায় বললেন, অন্য সব মৃত্যুই তো আমাদের দেশে স্বাভাবিক।

পরমেশ্বরবাবুর বাড়ির গেট পার হয়ে রাস্তায় নামতেই শীত করে উঠলো। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। রাস্তার আলোয় ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে আটটা।

তাড়াতাড়ি একটা বাস ধরে হিমেল হাওয়ার ঝাপটা খেতে খেতে বাড়ি ফিরে এলাম।

আর দরজায় কড়া নাড়ার পর অদিতি দরজা খুলে আমাকে দেখতে পেয়েই রাগে ফেটে পড়লো। কিন্তু আমার মনে হলো ওর দু'চোখের কোণে যেন দু'-ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠলো।

ও ধীরে ধীরে বললে, সেই দুপুরে বেরিয়েছ, বলে যাবে তো, তোমার যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

আমি কোন কথা বললাম না। সত্যি তো, ফিরতে এত রাত হবে এ কথা ওকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। আজ সকালেই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তারপর সারাদিন ও একা একা। নিশ্চয় আমাকে ফিরতে না দেখে ও অনেক কিছু ভেবে বসে আছে। আমি বুঝতে পারলাম, সারাদিনের দুশ্চিন্তার পর ফিরে পাওয়ার আনন্দে ওর চোখের কোণা চিকচিক করে উঠেছে। আমার হঠাৎ খুব হাসি পেল। ও কি ভেবেছিল, থানায় যাওয়ার পর আমাকে অ্যারেস্ট করে রেখে দিয়েছে? না কি গাড়ি চাপা পড়েছি আমি? আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল একটু রসিকতা করার। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস পেলাম না।

তখন আমি ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত। আমি এসে পোশাক না বদলেই খাটের ওপর ক্লান্ত শরীরটা ঢেলে দিলাম।

আর অদিতি কাছে এসে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে অস্ফুটে বললে, তুমি সেই দুপুরে বেরিয়ে গেছ, আমি একা। জানো, আমি আজ একবারও রান্নাঘরে যেতে পারিনি, একবার যেতেই কেমন গা ছমছম করে উঠলো। বারান্দায় রান্না করেছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

অদিতি ধীরে ধীরে বললে, এই, আমি এ বাড়িতে আর থাকতে পারবো না।

আমি এবারও কোন কথা বললাম না। ও গাঢ় গলায় বললে, রান্নাঘরে গেলে গা ছমছম করে। এঘরে এলে আমার কান্না পায়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। অনেকক্ষণ। অদিতি কোন কথা বললো না, আমি কোন কথা বললাম না।

তারপর হঠাৎ উল্লাসের গলায় অদিতি বলে উঠলো, একটা সুখবর আছে, জানো? মিলির বাবা লোকটি কিন্তু ভীষণ ভালো। অফিস থেকে ফিরে গণেশের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। গণেশকে খুঁজে পেয়েছেন র‍্যাশনের দোকানের কাছেই কোন একটা দোকানে।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

অদিতি বললে, নিজে ট্রেনভাড়া দিয়ে গণেশকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পালানের বাবাকে নিয়ে আসার জন্যে। সত্যি, শিবশঙ্করবাবু এত ভালো!

এত ভালো, এত ভালো! আমার সমস্ত শরীর তখন শিবশঙ্করবাবুর উপর বিষিয়ে উঠেছে। মনে হলো লোকটা অত্যন্ত জটিল এবং কুটিল। একটা ভালো-মানুষির ছদ্মবেশে উনি যেন আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছেন।

আমি শিবশঙ্করবাবুর ওপর রাগটা চাপতে না পেরে অদিতির ওপরই রেগে গেলাম। তিক্ত কণ্ঠে বললাম, তুমি তো বিশ্বসুদ্ধ সব লোককেই ভালো দেখো, আমিই শুধু খারাপ।

অদিতি কি বুঝলো কে জানে, ও মৃদু হেসে এগিয়ে এল, আমার চুলের মধ্যে ওর আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে বললে, তোমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে আমি কি কিছু বুঝতে পারি না।

৩

পরের দিন সকালে উঠেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল। কারণ এমনটা কখনো দেখিনি। পিছন দিকের এই সরু উঠোনটার মাঝখানে কয়েকটা করোগেটেড টিন দিয়ে একটা পার্টিশন করা আছে। ওদিকটা বাড়িওয়ালার। এদিকে বড় চৌবাচ্চা আছে, কল খোলা থাকলে আমাদের এদিকে চুরচুর করে জল পড়ে। প্রায়ই চৌবাচ্চা ভরে গেলেও ওরা কল বন্ধ করে দেয় না। ঝগড়াঝাঁটির সূত্রপাত তো সেই থেকেই। ফলে আমাদের এদিকের কলঘরে একটা বালতি ভরতেও আধ ঘন্টা লাগে। তার আগেই কোন কোনদিন জল আসাই বন্ধ হয়ে যায়। গরমের দিনে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হয়ে পড়ে।

এখন অবশ্য শীতকাল। জল নিয়ে কোন ঝামেলা হবার কথা নয়। তবু ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুতে গিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। কল খুলতেই এমন তোড়ে জল এসে পড়লো বেসিনে যে, ছিটকে এসে জামা ভিজিয়ে দিলো খানিকটা।

আমি মুখ হাত ধুয়ে অদিতিকে বললাম, কি ব্যাপার, এ যে পাইপের মুখে বন্যা দেখছি!

অদিতি টিনের পার্টিশনের ওপাশটার দিকে ইশারা করে বললে, চৌবাচ্চা আধখানা ভর্তি হতেই কল বন্ধ করেছে আজ।

একটু রহস্য রহস্য ঠেকলো।

অদিতি হাসতে হাসতে বললে, বোধহয় একটু মায়াদয়া হয়েছে আমাদের ওপর। আমারও সেই রকমই একটা ধারণা হলো। কিন্তু ধারণা পাল্টে গেল বাজার থেকে ফিরে আসার পরই। শুনলাম, রায়বাবু নাকি আমার খোঁজে এসে-ছিলেন একবার। আমি ফিরে এলে ওঁকে জানাতে বলেছেন।

অদিতি তখন টুকাইকে স্কুলের জন্যে তৈরী করতে ব্যস্ত। রোজ রোজ তো আর স্কুল কামাই করলে চলবে না। পড়া পিছিয়ে পড়বে। তাই স্কুলের ইউনিফর্ম পরিয়ে কোনরকমে ওর মুখে দুটি ভাত দিয়ে ওকে ছুটতে ছুটতে যেতে হবে সেই রাস্তার মোড়ে। স্কুলবাসে তুলে দিয়ে আসতে হবে অদিতিকেই। আজ আর পালান নেই।

কিন্ত ছবিটা চোখের সামনে যেন আজও ভেসে উঠছে। টুকাই এখনো মৃত্যুটিত্যু ঠিক ভাল করে বুঝতে পারে না। ও তো জানে পালান হাসপাতালে

গেছে। অসুখ হলে লোকে হাসপাতালে যায়।

সেই যে প্রথম দিন ও ঘুম থেকে উঠে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমরা লক্ষ করিনি, বুড়োটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, পালানের বাপের সঙ্গে, তারপর সে চলে যেতে ফ্যালফ্যাল করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল পালান, আর টুকাই গিয়ে ওর জামা ধরে টেনেছিল, তারপর থেকে তো সদাসর্বদা একসঙ্গে খেলা, গল্প, দু'জনে মিলে ঝগড়াঝাঁটি।

টুকাইকে ভীষণ ভালোবাসতো ছেলেটা। যখন-তখন ওর হুকুম মেনে যেন বেশ আনন্দ পেত। ইস্কুল-ইস্কুল খেলতো টুকাই। অর্থাৎ স্কুলে যা কিছু হতো, টীচার যা যা বলেছেন, আর ছাত্ররা যা যা উত্তর দিয়েছে, ঠিক সেইভাবে বলতো টুকাই। একদিন সন্ধ্যেবেলা চা খেতে খেতে সিগারেটে টান দিতে দিতে শুনে খুব মজা লেগেছিল। টুকাই তখন টীচার, আর পালান ছাত্র। কিন্তু পালানের নামটা বারবার বদলে যাচ্ছে, কখনো সঞ্জয়, কখনো দীপক, কখনো অমল, কমল। অর্থাৎ ওরা ওর সহপাঠী, তাদের উদ্দেশ্য করে টীচার যা যা বলেছেন, টুকাই বলতো, আর পালানকে শেখানো উত্তর দিতে হতো। উত্তর দিতে না পারলে : সঞ্জয়, ইউ আর আ নটি বয়। পালান তো হেসেই আকুল।

আবার এক একদিন পালানকে নিয়ে লুডো খেলতে বসতো। টুকাই শিখিয়ে নিয়েছিল ওকে। 'রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর লুডো খেলা, তোকে সকালে ফার্স্ট ট্রিপে ইস্কুলে যেতে হবে না? ও বেচারী সারাদিন খেটেছে। ভোরবেলায় উঠে উনোনে আঁচ দিতে হবে, ছেড়ে দে ওকে', অদিতি প্রায়ই রেগে যেত। পালান কিন্তু ঠিক খেলার ফাঁকে ফাঁকে ফাইফরমাশ খেটে যেত, অদিতির কিংবা আমার।

টুকাই একবার পালানকে অ আ ক খ শেখাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।

সেজন্যেই কিনা জানি না, একদিন বাজার থেকে ফিরছি, দেখলাম টুকাই ওর ধোপদুরস্ত স্কুলের ইউনিফর্ম পরে কাঁধে ওয়াটার বট্‌ল নিয়ে চলেছে, যেখানটায় স্কুলবাস দাঁড়ায় সেদিকে। আর পালান একটা নোংরা ইজের পরে একটা খাটো জামা পরে টুকাইয়ের বইভর্তি স্কুলব্যাগটা হাতে দোলাতে দোলাতে গ্রাম্য হাসি হাসতে হাসতে ওর সঙ্গে চলেছে।

পালানকে দেখে সেদিন হঠাৎ মনে হয়েছিল, স্কুলের বইভর্তি ঐ স্ট্র্যাপ দেওয়া ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যেতে পাওয়ায় ও যেন খুব খুশি। বোধহয় একটু গর্বিত।

আমার সেদিন মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয়েছিল। অথচ অপরাধটা সত্যি কার আমি খুঁজে পাইনি।

আমার নিশ্চয়ই নয়। বুড়োটা করুণ মুখে বলেছিল, ঘরে ভাত নাই বাবু। বিশটা টাকা আপনার ঠেঙে পাই, তো উবগার হয়। মেজবৌদি পালানের চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিল, কি নির্দয় বাপ রে বাবা!

কে যে দায়ী কে জানে। বুড়ো বাপটার ঘরে ভাত না থাকা, না কি পাঁচ-পাঁচটা মুখে ভাত দিতে হয় সেটাই।

এতসব কথা আমার বেশীক্ষণ ভাবতে ভাল লাগে না। আমার নিজেরও তো টানাটানির সংসার, আমার নিজেরও তো নানান দুশ্চিন্তা।

তবু বারো বছরের একটি অশিক্ষিত গ্রাম্য ছেলে হাসিহাসি মুখে ফিটফাট পোশাকে সাজানো টুকাইয়ের স্কুলব্যাগ বয়ে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসছে—এই দৃশ্যটা কেমন যেন থেকে থেকে বুকের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে।

আমি বাজার থেকে ফিরে খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, কখন পালানের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম নিজেই টের পাইনি।

অদিতি বললে, বাড়িওয়ালা যে খোঁজ করেছিল তোমার! যাবে না?

আমি চমকে উঠে বললাম, ও হ্যাঁ।

আধখানা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে রায়বাবুকে বার দুয়েক ডাকতেই উনি বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বললেন, আরে আসুন আসুন। আমাকে তো খবর দিলেই হতো, আপনাকে কষ্ট করে আসতে হতো না।

একটু রসিকতার ঢঙে বললেন, আপনি অবশ্য ইয়ংম্যান জয়দীপবাবু। কিন্তু আমি বুড়ো হ'লেও এখনো আপনার চেয়ে কম শক্তসমর্থ নই। সারাদিনে কতবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করি জানেন?

আমি ক্রমশই অবাক হচ্ছিলাম। এই মানুষটিকে যেন চিনতেই পারছি না, এ যেন অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তি। এমন বিনয়, এমন ভদ্র ব্যবহার কোনদিন লোকটির মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়লো না। এমন অনর্গল কথা বলতেও কখনো দেখিনি।

উনি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বসালেন। জিগ্যেস করলেন চা খাবো কিনা। আমি মাথা নেড়ে বললাম, না না, আমি তো এখনই অফিস যাবো।

রায়বাবু বললেন, আপনার দেরি করে দিচ্ছি না তো? তারপর উঠে এসে ঘরের দরজাটা বন্ধ করলেন। বুঝতে পারলাম, উনি বোধহয় কোন গোপন কথা বলতে চান।

আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করলাম।

রায়বাবু সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। এবং নিজেও একটা ধরালেন। অর্থাৎ কি ভাবে কথাটা শুরু করবেন যেন ঠিক করতে পারছেন না।

রায়বাবু আস্তে আস্তে বললেন, দেখুন জয়দীপবাবু, আমরা হয়তো অনেক ঝগড়াঝাঁটি করেছি এর আগে, অনেক ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমরা তো ভদ্রলোক, কি বলেন?

আমি সায় দিয়ে বললাম, তা তো নিশ্চয়ই।

রায়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে এসব তো বানানো পরিচয় মশাই, আসলে আমরা তো একই ক্লাশ, একই সমাজের লোক, তাই নয়?

আমি ভিতরে ভিতরে তখন হাসতে শুরু করেছি। ভাবছি অদিতির সঙ্গে এই বাড়িওয়ালা সম্পর্কে আলোচনায় কতদিন তো একথাটা আমিই বলেছি। রায়বাবু, আপনি তো কোনদিন আমাকে সমকক্ষ ভাবেননি, সমান মর্যাদা দেন নি। ভেবেছেন আপনি যেন একটা উন্নত ধরনের জীব। আমি আপনার খাস-তালুকের প্রজা। কিন্তু মশাই, আমার মত হাজার হাজার ভাড়াটের মধ্যে থেকেই তো আপনার বাড়ির পাশের জমিতে একজন বাড়িওয়ালা গজিয়ে ওঠে। আপনি নিজেও তাই কিনা কে জানে। অথচ তখন আপনারা একটা আলাদা ক্লাশ হয়ে যান। আমি অবশ্য ওসব স্বপ্নটপ্ন দেখি না, কিন্তু কোনদিন আমি নিজেও হয়তো একটা বিচিত্র জীব হয়ে যাবো।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, কিছু একটা ঘটে গেছে, এবং সেজন্যেই উনি আমাকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে দেখে নিজেই নেমে আসতে চেয়েছিলেন। নেমে এসে সমান হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এমন অদ্ভুত ঘটনা তো এক-আধটা

ঘটে যায়।

রায়বাবু এবার গলার স্বর নামালেন। বললেন, করোনারের রিপোর্ট যাতে আমাদের দু'জনের কারো বিরুদ্ধে না যায়, আমরা কেউই যাতে ঝামেলায় না পড়ি, সেটা তো দেখতে হবে। আপনার বিপদে যদি আমি না পাশে দাঁড়াই, আমার বিপদে যদি আপনি না দাঁড়ান, তা হলে তো কেউই বাঁচবো না।

আমি তাঁর কথা ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

রায়বাবু এবার ফিসফিস করে বললেন, কাল ঐ যে ভেন্টিলেটরের কথা তুললেন সেই পুলিশের দারোগা না কে, যিনি এসেছিলেন। আর ঐ যে মশাই পাশের বাড়ির শিবশঙ্করবাবু, উনি তো পাড়ার সকলকে ঐ ভেন্টিলেটরের কথাটা বলে বেড়াচ্ছেন। মানে, বাড়ি করার সময় প্ল্যানে তো ছিল, যাকে কনট্রাক্ট দিয়েছিলাম, সে মশাই টাকা মারবার জন্যে অনেক কিছু ঠিক ঠিক করেনি।

একটু থেমে বললেন, কিন্তু সে-কথা তো কোর্ট বুঝবে না, পুলিশ যদি একটু খুঁচিয়ে দেয়। তাই বলছিলাম, কেসটা চাপা দেওয়ার জন্যে যদি কিছু লাগে, বলবেন আমাকে। আমরা দু'জনই যাতে বাঁচতে পারি।

আমি তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, মনে থাকবে।

রায়বাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। বললেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা কিন্তু ম্যানেজ করবেন। আজকালকার দিনে, জানেন তো, কাউকে কোন বিশ্বাস নেই।

আর আমার মনে হলো, আমি যেন একটা পোস্টমর্টেম কেস চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অহঙ্কারী একটা মানুষ, একটা বাড়ির মালিক, একজন স্বার্থপর, অভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তি—তাকে ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কেটে কে যেন আমার সামনে তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন নগ্ন দেহটাকে মেলে ধরেছে। আমি তার ভিতরেব সবকিছু যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

৪

অফিসে যখন পেঁছিলাম তখন আমার মনের মধ্যে বিশেষ কোন দুর্ভাবনা ছিল না। গতরাত্রে পরমেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথা বলে অন্তত এটুকু ভরসা পেয়েছিলাম যে, বিপদে ওঁর সাহায্য পাবো। সকালে রায়বাবুর কথায় মনটা আরো হাল্কা হয়েছিল, দোষটা তাহলে আমার একার নয়।

কিন্তু অফিসে এসে পেঁছিনোর পরই যতীন আমাকে দেখে বলে উঠলো, কি ব্যাপার জয়দীপ, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

রাধানাথ আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওর কাছে মন খুলে অনেক কথা বলা যায়। ও এসে একসময় বললে, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ নাকি?

দত্তসাহেব একবার কি একটা ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, নিয়ে যেতেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ইউ আর লুকিং পেল, জয়দীপ!

শুনে শুনে আমার বুকের মধ্যে চাপা পড়া ভয়-ভয় ভাবটা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু কারো কাছেই ঘটনাটা প্রকাশ করতে পারলাম না। অথচ এ ব্যাপারটা

বলতে কেন যে সঙ্কোচ বুঝতে পারছি না।

কিন্তু কোন একজনকে না বলেও শান্তি নেই। শেষে টিফিনের সময় রাধানাথকে ক্যান্টিনে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম। আর তখনই রায়বাবুর কথাটা মনে পড়লো।—পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা যেন ম্যানেজ করবেন। ঐ কথাটা শোনার আগে পর্যন্ত আমার ধারণাই ছিল না ওটা ম্যানেজ করার জিনিস। আমি তাই আস্তে আস্তে বললাম, আচ্ছা রাধানাথ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি ম্যানেজ করতে হয়?

খবরটা শোনার পর থেকে রাধানাথকে রীতিমত চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জানি না। গুজব তো শোনা যায় কত কি। কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডারও নাকি আত্মহত্যা হয়ে যায়। আবার আত্মহত্যাকে পুলিশ নাকি...

আমি চমকে উঠে বললাম, সত্যি?

রাধানাথ বললে, জানি না, এত রকমের গুজব ছড়ায়, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে কোনদিনই জানা যায় না। কিন্তু তা বলে চুপ করে বসে থাকা যায় না, জয়দীপ।

আমি অসহায়ের মত বললাম, কিন্তু আমি যে কাউকেই চিনি না, জানি না।

রাধানাথ কি যেন ভাবলো। তারপর হঠাৎ বললে, ঠিক আছে ব্রাদার, ভয় নেই। বলে আমার কাঁধে হাত রাখলো। বললে, ছুটি নিয়ে চারটের সময় বেরিয়ে যাবো। আমার ভগ্নীপতির কথা তো তোমাকে বলেছি, নামকরা ডাক্তার। দেখা যাক, সে কিছু করতে পারে কিনা।

চারটের সময়েই দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। অথচ উদ্দেশ্যটা যে কি তা আমরা নিজেরাও জানি না। পোস্টমর্টেম সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা আছে শুধু। কাগজে তো প্রায়ই পড়ি। খুন, আত্মহত্যা, কিংবা সন্দেহজনক মৃত্যু হলে মৃতদেহটাকে কেটেছিঁড়ে পরীক্ষা করা হয়, কিসে মৃত্যু হলো সেই খবরটা মানুষের কাছে খুব জরুরী। কেন মৃত্যু হলো জানা চাই। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কি করার আছে, কিংবা যে ডাক্তার ছুরি বসিয়ে মৃতদেহটাকে ফালা ফালা করে দেখবে তারই বা কি করার আছে।

আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে রাধানাথ ভিতরে ঢুকে গেল। বাইরে তখন রোগীদের ভিড়। আমি টুলের ওপর থেকে একটা পুরোনো ছবির পত্রিকা নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

একটু পরেই রাধানাথ সুইংডোর ঠেলে আমাকে ডাকলো। আমি ভিতরে যেতেই রাধানাথ পরিচয় করিয়ে দিলো, উনি হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, হাসতে হাসতে বললেন, বসুন, এ তো সিম্পল কেস অফ অ্যাসফিকসিয়েশন, আকছার হয় আমাদের দেশে। ল্যাক অফ এডুকেশন এর জন্যে দায়ী, আপনিও নন আমিও নই। ও কথা বাদ দিন, বেশীর ভাগ রুগী যে মারা যায়, রুগী বলে ডাক্তারের দোষ, ডাক্তার বলে রুগীর দোষ, কিন্তু আসলে দায়ী তো সোসাইটি—দি সিস্টেম। যেমন অদ্ভুত দেশ, তেমনি অদ্ভুত গভর্নমেন্ট।

ভদ্রলোক বোধহয় একটু বেশী কথা বলেন। কিংবা ওঁর শালা, সে তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছে, তাই বিশেষ আপ্যায়ন দেখাবার জন্যেই হয়তো এত কথা। কিন্তু আমি তো জানতে চাইছিলাম উনি আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা।

উনি নিজেই এবার বললেন, ঠিক আছে, আপনি নাম ঠিকানা ডিটেল্‌সগুলো লিখে দিন, আমি বরং গাঙ্গুলিকে বলে দেবো। আচ্ছা দাঁড়ান...

আমাকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ডিটেল্‌স্‌ লিখে দিচ্ছিলাম। উনি তখন ও'র ডায়েরির পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন, ফোন নম্বর বের করে ডায়েল করলেন। বার তিনেক ডায়েল করার পরই পেয়ে গেলেন, ওধারে তখন হয়তো রিং হচ্ছে, সেই ফাঁকে রিসিভার কানে লাগিয়ে রেখেই উনি আমাকে বললেন, গাঙ্গুলি আমার ছাত্র ছিল, হি ওয়াজ র‍্যাদার ব্রিলিয়েন্ট...কে, গাঙ্গুলি নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডক্টর বোস—মড়া কাটছো নাকি, কতগুলো মড়া কাটলে আজ?

হা হা করে হাসলেন উনি টেলিফোনে উত্তর শুনে, তারপর বললেন, এক কাজ করো, যাবার সময় একবার ড্রপ ক'রো এখানে, হ্যাঁ, মড়া কাটারই ব্যাপার, তবে নাথিং সিরিয়াস আই হোপ, আচ্ছা, আচ্ছা।

উনি ফোন রেখে দিলেন, আমি কাগজটা এগিয়ে দিলাম। উনি নমস্কার করলেন, বাইরে তখন অনেক রোগী অপেক্ষা করছে। আমরা উঠে দাঁড়াতেই রাধানাথকে বললেন, দিদির সঙ্গে দেখা করবে না? যাও একবার। হেসে উঠে বললেন, ভাইরা বোনদের কাছে একজস্ট পাইপ, পেটের মধ্যে যত অভিযোগ জমা হয়ে থাকে, ভাইরা এলে সেগুলো বের করে দেয়। আবার হা হা করে হাসলেন।

রাধানাথ বললে, না, আজ আর যাবো না। আবার তো আসছিই খবর নিতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে টের পেলাম আমার মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে। রাধানাথের মুখ দেখেও বোঝা গেল ও অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

আতঙ্ক সরে গিয়েছিল বলেই রাধানাথ হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখো জয়দীপ, যতীন ছোকরাটা কিন্তু খুব মিথ্যে কথা বলে না। ঐ বাচ্চা ছেলেটা, পালান না কি নাম, ও মরে গিয়ে এখন একা লড়ছে। আর আমরা সবাই একদিকে, কারণ আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, পরস্পরকে চিনি, যেমন করে পারি খুঁজে বের করি। ডাক্তার, উকিল, ইনফ্লুয়েন্স সব তো আমাদের দিকে।

আমি কোন কথা বললাম না। কারণ এসব কথা নিজের মনে মনে ভাবা যায়, অন্যের কাছে শুনতে ভাল লাগে না।

আমরা সেই চারটের সময় বেরিয়েছি। ক্ষিদে পেয়েছিল। রাধানাথকে নিয়ে গিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম। দু'খানা ফাউল কাটলেট আর দু' কাপ চা।

•

রাধানাথ যতক্ষণ সঙ্গে ছিল, নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। ও চলে যাবার পর বাড়ি ফেরার পথে আবার কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব বুকের মধ্যে দুরদুর আওয়াজ তুলতে লাগলো। কিন্তু পাড়ায় ঢুকতে না ঢুকতেই কেমন একটা সঙ্কোচ আমাকে পেয়ে বসলো। ইদানীং বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়, কিংবা বাড়ি ফেরার সময় আমি কিছুতেই যেন মাথা তুলে হাঁটতে পারি না, কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

বেশ বুঝতে পারলাম, আমি খুব আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছি। যেন একজন ফেরারী আসামী লুকিয়ে বাড়ি ঢুকছে।

অদিতি দরজা খুলে দিতেই ভিতর বারান্দায় চোখ গেল। আমি চমকে উঠলাম। ভূত দেখার মত আতঙ্কে শিউরে উঠলাম।

হাঁটু মুড়ে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে লোকটা বসেছিল, মুখ তুললো। পালানের বুড়ো বাপটা। মেঝের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।

ও আমাকে দেখে মাথা নীচু করলো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আমি থমকে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন কথা

বলতে পারলাম না। ওর সামনে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে আমি আমার ঘরটিতে এসে বসলাম।

চেয়ারে বসে আছি ছোট্ট টেবিলটায় মাথা রেখে। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না, অনুভব করলাম টুকাইয়ের কচি কচি ঠাণ্ডা হাতখানা আমার বাহুর ওপর।—বাবা!

—উঁ। আমি মাথা না তুলেই বললাম। টুকাই ধীরে ধীরে জিগ্যেস করলো, পালানের বাবা কাঁদছে কেন বাবা? ওকে তো হাসপাতালে নিয়ে গেছে, অসুখ ভাল হয়ে যাবে, না বাবা? তুমি বলো না গো, যত বলছি ওর বাবা কাঁদছে শুধু!

অদিতির রাগত গলার রুক্ষ কর্কশ ধমক শুনলাম, চুপ করবি তুই! বারণ করছি, তবু বকবক করছে।

আমি মাথা তুললাম। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কষ্ট। যে লোকটার একমাত্র ছেলেটা মারা গেছে তাকে আমি একটু সান্ত্বনাও দিতে পারছি না।

টুকাই আমার চেয়ারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, মা'র কাছে ধমক খেয়ে অভিমানে ওর ঠোঁট ফুলে উঠেছে। আমি হাতখানা ওর পিঠে রেখে আদরের নরম স্পর্শ দিতেই ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো ওর চোখ বেয়ে।

টুকাই যেমন আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, এমনি গা ঘেঁষেই তো পালানও ওর বুড়ো বাপের পাশে দাঁড়াতো, যখনই ও আসতো পালানের সঙ্গে দেখা করতে, কিংবা মাইনের টাকাটা নিয়ে যেতে।

প্রথম প্রথম দেশগাঁয়ের জন্যে ওর মন খারাপ হতো। বোনদের কথা, দিদির কথা বলতো। অথচ দুটো মাস যেতে না যেতেই, বুড়ো একদিন জিগ্যেস করেছিল, বুনদের জন্যে তোর মন কেমন করে? যাবি?

পালান দোমনা ভাবে চুপ করে রইলো। তারপর হেসে উঠে বললে, টুকাই-দাদা যাবে তো?

আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম। বুড়োটাও।

টুকাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে, ওকে কাছে টেনে নিয়ে, মনে হলো এই শৈশবটাই সত্যি, এই শৈশবটাই একমাত্র খাঁটি। আর সবই মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যায়। মানুষও।

আমি তো বদলে যাচ্ছি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি। অদিতি তো আরো বদলে গেছে। ওকে আজ আর যেন চেনাই যায় না। ওর মধ্যে এমন একটা রুক্ষ কর্কশ গলা ছিল কোনদিন টের পাইনি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর নরম ঘাসের আসন ছেড়ে আমরা দু'জনে তখন নির্জনতা খুঁজে বেড়াচ্ছি। অদিতির সব কিছুই তখন আমার ভাল লাগতো। ওর চলার ছন্দ, ওর কথা ও হাসি, বিশ্বের সকলের প্রতি ওর মায়াময় ভালবাসা। অদিতি তখন স্বপ্ন দেখতো, স্বপ্ন দেখাতো। কতদিন শীতের দুপুর আমাদের কেটে গেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নরম রোদ্দুরে। গড়ের মাঠের বুকের ওপর দিয়ে কতদিন নিরুদ্দেশ যাত্রায় হেঁটে গেছি ঘন্টার পর ঘন্টা, অনর্গল কথার সঙ্গী হয়ে। আহা, শ্যামলীর ওপর তোমার এত রাগ কেন, ও না থাকলে কোথায় পেতাম আমি তোমাকে। অদিতি একদিন বলেছিল। শ্যামলীর ওপর সত্যিই কোন রাগ ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি একটু বিরক্তি বোধ করতাম অদিতির ব্যবহারে। কারণ হঠাৎ এক-একদিন ও শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে আসতো।

আমি ভাবতাম অদিতি হয়তো আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। একদিন সিনেমায় যাবার কথা বলেছিলাম, ও বলেছিল, শ্যামলীও যাবে কিন্তু।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসার কথা, ও এল শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে।

এ কথাটা আমি ওকে স্পষ্ট করে বলতে পারতাম না। অকারণ রাগে ফেটে পড়তাম শ্যামলীর ওপর। যেন শ্যামলী আমাদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের দেয়াল। যেন শ্যামলী আমাদের নির্জনতা নষ্ট করে দিচ্ছে।

আমার রাগ দেখে ও খুব হাসতো, মজা পেত। একদিন শুধু বলেছিল, তুমি তো নিজে থেকে কোনদিনই কথা বলতে পারতে না, আমিও কি পারতাম শ্যামলী সাহস না দিলে?

আমার মনে পড়েছিল, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে বেরোবার সময় ও যেদিন কি একটা অছিলায় কথা বলে, সেদিন শ্যামলী ওর সঙ্গে ছিল। সেদিন চওড়া সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে নামতে নামতে মনে হয়েছিল, সঙ্গের মেয়েটি কি যেন অনুনয় করছে ওকে।

আসলে এই মেয়েটিকে আমি প্রথম থেকেই দেখেছি খুবই লাজুক, কিংবা ভীতু ভীতু। অথচ অদিতিকে ঐ শ্যামলীই নাকি উৎসাহ দিয়েছিল আলাপ করার জন্যে।

আলাপের পরও শ্যামলী কেমন জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতো, কথা বলতো কম, হাসিতেও ওর কৃপণতা ছিল।

কথায় কথায় অদিতি বলেছিল, শ্যামলীর ইচ্ছে ও ল' পড়বে।

আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, তা হলে ওকে পোর্সিয়া বলে ডাকবো। কেমন!

অদিতি ওর দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে বলেছিল, দেখিস শ্যামলী, শেষে পাউন্ড অফ ফ্লেস চেয়ে বসিসনে যেন।

আমরা দুজনই শব্দ করে হেসে উঠেছিলাম, শ্যামলীকে অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল। আমি তাই অদিতির ভুলটা শুধরে দিয়েছিলাম।

সেই শ্যামলীকে এতদিন পরে দেখলাম পরমেশ্বরবাবুর জুনিয়র হিসেবে। কিন্তু পরমেশ্বরবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে অদিতিকে সে-কথা বলতে পারিনি। এখন আর ঐ নামটাও ও সহ্য করতে পারে না।

ও আজকাল কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। অথচ শ্যামলীর ওপর রাগ হওয়ার কথা আমারই।

এই তো কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা টুকাইকে নিয়ে। ফোর্ট উইলিয়মের পিছনের রেলিং ঘেরা জায়গাটা আমি ইশারায় দেখিয়ে-ছিলাম, অদিতি হেসে ফেলেছিল। তারপর শান্ত গলায় যেন হারানো একটা স্বপ্ন মন্থন করতে করতে বলেছিল, সেই দিনগুলোই বোধহয় ভাল ছিল।

ঐ বেদীটার সঙ্গে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

এখন যে-কোনদিন বেড়াতে গেলে ও ফিরে ফিরে বেদীটার দিকে তাকায়। কিন্তু জানে না, ঐ কংক্রিটের বেদীটার সঙ্গেই আমার আরো একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। জানতে চায়ওনি।

আমি কি এখন অদিতির ওপর ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছি? তা না হলে সেইসব দিনের কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ছে কেন! টুকাইকে এভাবে কর্কশ গলায় ধমক দেওয়ায় আমার রাগটা বেড়ে গেল হয়তো। কিংবা বুড়োটাকে দেখে।

শিবশঙ্করবাবুকে অদিতিই বোধহয় গণেশের খোঁজ আনার কথা বলেছে, বুড়োটাকে খবর দিয়ে আনানোর ব্যবস্থা করেছে। আর ওকে দেখার পর আবার যেন দুশ্চিন্তা বাড়ছে। বুড়োটা কি বলেছে, কিছু বলেছে কিনা কিছুই জানি

না। হয়তো এস-আই মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। তাঁর সামনেই পালানের মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করে বসবে হয়তো।

আমার তাই ইচ্ছে হলো অদিতিকে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিতে। সেই আঘাতটা দিতে পারলেই যেন খানিকটা শান্ত হবো।

'জানো অদিতি, কাল পোর্সিয়ার সঙ্গে দেখা হলো, পরমেশ্বরবাবুর বাড়িতে।' খুব হাল্কাভাবে যদি এ খবরটা জানিয়ে দিই, তাহলেই এতো যে মায়াদয়া ওর ঐ বুড়ো বাপটার ওপর, সব অন্তর্হিত হয়ে যাবে। তখন অন্য এক অদিতি বেরিয়ে আসবে ওর ভিতর থেকে।

কিন্তু না, পালানের বাপকে এখন একটু তোয়াজ করা দরকার। ও যাতে আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না আনে। পরমেশ্বরবাবু বলেছিলেন, দেখো, বাপটা যেন হৈ-চৈ না করে। অথচ কিভাবে লোকটার তোয়াজ করবো খুঁজে পেলাম না।

পায়ের শব্দে বুঝলাম অদিতি এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে অদিতি বললে, এই শুনছো, ওকে তো কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না, তুমি যাও না একবার।

আমি মাথা তুলে অদিতির করুণ মুখের দিকে তাকালাম।

তারপর নিঃশব্দে বুড়োটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হয়তো পায়ের শব্দ পেয়ে বুড়োটা মুখ তুলে তাকালো, আর সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠে ভাঙা গলায় 'বাবু' বলে বুকফাটা একটা চিৎকার করে উঠলো। দু'হাত বাড়িয়ে কান্নার গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠলো, আমার পালানরে ফিরায়ে দেন বাবু।

ঈশ্বরের কাছেও মানুষ বোধহয় এমনভাবে প্রার্থনা জানায় না।

পরের দিন সকালবেলাতেই রাধানাথ এসে হাজির হলো। অদিতি বলতে যাচ্ছিল, বসুন, চা আনছি। কিন্তু তার আগেই আমি ওকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। ও কোন খবর এনেছে নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় ভয়, পালানের বাবার সামনেই ও না কিছু বলে বসে।

পালানের বাবা থম্ মেরে বসে আছে বারান্দার এক কোণে। লোকটার মধ্যে যেন কোন সাড় নেই। ওর তো এখন অশৌচ। কাল রাত্রে অদিতি এসে আমাদের বিছানা থেকে পুরোনো তোষকটা টেনে বের করতে যাচ্ছিল। নতুন তোষকটার নীচে একটা পুরোনো তোষক পাতা আছে। সেটার ওপরের কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের তুলো বহুকাল পেঁজা হয়নি। তাহলেও মোটামুটি বেশ ভদ্র চেহারা সেটার। অদিতি বলেছিল, এটাই ওকে পেতে দিই, কি বলো?

সঙ্গে সঙ্গে পালানের সেই বিছানাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

নোংরা শতছিন্ন তেলচিটে একটা খাটো মাপের তোষক, বছরের পর বছর এক-একজন এসে সেটাকে ব্যবহার করে শতরঞ্জি বানিয়ে দিয়েছে। ভিতরে তুলো আছে কিনা বোঝাই যায় না। আর সেই চাদরটা। বিছানায় একটা বিকট দুর্গন্ধ। এস-আই মুখার্জি সেটা দু' আঙুলে চিমটের মত ধরে নাক সিঁটকে বলেছিলেন, কি ডার্টি রে বাবা!

অদিতির নিশ্চয়ই খুব খারাপ লেগেছিল। ওরই তো ঐসব দিকে চোখ দেবার কথা। পালান বেঁচে থাকলে কোনদিনই চোখে পড়তো না। বেঁচে থাকতে পালান নিশ্চয় আমাদের ভয় পেতো, শাসন মানতো। বুড়ো বাপটাও। মরে গিয়ে এখন ও যেন অনেক বেশী শক্তিশালী। এখন ওর মৃতদেহটা আমাদের ভয়

দেখাচ্ছে। ওর বুড়ো বাপ আমাদের শাসন করছে, একটি কথাও না বলে, চুপচাপ স্তম্ভিতভাবে বসে থেকে। পালান সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে হয়তো থরথর করে কেঁপেছে, কিন্তু একটু গরম বিছানার কথা বলতে সাহস পায়নি। অথচ বুড়োটার জন্যে আমাদের বিছানার তলা থেকে পুরোনো তোষকটা অদিতি টেনে বের করতে গিয়েছিল গত রাত্রে।

আমি বললাম, ওর তো এখন অশৌচ।

অদিতি আমার মুখের দিকে অর্থহীন ভাসা-ভাসা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো।

আমি বলেছিলাম, ওকে বরং একটা কম্বল দাও।

সেই কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে পালানের বাবা বসেছিল, দেয়ালে ঠেস দিয়ে জড়সড় হয়ে। ওর সামনেও এক কাপ চা রেখে গেল অদিতি। লোকটার কোনদিকে কোন খেয়াল নেই, শোকে অভিভূত জড়পিণ্ডের মত বসে আছে। দেখলাম, কেমন অন্য-মনস্কভাবে ও চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলো। এই গভীর শোকের মধ্যেও তাহলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শরীর সবই বেঁচে থাকে।

ঠিক সেই সময়েই রাধানাথ এসে হাজির হলো। অদিতি কি বলতে যাচ্ছিল, আমি ভাবলাম রাধানাথ কিছু বলে বসবে পালানের বাবার সামনে, তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

রাধানাথ বললে, পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে, জামাইবাবু খবর পাঠিয়েছে। বলেছে, থানা থেকে চিঠি নিয়ে মর্গে চলে যেতে, ডেড বডি দিয়ে দেবে।

আমি বললাম, ওর বাপটা এসে গেছে, কি করি বলো তো!

—তা হলে তো ঝামেলা চুকেই গেল। রাধানাথ প্রথমটা না ভেবেই বলে উঠেছিল।

আমি ওকে সচেতন করে দিতেই ও বললে, না না, থানায় ওকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

শেষে ঠিক হলো আমরা দু'জনে গিয়ে চিঠিটা নিয়ে নেবো, তারপর হিন্দু সৎকার সমিতিতে টাকা দিয়ে ডেড বডি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো শ্মশান অবধি। আর তখন এক ফাঁকে এসে বুড়োকে সঙ্গে করে বার্নিং ঘাটে নিয়ে যাবো। বললাম, নিয়মকানুন তো ঠিক জানি না, পালানের বাবাকেই বোধহয় মুখাগ্নি করতে হবে।

তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা রাধানাথ, পোস্টমর্টেমে খারাপ কিছু পায়নি তো।

রাধানাথ কি যেন চিন্তা করছিল, উত্তর দিলো না।

হঠাৎ জিগ্যেস করলে, উকিলবাবুর বাড়ি আর গিয়েছিলে? উকিলবাবু মানে পরমেশ্বরবাবু। ওখানে যাবার কথা মনে পড়লেই অস্বস্তি, শ্যামলীর সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়ার।

আমি একদিন রেগে গিয়ে অদিতিকে বলেছিলাম, জানি জানি, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না, তুমি তাই শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে আসো।

অদিতি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে—তোমাকে বিশ্বাস করি না? কি যে বলো!

তারপর ও হেসে উঠে বলেছিল, আমি কি করি বলো তো, শ্যামলী যে নিজেই আসতে চায়। তোমার মত ভালো নাকি আর কাউকে দেখেনি ও।

আমি ইয়ার্কি করে বললাম, সর্বনাশ! শ্যামলী কি আমার প্রেমে পড়ে

গেছে নাকি?

অদিতি বলে উঠলো, ছি ছি, তুমি ওকে অত ছোট ভেবো না।

এস-আই মুখার্জি লোকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কুলিখালাসী ধরনের একটা আসামী লোককে উনি অভব্য ভাষায় চিৎকার করে গালিগালাজ দিচ্ছিলেন, লোকটার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে, আমরা যেতেই উনি মুখে অমায়িক হাসি এনে বসতে বললেন। রসিয়ে রসিয়ে ঐ লোকটার কুকীর্তির বর্ণনা দিলেন। তারপর ডেড বডি কিভাবে ছাড়াতে হবে তার নির্দেশ দিলেন। কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে একবার ও-সির কাছে নিয়ে গেলেন। ও-সি ঠিক চিনতে পারলেন, প্রথম দিন সব প্রথমে ওঁর সংগেই দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে, কেস করোনারের কোর্টে যাবার আগে দেখা করবেন একবার।

মর্গ থেকে ডেড বডি বের করা যে এত ঝামেলা আমরা জানতাম না। যখন চাদরে ঢাকা মৃতদেহটা সৎকার সমিতির গাড়িতে তুলে নিলো, ড্রাইভারকে সব বুঝিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। এবার আমি পালানের বাবাকে গিয়ে কি বলবো? কি ভাবে বলবো? এর চেয়ে বড় পরীক্ষা বোধহয় মানুষের জীবনে নেই। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া পুত্রের পিতাকে ঠেলে ঠেলে সচেতন করে বলতে হবে, তোমার মৃতপুত্রের মুখাগ্নি করবে চলো। এর চেয়ে হৃদয়হীন কাজ বোধহয় আর নেই।

রাধানাথকে নিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এসে বসলাম। অদিতি এল একমুখ উৎকণ্ঠা নিয়ে। টুকাই তখন স্কুলে চলে গেছে। আমি আমার সমস্যার কথা বললাম অদিতিকে। অদিতি বলে উঠলো, না না, আমি পারবো না, তোমরা কেউ বলো। রাধানাথের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি বলুন বরং।

রাধানাথ হাতজোড় করে মাথা নাড়লো।

আমরা তিনজনই খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিলাম, পাছে ওর কানে যায়।

শেষে আমিই উঠে দাঁড়ালাম। আর সংগে সংগে অদিতি আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো। যেন বলতে চাইলো, তুমি না টুকাইয়ের বাবা, ছেলের বাপ হয়ে তুমি ওকে বলতে পারবে মৃতপুত্রের মুখাগ্নি করার কথা!

আমি অসহায়ের মত অদিতির মুখের দিকে তাকালাম। যেন বুঝতে পারলাম, কেন ও বলে উঠেছিল, না না, আমি পারবো না, তোমরা কেউ বলো।

ওর মনের মধ্যে কি তোলপাড় চলছে আমি টের পেলাম না।

তবু আমি গিয়ে দাঁড়ালাম পালানের বাবার সামনে। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে ওর সাদা চুলের ওপর হাল্কা হাত রাখলাম, শোনো হারান।

ও চোখ তুলে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলো, যেন চোখের তারা দুটোর ওপারে অসীম শূন্যতা।

আমি বললাম, চলো হারান, একবার শ্মশানে যেতে হবে। পালানকে একবার দেখবে না!

ও কোন কথা বললো না, নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লো ধীরে ধীরে।

আমি বললাম, তা হয় না হারান, একবার চলো, আর তো দেখতে পাবে না। বলে ওর হাতখানা মুঠো করে ধরলাম, শির-ওঠা খেটে-খাওয়া মানুষের কঠিন একখানা হাত।

ও হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। কোন কথা বললো না।

শোকের মধ্যে বোধহয় প্রতিজ্ঞার মত কিংবা কোন দৃঢ় শপথবাক্য উচ্চারণের মত লুকোনো কোন অসীম শক্তি লুকিয়ে আছে। কেউ তাকে নড়াতে পারে না। একমাত্র পুত্রের মৃতমুখ দেখতে সে কিছুতেই রাজী হলো না। হয়তো সেই জীবন্ত মুখখানাকে চিরকালের জন্যে স্মৃতি করে রাখবে বলে।

অদিতি তার জানালা থেকে মিলির মাকে ডেকে এনেছিল। তিনি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। রায়বাবু নেমে এলেন তাঁর দোতলা থেকে, অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন হারানকে। কিন্তু একগুঁয়ের মত সে কেবলই মাথা নাড়লো, কেবলই মাথা নাড়লো।

অবশেষে কোন উপায়ান্তর না দেখে রাধানাথ বললে, চলো, আমরাই গিয়ে ব্যবস্থা করি, মিছিমিছি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি হিসেব করে দেখলাম, সত্যি অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। সৎকার সমিতির গাড়িখানা হয়তো এতক্ষণে পেঁাছে গেছে শ্মশানে। ওরা দেরি দেখলে হয়তো অপেক্ষা করবে না।

আমি রাধানাথকে নিয়ে শ্মশানঘাটে যখন পেঁাছলাম তখন সৎকার সমিতির গাড়ি থেকে পর পর কয়েকটা মৃতদেহ নামানো হয়ে গেছে।

কে একজন বললে, বড্ড দেরি করলেন, এখন সব ক'টা এনগেজ্‌ড।

আরেকজন বললে, আপনারা না থাকলেও চলবে। কেউ কি মুখাগ্নি করবেন?

আমি সজোরে মাথা নেড়ে বলে উঠলাম, না না।

তবু আমরা অপেক্ষা করলাম। জানি, আমাদের থাকার কোন প্রয়োজন নেই। জানি, চাদর সরিয়ে পালানের মুখটা দেখার আমার সাহস হবে না। তবু চলে যাওয়ার কথা আমরা ভাবতে পারলাম না।

আমি বললাম, থেকেই যাই, কি বলো রাধানাথ? আজকের দিনটা তো সি-এল হয়েই গেছে।

ও সায় দিলো।

আমরা শ্মশানঘাটের এধারে ওধারে পায়চারি করলাম। ধু ধু আগুন আর ধোঁয়ায় চতুর্দিকে একটা দম বন্ধ হওয়ার আবহাওয়া। নোংরা, দুর্গন্ধ। মানুষের শেষযাত্রা এমন কুৎসিত ক্লেদাক্তপিচ্ছিল পথ বেয়ে—ভাবাই যায় না। সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গায় অন্তিমশয়নের আসন পাবার এই কাড়াকাড়ির চেয়ে অসভ্যতা যেন আর নেই।

রাধানাথ হঠাৎ বললে, এখানে দাঁড়ানো যায় না জয়দীপ, চলো বরং ঐ দিকটায়, ওখানে ঘাস আছে, পরিচ্ছন্ন।

আমরা তাই ইলেকট্রিক চুল্লীর দিকটায় এসে রেলিং ঘেরা বাগানের ঘাসে বসলাম। সেখান থেকে মৃতদেহ বয়ে আনার গাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। বড় বড় হরফে তার গায়ে সৎকার সমিতির নাম লেখা।

একবার আমরা উঠে গিয়ে দেয়ালের লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করলাম। কয়েকটা লেখা একেবারে নতুন, কাঠকয়লা দিয়ে লেখা। কয়েকটা পুরোনো হলেও এখনো অস্পষ্ট হয়নি। আর অনেকগুলোই মুছে গেছে। 'বিপুল, তোকে আমরা কোনদিন ভুলবো না।' 'বদলা নেবো, সমীরণ, তোর মৃত্যুর বদলা আমরা নেবোই।' 'স্নেহের বোন তুলি, তুই আমাদের বুকের মধ্যে থাকবি।' 'মা, তোমাকে চিরশান্তির

কোলে রেখে গেলাম।' 'মাধবী, এবার আমি কি নিয়ে বাঁচবো।' এমনিধারা আরো কত বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস, কত প্রতিজ্ঞাপত্র সারা দেয়াল জুড়ে, একটার ওপর আরেকটা।

দেখতে দেখতে আমার মনের মধ্যেও একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এল। মনে হলো আমার কল্পনার হাত আমার বুকের দেয়ালে পালানের উদ্দেশে কি একটা কঠিন শপথবাক্য লিখতে চাইছে। কিন্তু কি সেই শপথবাক্য আমি খুঁজে পেলাম না।

আর রাধানাথ তখনই ফিরে দাঁড়িয়ে সেই মৃতদেহবহনকারী গাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে উপহাস করে বলে উঠলো, শালার সারা দেশটাই যেন সৎকার সমিতি।

কথাটার মধ্যে যেন সেই পরমেশ্বরবাবুর কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। বেঁচে থাকার সময় কেউ ফিরেও তাকায় না, মৃত্যু ঘটলে তবেই তদন্ত হয়।

দেয়ালের ঐ লেখাগুলোর উদ্দেশেই রাধানাথ ওর উপহাস ছুঁড়ে দিলো কিনা কে জানে।

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে আমাদের হুঁশ ছিল না। সিগারেটের প্যাকেট শেষ হয়ে যেতেই মনে হলো অনেক সময় পার হয়ে গেছে।

অধৈর্য হয়ে আমরা খোঁজ নিতে এলাম। এসেই শুনলাম, পালানের মৃতদেহ চিতায় শোয়ানো হয়ে গেছে। ওরা কখন ওকে নামিয়ে নিয়েছে আমরা লক্ষ করিনি।

কে একজন বললে, আপনাদের তো খুঁজলাম অনেকক্ষণ ধরে।

আমরা উৎসুক চোখ মেলে বললাম, কোথায়? কোন চিতাটা?

ওরা আঙুল দিয়ে দেখালো, কোনটার দিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা শুধু তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। পালানকে দেখা যায় কিনা, পালানের মুখখানা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। একটা ঘূর্ণি বাতাস লেগে পর পর সাজানো অনেকগুলো চিতার ধোঁয়া এক হয়ে গেছে। পাশাপাশি সারি সারি চিতা জ্বলছে, মনে হলো যেন একটাই চিতা।

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে উঠতেই আমরা সেখান থেকে সরে এলাম।

তারপর রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে কখন আমি পালানের কাছে পৌঁছে গেছি! এই তো পালান মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছে মুখে বালক-হাসি মেলে দিয়ে, আর টুকাই বলছে, কাম হিয়ার অঞ্জন। টিচারের মতই ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে জানালার ধাপীতে খড়ি দিয়ে কি যেন লিখছে টুকাই, তারপর পালানের দিকে তাকিয়ে বলছে, অঞ্জন, হোয়ের ইজ দ্য গার্ল নাও? বল্, দ্য গার্ল ইজ অ্যাট দ্য স্কুল নাও। নাও কাম দেবাশিস, হোয়ের ইজ দ্য বয় গোয়িং? পালানের দিকে তাকিয়ে টুকাই বলছে, আর পালান হাসছে, হাসছে।

৫

সারাক্ষণ আমার একটাই ভাবনা। যতই ভুলে থাকতে চাই, ততই যেন ঘুরে ঘুরে সেই চিন্তাটা মাথার মধ্যে জট পাকায়। এক-একদিন মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ভয় ভাবটা ফিরে আসে।

পালানের মৃতদেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েও যেন আমাকে রেহাই দিতে চাইছে না। 'বদলা নেবোই, সমীরণ, তোর মৃত্যুর আমরা বদলা নেবোই।' সেই শ্মশান-ঘাটের দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা প্রতিজ্ঞাপত্রটা যেন এখনো ভয় দেখাচ্ছে। চিতার আগুনে নিঃশেষ হয়েও পালান চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে চাইছে। যেন প্রতিটি মানুষ বলছে, 'বদলা নেবোই, জয়দীপ, পালানের মৃত্যুর আমরা বদলা নেবোই।' কিংবা পালান নিজেই বুঝি মৃত্যুর ওপার থেকে চিৎকার করে বলছে।

আমার হঠাৎ একবার মনে হলো শ্যামলীও যেন বলছে, একদিন সে বদলা নেবেই।

একদিন আমরা সিনেমা যাবো ঠিক ছিল, আমি আর অদিতি। দুখানা টিকিট কেটে রেখেছিলাম। মেট্রোর তলায় আমি অপেক্ষা করছি। শেষ মুহূর্তে অদিতি এল শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে। মুখেচোখে কেমন ব্যস্ততার ভাব।—এই, যাওয়া হবে না আমার। শ্যামলী আর তুমি যাও। আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

আমি আপত্তি করতেই অদিতি বলেছিল, সত্যি উপায় নেই, পরে বলবো, পরে বলবো।

আমার মনে হয়েছিল, ও যেন প্রমাণ দেখাতে চাইছে, ও আমাকে বিশ্বাস করে।

আমার কি দোষ! আমি কি বলতে পারতাম, না না, শ্যামলীকে নিয়ে আমি সিনেমায় যাবো না। কিংবা শ্যামলীকে—তুমি ফিরে যাও!

চুপচাপ দু'জনে পাশাপাশি বসেছিলাম। ছবির দিকে কারো মন ছিল না।

শ্যামলী হঠাৎ বললে, আপনার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে। অদিতি এল না।

কি আর বলা যায়, স্তোক দেবার মত করে বললাম, তোমার সঙ্গ কি খারাপ লাগার মত!

ও ফিসফিস করে বললে, সত্যি? আমাকে আপনার খারাপ লাগে না?

আমি ভিতরে ভিতরে কেমন যেন শিউরে উঠলাম। আমার কেমন সন্দেহ হলো, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোন রহস্য আছে। যেন অদিতি আমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই শ্যামলীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। নাকি মেয়েদের স্বাভাবিক ঈর্ষাই কাজ করছে শ্যামলীর মনে!

কত সহজ জিনিসকেই না আমরা সন্দেহ করে বসি। এস-আই মুখার্জিকেও তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

এস-আই মুখার্জি বলেছেন, নিশ্চিন্ত করা তো আমাদের হাতে নয় জয়দীপ-বাবু, সবই নির্ভর করছে করোনারের ওপর। করোনারের কোর্টে গিয়ে যতক্ষণ না ফয়সালা হচ্ছে...

রায়বাবু এখন ঘন ঘন আসছেন। আমরা এখন আর ওঁকে নটবর বলি না। বাড়িওয়ালা রায়বাবু আর ভাড়াটে জয়দীপ সব দ্বন্দ্ব ভুলে একটি অলিখিত চুক্তিতে

পাশাপাশি সই করে দিয়েছে। রায়বাবু এসে বসেন, গল্প করেন। কোন কোনদিন আমিই ও'র দোতলায় উঠে যাই। উনি ব্যস্ত হয়ে চা দিতে বলেন। তারপর ফিসফিস করে বলেন, দেখবেন জয়দীপবাবু, করোনারের কোর্টে দয়া করে ভেন্টিলেটরের কথাটা তুলবেন না। কোনদিন বলেন, এস-আই কেমন লোক মনে হচ্ছে, যদি কিছু দিতে-টিতে হয় জানাবেন। কোনদিন জিগ্যেস করেন, এস-আই আর কোনদিন কি ভেন্টিলেটরের কথা তুলেছিল? আমি ও'কে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি, ভরসা দিই। তারপর ধীরে ধীরে বলি, আপনাকেও তো সাক্ষী দিতে হবে, দেখবেন, দরজাটা যে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, আপনিই ভেঙেছিলেন, সে-কথা যেন অস্বীকার করে বসবেন না। রায়বাবু নিজের দোষ কাটাবার চেষ্টা করেন। আরে মশাই, তখন ঘাবড়ে গিয়ে কি না কি বলেছি, সেটাই ধরে রাখছেন! পরে তো এস-আইকে বললাম।

এত দুর্ভাবনার মধ্যেও এক এক সময় আমার হাসি পেয়ে যায়। নিজেকে চিরে চিরে দেখতে ইচ্ছে করে। মর্গে, পালান, তোকে যেভাবে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ফালা ফালা করে দেখেছে, ঠিক তেমনি করে নিজেকে কেটে ছিঁড়ে আমি দেখতে চাই। তুই পাড়াগাঁয়ের গরীব-ঘরের একটা দুর্বল অসহায় বালক, ভেবেছিলি, মরে গিয়ে তুই দৈত্যের মত অসীম শক্তি পেয়ে গেছিস তোর হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু, দ্যাখ দ্যাখ, স্বার্থ কি জিনিস! সবাই ভাবতো রায়বাবু আর আমার মধ্যে একটা বিভেদের পাঁচিল, কেউ ভাঙতে পারবে না। আমি ভাবতাম, অদিতি ভাবতো, রায়বাবু বাড়িওয়ালা, ও তো বড়লোক। আর আমরা দু'শো টাকার ভাড়াটে, মধ্যবিত্ত চাকুরে মানুষ। আমরা পরস্পরের শত্রু। কিন্তু, দ্যাখ দ্যাখ, আমরা কেমন এক হয়ে গেছি। হবারই কথা, কারণ অদিতি কখনো কখনো স্বপ্ন দেখে, আমরাও রায়বাবুর মত বাড়িওয়ালা হবো। কোনদিন হয়তো বড়লোক হয়ে যাবো। কে জানে, হয়তো অভিজিৎদের মতও বড়লোক হয়ে যেতে পারি। প্রকান্ড তিনতলা বাড়ি, একেবারে চৌরাস্তার মোড়ে। দক্ষিণের হু হু হাওয়া, আলো বাতাস, মোজেকের মেঝে, দামী নক্‌শাকাটা টালি বসানো সুদৃশ্য সিঁড়ি, নরম কার্পেট মোড়া বিশাল ড্রয়িং রুম।

অভিজিৎ আমার কলেজের সহপাঠী ছিল, এখন সে একটা নামী ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক। ও নিজে বড় ইঞ্জিনিয়ার। প্রচুর টাকা উপার্জন করেছে, এবং অহংকার। আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

চিনতে পেরে বৃষ্টির দিনে বাস-স্টপের সামনে ও হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো, আরে জয়দীপ যে, কি খবর! আয় আয়।

আমি ভেবেছিলাম, আমাকে লিফ্‌ট দেবে। আসলে তা নয়, চরচর করে ও কতখানি ওপরে উঠে গেছে সেটুকু দেখাবার লোভেই হয়তো একেবারে ওর গাড়ি বারান্দার নীচে এসে থামলো। দু-দুটো চাকর এসে দরজা খুলে দিলো দু'পাশ থেকে। আমরা নামলাম।

আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। আমি দু'শো টাকা ভাড়ার একতলার বাসিন্দে। আমি একটা সাহেব কোম্পানির দিশী সাহেবের আন্ডারে কাজ করি, তার ভয়েই তটস্থ। ওর দামী কাপড়ের ট্রাউজার্সের পা দু'খানা গটগট করে আত্মবিশ্বাসের আওয়াজ তুলে চওড়া সিঁড়ির উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে লাউঞ্জের কার্পেটে ডুবে গেল। পিছনে পিছনে জড়োসড়ো আমি।

ওর সুন্দরী স্ত্রী দু'হাত জড়ো করে নমস্কার জানালো।

আমি সোফার বিস্তৃত আরামের কোনা ঘেঁষে বসলাম।

অভিজিৎ আরেকটায়, প্রায় সব আরামটুকু আত্মসাৎ করার মত করে ধপ্ করে বসে পড়লো। তারপর একটা টায়ার্ড ভাব করে দুটো পা ছড়িয়ে মেলে দিতেই একজন পরিচ্ছন্ন পোশাকের চাকর ছুটে এসে ওর পায়ের সামনে উবু হয়ে বসলো। কাঁধে ঝাড়ন ঐ চাকরগুলোকে বোধহয় বেয়ারা বলে। সে চুপচাপ অভিজিতের জুতোর ফিতে খুলে দিলো, আলতোভাবে পা থেকে জুতো জোড়া খুলে নিলো।

তার আগেই কিন্তু আমার চোখে পড়ে গিয়েছিল, ওর সুন্দরী স্ত্রী যেন চোখের ইশারায় অভিজিৎকে নিষেধ করেছিল চাকরকে দিয়ে জুতো খোলাতে। অভিজিৎ মুখে একটা তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করেছিল, ধুৎ।

অভিজিতের এই চাকরকে দিয়ে জুতো খোলানোর দৃশ্যটা আমি কোনদিন ভুলতে পারিনি। জানি না কেন, আমি সেদিন নিজেই অপমানিত বোধ করেছিলাম। মুহূর্তের জন্যেও কি আমি ঐ বেয়ারাটার সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, নাকি মনুষ্যত্বের মর্যাদা পদলুণ্ঠিত হতে দেখেই ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল ?

করোনারের কোর্ট, পালানের মৃত্যু, রায়বাবুর আতঙ্ক সব মাথার মধ্যে মিলেমিশে গিয়ে একসময় প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল।

রেগে গিয়ে বললাম, অভিজিৎ, তুই যতই ওপরে উঠছিস ততই নীচে নেমে যাচ্ছিস। লোকটা তোর ভৃত্য হতে পারে, কিন্তু মানুষ। মানুষের মর্যাদা দিতে শিখলি না।

অভিজিৎ শব্দ করে হেসে উঠলো। বললে, মানুষের মর্যাদা? ওসব ফাঁপা কথার মানে বুঝি না, আমি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, লোহালক্কড় নিয়ে কারবার।

আমি চিৎকার করে বললাম, মনুষ্যত্ব কি জিনিস তুই জানিস না!

অভিজিৎ হাসতে হাসতে বললে, প্রচণ্ড শীতে বারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে সিঁড়ির তলায় কিংবা বারান্দায় শুতে দেওয়ার নাম মনুষ্যত্ব?

—আমি তাকে দিয়ে জুতো খোলাই না।

অভিজিৎ চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, আমি আলবৎ আমার সার্ভেন্টকে দিয়ে জুতো খোলাবো। কিন্তু আমি তাদের জন্যে সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার্স করে দিয়েছি, বিছানা দিয়েছি, আমি তাদের আশি টাকা মাইনে দিই।

—ওটা তোর টাকার গর্ব। আমি পারি না বলেই মাত্র কুড়ি টাকা দিই।

—ওতে তার মর্যাদা থাকে না, তার বুড়ো বাপটার মনুষ্যত্বও বিকিয়ে যায়।

—কিন্তু আমি মানুষকে অপমান করি না। তুই তাকে জুতোর তলায় থেঁতলে দিচ্ছিস।

অভিজিৎ যেন রেগে গেল।—তুই তো মানুষ খুন করিস। মার্ডারার।

মার্ডারার! তন্ময়তা ভেঙে যেতেই আমি হেসে ফেললাম। কবে আবার অভিজিতের সঙ্গে আমার এসব তর্ক হয়েছে। কোনদিনই না। কিন্তু করোনারের কোর্টের কথা ভাবতে ভাবতে, পালানের কথা ভাবতে ভাবতে, আমি কখন যেন নিজেকে বিচার করতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

একদিন অভিজিতের ঐ ব্যবহারটা দেখে আমি মনের ভেতর থেকে ওকে ক্ষমা করতে পারি নি, আমি নিজেও বড় অপমানিত বোধ করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আজ যেন নিজেকেই ক্ষমা করতে পারছি না। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় তার দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি হারিয়ে গেছি।

ঠিক এমন একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি আরো একদিন পড়েছিলাম। কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। শ্যামলী না অদিতি।

পরমেশ্বরবাবুর বাড়ি থেকে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে অপরিণত কৃষ্ণ-চূড়া গাছের আলোছায়ায় শ্যামলীর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলাম।

দু'জনেই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

শ্যামলীর সাদা শার্ট-কলার ব্লাউজের ওপর পেঁচিয়ে পরা কালো পাড় সাদা শাড়ির সুন্দর তন্বী শরীর স্থির হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্যে কেউ কোন কথা খুঁজে পেলাম না। তারপর শ্যামলী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, অদিতি কেমন আছে? আপনি?

—তুমি ভালো? এছাড়া আর কি প্রশ্নই বা করা যায়।

ও বললে, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা। ও কব্জিতে চওড়া কালো স্ট্র্যাপে বাঁধা ঘড়িটা চোখের কাছে নিয়ে দেখলো।

ওর বিরুদ্ধে একটা প্রচন্ড অভিমান আমার বুকের মধ্যে, কিংবা রাগ। তবু একটু কৌতূহল বোধ করলাম। আমি ওর নির্দেশ মানতে রাজি হলাম।

পরমেশ্বরবাবু আমাকে নির্ভয় করেছেন। আমি এখন কিছুটা হাল্কা বোধ করছি। কোন একজনের ওপর বিশ্বাস রাখলেই মানুষ কত নিশ্চিন্ত হতে পারে।

উনি বললেন, এটা তো একটা সিম্পল কেস অফ অ্যাকসিডেন্ট। মনে তো হয় না কোন বিপদ ঘটবে। তবে করোনারের কোর্ট সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না, ওখানে তো শুধুই তদন্ত হবে। তুমি ভয় পাচ্ছো কেন, তার পরেও তো কোর্ট আছে। তখন আমরা আছি। ক্রিমিনাল সাইডের বড় উকিল দিয়ে দেবো তোমাকে।

আমি ভরসা পেয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপরই শ্যামলীর সঙ্গে দেখা।

সেদিন ছবি শেষ হয়ে গেল, বাইরে বেরিয়ে শ্যামলী বললে, বড় খারাপ লাগছে, আপনার দিনটা মাটি করে দিলাম। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল, ও সত্যি বড় সঙ্কুচিত ও লজ্জিত।

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে উঠলাম, এখনি বাড়ি ফিরে কি হবে, চলো, বরং একটু গল্প করে সময় কাটাই।

ওর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

—যাবেন?

প্রিন্সেপ ঘাটের পূর্বদিকে, যেখানে ফোর্ট উইলিয়মের খাদ ঘেঁষে রেলিং ঘেরা কংক্রিটের বেদী, সেইদিকে ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামলী দু-একটা কথা বলছিল থেকে থেকে।—আমার সব সময় ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, গল্প করতে, আপনি তো একটুও পছন্দ করেন না।

—অদিতি বলেছে বুঝি? আমি আহত বোধ করলাম, অদিতির ওপর রাগ হলো।

রাস্তার টিউব-লাইটের আলোয় ওর চোখ দেখা যাচ্ছিল অস্পষ্টভাবে, হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ ছলছল করছে। ওর গলার স্বরে কান্নার আভাস। বললে, আমি জানতাম না, অদিতি তো আমাকে কিছুই বলেনি তখন। একটুক্ষণ থেমে বললে, অদিতি যে আগেই এসে গেছে।

আমার মধ্যে সেই মুহূর্তে কি ঘটে গেল আমি জানি না। আমার মনে হলো শ্যামলীর চেয়ে অপরূপ আর কেউ নেই। কারণ এই শ্যামলীর কাছে দু'হাত বাড়িয়ে আমি যা কিছু চাইবো, আমি পেতে পারি। অদিতি সব সময় শুধু

সাবধানী।

তারপর কখন যে সেই ঘাসের আসন থেকে উঠে আমরা দুজনে কংক্রিটের বেদীর অন্ধকারে গিয়ে বসেছিলাম, কখন আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেশে আদর করেছিলাম, আমি নিজেই জানি না।

কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায় এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি তখন হারিয়ে গেছি। ঠিক আজকের মতই।

পরমেশ্বরবাবুকে আমি বলেছিলাম, আচ্ছা কাকাবাবু, এই ব্যাপারটায়, এই ছেলেটার মৃত্যুর মধ্যে আমার কি সত্যিই কোন দায়িত্ব আছে?

ও'র ক্লার্ক তখন খটাখট আওয়াজ তুলে টাইপ করে যাচ্ছে। ও'র টেলিফোন বেজে উঠলো, কার সঙ্গে যেন সংক্ষেপে কথা সারলেন। ব্রীফ হাতে একজন মক্কেল ঢুকে ও'কে নমস্কার করলো।

উনি বললেন, দায়িত্ব তো ঠিক হয় আইনের ক্ষুরস্য ধারায়, তুমি এখনই এত ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন!

পরমেশ্বরবাবু যখন ভরসা দিচ্ছিলেন, তখন আমার সব ভয় চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার সেই দুশ্চিন্তাটা চেপে বসছে বুকের মধ্যে। সকলেই সাহস দিচ্ছে, অদিতিও রাত্তিরে হঠাৎ কিভাবে টের পেয়েছিল আমার ঘুম ভেঙে গেছে, জানি না ও জেগেই ছিল কিনা, ও ধীরে ধীরে আমার বুকের ওপর সান্ত্বনার মত নরম হাতখানা রেখে বলেছিল, ঘুমোও। আমার মনে হয়েছিল, ঐ ছোট্ট কথাটার মধ্যে ও যেন বলতে চাইছে, ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন, আমরা তো কোন দোষ করিনি। কিংবা ভয় পেয়ো না।

এই মুহূর্তে সে কথাটা মনে পড়ে যেতেই অদিতির জন্যে আমার ভীষণ মায়া হলো। আমি যেন অনেককাল ওকে সেই পুরনো দিনের ভালোবাসার চোখে দেখিনি। ওর মনের মধ্যে কি তোলপাড় চলেছে, তার কোন খোঁজই রাখিনি আমি। আমি শুধু নিজের দুশ্চিন্তাটা নিয়েই ডুবে আছি। অকারণে অদিতির ওপর রেগে গেছি। ও কেন পালানের বুড়ো বাপটার খোঁজ করেছিল, ও কেন পালানের জন্যে দুঃখ বোধ করেছে, আমার বিপদের কথা ভুলে গিয়ে। ও কেন মুখ ফুটে জিগ্যেস করে না, পরমেশ্বরবাবু কি বললেন, কিংবা এস-আই মুখার্জি কিছু বলেছেন কিনা।

আর এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার রাধানাথের কথা মনে পড়ে গেল। তার ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত বুক ভরে গেল। আমার বলে উঠতে ইচ্ছে হলো, রাধানাথ, তোমাকে আমি কোনদিনই এত পরিপূর্ণভাবে চিনতে পারিনি। তুমি আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে আমি আমার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেতাম না। তোমার জন্যে কোন মহৎ ত্যাগের সুযোগ দিয়ে তুমি যেন আমাকে বাঁচিয়ে তুলো।

রাধানাথের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমি যেন বন্ধুত্বকে নতুন করে চিনতে পারলাম। অদিতির বিশ্বাস আর শ্যামলীর অবিশ্বাস, সব যেন এতদিন আমার কাছে রহস্যের মত মনে হতো। সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব রহস্যের পর্দা সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অদিতিকে একদিন আঘাত দিয়েছিলাম এ-কথা ভেবে শ্যামলীকে আমি কিছুতেই যেন ক্ষমা করতে পারছিলাম না।

আমি একটা চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলাম। শ্যামলী পরমেশ্বরবাবুর কাছে গেছে। এখনই কাজ সেরে এসে দাঁড়াবে ঐ বাড়িটার সামনে। এখান থেকে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। ওর নাকি অনেক কথা বলার আছে আমাকে।

আমি হঠাৎ উঠে পড়ে বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালাম। কি হবে শ্যামলীর জন্যে অপেক্ষা করে! আমি জানি ও কি বলবে। হয়তো বলবে, 'বন্ধুর জন্যে এটুকু করতেই হয়।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যেতেই শ্যামলীর ওপর আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। 'অদিতি যে আগেই এসে গেছে।' এখন মনে হচ্ছে সবকিছুর মধ্যেই যেন ঐ কথাটা লুকিয়ে আছে। তফাৎ বুঝি বা শুধু ওখানেই। রায়বাবু, মানে রায়বাবুরা আমাদের আগে এসেছেন। তাই আমরা ভাড়াটে। আবার আমরা আগে এসেছি, তাই পালানের বুড়ো বাপটা ছেলেকে নিয়ে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। শিক্ষাদীক্ষা, টাকাকড়ি, বাড়িঘর—সব, সব। হয়তো প্রেমও।

অদিতি সেদিন সারাক্ষণ গম্ভীর গম্ভীর। মেঘের মত থমথম করছে ওর মুখ।

তারপর হঠাৎ একসময় ফেটে পড়লো, ছি-ছি-ছি, তুমি এত ছোট।

একটু থেমে বললে, শ্যামলীর কি কান্না কি কান্না, কাঁদতে কাঁদতে ও সমস্ত কিছু আমার কাছে স্বীকার করেছে, বলেছে আর কোনদিন ও বন্ধুর অপমান করবে না।

আমি অপমানে মাথা নীচু করে রইলাম। অদিতি বললে, ছি ছি, তুমি শেষে ওর কাছেও আমাকে ছোট করে দিলে!

এরপর কয়েকটা দিন অদিতি আমাকে এড়িয়ে গেছে। আমার মনের মধ্যে তখন কি দুর্যোগ। অভিমান ভাঙাবো এটুকু সুযোগও তখন অদিতি দিতো না।

আমি হঠাৎ কখন একটা দোতলা বাসে উঠে পড়েছি। সামনের সীটে বসে বসে কল্পনার চোখে দেখতে শুরু করেছি শ্যামলীকে। ঐ তো ও দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে, চঞ্চল উৎকণ্ঠায় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। খুঁজছে আমাকে, খুঁজছে—ওর যে অনেক কথা বলার আছে, না বলে ওর শান্তি নেই।

খুঁজুক, যত চায় ও আমাকে খুঁজে বেড়াক। আমি বরং মনে মনে অট্টহাস করি।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে আমার হঠাৎ বড় অনুশোচনা হলো। শ্যামলীর জন্যে। সব ভুলে গিয়ে বেচারীর কি বলার ছিল সেটুকু শুনলে কি ক্ষতি হতো! আমার কেবলই মনে হতো, পালানের মৃত্যুর জন্যে অদিতির অবহেলাই যেন কিছুটা দায়ী। এক একবার সন্দেহ হয়েছে, অদিতিই হয়তো ওকে রান্নাঘরটায় শুতে বলেছিল। পরমেশ্বরবাবুর সেদিনের কথাটা বার বার কানে বাজতো, নেগলিজেন্স ইজ অ্যান অফেন্স। অদিতি কেন খোঁজ রাখেনি পালান শুয়েছে কিনা, কিংবা সেই শীতের রাতে বেচারী কষ্ট পাচ্ছে কিনা। এস-আই মুখার্জি যখন পালানের বিছানাটা চিমটের মত দু'আঙুলে তুলে ধরে বলেছিলেন, কি ডার্টি রে বাবা, তখন অদিতির ওপর ক্ষণিকের জন্যেও আমার বোধহয় ঘৃণা হয়েছিল। অদিতি কেন ঐ বিছানার খবর রাখেনি, কেনই বা একটা পরিচ্ছন্ন বিছানা দেবার কথা বলেনি কোনদিন। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, অদিতির

অবহেলাই পালানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমার অবহেলাও তো আরেকটা মৃত্যুর জন্যে দায়ী—। একজনের নিঃশব্দ গোপন ভালবাসাকেও তো চোখ মেলে দেখতে চাইনি একদিন, নিতান্ত অবহেলাতেই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম।

৬

বালকটির বয়স মাত্র বারো বছর, চোখে ছিল তার দাম-শ্যাওলার আভা, মুখে নিকোনো উঠোনের ভিজে ঠাণ্ডা প্রলেপ। এই গ্রাম্য বালককে কে বা কারা দমবন্ধ করে হত্যা করেছে, তারই তদন্ত হবে বলে আজ করোনারের কোর্টে লোকে লোকারণ্য। তাদের সকলের চোখেমুখেই কৌতূহল, যদিও কোনদিন এই অসহায় দরিদ্র নির্বোধ বালকটির অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না। আদালত প্রাঙ্গণে আজ কৌতূহলী জনতার ভিড় ভেঙে পড়েছে, তারা জানতে চায় কে বা কারা এই বালকটিকে হত্যা করেছে। তারা তদন্ত চায়, তদন্তের ফলাফল জানতে চায়। করোনারকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে, এই সরল গ্রাম্য বালকটিকে হত্যা করা হয়েছে কিনা। হত্যা করা হয়ে থাকলে, কে বা কারা এই হত্যার জন্য দায়ী তা খুঁজে বের করে তাকে বা তাদের অভিযুক্ত করতে হবে।

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা উঁচু মঞ্চের ওপর করোনারের চেয়ার-টেবিল সাজানো রয়েছে। করোনারের চেয়ার এখনো শূন্য, তিনি এখনো এসে আসন গ্রহণ করেননি। পেশকার নথিপত্র সাজাচ্ছেন তাঁর টেবিলের ওপর। করোনারের টেবিলের ডানদিকে রেলিং ঘেরা কাঠগড়ায় এখনো কেউ এসে দাঁড়ায়নি। জুরীদের আসনগুলি শূন্য। পুলিস ইন্সপেক্টর এসে পৌঁছননি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে যিনি আসবেন তিনি এখনো অনুপস্থিত। কোর্ট ইন্সপেক্টরকে এখনো দেখা যাচ্ছে না। প্রসিকিউটর কি এ মামলায় কেউ আছেন? এখনো জানা যাচ্ছে না।

আমরা দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছি। আমি এবং অদিতি। এবং রায়বাবু। এবং ডাক্তার বোস। সেই অ্যাম্বুলেন্সের স্ট্রেচারবহনকারীর দল ওপাশে বসে আছে। কিন্তু ঐ লোকটি কে—আমি গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি একটি বৃদ্ধ মাথা নীচু করে বসে আছে। ও কি সেই বালকটির বৃদ্ধ পিতা?

হঠাৎ নেপথ্য থেকে সমবেত স্বরে কারা যেন চিৎকার করে উঠলো, তদন্ত চাই, তদন্ত চাই। দায়ী কে তা খুঁজে বের করা হোক, তাকে অভিযুক্ত করা হোক।

আমরা জানি আমাদের সকলকেই একে একে সামনের ওই কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সকলকেই একে একে নির্ভেজাল সত্য বলার শপথ উচ্চারণ করে করোনারের সামনে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আমরা সেজন্যেই করোনারের অপেক্ষা করছি। আমরা এবং এই অগণিত দর্শকের দল।

দর্শকদের আসনে যাঁরা নিঃশব্দে বসেছিলেন, হঠাৎ তাঁদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রলম্বিত হাতের তর্জনী করোনারের শূন্য আসনের দিকে

নির্দিষ্ট করে চিৎকার করে বলে উঠলো, মহামান্য বিচারক, আপনার কাছে আমরা ন্যায়বিচার চাই।

স্টেজের ওপর সাজানো করোনারের আদালতে তখন একটিমাত্র নিরীহ ব্যক্তি ফাইলের ওপর ফাইল সাজিয়ে রাখছিল। সে হঠাৎ ঐ চিৎকার শুনে চমকে উঠে দর্শকদের দিকে ফিরে তাকালো, তারপর স্টেজের সামনে এগিয়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশে বললে, আপনারা ধৈর্য ধরুন, মহামান্য করোনারের আদালত এখনো বসেনি।

এই কথা বলে সে যথাস্থানে ফিরে গেল এবং ফাইলের ওপর ফাইল সাজাতে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই আমরা দেখতে পেলাম পুলিশের ইউনিফর্ম পরিহিত কে একজন একটি ফাইল হাতে ঢুকলেন। সাদা মলাটের একটি ফাইল হাতে নিয়ে তিনি মঞ্চের এক ধারে রাখা কয়েকটি চেয়ারের একটিতে বসতে গিয়ে হঠাৎ গুরু-গম্ভীর থমথমে মুখে আমাদের দিকে একবার তাকালেন কঠিন দৃষ্টিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমার এবং অদিতির মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

আমরা অপেক্ষা করতে করতেই একে একে কোর্ট ইন্সপেক্টর, নাকি প্রসিকিউটর, পোস্টমর্টেমের ডাক্তার, আরো কে কে এসে নিজের নিজের চেয়ারে বসলো। এবং জুরীর দল সারিবন্ধভাবে মঞ্চে প্রবেশ করে সারি দিয়ে পাশাপাশি বসলো। এবং তারপর পরস্পরের সঙ্গে গল্প করতে শুরু করলো। কেবল একজন জুরী, অর্থাৎ জুরীদের একজন, ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো, তার কোঁচানো ধুতির কোঁচাটা মাটিতে লুটোচ্ছিল বলে সে সেটা বাঁ হাতে ফুলের তোড়ার মত ধরে রইলো। সে বোধহয় পান চিবোচ্ছিল, পান চিবোতে চিবোতেই দর্শকদের প্রশ্ন করলো, এই মামলাটা কিসের, আপনারা জানেন? আজ আমরা কিসের তদন্ত করতে এসেছি?

দর্শকদের মধ্যে থেকে উন্মাদ সেই লোকটি আবার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে গেল, মহামান্য জুরীবৃন্দ......

কোঁচানো ধুতির সেই লোকটি হাত তুলে তাকে থামতে বললো। তারপর পানের পিক্‌টা গিলে নিয়ে বললে, করোনার যতক্ষণ না আসছেন, ততক্ষণ আমি একজন নগণ্য নাগরিক। বলেই সে তার প্রশ্নের উত্তর শোনার অপেক্ষা না করে নিজের আসনে ফিরে গেল।

পরক্ষণেই মঞ্চের ওপর কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এবং সেই নিরীহ ব্যক্তিটি, যে করোনারের টেবিলে ফাইলের ওপর ফাইল স্তূপীকৃত করছিল, সে পিছনের খাসকামরার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই সামনে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে বললে, আপনারা সব চুপ করুন, করোনার আসছেন।

পর্দা সরিয়ে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর থমথমে গোলাকার রক্তবর্ণ মুখ দেখে আমি ভীত বোধ করলাম। সেই মুহূর্তে আমি একবার অদিতির বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালাম।

ভাবলেশহীন গাম্ভীর্য সহকারে করোনার তাঁর আসনের দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আসনে যাঁরা বসেছিলেন এবং জুরীর দল, এবং দর্শকেরা, সকলেই তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

আমরাও তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। আমি ও অদিতি। এবং রায়বাবু ও ডাক্তার বোস। স্ট্রেচারবহনকারীরা এবং আরো কে কে। শুধু খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির সেই বৃদ্ধটি হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঠায় বসে রইলো।

আর তা দেখতে পেয়ে সম্ভবত সেই পেশকার ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে বৃদ্ধটিকে খোঁচা দিয়ে উঠে দাঁড়াতে বললো। কিন্তু বৃদ্ধটি শূন্যদৃষ্টির চোখে তার দিকে শুধু তাকিয়ে রইলো, উঠে দাঁড়ালো না।

করোনার তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেই বসে পড়লো।

এতক্ষণ আমরা যাঁকে কোর্ট ইন্সপেক্টর বা প্রসিকিউটর ভাবছিলাম, তিনি সামনে এগিয়ে এলেন। শীর্ণকায় লোকটির খাঁড়ার মত নাক কেমন একটা বিভীষিকার সঞ্চার করলো। তিনি এক টিপ নস্যি নিয়ে অনুনাসিক স্বরে বললেন, পুলিশ রিপোর্ট!

ইউনিফর্ম পরিহিত সেই পুলিশের লোকটিকে প্রথমে চিনতে পারিনি। কারণ তাঁকে এখন আর এস-আই মুখার্জি বলে মনে হচ্ছিল না। তাঁর মুখ থমথম করছিল।

দর্শকরা যাতে শুনতে পায় সেজন্যই বোধহয় তিনি চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, এই ঘটনাকে আমি আনন্যাচারেল অর্থাৎ অস্বাভাবিক মনে করি। অমুক তারিখে সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওয়ান মিস্টার জয়দীপ সান্যাল (আমার নাম উচ্চারিত হতেই আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো) আমার কাছে প্রথম রিপোর্ট করেন। ঘটনাটি হলো এই এই এই। ল্যান্ডলর্ড অফ প্রেমিসেস নম্বর এত... ল্যান্ডলর্ড নটবর রায়, অ্যাবাভ মেনশন্‌ড্ সান্যাল এবং তাঁর স্ত্রী অদিতি সান্যাল, এই তিনজনই এর প্রধান উইটনেস। ল্যান্ডলর্ড নটবর রায় এঁদের দু'জনের সামনেই লাথি মেরে দরজা ভেঙেছিলেন, একথা অবশ্য তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন। আমি অন এনকোয়ারি রান্নাঘরটিতে ঢুকে দেখতে পাই, একটি বাচ্চা ছেলের ডেড বডি মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। এবং তার কনুই ও হাঁটুতে ছড়ে যাওয়ার দাগ, আই মীন ব্রুইজেস ছিল, মৃতদেহটির একটি পা ছিল দুর্গন্ধময় অত্যন্ত নোংরা বিছানার ওপর। সেটিকে বিছানা বলা যায় না, আমি এভিডেন্স হিসেবে সেটি দাখিল করেছি।

অন এনকোয়্যারি ইট ওয়াজ ফাউন্ড যে, রান্নাঘরটিতে কোন ভেন্টিলেটর ছিল না। (আমি এই সময় পাশে উপবিষ্ট রায়বাবুর মুখের দিকে তাকালাম)। অ্যাবাভ মেনশন্‌ড্ সান্যাল, অদিতি সান্যাল ও ল্যান্ডলর্ড নটবর রায়ের স্টেটমেন্ট গ্রহণ করে আমি তখন ডেড বডি পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দিই। মহামান্য আদালত, আই হ্যাভ নাথিং টু অ্যাড।

এস-আই মুখার্জি তাঁর আসনে ফিরে যেতেই সেই খড়্গনাসা কোর্ট ইন্সপেক্টর দর্শকদের শোনানোর জন্যে চিৎকার করে বললেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট!

পোস্টমর্টেমের ডাক্তার এগিয়ে এলেন। বাড়ির প্ল্যানের মত গোল পাকানো একখানি কাগজ খুলে সেটি চোখের সামনে মেলে ধরে তিনি বললেন, ডেড বডির কনুই এবং হাঁটুতে ইনজুরি ছিল, কিন্তু অত্যন্ত মাইনর ইনজুরি। ডেড বডির অমুক অমুক জায়গা আমি অমুক পদ্ধতিতে কেটে-ছিঁড়ে দেখেছি। আমার স্থিরবিশ্বাস, ছেলেটি দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল, কিংবা তাকে এভাবে দমবন্ধ করে মারা হয়, যদিও তার কোন চিহ্ন ছিল না। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, কিংবা আত্মহত্যা, কিংবা মার্ডার।

ঠিক এই সময়েই ঝড়ের বেগে স্টেজের ডান দিক থেকে একজন দীর্ঘ ঋজু-দেহ ব্যক্তি হঠাৎ ঢুকে পড়লেন। তাঁর পরিধানে ছিল ধোপদুরস্ত ট্রাউজার্স ও কোট, পিঠের ওপর কালো গাউন। তাঁকে দেখে কোন ব্যারিস্টার বা নামী

অ্যাডভোকেট বলে মনে হলো।

তিনি তাঁর দীর্ঘ সবল হাতের তর্জনী পোস্টমর্টেমের ডাক্তারের দিকে দেখিয়ে বললেন, বাট আই ওয়ান্ট দ্য ট্রুথ। কে দায়ী এর মৃত্যুর জন্যে? এটা কি অ্যাকসিডেন্ট, সুইসাইড, অর ইজ দেয়ার এনিথিং হোমিসিড্যাল ইন নেচার?

কোর্ট ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু স্যার, সাক্ষীদের জেরা করে সে কথাই তো আমাদের জানতে হবে!

দর্শকদের মধ্যে থেকে সেই উন্মাদ গোছের লোকটা আবার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, তার পাশের লোকেরা তাকে টেনে বসিয়ে দিলো।

কোর্ট ইন্সপেক্টর চিৎকার করে হাঁক ছাড়লেন, উইটনেস নাম্বার ওয়ান, অদিতি সান্যাল।

অদিতি একবার আমার দিকে ফিরে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে এস-আই মুখার্জি এবং পোস্টমর্টেমের ডাক্তার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই।

কোর্ট ইন্সপেক্টর চিৎকার করে উঠলেন, ওখানে নয়, ওখানে নয়। কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান। অদিতি পাংশুমুখে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো।

আর সেই রাগী ব্যারিস্টার ভদ্রলোক নাটকীয়ভাবে বললেন, আপনি বলতে পারেন কে এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী?

অদিতি তাঁর দিকে মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লো। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বললে, আমার ধারণা এটি একটি হত্যাকাণ্ড। যে একে হত্যা করেছে তার নাম বিশ্বনাথ।

—বিশ্বনাথ? সমস্বরে অনেকেই আমরা বলে উঠলাম।

কোর্ট ইন্সপেক্টর অনুনাসিক স্বরে জিগ্যেস করলেন, কে এই বিশ্বনাথ? তার নামে কি সমন পাঠানো হয়েছে? তার ঠিকানা জানেন?

অদিতি তখন করোনারের দিকে তাকিয়ে বললো, হুজুর, বছরখানেক আগে সে আমার বাড়ির চাকর ছিল, তাকে আমি পাশের ছোট ঘরটায় শুতে দিতাম, কিন্তু সে ঘড়ি আংটি টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। ফলে আমি এই ছেলেটিকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। হুজুর, সেই বিশ্বনাথ একে হত্যা করেছে।

অদিতি একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই, এমন কি করোনারও সশব্দে হেসে উঠলেন। কোর্ট ইন্সপেক্টর বললেন, হুজুর, ভদ্রমহিলা অপ্রকৃতিস্থ। ও'র সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

ঠিক তখনই স্টেজের বাঁদিক থেকে একজন মহিলা অ্যাডভোকেট আদালতে ঢুকলেন। তিনি নিঃশব্দে বাঁদিকে রাখা একটি চেয়ারে বসলেন। তিনি শার্ট-কলার ব্লাউজের ওপর একটি কালোপাড় সাদা ধোপদুরস্ত শাড়ি পরেছিলেন, এবং একটি নতুন চকচকে কালো গাউন তাঁর পিঠে চাপানো ছিল।

ঐ মহিলা অ্যাডভোকেটের দিকে একবার তাকিয়ে ব্যারিস্টার ভদ্রলোক অদিতিকে বললেন, আপনি যেতে পারেন। আপনি তদন্তের ব্যাপারে আমাদের একটুও সাহায্য করতে পারলেন না।

অদিতি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললো, কিন্তু বিশ্বনাথ যে আমার মধ্যে অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর সেজন্যেই সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে আমি পালানকে ঐ ঘরখানা খুলে দিতে পারিনি, তাকে বারান্দায় শুতে দিয়েছিলাম।

অদিতি যখন এ কথাগুলি বলতে বলতে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে আসছে,

তখনই সেই মহিলা অ্যাডভোকেট, তাঁকে এখন বেশ সুন্দরী মনে হচ্ছিল, তিনি, উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র বিদ্রুপের স্বরে করোনারকে উদ্দেশ করে বললেন, মিথ্যে কথা, ওঁকে জিগ্যেস করে দেখুন, জয়দীপের ওপর অবিশ্বাস হওয়ার পরও দ্যাট অদিতি এই জয়দীপ সান্যালকেই বিয়ে করলেন কি করে? আমি বলছি, এই অদিতি এবং তার স্বামী জয়দীপ, এরা দুজনেই এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী। কারণ সামান্য সহানুভূতির অভাবে এবং সততাকে মূল্য দিতে পারেনি বলে, এই অদিতি সান্যাল এর আগেও আরেক ধরনের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হয়েছিল। আপনি কল্পনা করুন, সেই প্রচণ্ড শীতের রাত, ওঁদের বারান্দায় হু হু হাওয়া, ছেলেটির গায়ে একটি সুতী জামা, সে যদি একটু উষ্ণ আরাম চেয়ে থাকে...

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলাম, না না, কক্ষনো না, আমরা দায়ী নই। ঐ রায়বাবু, উনি যদি ভেন্টিলেটর রাখতেন...

সঙ্গে সঙ্গে রায়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি কি করতে পারি, আপনি বিচার করে দেখুন, আমি একজন কন্ট্রাকটরকে বিশ্বাস করেছিলাম, আমি টাকা দিতে কার্পণ্য করিনি...

গম্ভীর মুখে করোনার আমাদের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর হাতুড়ি ঠুকলেন। বললেন, চুপ করুন আপনারা, চুপ করুন। আপনাদের যখন টার্ন আসবে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলবেন...

আর সেই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক বলে উঠলেন ঐ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা, আই মীন জয়দীপ সান্যাল অ্যান্ড অদিতি সান্যাল, যাঁরা একটি বাচ্চা ছেলেকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের ওপরই সব দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা কি অন্যায় নয়? কিন্তু ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে কেউ দায়ী করছেন না কেন? উইটনেস নাম্বার ফাইভ হারান মণ্ডলকে কাঠগড়ায় তোলা হোক। অ্যান্ড নাউ, হারান মণ্ডল, তুমি বলো, টাকার লোভে এবং তোমার ঘরে ভাত নাই বলে তুমি কি তোমার ছেলেকে...

ব্যারিস্টার ভদ্রলোক কথা শেষ করতে পারলেন না। শার্ট-কলারের ব্লাউজের ওপর সাদা-শাড়ি এবং কালো চকচকে গাউনের সেই মহিলা অ্যাডভোকেট বসে পড়েছিলেন, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আই অবজেক্ট।

ব্যারিস্টার ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু উইটনেসের কি বলার আছে তা জানতে হবে। হারান, তুমি বলো, তুমি কি দায়ী নও?

বৃদ্ধ হারান চোখ তুলে তাকালো এবার, তারপর মাথা নেড়ে বললে, হাঁ হুজুর।

মহিলা অ্যাডভোকেট বাধা দিয়ে বললেন, ও শোকে অভিভূত হয়ে আছে, এখানে কিসের তদন্ত হচ্ছে ও নিজেই জানে না, কোনো কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। অতএব ওর সাক্ষ্যের কোন দাম নেই এখন। ছেলেটির মৃত্যুর জন্যে যদি কেউ দায়ী হয়, তবে ঐ অদিতি এবং জয়দীপ।

কোর্ট ইন্সপেক্টর বিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, প্রকৃত লক্ষ্য থেকে আপনারা সকলেই অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। আপনি একজন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবী হয়ে ঐ বুড়ো বাপটিকে কি ছেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছেন? তাহলে তো আমি বলবো, অশিক্ষাই এই মৃত্যু'র জন্যে দায়ী। ছেলেটিকে যদি শিক্ষা দেওয়া হতো যে কোন বদ্ধ ঘরে ভেন্টিলেটর না থাকলে মৃত্যু ঘটতে পারে...

—ননসেন্স! ব্যারিস্টার চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, এ মামলায় শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে আনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

—উনি আমাকে ননসেন্স বলছেন। কোর্ট ইন্সপেক্টর করোনারের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে প্রতিবাদ করলেন।

করোনার বললেন, অর্ডার, অর্ডার!

আর তখনই দর্শকদের মধ্যে থেকে সেই পাগল লোকটা লাফিয়ে উঠে বললে, মহামান্য বিচারক, এঁরা কেউই কিন্তু আসল কথাটা বলছেন না।

—আপনি চুপ করুন। করোনার টেবিলের ওপর হাতুড়ি ঠুকলেন।

কিন্তু উন্মাদ লোকটি তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো, আমি অনেকক্ষণ চুপ করে আছি, আমরা অনেককাল থেকে চুপ করে আছি। কিন্তু এখন আর আমি চুপ করবো না। কারণ একজনও এখানে সত্যি কথাটা বলছেন না। বাট্ ট্রুথ মাস্ট কাম আউট। দেশের দারিদ্র্যের কথা, আর্থিক অবস্থার কথা আপনারা কেউই বলছেন না। কেন ঐ বুড়ো লোকটিকে মাত্র কুড়িটি টাকার জন্যে তার একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হয়েছিল? কেন? কেন ছেলেমেয়ের মুখে ভাত তুলে দেওয়ার সামর্থ্য নেই ঐ বৃদ্ধের? যে বয়সে ঐ ছেলেটির নিজেরই স্কুলে যাবার কথা, সে বয়সে কেন তাকে সান্যাল দম্পতির পুত্রের স্কুলব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হয়? কেন ঐ জয়দীপ সান্যাল ও অদিতি সান্যাল তাদের ভৃত্যটিকে ভাল মাইনে দিতে পারেন না? কেন তাকে গরম বিছানা কিংবা শোবার জায়গা দিতে পারেন না? অদিতি সান্যাল বিশ্বনাথ নামের যে ভৃত্যটিকে দায়ী করতে চেয়েছিলেন, কেন সে ঐ অতটুকু বয়সে ঘড়ি আংটি টাকা চুরি করতে বাধ্য হয়?

করোনার তখনো হাতুড়ি পিটে চলেছেন টেবিলের ওপর, আর চিৎকার করে বলছেন, অর্ডার, অর্ডার।

কিন্তু কেউ শুনছে না। দর্শকদের মধ্যে থেকে একে একে সকলেই দাঁড়িয়ে উঠছে, চিৎকার করছে, এঁর কথা শুনতে হবে। কারণ একজনও আপনারা সত্যি কথাটা বলছেন না।

সকলেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করতে শুরু করলো। চিৎকার আর হট্টগোলে কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না।

অদ্ভুত একটা হট্টগোল, চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে দর্শকরা যে যেদিকে পারছে ছোটাছুটি করছে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। স্টেজের দিকে।

তার মধ্যে করোনার চিৎকার করে বলছেন, আদালত বন্ধ করে দিচ্ছি, আপনারা কেউ যখন আমার কথা শুনবেন না, আদালত আজকের মত বন্ধ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে স্টেজের ওপর যবনিকা পড়ে গেল, আলো নিভে গেল।

৭

আমি এস-আই মুখার্জির কাছ থেকে আগেই খবর পেয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই সমন যাবে আপনার নামে, আপনার স্ত্রীর নামেও। এখন যেন কোলকাতার বাইরে যাবেন না।

'সমন' শব্দটা উনি কেমন যেন ঠাট্টার সুরে উচ্চারণ করেছিলেন, হয়তো ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্যেই, কিংবা ওটা ঠিক সমন নয় বোঝাবার জন্যে।

সেই যে আমি আর রাধানাথ গিয়ে পালানের মৃতদেহটা চিতায় তুলে দেওয়া দেখে এলাম, তারপর থেকে নিত্যদিন অফিসে যাতায়াত আর সংসারের নানান ঝামেলায় কখন থেকে যেন ভয়-ভয় ভাবটা কমে গিয়েছিল। শুধু কোন-কোনদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেলেই কেমন বুক দুরুদুরু করে উঠতো। কিংবা মাঝরাতে ঘুম

ভেঙে গেলে।

উনি মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিতে বলেছিলেন। তাই যেদিন গিয়ে সমন আসার কথাটা শুনলাম, সেদিন থেকেই কে যেন মনের শান্তি কেড়ে নিল।

আমি তো কোনদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াইনি, তার ওপর অদিতির নামেও সমন আসবে শুনে আমার ভয় আরো বেড়ে গেল। পরমেশ্বরবাবু যতই পরামর্শ দিন না কেন, আমার নিজের ওপরই আস্থা ছিল না। জেরার মুখে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবো কিনা সন্দেহ ছিল নিজের মনেই, অদিতির কথা ভেবে আমি খুব নার্ভাস বোধ করতে লাগলাম। কলেজে পড়ে পরীক্ষা পাশ করা এক জিনিস আর বাস্তব জীবনের যে কোন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো আরেক জিনিস। ও হয়তো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলবে, আর তা বলে ফেললেই কি যে হতে পারে, আমি নিজেও কল্পনা করতে পারছিলাম না।

পরমেশ্বরবাবু বলেছিলেন, নেগলিজেন্স ইজ অ্যান অফেন্স। কথাটা আমাকে কর্তব্যজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে শুধুই একটা সৎপরামর্শ, না কি সত্যি সত্যি পালানের মৃত্যুর ব্যাপারেও বিচার্য, তা আমি বুঝতে পারিনি। জিগ্যেস করতেও সাহস হয়নি।

শুধু মামলা-মকদ্দমার ভয় নয়, জেল-জরিমানার ভয় নয়, যে ভয়ে আমি তটস্থ ছিলাম তা হলো অপমানের। বাচ্চা চাকর কত লোকই তো বাড়িতে রাখে, পালান যেভাবে ছিল সেভাবেই তো তারাও থাকে, কিন্তু ছেলেটা নিজের বোকামির জন্যে মারা যাওয়ার পর থেকে আমিই যেন অপরাধী। পাড়ার লোকের সামনেও প্রথম প্রথম মাথা তুলে কথা বলতে পারতাম না। আর খবরটা সযত্নে অফিসের লোকদের কাছেও গোপন রেখেছিলাম। মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারিনি। বরং রাধানাথকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলাম, ও যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না দেয়।

সমনের কথা শুনে আমার তাই বুক কেঁপে উঠলো। কি জানি, মামলা উঠলে তখন তো লোক-জানাজানি হবেই! তখন আবার ঘটনাটা গোপন করেছি বলেই তারা আমার দোষটাকেই বড় করে দেখবে। হয়তো অফিসের ক্যান্টিনে বসে হাসা-হাসি করবে, কিংবা আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে বলবে, এই লোকটা একটা বাচ্চা ছেলেকে মেরে ফেলেছে।

আমি বোধহয় খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফিরেই অদিতিকে শুকনো মুখে বললাম, দিন কয়েকের মধ্যেই নাকি সমন আসবে তোমার নামেও।

অদিতির মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে দেখালো। আমি অদিতিকে সাহস দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, যা হয় হবে, আমি আর ভাবতে পারছি না।

অদিতির ওপর আমার যেটুকু বা আস্থা ছিল, পরমেশ্বরবাবুর কথা মনে পড়তেই সেটুকুও উবে গেল। উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, অদিতিকে নিয়েই সমস্যা, ঠিক মত উত্তর দিতে পারবে তো!

ওর সম্পর্কে আমার ভয়টা চাপা দেবার জন্যেই বললাম, তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তর দিয়ে যাবে। আর নিজেকেই যেন স্তোক দেবার জন্যে বললাম, যা সত্যি তাই বলবে, তার জন্যে ভয় পাবার কি আছে!

আশ্চর্য, আমি যে ভিতরে ভিতরে এত দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি নিজেই বুঝতে পারিনি। আগে থেকে তো জানাই ছিল। মন শক্ত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সত্যি সত্যি যেদিন এল, হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গিয়ে আমার হাত কেঁপে গেল। কাগজখানা কেঁপে উঠলো বলেই হাতটা কাঁপছে টের পেলাম। সই করার পর বুঝতে পারলাম সইটা আমার সই বলে চেনাই যায় না।

অদিতিকেও সই করে নিতে হয়েছিল।

সেদিন বিকেলেই চটির শব্দ তুলে রায়বাবুও নেমে এসেছিলেন। পাংশুমুখে বলেছিলেন, কি ঝামেলায় যে ফেললেন জয়দীপবাবু! আমাকেও একটা কি যেন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। একদিন তো থানায় গিয়েছিলাম, পুলিশের মতিগতি বোঝা দায় মশাই।

—গিয়েছিলেন থানায়? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় বেড়ে গেল। উনি গিয়ে আবার গোলমাল পাকিয়ে আসেননি তো।

রায়বাবু তো বিশ্বাস করেন সব সমস্যার একটাই সমাধান। টাকা। আমি নিজেও অবশ্য একবার সেকথা ভেবেছিলাম, কিন্তু টাকার কথা বললেই তো আমাকে সত্যি সত্যি অপরাধী ভেবে বসবে।

পালানের বুড়ো বাপটাকে দেশে পাঠিয়ে দেবার পরামর্শ তো রায়বাবুই দিয়েছিলেন। অদিতি ওর গায়েপিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্যে পুত্রশোক থাকলে কি করে রুখবে হারান, ভগবানের ওপর তো হাত নেই, এমনিধারা কথা আমিও বলেছিলাম।

আর রায়বাবু একবার আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, ও লোকটা ফ্যাসাদ বাধাতে পারে, আমি বরং কিছু টাকা দিচ্ছি, আপনিও কিছু দিন, দেশে চলে যেতে বলুন।

একটু থেমে বলেছিলেন, পাড়ার লোকদের কার মনে কি আছে বলা তো যায় না, আপনার তো খুব বন্ধু, জয়দীপবাবু, ঐ শিবশঙ্কর, ও শালাকে কোন বিশ্বাস নেই। প্রথম দিন থেকেই কেবল ভেন্টিলেটর ভেন্টিলেটর করছে।

আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পর সেদিন নেমে এসে রায়বাবু কথাটা তুললেন আবার। বললেন, তবু রক্ষে বুড়োটা চলে গেছে। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, দেখলেন তো নিজের চোখেই, অত হাউ হাউ কান্না, অত যে দুঃখ, একমাত্র ছেলে মারা গেছে বলে, তবু কেমন হাত পেতে টাকাগুলো নিলো দেখলেন।

রায়বাবুর কথাগুলো আমার কাছে বিস্বাদ ঠেকলো। উনি বুঝতে পারলেন, ওঁর উপস্থিতি আমার ভাল লাগছে না।

করোনারের কোর্টে যাবার দিন আমি ওঁকে কোন খবরই দিলাম না। উনি তো নিজেই সই করে নিয়েছেন, যেতে হয় যাবেন, যাবেন নিশ্চয়ই, আমার তো কোন দায়িত্ব নেই।

রাধানাথকে আমি আগেই বলে রেখেছিলাম। ও ঠিক সময়মত এসে হাজির হলো। সকাল থেকেই আমার ঘন ঘন তেষ্টা পাচ্ছিল, খেতে বসে কিছুই খেতে পারলাম না। বারবার অদিতির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, ও ভয় পাচ্ছে কিনা।

করোনারের কোর্ট সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিল না, রাধানাথ খবর নিয়ে এসেছিল। ও পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। গলির মোড়ে গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে বললে। তারপর রাধানাথের পিছনে পিছনে আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখনো হাতে অনেক সময় আছে।

হলঘরের মত একখানা বড়োসড়ো ঘর, সারি সারি বেঞ্চি পাতা।

আমি চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম। অন্য সব কোর্টে যেমন বড় বড় চৌকির ওপর টেবিল-চেয়ার রাখা থাকে এখানেও তেমনি। তা

হলে করোনার ঐ উঁচু জায়গাতেই বসবেন, মাঝখানের চেয়ারে। তাঁর ডানদিকে রেলিং ঘেরা কাঠগড়া। ওখানেই তো আমাদের একে একে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

কি একটা শব্দ শুনে আমি পিছন ফিরে তাকালাম। হলঘরটার একদম পিছনে দেয়াল ঘেঁষে একটু উঁচু জায়গায় এক সারি লোক বসে আছে। ওরা কারা আমি জানতাম না।

করোনারের সামনের দিকে অনেকগুলো বেঞ্চি পাতা ছিল, একেবারে ফাঁকা। আমরা সেখানে গিয়ে বসলাম পাশাপাশি। অদিতি, আমি, রাধানাথ। রাধানাথ সঙ্গে থাকায় অনেকখানি সাহস পাচ্ছিলাম।

আমরা কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতেই রাধানাথের পাশে এসে বসলো আরেকজন। সে ফস্ করে দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরালো।

আমি গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, সিগারেট খাওয়া যায়?

লোকটা হাসলো। বললে, করোনার না আসা পর্যন্ত এটা কোর্ট নয়।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করতে যাচ্ছিলাম, অদিতি নিষেধের কণ্ঠে বলে উঠলো, এই, না, খেয়ো না এখন। বলে কাঠগড়ার ওপারটা ইশারায় দেখালো।

আমরা লক্ষই করিনি আগে, রেলিঙের ফাঁক দিয়েই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, কয়েকজন কখন এসে বসেছে ওখানে। এস-আই মুখার্জিকে দেখতে পেলাম। তাঁর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করা উচিত কিনা বুঝতে পারলাম না। উনি যদি একবার এদিকে তাকান তা হলে বরং ঘাড় নাড়বো।

রাধানাথ ওর পাশের লোকটিকে জিগ্যেস করলো, ওরা কারা? অর্থাৎ একেবারে পিছনে দেয়াল ঘেঁষে খানিকটা উঁচুতে যারা সারি সারি বসেছিল।

লোকটা বললে, জানেন না? ওরা জুরী।

জুরীরা ওখানে বসে নাকি! হবে হয়তো। আমি ফিরে ফিরে ওদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। যেন ওদের ওপরই আমার ভাগ্য নির্ভর করছে। আসলে কার ওপর যে আমার ভাগ্য নির্ভর করছে তা তো জানি না। এস-আই মুখার্জি, না পোস্ট-মর্টেমের ডাক্তার গাঙ্গুলি? করোনার, না জুরীর দল? যে কেউ একটা ফ্যাঁকড়া তুললেই হলো।

অদিতি শুনতে পায়নি এই কথা ভেবে আমি ওকে বললাম, ওরা জুরী।

অদিতি ফিরে তাকালো ওদের দিকে। আর আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ওর ভয়-ভয় করছে। কারণ অদিতি আমার বেঞ্চির ওপর রাখা হাতখানার ওপর ওর হাত রাখলো। আমি অনুভব করলাম ওর হাতখানা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমি সাহস দেবার জন্যে ওর হাতখানা মুঠো করে ধরলাম, আর তখনই অদিতি ফিসফিস করে বললে, জয়, তোমার হাত কাঁপছে কেন, ছিঃ, ভয় পেও না।

আমি অদিতির মুখের দিকে তাকালাম, অদিতি আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমার মুখ নিশ্চয়ই যথেষ্ট করুণ দেখাচ্ছিল, তবু আমি মুখে আরো করুণ-ভাব আনার চেষ্টা করে কাঠগড়ার ওদিকে উপবিষ্ট এস-আই মুখার্জির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিলাম।

কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশ পাওয়ার পর আমি অবশ্য অদিতিকে সঙ্গে নিয়ে ও'র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। অদিতিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তবু আমার কেমন মনে হয়েছিল, অদিতি তো এখনো যথেষ্ট সুন্দরী, এবং শিক্ষিতা, ছোটবেলায় ও ইংরেজী মিশনারী স্কুলে পড়েছিল বলে ওর ইংরেজী উচ্চারণ খুব ভাল, প্রথম প্রথম আমি মুগ্ধ হতাম, তাছাড়া চোখের মধ্যে আসন

বিছিয়ে হেসে হেসে ও যখন কথা বলে তখন সকলেই যেন কৃতার্থ বোধ করে, সুতরাং ওকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে এস-আই মুখার্জির মন নিশ্চয় একটু নরম হবে।

রাধানাথ হঠাৎ বললে, আরে, ঐ তো ডাক্তার গাঙ্গুলি, যিনি পোস্টমর্টেম করেছেন।

আমি দেয়ালঘড়ির কাঁটার দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই করোনারের আসার কথা। বেঞ্চিগুলো সবই খালি। বোধহয় খালিই থাকে।

একজন পর্দা সরিয়ে পিছনের খাসকামরা থেকে বেরিয়ে এল হাতে কাগজপত্র ফাইল ইত্যাদি নিয়ে। প্রথমে ভেবেছিলাম উনিই করোনার। রাধানাথ বললো, না না, বোধহয় কোর্ট ইন্সপেক্টর, কিংবা কি জানি...বলে হাসলো।

লোকটি কাগজ গুছোতে গুছোতে এস-আই মুখার্জি এবং ডাক্তার গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে বললে, আসছেন।

একটু পরেই পর্দা সরিয়ে পিছনের খাসকামরা থেকে করোনার বেরিয়ে এলেন। সকলে দাঁড়িয়ে উঠলো দেখে বুঝলাম উনিই করোনার। আমার ভাগ্য ও'রই হাতে। আমরাও দাঁড়িয়ে উঠলাম।

আমি তো কল্পনায় কত কি ভেবে রেখেছিলাম। হয়তো রাগী থমথমে মুখ। তা নয়, নিতান্তই নিরীহ টাইপের মুখ, তবু ভয় গেল না। চেহারাটাকে আমরা ভয় পাই না, ভয় পাই চেয়ারটাকে।

করোনার আসন নিতেই আমরাও বসে পড়লাম।

কোর্ট ইন্সপেক্টর এস-আই মুখার্জিকে কি জিগ্যেস করলেন, তিনি তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন। উনি তা হলে আমাদের অনেক আগেই লক্ষ করেছেন।

ঠিক তখনই কে যেন এসে পিছনের বেঞ্চে বসলো। অদিতি আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, রায়বাবু এসেছেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর তখন বিড়বিড় করে কি সব বলে গেলেন, হাতে একখানা কাগজ। বোধহয় আমাদের কেসটা সম্পর্কে কিছু বললেন।

কে একজন বললে, অদিতি সান্যাল! উইটনেস বক্সে আসুন।

অদিতি উঠে দাঁড়ালো। আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। ওকেই প্রথম যেতে হবে আমি ভাবিনি। অদিতি নার্ভাস হয়ে পড়বে না তো। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবে তো?

কোর্ট ঘরখানা বড়োসড়ো হলেও লোকজন বিশেষ তো কেউ ছিল না। তবু কোর্ট ইন্সপেক্টর প্রয়াজনের চেয়ে অনেক উচ্চকণ্ঠে বললেন, সতেরোই জানুয়ারী সকালের ঘটনাটা আপনি বলুন।

অদিতি খুব শান্ত গলায় বলতে শুরু করলো। ও বললে, আমি খুব সকালে উঠে পালানকে ডেকে তুলতাম, উনোন ধরিয়ে দেবার জন্যে। কারণ আমার ছেলেকে স্কুলে যেতে হয়, স্বামীকে অফিস বেরোতে হয় সাড়ে নটায়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর কেমন অদ্ভুত ভাবে দুলতে দুলতে কথা বলছিলেন, প্রায় যাত্রার ভঙ্গিতে। তিনি আবার বেশ জোর গলায় টেনে টেনে বললেন, আপনি ঘটনার কথা বলুন।

লোকটির ওপর ভীষণ রাগ হলো। অদিতি উকিল না ভাড়াটে সাক্ষী। ও তো জীবনে এই প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছে। ঘটনা বলতে কি বোঝায় ও কি জানে নাকি?

অদিতি তখন বলতে শুরু করেছে।—বারান্দার যেখানটায় পালান প্রতিদিন শোয়, সেখানে ওর বিছানা না দেখতে পেয়ে আমার ভয় হলো, হয়তো চুরি করে পালিয়েছে।

কোর্ট ইন্সপেক্টর আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, করোনার বললেন, ইন্টারাপ্ট করবেন না।

অদিতি বললে, সদর দরজায় ভিতর থেকে খিল দেয়া আছে দেখে আমি ওকে খুঁজতে এসে দেখলাম, রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তখন আমার স্বামীকে চিৎকার করে ডাকলাম। তিনি এসে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিলেন। শব্দ শুনে রায়বাবু নেমে এলেন, তারপর লাথি মেরে দরজা ভাঙলেন। তখন দেখতে পেলাম পালান পড়ে আছে, ও যে মারা গেছে তখনো ভাবতে পারিনি।

কোর্ট ইন্সপেক্টর বললেন, আপনি কি তাকে রান্নাঘরে কোনদিন শুতে বলেছিলেন?

অদিতি বললে, না।

কোর্ট ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, রান্নাঘরে কি কোন জিনিসপত্র ছিল?

অদিতি বললে, বাসনপত্র, ঘুঁটে, কাঠকয়লা এইসব।

—আপনার স্বামী তখন কি করলেন?

অদিতি ধীর স্থির গলায় বললে, উনি তাড়াতাড়ি ওর বুকে-পিঠে হাত দিয়ে বেঁচে আছে কিনা পরীক্ষা করলেন, তারপর ডাক্তার ডাকবার জন্যে ছুটে গেলেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর বললেন, এবার যেতে পারেন।

এত সহজে অদিতিকে নিষ্কৃতি দেবে আমি ভাবিনি। এবার কে যেন বললে, জয়দীপ সান্যাল, উইটনেস বাক্সে উঠুন।

অদিতি ফিরে এল, আমি দুরুদুরু বুকে কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবো তো?

কোর্ট ইন্সপেক্টর আমাকে কাঠগড়ায় উঠতে দেখেই চিৎকার করে জিগ্যেস করলেন, আপনার কি মনে হয়েছিল ছেলেটি বেঁচে আছে? কেন মনে হয়েছিল?

আমি বললাম, বুকেপিঠে হাত দিয়ে একটু শরীরের তাপ পেলাম মনে হলো। তাই ডাক্তার ডাকবার জন্যে ছুটে গেলাম।

কোর্ট ইন্সপেক্টর শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে রসিকতার ভঙ্গিতে চিৎকার করে বললেন, আপনি পাল্‌স্‌ দেখলেন না, নিশ্বাস পড়ছে কি না দেখলেন না, অথচ ভেবে নিলেন সে বেঁচে আছে?

ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল, আমি কি উত্তর দেবো খুঁজে পেলাম না।

কোর্ট ইন্সপেক্টর যেন মস্তবড় একটা যুদ্ধ জয় করেছেন এমন মুখের ভাব করে চেঁচিয়ে বললেন, আপনি কি অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর কি থানায় গিয়েছিলেন?

বললাম আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোর্ট ইন্সপেক্টর বললেন, এবার যেতে পারেন।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি কি ভুল উত্তর দিয়ে ব্যাপারটাকে জটিল করে দিলাম? কিন্তু এত অল্প প্রশ্ন করেই ছেড়ে দিলেন কেন উনি? তবে কি আমাকে কোন বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন?

আমি ফিরে এসে অদিতির পাশে বসলাম। আর তখন দেখতে পেলাম

এস-আই মুখার্জি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি ধীরে ধীরে সব ঘটনাটা বললেন। মনে হলো এতক্ষণ তিনি ঝিমুচ্ছিলেন। গড় গড় করে বলে গেলেন—বয়স বারো, নাম পালান মণ্ডল, সকাল সাড়ে ছটায় রিপোর্ট পেলাম জয়দীপ সান্যালের কাছ থেকে, গিয়ে ডেড বডি দেখলাম, একটা ডার্টি বিছানায় পড়ে ছিল, উপুড় হয়ে, কনুইয়ে হাঁটুতে ব্রুইজেস ছিল। উনোনের পাশে কিছু কয়লা এবং কাঠকয়লা ছিল এবং একটা হাতপাখা।

তারপর এলেন ডাক্তার গাঙ্গুলি। তিনি তাঁর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। বললেন, ইটস্ এ কেস অফ কার্বোন মনোক্সাইড পয়েজনিং।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল ঘেঁষে বসা জুরীদের সারি থেকে একজন দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করলেন, পয়জন্!

করোনার মনে হলো হেসে ফেললেন। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ডাক্তার গাঙ্গুলি বললেন, একটি বন্ধঘরে যদি কাঠকয়লার আগুন জ্বলে তা হলে কার্বোন মনোক্সাইডে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা। ছেলেটিকে পোস্টমর্টেম করে দেখা যায় যে, কার্বোন মনোক্সাইডের প্রতিক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে।

করোনার কোর্ট ইন্সপেক্টরকে কি যেন বললেন, আর এস-আই মুখার্জি আবার এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, ইট ওয়াজ এ চিলি নাইট। ঘরে উনোন ছিল, সম্ভবত ছেলেটি ঘর গরম করার জন্য উনোনে কিছু কাঠকয়লা ফেলে দিয়েছিল। তার কনুইয়ে এবং হাঁটুতে যে ছড়ে যাওয়ার দাগ ছিল, তা দেখে মনে হয়, ছেলেটি মৃত্যুর পূর্বে উঠে দাঁড়াবার এবং দরজা খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। রান্না-ঘরের এবড়োখেবড়ো সিমেন্টের মেঝেতে ঘষা খেয়ে তার কনুই ও হাঁটু ছড়ে গিয়েছিল। আচ্ছন্ন অবস্থায় হয়তো উঠে দাঁড়াতে পারেনি বা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। ইট ওয়াজ এ ট্র্যাজিক ডেথ।

পোস্টমর্টেমের ডাক্তার বললেন, না, সামান্য ছড়ে যাওয়ার দাগগুলো আরো আগের। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে রান্নাঘরে শুতে যাবার সময় হয়ে থাকবে।

করোনার ধীরে ধীরে কি লিখলেন এবং পড়ে শোনালেন, তারপর সকলকে শোনাবার জন্যে জোরে জোরে বললেন, ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল্ অ্যাকসিডেন্ট। অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড্। বলে ফাইল বন্ধ করে দিলেন। নিজেই ফাইলটার ফিতে বেঁধে গিঁট দিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আনন্দে আমি আর অদিতি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমরা ধীরে ধীরে সেই হলঘরটার বন্ধ হাওয়ার পরিবেশ ছেড়ে বাইরে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম।

পিঠের ওপর দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের যে বিশাল পাথরটা বয়ে বেড়াচ্ছিলাম সেটা নেমে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কি এক দম বন্ধ হওয়া কষ্ট যেন চেপে বসতে চাইছে। পালানের হাসি হাসি মুখটা এক ঝলক চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর সেই প্রথম আমি তার জন্যে শোক অনুভব করলাম।

সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে রাধানাথ তাকে থামালো। আমরা উঠে বসলাম। আর অদিতি হাসতে হাসতে বললে, উঃ, কি ভয়ই না পেয়েছিলাম! চলো চলো, টুকাইকে মিলিদের বাড়িতে রেখে এসেছি।

কিন্তু তখনো আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে—ইট্ ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল্ অ্যাকসিডেন্ট। উপহাসের মত শোনাচ্ছে, অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড্।

লজ্জা

কলেজ ছুটির পর বাড়ি ফিরেই আমার মনে হল কিছু একটা ঘটে গেছে। অন্যান্য দিন আমি আরো আগে ফিরি। সেদিন চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে বাড়ি ঢোকার সময় পাশের ঘরটায় চোখ গেল। চার দেয়ালের উঁচু উঁচু লোহার শেলফগুলো মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা এই পুরু ধুলোর শোফাকোচে সাজানো ঘরখানা পিসেমশাইয়ের চেম্বার। উনি হাই-কোর্টের বড় অ্যাডভোকেট। এ-সময় তাঁর ঘর রমরম করে, তাঁর টেবিলের চার-পাশ ঘিরে পুরুষ্টু ব্রীফ কোলে নিয়ে মক্কেলরা বসে থাকে। দূরের শোফাকোচে অপেক্ষা করে আরো কয়েকজন, তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে, আর সে-সব ছাপিয়ে পিসেমশাইয়ের গলা শোনা যায় যখন তিনি মক্কেলকে কিছু বোঝাতে শুরু করেন। কোন কোনদিন আবার ঘরভর্তি লোক থাকলেও কেমন একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, কোন মক্কেলের কাশির শব্দ কিংবা পায়ের চটি টানার শব্দও শোনা যায় না। ক্লার্ক শিবনাথবাবুর টাইপরাইটারই শুধু থেমে থাকে না।

পিসেমশাই এমনিতে একটু রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ঘোরানো চেয়ারটা বহুদিনের, একটু এদিক ওদিক করলেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয়। টেবিলের ওপর একরাশ বই আর ব্রীফ সব সময় জড়ো হয়ে থাকে, পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে সে-সবের কোন একটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ এক এক-বার চেয়ারটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে যেন একটু বিশ্রাম করে নেন, তারপর উনি আবার পড়তে শুরু করেন। কথা বলার সময়ও তাই। আমার মনে হয়, ওটা ওঁর পায়ের একজিমার জন্যে। পায়ে রুপোর টাকার মত সাইজের একটা একজিমা আছে বলে পিসেমশাই মোজা পরে থাকেন। হয়তো চুলকে উঠলে বা সুড়সুড় করলে চেয়ারটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে চুলকুনোর ইচ্ছেটাকে সংযত করেন।

মক্কেলদের সামনে যখন বাইফোকাল পুরু লেন্সের চশমা চোখে দিয়ে বসে থাকেন, তখন তাঁকে বেশ একটু ভয়-ভয় করে। আসলে অ্যাডভোকেট হলেও তাঁকে তখন জজের চেয়েও রাশভারি লাগে। ঘরখানারও তখন বেশ গমগমে ভাব থাকে। আর ঐ পরিবেশে এবং ঐ চেহারায় দেখে আসছি বলে ওটাই খুব স্বাভাবিক লাগে। কিন্তু পিসেমশাইয়ের ধুলো-জমা চেম্বারের সঙ্গে বাড়ির ভিতরটার যেমন একেবারেই মিল নেই, দিব্যি ছিমছাম, তেমনি বাড়ির মধ্যে পিসেমশাইও অনেক সময় অন্য মানুষ।

এতদিন ধরে যা যা স্বাভাবিক মনে হয়েছে, তা থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই খট্‌কা লাগার কথা। কিন্তু এ-রকম দৃশ্য কোনদিন দেখিনি।

দরজা খোলা ছিল বলে গটগট করে ভিতরে ঢুকছিলাম, ওঁর চেম্বারের পাশ দিয়েই সিঁড়ির দিকে যেতে হয়, তাই ঘরখানার দিকে তাকাতে না চাইলেও এক-বার না একবার চোখ পড়বেই। আর চোখ পড়তেই কেমন খাপছাড়া লাগলো। এমনটি কোনদিন দেখিনি। আমি বাড়ানো পা এক মুহূর্তের জন্যে থামিয়ে দিয়ে আবার তাকালাম।

ঘরে কেউ কোথাও নেই, একজন মক্কেলও না। আর পিসেমশাই টেবিলে

কনুই রেখে হাতের ওপর মাথার ভার দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ বসে আছেন। চশমাটা খুলে নামিয়ে রেখেছেন সামনে। সাপের ফণায় ধরা টেবল-লাইট জ্বালাই আছে, কিন্তু ঘরের আর সব আলো নেভানো। তাই বইয়ের শেলফ, শোফাকৌচ, টেবিল ঘিরে চেয়ারপত্র ঐ আবছা আলোয় অন্ধকারে কেমন একটা গা ছমছমানি ভাব এনে দিচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওঁর ক্লার্ক শিবনাথবাবুকেও দেখতে পেলাম না। টাইপরাইটারের শব্দও এলো না।

আমার একবার মনে হল, বোধহয় পিসেমশাইয়ের শরীর খারাপ। মুহুরী এবং মক্কেলদের হয়তো বিদেয় করে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন! কিন্তু তা হলে এখানে এভাবে বসে থাকার কি দরকার। ওঁর তো তা হলে এসময় বিছানায় শুয়ে থাকাই উচিত। দিব্যি কর্মক্ষম এইসব বৃদ্ধদের এমনভাবে বসে থাকতে দেখলেই হার্টের কথা মনে পড়ে যায়, যদিও স্ট্রোক ব্যাপারটা কি আমার জানা নেই, কখনো দেখিনি, কি কি উপসর্গ তাও জানি না। তবু কেমন ভয়-ভয় করলো। বাণীপিসীমা হয়তো জানেনও না।

বাণীপিসীমা আমার নিজের পিসীমা নন। বেশ দূর সম্পর্কের। কিন্তু সেই যে মেজদির বিয়েতে গিয়ে আমার চিবুকে হাত ঠেকিয়ে নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে বাবাকে বলেছিলেন, 'মনুকে কলকাতার কলেজে পড়াবে সে তো ভাল কথা, কিন্তু মনু আমার হোস্টেলে থাকতে যাবে কোন দুঃখে', তারপর থেকে আমি তো এ বাড়িরই একজন, একেবারে আপন। ওঁদের দুঃখকষ্টও আমার দুঃখকষ্ট হয়ে গেছে। আমার নিজের পিসেমশাই সম্পর্কে হয়তো এতখানি দুশ্চিন্তা হত না।

আমি কি করবো প্রথমটা ঠিক করতে পারলাম না। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। ওপরে গিয়ে বাণীপিসীমাকে খবরটা দেব, নাকি আমারই উচিত পিসেমশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা।

সত্যি কথা বলতে কি, এ বাড়ির লোক হয়ে গেলেও পিসেমশাইয়ের সঙ্গে আমার কেমন একটা দূরত্ব রয়েই গেছে প্রথম দিন থেকে। বাণীপিসীমার সঙ্গেও ওঁর সেই দূরত্ব আছে কিনা সে সন্দেহও আমার কখনো কখনো হয়েছে। আসলে সে-জন্যেই আমি হয়তো ওঁকে একটু এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। কিছুটা তাঁর মুখের গম্ভীর মুখোশটার জন্যেও। তবে ভেতরে ভেতরে ওঁকে সমীহ করতাম।

আমার হঠাৎ মনে হল, বাণীপিসীমাকে খবরটা দেওয়ার চেয়ে আমারই উচিত পিসেমশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁর শরীর খারাপ কিনা জেনে আসা। যে কোন অসুস্থ মানুষকে তার কুশল প্রশ্নে রীতিমত খুশি করা যায়, তা আগেও দেখেছি। এবং যেহেতু যথেষ্ট আপন হয়ে যাওয়ার পরও আমি যে এ-বাড়ির আশ্রিত তা ভুলতে পাবতাম না, সেহেতু পিসেমশাইকে মাঝে মাঝে খুশি করার ইচ্ছেও আমার হত।

আমি সিঁড়ির কাছ থেকে ফিরে এসে চেম্বারের দরজার সামনে এক মিনিট অপেক্ষা করলাম। না, উনি চোখ খুললেন না।

আমি তাই পা টিপে টিপে ওঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। বড় হল ঘরখানার একপাশে গদি মোড়ানো শোফাকৌচ আর ওঁর টেবিলের চারপাশ ঘিরে চেয়ারের সারি, দুটো ছোট মাপের টুল। কাছে যেতে হলে একখানা চেয়ার সরাতেই হয়। সরাতে গিয়ে খট্ করে একটা শব্দ করে ফেললাম।

উনি চোখ খুললেন, তাকালেন, আবার চোখ বুজলেন।

আমি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, যদি নিজে থেকেই কিছু বলেন এই আশায়।

উনি কিছুই বললেন না দেখে খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, পিসে-মশাই, আপনার কি শরীর খারাপ?

উনি এবার মুখ তুলে তাকালেন, তারপর কেমন যেন ঈষৎ বিরক্তি চাপা দিয়ে বিষন্ন গম্ভীর গলায় উচ্চারিত দীর্ঘশ্বাসের মত বললেন, ভেতরে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। মনে হল, কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে। সাংঘাতিক কিছু।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে হল, আমি যেন হঠাৎ বাইরের লোক হয়ে গেছি। আমি যেন এ-বাড়ির কেউ নই। সম্পর্কটা যেমনকার দূরের তেমনি দূরেই রয়ে গেছে। বন্ধুদের যে-ভাবে বলে বোঝাতে হয়, যাতে তারা এবাড়িতে ঘন ঘন ডাকতে না আসে, বা ঘর ফাঁকা পেয়ে বসে আড্ডা দিতে না চায়, ঠিক সেভাবেই যেন নিজেকেও বোঝাতে হচ্ছে।

আর কোন কথা না বলে আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু তখন আমার সমস্ত মন জুড়ে দারুণ উৎকণ্ঠা। কি ঘটেছে তা জানার চেয়ে বেশি অস্বস্তি, তেমন কিছু ঘটে থাকলে আমার ব্যবহারের দিক থেকে কি করণীয়! তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল, যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটে থাকে বাণীপিসীমার কাছেই জানতে পারবো।

এই সময়টা আমার জলখাবারের সময়। কোনদিন বাণীপিসীমা নিজেই ডাকেন, কোনদিন রান্নার ঠাকুর জিজ্ঞেস করে যায়, কোনদিন টুনটুন কিংবা বাবুল হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়, বাণীপিসীমা নিজেই তালের বড়া কিংবা সরুচাকুলি বানিয়েছেন এ-খবর জানিয়ে।

পিসেমশাইয়ের গম্ভীর গলার দুটি শব্দ শুনেই আমার তখন খিদেটিদে একদম চলে গেছে। যতক্ষণ না ব্যাপারটা জানতে পারছি শান্তি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেই বাণীপিসীমাকে দেখতে পেলাম। উনি কি একটা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকলেও ওঁর ফরসা গোলগাল মুখখানার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করলাম। তা হলে সত্যিই কিছু ঘটেছে। কারণ, ওঁর মুখ কেমন থমথম করছিল, মুখের ফর্সা রঙটাও কেমন একটু লালচে-লালচে।

উনি আমার দিকে তাকালেনও না, কোন কথাও বললেন না। বাড়ির মধ্যেও কেমন একটা থমথমে ভাব লক্ষ করলাম। ইতিমধ্যে টুনটুন ও বাবুলের গলা শুনতে পাওয়ার কথা, হীটারে দুধের কড়াই চাপিয়ে গোবিন্দ চাকরটা এ সময় অনর্গল ভ্যাজ ভ্যাজ করে এবং বাণীপিসীমার ধমক খায়।

নীচের তলায় ঠাকুর রান্না করলেও বাণীপিসীমা দুধটা নিজের চোখের সামনে ফুটিয়ে নেন, তাকে বিশ্বাস করেন না। ভাঁড়ার দোতলায়, চাবি খুঁটে বাঁধা থাকে, ঠাকুরকে দু'বেলা হিসেব মত তেল ঘি চিনি মশলা বুঝিয়ে দেন। অসুস্থ থাকলেও তাকে নিজে নিয়ে নিতে বলেন না কোনদিন। সে জন্যেই আরো আশ্চর্য লাগলো, ঠাকুরকে ও প্রান্তের ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় চাবি লাগাতে দেখে।

আমি কাউকে না পেয়ে ওকেই জিজ্ঞেস করলাম চাপা গলায়, এই ঠাকুর, কি হয়েছে কি?

ও ঠোঁট উল্টে হাত উল্টে এমন একটা ভঙ্গি করলো যার অর্থ—কি জানি!

একটু একটু করে আমার উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছিল। সত্যিই যদি বিশেষ কিছু ঘটে থাকে, কোন দুর্ঘটনা বা বিপদ-আপদ, তা হলে আমাকেও তো সেই দুশ্চিন্তা বা দুঃখের

ভাগ নিতে হবে। অন্তত মুখেচোখে তেমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাছাড়া পিসেমশাই এবং বাণীপিসীমা যদি ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার মত ভাব-ভঙ্গি দেখান, তা হলে কৌতূহল আরো বেড়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এ-সব দিক ভাববার মত মনের অবস্থা তখন নয়। কারণ আমার বুকের মধ্যে তখন দুরুদুরু ভয়-ভয় ভাব।

বাড়িটা বেশ বড়োসড়ো, দোতলায় অনেকগুলো ঘর, তেতলায় আধখানা ছাদ আর বাকীটা ছেলেমেয়েদের পড়ার খুপরি।

আমি তখনো দোতলায় দাঁড়িয়ে আছি সিঁড়ির সামনে। এঘর-ওঘর করে বাণীপিসীমাকে খুঁজে বেড়ানোর অস্বস্তি কেটে যায় যদি উনি আবার এদিকে আসেন। কিন্তু ওঁকে এদিকে ফিরে আসতে না দেখে নিজেই গেলাম। এবং বাণীপিসীমাকে দেখে চমকে উঠলাম।

ওঁর ঘরের দরজায় চৌকাঠের পাশে মেঝেতে বসে আছেন বাণীপিসীমা। কপাটের একটি পাল্লায় মাথা ঠেকিয়ে। মুখ থমথমে, চোখে কেমন একটা কান্না-কান্না ভাব।

কি বলবো খুঁজে পেলাম না, আমতা আমতা করে বললাম, পিসেমশাইয়ের বোধহয় শরীর খারাপ, নীচে একা চুপচাপ বসে আছেন টেবিলে মাথা দিয়ে।

বাণীপিসীমা চোখ তুলে তাকালেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, খেয়েছো কিছু? তুমি খাবে যাও।

তাঁর গলার স্বর যেন এক্ষুনি কান্না হয়ে যাবে, চোখে জল টলমল করছে।

বাণীপিসীমার বড় ছেলে, সুদীপদা, বিলেতে পড়াশুনো করতে গেছেন। তাঁকে আমি দেখিই নি। দেখে থাকলেও এতই ছোটবেলায় যে মনে পড়ে না। সেই সুদীপদা একবার মাসখানেক চিঠিপত্র দেননি, পর পর চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়ে বাণীপিসীমা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু সেবারও তাঁকে এমন হতে দেখি নি।

আমার আর একটুও সন্দেহ রইলো না যে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। অথচ কি ঘটেছে আমি কিছুই হদিস পেলাম না। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কিছু অনুমান করে নিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলাম। সুদীপদার কিছু ঘটেনি তো?

মারা-টারা যাননি তো?

না, অতখানি কিছু ঘটতে পারে না। তেমন কিছু হলে বাণীপিসীমার কান্নায়, টুনটুন ও বাবুলের কান্নায় বাড়ি তোলপাড় হয়ে যেত। তাছাড়া খবরটা চাপাও থাকতো না।

আমার তখন খাবার ইচ্ছে-টিচ্ছে চলে গেছে। শুধু একটাই ইচ্ছে, এ বাড়িতে কি ঘটেছে তা জানবার। কিন্তু বাণীপিসীমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে গেলাম। যদি টুনটুন আর বাবুল কিছু বলতে পারে।

ওরা এ সময় ছাদের ঘরে বসে পড়াশুনো করে। একখানা ওদের পড়ার ঘর, পাশেরটা তালা দেওয়া থাকে, পিসেমশাই গরমের দিনে কখনো কখনো রাত্তিরে শোন।

ছাদে আলো জ্বলছিল, আমি উঠে এসে টুনটুনের পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়াবো, আলসের দিকে চোখ গেল। প্রথমটা ভেবেছিলাম টুনটুন। ও আজকাল মাঝে মাঝে শাড়ি পরে।

কিন্তু তার আগেই রেণু দুহাত মেলে দিয়ে সশব্দ হাসির ঝর্না তুলে প্রায় ছুটে এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো। বললে, মনুদা, এতক্ষণে ফেরার সময় হল তোমার। কি আড্ডাবাজ, কি আড্ডাবাজ হয়েছো তুমি। কোন্ সেই দুপুরে এসেছি, বাবুলকে বলছি তখন থেকে মনুদা ফিরছে না কেন রে! তোমার আর বাড়ি ফেরার নাম নেই।

বলে হাত ধরে টানতে টানতে ও আমাকে টুনটুনদের পড়ার ঘরে নিয়ে গেল।

বাবুল শুধু ওকে শব্দ করে হেসে উঠতে দেখে বললে, এই দিদি, আমার টাস্ক আছে স্কুলের, ডিস্টার্ব করো না।

রেণু ওকে প্রায় ভেংচে উঠলো, যা যা, কদ্দিন পরে এলাম বলো, উনি আমাকে টাস্ক দেখাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে বাবুলকে দুহাতে ঘিরে ওর গালে চিবুক ঘষে দিয়ে কেমন আদুরে গলায় বললে, রাগ করিস নে ভাইয়া, কদ্দিন তোদের দেখিনি বল্।

দিদির আদরে বাবুলও হেসে ফেলল।

শুধু টুনটুন বললে, এই মনুদা, আজ অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে হবে।

রেণু ধমক দিয়ে উঠলো, ওসব ছাড় তো আজ, আমি এখন মনুদার সঙ্গে গল্প করবো। বলে আমাকে ছাদের আলসের দিকে টেনে নিয়ে গেল।—চলে এসো মনুদা, পড়ুয়া মেয়ে ও, ওকে পড়তে দাও।

এই সময়টা প্রতিদিন আমি টুনটুন আর বাবুলকে ঘন্টাখানেক পড়াই। প্রথম প্রথম এ বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে ওদের পড়া বুঝিয়ে দিতাম। তারপর কখন থেকে যেন ওটা নিয়মিত হয়ে গেছে। পিসেমশাই বা বাণীপিসীমা কোন-দিন এ-কথা মুখ ফুটে বলেন নি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, আমার দিক থেকেও কিছু একটা প্রতিদান দেওয়া উচিত। হোস্টেল সম্পর্কে বাবার একটা আতঙ্ক ছিল। আমার ধারণা হোস্টেলের খরচ সম্পর্কে। নিজের পিসীমা না হয়েও বাণীপিসীমা যখন তার এমন একটা সুরাহা করে দিলেন, তখন মনে হল আমার দিক থেকেও কিছু দায়িত্ব আছে। এছাড়া আরো কিছু ছিল কিনা, আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি না।

আসলে রেণু আর আমি প্রায় সমবয়স্ক। আমি সামান্য বড়। মফঃস্বলের ছেলে বলেই একটু বেশী বয়সে পাশ করেছি।

আমি যেদিন প্রথম এ-বাড়িতে আসি, সেদিন মনে আছে, পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর দোতলার ঘরে লাজুক লাজুক ভাবে কথা বলছি, অর্থাৎ পিসেমশাই একটার পর একটা প্রশ্ন করছেন, আমি উত্তর দিচ্ছি। ঠিক সেই সময় রেণু ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়েই দরজার সামনে থেমে পড়ে কপাটের দু-পাল্লায় দু'হাত রেখে অদ্ভুত রকম চোখ বড়ো-বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল, এই মনু, তুমি অ্যাত্তো বড়ো হয়ে গেছ?

আমি ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। কোন্ ছেলেবেলায় দেখেছি রেণুকে, চিনতেই পারিনি। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন নিখুঁত সুন্দর চেহারা আমি তার আগে দেখিনি। সেদিনের সেই ছবিটা এখনো আমার চোখে লেগে আছে।

তারপর কবে যেন আমি ওকে ঠাট্টা করে রেণুদি বললাম, আর ও আমাকে মনুদা বলতে শুরু করলো।

সেই রেণুকে এতদিন পরে দেখে আমি নিজেও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু একটু আগে দেখে আসা পিসেমশাইয়ের মুখখানা, পিসীমার গাঢ় গলার 'খেয়েছো কিছু? তুমি খাবে যাও,' কথাটা মনে পড়তেই আমার সন্দেহ হল কোথায় কি যেন ঘটে গেছে। হয়তো এই রেণুকে নিয়েই।

কিন্তু ওর কথাবার্তা হাসি উচ্ছলতার মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা বা বিষাদের ছায়া দেখতে পেলাম না।

২

প্রথম এসে মনে হয়েছিল বাণীপিসীমাকে এ-বাড়িতে ঠিক যেন মানায় না। কিংবা এ-বাড়িতে কাউকেই যেন কারো সঙ্গে ঠিক মানায় না। আর নিজেকে আরো বেমানান লেগেছিল।

তখন আমার একটা বিচিত্র সঙ্কোচ ছিল মনে। কেমন একটা অস্বস্তি। সেই অস্বস্তি ভিতরে ঢুকে আরো বেড়ে গেল এমন সাজানো গোছানো ঘর দেখে, জানালায় দরজায় সুন্দর সুন্দর পর্দা দেখে। বাবার হাতের ছাতাটা যেন আমাকে হঠাৎ বিদ্রূপ করে উঠলো।

বাবার ছিল সেটেলমেন্ট আপিসের চাকরি, মফঃস্বলে ঘুরতে হত। কিন্তু ঠিক সেজন্যে নয়, আসলে ছাতাটা বাবার সঙ্গে প্রায় মুদ্রাদোষের মত লেগে থাকতো। পুরনো বাঁশের হাতলওয়ালা ছাতা, কখনো কখনো তার এক কোণায় সেলাই খুলে গিয়ে কালো কাপড়ের প্রান্তটা গুটিয়ে যেত, বন্ধ করলে সুন্দর-ভাবে ভাঁজ হত না। আমার শুধু মনে হয়েছিল, ঘরের মধ্যে বাবার ছাতাটাই শুধু মানাচ্ছে না, আমাকেও যে বেমানান লাগছে তখন বুঝতে পারিনি। লজ্জা-লজ্জা ভয়-ভয় ভাবের জন্যে তখন ও কথা মনেও আসেনি।

কিন্তু বাণীপিসীমা বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, তা না হলে মেজদির বিয়েতে এত কষ্ট করে যাবেনই বা কেন। শুনেছি, সম্পর্ক দূরের হলেও ও'রা দু'জনেই যখন ছোট ছিলেন, পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন।

বাবা বলেছিল, মনু এখন নয় কিছুদিন তোদের এখানেই থাক, বাণী, তুই যখন এত করে বলছিস। অসুবিধে হলে তখন হোস্টেল তো রয়েইছে।

বাণীপিসীমা অবশ্য দু-দু'খানা চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা এমন-ভাবে বললো, যেন হোস্টেলে সব সময়েই আমার জন্যে সীট রাখা থাকবে।

বাণীপিসীমাকে প্রণাম করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উনি ততক্ষণে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠেছেন, অসুবিধে হবে কেন, তারপর হেসে ফেলে বলেছেন, তবে তোমার ছেলের অসুবিধে হলে অন্য কথা।

পিসেমশাইকে মনে হচ্ছিল খুব অল্পকথার মানুষ, খুব গম্ভীর প্রকৃতির। আমি আসায় উনি খুশি হয়েছেন না অখুশি হয়েছেন, বুঝতে পারছিলাম না। বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা, চুল উঠে গিয়ে কপালটা অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে গেছে, আরাম কেদারায় বেশ আয়েশের সঙ্গে পা ছড়িয়ে বসে দাঁতে পাইপ চেপে কাগজ পড়ছিলেন। উনি আমাদের কথাবার্তা শুনছেন মনেই হয়নি।

হঠাৎ পাশের টুলে পাইপ নামিয়ে রেখে কাগজটা ভাঁজ করে সোজা হয়ে বসে বলে উঠলেন, সেট্‌লমেন্টে তো চাকরি করো হে, একটা ব্যাপার সেট্‌ল করতে এত সময় লাগে কিসের।

পিসেমশাইয়ের সঙ্গে অন্য সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। গুমোট হাওয়াটা এক মুহূর্তে হাল্কা হয়ে গেল।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর পিসেমশাই চুপ করে গিয়েছিলেন, প্রায় অন্যমনস্ক। বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়েও আরামকেদারায় দিব্যি গা এলিয়ে বসেছিলেন, আমার একটু খারাপ লেগেছিল। সেবার বাণীপিসীমা বলে এসেছিলেন ঠিকই, দু-দু'খানা চিঠি লিখে সে কথা মনে পড়িয়েও দিয়েছিলেন, কিন্তু কেমন একটা সন্দেহ ছিল পিসেমশাইয়ের সম্পূর্ণ মত আছে কি না।

বাবা হেসে উঠে বললে, সেটেল্‌মেন্ট কখনো এক তরফা হয় নাকি, তুমি তো কিছুই বলছো না।

পিসেমশাই হেসে হেসে বললেন, তোমার ভগিনীর মত মানেই তো আমার মত, আমি তো ওর অর্ধাঙ্গ মাত্র।

পিসীমা রসিকতা পছন্দ করলেন না, ও'র মুখেচোখে সে ভাব ফুটে উঠলো।

পিসেমশাই বোধহয় আরো রাগাবার জন্যেই বললেন, শাদীর রাতেই ওর সঙ্গে আমার কি কন্ট্রাক্ট হয়েছিল জানো? যে-কোন মাইনর ইস্যুতে ওর মতই বজায় থাকবে, মানে সেটাই হবে দু'জনের মত। শুধু মেজর ইস্যুর বেলায় আমার মত ও মেনে নেবে।

পিসেমশাই একটু থেমে বললেন, সে জন্যে জীবনে কখনো মতভেদ হয়নি।

বাবা সবিস্ময়ে হেসে উঠলো।—তাই নাকি? তা হলে তো...

পিসেমশাই হাতের ভঙ্গিতে বাবাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, কারণ জীবনে মেজর ইস্যু তো এলোই না, যখনই যে কথা বলেছি, তোমার বোনের কাছে সেটা মাইনর ইস্যু।

বাণীপিসীমা রেগে গিয়ে বললেন, ওর কখনো কান্ডজ্ঞান হবে না দাদা। কার সামনে কি বলতে হয় তাও জানে না। আমাকে বসতে বলে উনি চলে গেলেন। বললেন, দাঁড়াও, রেণু টুনটুনদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পিসেমশাইয়ের রসিকতায় আমি হেসে ফেলেছিলাম, বাণীপিসীমার রাগ দেখে বুঝতে পারলাম হাসা উচিত হয়নি।

বাবা গিয়ে খাটের পাশে বসলো। পিসেমশাই বললেন, এসো, তোমার কাছে একটু জরীপ-টরীপ শিখে নিই, আমার মামলায় লাগবে।

বাবা গিয়ে খাটের পাশে বসলো, কিন্তু পিসেমশাই তখন হঠাৎ আমাকে টুকরো টুকরো প্রশ্ন করতে শুরু করলেন পড়াশুনো সম্পর্কে।

আর তখনই রেণু ছুটতে ছুটতে এসে দু'পাল্লায় দুটি হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, এই মনু, তুমি অ্যাত্তো বড় হয়ে গেছ?

রেণু আমার চোখে তখন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়ে, তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সঙ্কোচ, অথচ ওর স্বতঃস্ফূর্ত ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আরো ভাল লাগলো ও যখন গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলো।

সেদিন থেকেই আমি একটু একটু করে এ-বাড়ির লোক হয়ে গেলাম। শুধু মাঝে মাঝে মনে হত, এ বাড়ির কেউই যেন এ বাড়ির লোক নয়।

অথচ কল্পনায় আমার মনে একটি সুখী পরিবারের যে ছবি আঁকা ছিল, তার সঙ্গে পিসীমার বাড়ির যেন হুবহু মিল আছে। তাই বাণীপিসীমার মুখে অসুখী ছাপ দেখে আমার নিজেকেও অসুখী লেগেছিল। কোন আপদ-বিপদ ঘটেছে ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলাম।

জরি-পাড় শান্তিপুরী সাদা শাড়ি পরতেন বাণীপিসীমা, কোথাও যেতে আসতে হলে। চওড়া করে সিঁথিতে সিঁদুর দিতেন। হাতে নোয়া আর শাঁখা-গুলোই বেশি চোখে পড়তো সোনার চুড়িগুলোর থেকে। দোতলার এক প্রান্তে, যে ঘরটি আমাকে খুলে দেওয়া হয়েছিল, তারই পাশে ছোট এক চিলতে একখানি ঠাকুরঘর ছিল বাণীপিসীমার, পরিচ্ছন্ন পরিপাটি। তামার কোশাকুশি, গঙ্গা-জলের পাত্র সব মেজেঘষে ঝকঝকে করে রাখতেন নিজেই। রেণু কিংবা টুনটুন মরে গেলেও ওদিক দিয়ে যেতে চাইতো না, বরং মাকে ঠাট্টা করতো কখনো কখনো, তাই মেঝেতে ন্যাতা বুলিয়ে নিকোনোর কাজটাও উনি নিজেই করতেন। ঝি-চাকরদের ওদিকে যেতে দিতেন না।

প্রথম যেদিন কলেজ যাবো, আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন! বললেন, আয় মনু, আজকে ঠাকুর প্রণাম করে যেতে হয়।

ওঁর ঠাকুরঘরে ঢুকে অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধের আমেজে মন ভরে গিয়েছিল। ধূপের ধুনোর বাসি ফুল বেলপাতার বিচিত্র গন্ধটা যেন বন্ধ দরজার আড়ালে আটকা পড়েছিল। রুপোর সিংহাসনে ফুলের মালা ফুল বেলপাতা ইত্যাদির আড়ালে কি ঠাকুর ছিল বুঝতেই পারি নি। কিন্তু বাণীপিসীমার পর আমি যখন প্রণাম করে উঠলাম, তখন ওঁকেই ঠাকুর মনে হল। ফর্সা ডিমের মত গোল মুখ, তার দু'পাশে কোঁকড়ানো চুল তাঁর। আমি ওঁকেও প্রণাম করেছিলাম।

বাণীপিসীমা তখন ফুল বেলপাতা নিয়ে আমার মাথায় ঠেকিয়েছিলেন, তারপর আমার শার্টের বুক পকেটে দিয়ে দিয়েছিলেন! বারবার বলে দিয়ে-ছিলেন, খুব সাবধানে যাবে, ট্রাম একেবারে না থামলে উঠবে না, নামবেও না।

সেদিনই মনে হয়েছিল, বাণীপিসীমাকে যেন এ বাড়িতে মানায় না।

রেণুর হাসি উচ্ছলতাও যেন বাণীপিসীমার থমথমে কান্নাচাপা মুখের সঙ্গে মানাচ্ছিল না।

ছাদের আলসে ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রেণুকে আমার খুব ভাল লাগছিল। খুব অন্তরঙ্গভাবে ও কথা বলছিল, একে একে সকলের খবর জানতে চাইছিল। ওর ধারণা, ও চলে যাবার পর এখানকার সব কিছুই হয়তো বদলে গেছে।

ও কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় কেমন চুপ করে গেল। কেমন যেন বিষণ্ণ দেখালো ওকে। ধীরে ধীরে বললে, তুমি তো দিব্যি পরীক্ষা দেবে, না মনুদা? আমার আর পড়াশুনো হল না।

তারপর কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত করে বললে, আর কিছুই হল না। আমি হেসে উঠলাম, তোর কিছুই হল না কি রে, তোর তো বিয়েই হয়ে গেল। ও আমার হাত চেপে ধরলো।—তুমি, তুমি এ-কথা বলো না মনুদা। ওর গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো।

আমি তার কোন মানেই বুঝতে পারলাম না। আমি কোন প্রশ্ন করতেও পারলাম না। আসলে আমি তো কখনো ওকে এভাবে কথা বলতে দেখিনি।

আমি ওকে এড়িয়ে ছাদ থেকে নীচে নেমে এলাম। কারণ আমি ওর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছিলাম না। কোন কিছু জিজ্ঞেস করতেও পার-ছিলাম না। অথচ আমার মাথার মধ্যে তখন একটাই প্রশ্ন। আজ এ-বাড়িতে কি ঘটে গেছে, কিছু কি ঘটে গেছে? তা না হলে পিসেমশাই তাঁর চেম্বারে ওভাবে

বসে আছেন কেন, সক্কলকে বিদায় দিয়ে, একা একা। ও'র মুখে আমি দুশ্চিন্তার স্পষ্ট ছাপ দেখেছি। বাণীপিসীমাই বা তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় কপাটে মাথা ঠেকিয়ে ওভাবে বসে ছিলেন কেন? তাঁর মুখেও আমি কষ্টের ছাপ দেখেছি। অথচ কেউ আমাকে কিছুই বলছে না। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এরা যেন আমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখতে চাইছে। আমি যেন একটা রাস্তার লোক।

ছাদ থেকে নেমে আসার সময় বাণীপিসীমা বোধহয় পায়ের শব্দ পেয়ে এগিয়ে এলেন, তুমি কিছু না খেয়ে চলে গেলে কেন, এসো আমার ঘরে।

আমি বললাম, পিসীমা, আমার একটুও ক্ষিদে নেই।

—তবু এসো। কথা আছে।

আছে? তা হলে কথা আছে? আমি ও'র পিছনে পিছনে ও'র ঘরে এলাম।

বাণীপিসীমা একেবারে সামনাসামনি আমার বুকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁ বাবা, রেণু তোমাকে কিছু বললো?

আমি চমকে উঠলাম। হতবাক্ হয়ে সপ্রশ্ন চোখে ও'র মুখের দিকে তাকালাম। বাণীপিসীমা কি জানতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারলাম না।

আমি অসহায়ের মত বলে উঠলাম, কৈ না তো, কিছুই তো বলেনি।

—কিচ্ছু বলেনি? উনি যেন আমার চোখে চোখ রেখে কিছু খুঁজে বের করতে চাইলেন। আমি কিছু গোপন করছি কিনা।

বললাম, না পিসীমা, কিছু তো বলেনি আমাকে।

আশ্চর্য, আমি নিজেও তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। বরং আমার বুকের মধ্যে একটা অভিমান জমা হয়ে উঠতে চাইলো।

পরের দিন সকালে কপাটে কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙলো। ভেবেছিলাম, হয়তো রেণু। বিয়ের আগে ওর ছিল মর্নিং কলেজ। খুব সক্কালে উঠে নিজেই চা বানিয়ে খেয়ে কলেজ চলে যেত। বেশির ভাগ দিন কখন ফিরতো, আমি টেরও পেতাম না। কারণ আমার কলেজটা ছিল বেশ দূরে, ও ফিরে আসার অনেক আগেই আমাকে বেরিয়ে যেতে হত। কোন কোনদিন ও তাই দুষ্টুমি করে ভোরবেলা বার কয়েক আমার ঘরের দরজার কড়া নেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত। আমি হুড়মুড় করে বিছানা থেকে উঠে কপাট খুলে দেখতাম, কেউ কোথাও নেই। সব্বাই তখন আধো ঘুমের মধ্যে। প্রথম দু'দিন আমি বুঝতেও পারিনি। তাছাড়া অত সকালে তখনো চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে, তাই আবার গিয়ে শুয়ে পড়তাম। হয়তো ভুল শুনেছি, আশেপাশে অন্য কোন দরজায় কেউ কড়া নেড়েছে। কিন্তু তারপর একদিন রেণু ধরা পড়ে গেল। আমি সেদিন কপাট না খুলে এপাশে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। রেণুও তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়েছে। চোখোচোখি হতেই হেসে ফেললে ও। আমি কিন্তু হাসিনি, আমার সেদিন খুব রাগ হয়েছিল ওর ওপর।

আমি তাই ভেবেছিলাম, ওর সেই পুরোনো অভ্যাসটা বুঝি ফিরে এসেছে। ঘুম ভেঙে গেল, তবু বিছানা ছেড়ে উঠলাম না। দরজা না খুললেই ও জব্দ হবে। কিন্তু আবার কড়া নাড়ার শব্দ শুনলাম। এ সেই রসিকতা করার মত ঘন ঘন কড়া নাড়ার আওয়াজ নয়। কে যেন সাবধানে আস্তে আস্তে কড়া

নাড়ছে।

আমি উঠে কপাটের খিল খুললাম। তখনো চোখে ঘুম লেগে রয়েছে।

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলাম। বাণীপিসীমা।

চোখ রগড়ে তাকিয়ে দেখতে হল। এই ভোর সকালে বাণীপিসীমা স্নান করে নিয়েছেন মনে হল। লাল পাড় গরদের শাড়ি পরেছেন।

বাণীপিসীমা আস্তে আস্তে বললেন, আমাকে একবার মায়ের মন্দিরে নিয়ে যাবে মনু?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

উনি বললেন, তুমি চোখ-মুখ ধুয়ে নাও তা হলে, আমি জোগাড়-যন্তর করে আসছি।

এর আগেও কখনো কখনো ওঁকে নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই আমার খুব অস্বস্তি হত। কারণ পিসেমশাই এ-সব একেবারে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। জানতে পারলে বড় অশান্তি সৃষ্টি করতেন। একবার ফেরার সময় একে-বারে সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলেন বাণীপিসীমা। সেদিন কি হয়েছিল কিছুই জানি না, বাণীপিসীমা সারাদিন কিচ্ছু খাননি। কেউ ওঁকে খেতে বলেওনি। পিসেমশাই তো কোর্টে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো জানতেনও না। বিকেলে ফিরে এসে খোঁজও নেননি হয়তো। সন্ধ্যেবেলায় যথারীতি মক্কেলদের নিয়ে বসে গিয়েছিলেন।

এ-সব সময় বাণীপিসীমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হত। পিসেমশাই লোক-টাকে মনে হত ভীষণ নিষ্ঠুর।—একটা ঠাকুরঘর তো পেয়েছো, আবার ওসব ক্রাউডের মধ্যে যাওয়া কেন' পিসেমশাই বলেছিলেন সেদিন। সেই যে রূপ-কথার গল্প আছে না, সোনার মুকুট তো গড়িয়ে দিয়েছি, ফুলের মুকুটের জন্যে লোভ কেন!

বাণীপিসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে আমি প্রশ্ন কবলাম, পিসীমা, তুমি কি রাত্রে ঘুমোওনি নাকি?

ওঁর দুচোখে কালো ছায়ার বৃত্ত। স্নান করে এসেছেন, তবু কেমন বিবর্ণ লাগছিল।

হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আমার ঘুম চলে গেছে মনু। অরুণ আমার ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে।

আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। অরুণ, অরুণদা! রেণুর সঙ্গে অরুণদার যখন বিয়ে হল, তখন তো সবাই খুব খুশি হয়েছিল। সবারই পছন্দ, বেশ হাসিখুশি মানুষ। আমারও ভাল লেগেছিল। সেই অরুণদা এমন কি করেছে যার জন্যে ওঁদের এত দুশ্চিন্তা।

বাণীপিসীমা নিজের থেকেই আবার বললেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না রে। ওর মনে কি আছে কে জানে, কেন যে এমন মিথ্যে অপবাদ দিল!

সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রেণু, রেণু সম্পর্কে অপবাদ। আমি এ-কথা ভাবতেও পারিনি। আমার মাথাটা কি রকম ঝিমঝিম করে উঠলো। আমি মুহূর্তের মধ্যে কত কি ভেবে বসলাম। এই অপবাদের মধ্যে আমার কোন ভূমিকা নেই তো? বাণীপিসীমার দিকে ফিরে তাকাতেও আমার লজ্জা করছিল। বাণীপিসীমা কি ভাবছেন তাহলে এখন! সরল বিশ্বাসে এই ছেলেটিকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম!

আমার মনে পড়লো। গত সন্ধ্যায় আমি যখন পিসেমশাইয়ের শরীর সম্পর্কে

উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর শরীর খারাপ কিনা জানতে গিয়েছিলাম, উনি তখন শুধু দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন: ভেতরে যাও। এই মুহূর্তে মনে হল, তাঁর সেই চোখ তুলে তাকানো যেন ঘৃণিতের প্রতি ভর্ৎসনা দিয়ে বলে উঠেছিল: বেরিয়ে যাও।

আমি বুকের মধ্যে একটা অসহ্য শূন্যতা অনুভব করলাম। একটা নিষ্পাপ কান্না চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে রেণুর জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হল। আহা বেচারী। গতকাল অত হাসি উদ্দাম উচ্ছলতার মধ্যেও নিশ্চয় ওর কষ্টটা লুকিয়ে রেখেছিল। জানতে দেয় নি।

অরুণদার ওপর আমার ভীষণ রাগ হল। যেন ওকে সামনে পেলে আমি ওকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। পরক্ষণেই আমার ইচ্ছে হল অরুণদার কাছে ছুটে গিয়ে ওর দুটো হাঁটু জড়িয়ে ধরে আমি বলি, রেণুর ওপর তুমি কোন অবিচার করো না অরুণদা।

নিমেষের জন্যে আমার তখনই একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার কলেজের বন্ধু সুশান্ত একবার আমাকে ডাকতে এসে রেণুকে দেখেছিল। তারপর আড্ডায় তার রূপের প্রশংসা করতে গিয়ে একটা অভব্য রসিকতা করেছিল আমাকে নিয়ে। সেদিন আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে চলে এসেছিলাম। অনেকদিন পর্যন্ত সুশান্তর সঙ্গে কথা বলতে পারি নি। কিন্তু ও তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল আমার। আমি অনেকদিন পর্যন্ত রেণুর সঙ্গেই ভাল করে কথা বলতে পারি নি।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম, রেণুর জীবনে সত্যি কোন গোপন রহস্য থাকতে পারে কিনা।

আর তখনই বাণীপিসীমা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়া গলায় বললেন, জানি না অরুণের মনে কি আছে। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না রে মনু।

৩

টুনটুন এসে বললে, বাবা তোমাকে ডাকছেন। বলেই চলে যাচ্ছিল। পা থামিয়ে ফিরে তাকিয়ে হাতের আঙুলটা মেঝের দিকে নির্দেশ করে বললে, নীচে।

পিসেমশাই তো বড় একটা আমাকে ডাকেন না। বলতে গেলে কাউকেই ডাকেন না। ওঁকে এক এক সময় যন্ত্রের মত মনে হয়। উনি ঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠেন, খবরের কাগজ পড়েন, ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে চা জলখাবার পেঁছে দেওয়া হয়। স্নান-খাওয়া, কোর্টে বেরোনো, দুধ, ছানা, কমপ্ল্যান, মক্কেল নিয়ে বসা...সবই ওঁর ঘড়ি ধরে। কাঁটায় কাঁটায় ঐ নিয়ম রক্ষার জন্যে সমস্ত বাড়ি তটস্থ। না, সে-কথা বললে ভুল হবে। আসলে আড়ালে থেকে বাণীপিসীমাই তদারকি করেন, যন্ত্রের মত কাজগুলো করে যান তিনি। দু বেলা খাবার সময় টেবিলের সামনে বাণীপিসীমা বসে থাকেন, ঠাকুরকে এটা ওটা ফরমাশ করেন, হয়তো ওঁদের কথাবার্তাও হয় ঐ সময়েই। যে লোকটি মক্কেলদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলেন, বাড়ির মধ্যে তিনি প্রায়ই চুপচাপ। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলেন না। সেই বাবার সঙ্গে একবার রসিকতা করে হেসেছিলেন, হাসিয়ে-

ছিলেন। রেণুর বিয়ের সময়েও অন্য চেহারা দেখেছি। কিন্তু সেগুলো ব্যতিক্রম।

আমি নীচে নেমে এলাম। খুব একটা বিচলিত বোধ করলাম না। গতকাল থেকে ও'কে যে-ভাবে মুষড়ে পড়তে দেখেছি, মনে হল না বাণীপিসীমাকে নিয়ে মায়ের মন্দিরে যাওয়ার জন্যে উনি রাগারাগি করবেন।

নীচে নেমে ও'র ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

পিসেমশাই আর অরুণদা সামনাসামনি বসে ঈষৎ চাপা গলায় কি যেন পরামর্শ করছিলেন।

আমাকে দেখেই অরুণদা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে ডাকলেন, এসো অনিমেষ। উনি স্বাভাবিক হতে চাইলেন। বললেন, কাল এসে তো তোমার দেখাই পেলাম না।

আমার তো প্রচণ্ড রাগ হওয়ার কথা। বাণীপিসীমার কাছে সকালে যেটুকু শুনেছি, তার ওপর কল্পনায় সম্ভাব্য অসম্ভাব্য যা কিছু ভেবে নিয়েছি, তাতে অরুণদার মুখের ওপরই কয়েকটা কথা শুনিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

তার বদলে আমি কি রকম নার্ভাস বোধ করলাম। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করে উঠলো। আমি তখন ধরেই নিয়েছি অরুণদা আসলে একটা স্কাউণ্ড্রেল। ওর নিশ্চয় কোন একটা অসৎ উদ্দেশ্য আছে। হয়তো কারো সঙ্গে প্রেম-ট্রেম ছিল। কিংবা টাকার লোভও হতে পারে। বিয়েতে পিসেমশাই গয়নাপত্তর তো কম দেন নি। ডিভোর্স-টিভোর্সের রাস্তায় যাচ্ছে কিনা কে জানে। এমন সব গল্প তো হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু বিশ্বাসও হচ্ছিল না। রেণুদির মত রূপসী স্ত্রী অরুণদা আর কোথাও পেত নাকি।

অরুণদা হাসি হাসি মুখে আমাকে ডাকলেন বটে, আমি কিন্তু ভয় পেয়ে গেলাম। 'অপবাদ' শব্দটা শোনার পর থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ-বাড়িতে আমাকে ছাড়া আর কাকে নিয়ে রেণুর অপবাদ রটতে পারে। আমাদের সঙ্গে বাণীপিসীমার সম্পর্কটা যে অনেক দূরের, নিজের পিসীমা নন উনি, এ খবরটাই হয়তো অরুণদার জানা ছিল না। ছুটিতে একবার যখন বাড়ি গিয়েছিলাম, আমার মাসীমা তো হাসতে হাসতে মাকে ঠাট্টা করে আমার সামনেই বলেছিল, বাণীর মেয়ের সঙ্গে মনুর বিয়ে দিলেই তো পারিস। মা হেসে ফেলে মাসীমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, ওর মাথায় আর ঐসব ঢোকাস না। সেদিনও আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।

অরুণদা মুখে হাসি এনে বললেন, এসো অনিমেষ...কাল তো তোমার সঙ্গে দেখাই হল না।

ও'র মুখের হাসি দেখেও আমি সাহস পেলাম না। আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল, অরুণদা পিসেমশাইয়ের সামনেই হয়তো আজেবাজে অভিযোগ করে বসবেন। করে বসেছেন তো নিশ্চয়ই। সেজন্যই কাল অমন গম্ভীরভাবে বললেন, ভেতরে যাও। শরীর খারাপ কিনা এ-প্রশ্নের কোন উত্তরই দিলেন না।

পিসেমশাইকে আমি যতটা সমীহ করি ততটাই ভয়। আমার তো আজ একবার হঠাৎ মনে হয়েছিল, আমি এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। পিসেমশাই কি ভাবলেন না ভাবলেন, তার চেয়ে বড় কথা, এই ধরনের কথা যদি বাবা-মার কানে যায়, আমি তো মুখ দেখাতে পারবো না। দুঃখে-কষ্টে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এমন কি এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল, আমার সেই কলেজের বন্ধু সুশান্ত, ও তো একটা লোচ্চা, সেদিনের সেই ঘটনার পর ও রেগে

গিয়ে বেনামীতে কোন চিঠি দেয় নি তো অরুণদাকে?

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম, আমার মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকালেন পিসেমশাই, হাতের ইশারায় বসতে বললেন।

আমি বসলাম। কিন্তু মনে হল আমার হাঁটু কাঁপছে।

পিসেমশাই ধীরে ধীরে বললেন, তুমি শুনেছো কিছু?

আরেকটু হলে আমার চোখে জল এসে যেত। আমি শুধু মাথা নেড়ে বললাম, না।

পিসেমশাই আর অরুণদা এক মিনিট চুপচাপ বসে রইলেন। যেন কিভাবে কথা শুরু করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

পিসেমশাই ওঁর পিতলের দোয়াতদানি থেকে মোটা লাল-নীল পেন্সিলটা তুলে নিয়ে দু'বার টেবিলে ঠুকলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি তো রেণুকে অনেকদিন থেকে দেখছো, ওর বিয়ের আগে থেকেই, আচ্ছা মনু, তুমি কি কোনদিন ওর ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছো?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। প্রশ্নটা ভাল করে বুঝতেও পারলাম না।

পিসেমশাই আবার বললেন, ধরো ওর ব্যবহারে, কথাবার্তায়...

আমি মাথা নেড়ে বললাম, কৈ না তো।

অরুণদা আমার মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকালেন। যেন কিছু জানতে চাইছেন।

পিসেমশাই আবার প্রশ্ন করলেন কাল তোমার সঙ্গে রেণুর দেখা হয়েছে? কথাবার্তা বলেছো ওর সঙ্গে?

আমি অপরাধী মুখ করে তাঁর কথায় সায় দিলাম ঘাড় নেড়ে। কিন্তু তার পরের কথাটাতেই আমি চমকে উঠলাম।

পিসেমশাই যেন মামলা জেতার ভঙ্গি করে বলে উঠলেন, নাও লুক, সত্যি যদি তেমন কিছু থাকতো, আমরা বাড়ির লোক, বলতে পারো লক্ষ করিনি, বাট হি ইজ অ্যান আউটসাইডার, ওর নিশ্চয় চোখে পড়তো।

আউটসাইডার! কথাটা আমার কানে খট করে লাগলো। কিন্তু তখন ও নিয়ে অভিমান করার সময় নয়। আমি তখনো একটা রহস্যের মধ্যে ডুবে আছি। তখন ভয়-ভয় ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে, তবু বুঝতে পারছি না ওঁরা ঘুরেফিরে কোথায় এসে পোঁছতে চাইছেন।

অরুণদা কেমন ছটফট করে উঠলেন। ওঁর গলার স্বর বড় কাতর শোনালো। বলে উঠলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, ফর নাথিং আমি কেন বানিয়ে বানিয়ে বলতে যাবো।

পিসেমশাই হেসে উঠলেন, কিংবা হেসে ওঠার ভান করলেন। বললেন, অরুণ, তুমি ভুল করছো, আফটার-অল তোমরা, তুমি আর রেণু আমার বুকের পাঁজরা। তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা আমি ভাবতেই পারি না। হোয়াট আই মীন টু সে, সবটাই তোমার মনের ভুল হতে পারে। উনি সশব্দে হেসে উঠলেন, আমার মেয়েকে যে আমি জন্মাবধি দেখেছি হে, সে জন্যেই তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না।

অরুণদা আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন। পিসেমশাই হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দিলেন।—ঠিক আছে। লেট আস অবজার্ভ।

সেই সময়েই টুনটুন এসে হাজির হল। দেখে মনে হল, ও এরই মধ্যে একটু সেজে নিয়েছে। একখানা ভাল শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরলে ওকে খুব

রোগা লাগে। ঠোঁটে বোধহয় একটু লিপস্টিক দিয়েছে।

ও এসে বললে, জামাইবাবু, মা আপনাকে ডাকছে, ওপরে চলুন। কাল না খেয়ে পালিয়েছিলেন, মা খুব কান্নাকাটি করছিল। 'দোষ করবেন আপনি, আর ধমক খাবো আমরা, চলুন ওপরে চলুন।

টুনটুন বড্ড কথা বলে, থামতে চায় না। ওটা ভীষণ বোকা, কোথায় কি ধরনের কথা বলতে হয় তাও জানে না।

অরুণদা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলেন। পিসেমশাই বললেন, হ্যাঁ যাও, ওপর থেকে ঘুরে এসো।

অরুণদা চলে গেলেন। আমারও পালাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু কেমন মনে হল, পিসেমশাই আমাকে একা চান। হয়তো কিছু বলার আছে। আমি বসে রইলাম।

পিসেমশাই স্বগতোক্তির মত বললেন, আজকালকার ছেলেদের বোঝাই দায়, কোথাও কিচ্ছু নেই, আরে বাপু একটু রয়ে সয়ে দেখবি তো, দুম করে একটা কথা বলে দিলে যে গোটা একটা সংসারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, সে খেয়ালই নেই।

একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, সত্যি বলো তো, কিছু আনন্যাচারেল মানে অ্যাবনরমাল কিছু দেখেছো কাল?

ততক্ষণে আমার নিজের যা-কিছু ভয় সরে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি আমার বিরুদ্ধে ও'দের কোন অভিযোগ নেই।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, কিচ্ছু না। আমি নির্বোধের মত অকারণ কত-গুলো কথা ভেবে নিয়েছি। নাকি আমার কোন গিল্টি কনসেন্স ছিল বলেই ভেবেছি?

আমার মনে তখন প্রচন্ড কৌতূহল। ঠিক কি বলতে চাইছেন পিসেমশাই? মানে অরুণদা। আনন্যাচারেল কিছু, অ্যাবনরমাল কিছু বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

পিসেমশাই পাইপ খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, আমার বরং অরুণ সম্পর্কেই ভয় হচ্ছে। হঠাৎ ওর এসব মনে হল কেন, আর তো কারো মনে হয়নি।

আমি সপ্রশ্ন চোখে ও'র দিকে তাকালাম। পিসেমশাই একটু চাপা গলায় বললেন, অরুণের ধারণা রেণুর মধ্যে একটা স্ট্রীক অফ ইনস্যানিটি আছে।

—ইনস্যানিটি? আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। বললাম, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

পিসেমশাই হেসে বললেন. আমিও তো সে কথাই বলছি।

তারপর পিসেমশাই মাঝপথেই আলোচনা থামিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, যাও।

আমার মাথাটা তখন ঝিমঝিম করছে। কোন রকমে উঠে আমি চলে আস-ছিলাম, দরজা পর্যন্ত পে'ৗছেছি, পিছন থেকে পিসেমশাই ডাকলেন, শোন একবার।

কাছে এগিয়ে যেতেই চাপা গলায় বললেন, রেণুকে কিছু বলো না। ও শুনলে একটা সীন ক্রিয়েট করবে। এমন কি সত্যি সত্যি বিগড়ে যেতে পারে। এ-সব তো বুঝি না ভালো, আমাদের ফ্যামিলিতে এ-রকম কোন হিস্ট্রি নেই।

আমি আবার চলে আসছিলাম, উনি আবার ডাকলেন।

গেলাম।

উনি ধীরে ধীরে বললেন, একটা কথা বলছি কিছু মনে করো না। এইসব ব্যাপার তোমার মা-বাবাকে লিখে জানিও না যেন।

আমি চলে এলাম। কিন্তু ওঁর শেষ কথাটা আবার মনে পড়িয়ে দিল আমি একজন আউটসাইডার। বাইরের লোক। এইবার অভিমানে আমার চোখ ঠেলে জল এলো। মনে মনে বললাম, বাণীপিসীমা, তোমরা কি গো, এখনো আমাকে বাইরের লোক ভাবো। তোমার যখন ঠাকুর-চাকর পালিয়েছিল, শীতকালের সকালে উঠে আমি তোমার কয়লা ভেঙে দিয়েছি। একবার বাবুলের অসুখের সময় আমি তার মাথায় আইসব্যাগ ধরে রাত কাটিয়েছি, তুমি আর সে-রাতে জেগে থাকতে পারছিলে না। আমি আউটসাইডার, আমি বাইরের লোক, আমাকে শুধু অরুণদার সামনে সাক্ষী হিসেবে ডাকা যায়। আমাকে সাবধান করে দিতে হয় যাতে বাইরে না রাষ্ট্র করি। বাণীপিসীমা, তোমরা যদি জানতে রেণুকে আমি কতখানি ভালবাসি। 'ইনস্যানিটি' কথাটা আমার বুকের মধ্যে ছুরির মত বিঁধে গেছে, তোমরা জানো না। আমার বাবা-মাকে তোমরা চেনো না, চিনতে পারো নি। তাই তোমাদের এত ভয়। তোমার সংসারে কিছু ঘটেছে, রেণুর তেমন কিছু হয়েছে শুনলে মা সারা রাত ঘুমোতে পারবে না। ঠিক আমার মতই বাবার চোখেও জল আসবে।

৪

অনেক রাত অবধি আমার ঘুম এলো না। বিছানায় পড়ে ছটফট করলাম। রেণুর জন্যে একটা অসীম উৎকণ্ঠা। ওর জন্যে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। আমি তো খুব সহজেই অরুণদার সামনে বলে দিলাম, কখনো কিছু আনন্যাচারেল ব্যবহার দেখিনি, কখনো ওর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। কিন্তু এখন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছি ওর প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার। কিন্তু কাকে অস্বাভাবিক বলে তাই যে আমি জানি না। অ্যাবনরমাল কাকে বলে? আমি তো ক্রমশই দেখছি প্রতিটি মানুষই অ্যাবনরমাল। রেণুর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখেই থাকি, ওর চরিত্রে হয়তো সেটাই স্বাভাবিক।

বাণীপিসীমার এত যে দেবদেবীতে ভক্তি, ঠাকুরঘর নিয়ে থাকেন, কিন্তু তিনিও তো মায়ের মন্দিরে যান পিসেমশাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে। এটাও তো অস্বাভাবিক। পিসেমশাইয়ের সবটাই তো অ্যাবনরমাল। শুধু মক্কেলদের কাছেই উনি স্বাভাবিক, সংসারের কোন খবরই রাখেন না। মুখের ওপর বলে দিলেন আউটসাইডার, অথচ চাইছেন নিজের বাবা-মাকেও আমি যেন বাইরের লোক ভাবি, যেন এ-বাড়ির সুখ-দুঃখের কথা লিখে জানিয়ে না দিই।

কিন্তু পিসেমশাই যাই বলুন, অরুণদাকে অবিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে ওঁর মুখে-চোখে এমন কিছু ছিল যা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। উনি নিশ্চয় রেণুর ভাল চান, হয়তো দেরী হয়ে যাওয়ার আগে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে চান। সে জন্যেই বলেছেন এ-সব কথা। কি জানি, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। যদি সত্যি হয়ে যায়, এই আতঙ্কে, রেণুর জন্যে আমার ভীষণ মায়া হল।

ওর কথা ভাবতে ভাবতে একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

কলেজের এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম সেদিন। বড় রাস্তা থেকে নেমে একটা এ'দো গলির বাঁক নিয়ে খানিকটা গিয়ে তার বাড়ি। আমি দ্রুত হাঁটছিলাম। গলির বাঁকে পে'ছিনোর আগেই দূর থেকে চোখে পড়লো। ভারি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির, কচি কচি নির্মল মুখ, বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। একতলার জানালার গরাদে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল, দৃষ্টি অন্য দিকে। তখনো তার চোখ দেখতে পাইনি। কাছে পে'ছিতে শান্ত নিস্পৃহ গলার ডাক শুনলাম, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা আমাকে একটু দই দেবে? আমি প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। ভেবেছিলাম, সত্যি সত্যি কোন দইওয়ালাকে ডাকছে। কিন্তু ততক্ষণে আমি তার সামনাসামনি এসে গেছি। ফিরে তাকিয়েছি তার দিকে। মেয়েটি আমাকে দেখেও থামলো না, কিংবা দেখতেই পেল না। অদ্ভুত একটা শূন্য দৃষ্টি তার চোখে। ঠাণ্ডা নম্র স্বরে সে তখনও অবিরাম বলে চলেছে: দইওয়ালা, ও দইওয়ালা, আমাকে একটু দই দিয়ে যাও না, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা, আমাকে একটু দই দিয়ে যাবে! একই কথা সে অনর্গল আউড়ে চলেছিল। আর তার শূন্য অর্থহীন দৃষ্টির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। নিজেই অস্ফুটে বলে উঠেছিলাম, আহা বেচারী।

পূর্ণ, আমার বন্ধু, সব শুনে অসভ্যের মত হেসে উঠেছিল। ওর বোধহয় মায়া-দয়া বলে কিছু নেই। হাসতে হাসতে বলেছিল, ও বাড়িটা আসলে পাগলা-গারদ, সামনে নাম লেখা আছে দেখিস নি? 'আরোগ্য'? ওরকম আমি অনেক দেখেছি।

পাগলা-গারদ কথাটা তো আমরা সবাই বলি। কিন্তু কি নিষ্ঠুর কথা। ঐ মেয়েটির মুখের ছবি তখনো বুকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে। সেজন্যেই হয়তো বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করলাম। ওর জন্যে তো একটা সুন্দর জীবন অপেক্ষা করতে পারতো। কোন যুবার বিশুদ্ধতম প্রেম। মানুষের মত এমন নির্দয়, নির্মম বোধহয় আর কেউ হতে পারে না। কোন একজনের মাথার মধ্যে কোথায় কি ঘটে গেল। ব্যস্, তা হলেই সে পাগল, মানুষের সমাজে একজন আউটসাইডার। লোকে তাকে দেখে হাসবে, এই পূর্ণর মত এতটুকু দুঃখ পাবে না।

তবু বললাম, না রে পূর্ণ, হাসির ব্যাপার নয়, বড় কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার জন্যে।

ও হেসে উঠলো আরো শব্দ করে। চিমটি কাটার মত করে বললে, দুঃখ হচ্ছে তোর? ব্রাদার, ও দুঃখুটা কিন্তু আসলে ক্লাস কনসাসনেশ।

আমি জানতাম ওর কথাবার্তা ছকে ফেলা অঙ্কের মত। ও সব কিছুর মধ্যে নিয়ম আবিষ্কার করে। তাই রেগে গিয়ে বললাম, তোর হৃদয় বলে কিছু নেই।

ও রাগে না, বড়জোর ঠাণ্ডা মাথায় তর্ক করে।

ও রসিকতার ঢঙে বললে, ফ্রয়েডীয়ান অ্যাঙ্গেল থেকে বলতে পারতাম, এই ভরযৌবন বয়েস, দিব্যি সুশ্রী, তোর দুঃখের কারণ সেটাই। কিন্তু তাও সত্যি নয়।

একটু থেমে বললে, তোর ঐ দুঃখটা আসলে ক্লাস কনসাসনেশ। মেয়েটিকে দেখে যেহেতু তুই বুঝতে পেরেছিস যে সে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, দুঃখ সেজন্যেই। আমাদের ঐ বস্তির রামপিয়ারীকে দেখলে তোর একটুও দুঃখ হতো না।

ও উপদেশ দেবার স্বরে বললে, মানুষকে ভালবাসতে শেখ অনিমেষ। শুধু

নিজের ক্লাসকে নয়।

পূর্ণর কথা আমার একটুও ভাল লাগছিল না। আমি তখনো কানের কাছে 'দইওয়ালা, দইওয়ালা' ডাক শুনছি। সেই শূন্যদৃষ্টির মুখখানা তখনো চোখের সামনে ভাসছে।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে ওর কথাগুলো আমাকে কাঁটার মত বিঁধলো।

মনে হলো ওর কথার মধ্যে কোথাও হয়তো সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে।

দেখেছি, ওর কথাগুলো সব সময় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদিন কলেজের কমনরুমে খবরের কাগজের একটা দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সুকুমার বসু নামের একটি বাইশ বছরের ছেলের ট্রামে চাপা পড়ে মৃত্যু হওয়ার খবর। ছেলেটির সেদিনই নাকি এ-জি বেঙ্গলে নতুন চাকরিতে জয়েন করার কথা ছিল।

শান্তনু বললে, অনিমেষ, একেই বলে অদৃষ্ট। কোথায় চাকরিতে এই প্রথম জয়েন করবে, বাবা-মার মুখে হাসি ফুটবে...কি প্যাথেটিক!

পূর্ণ কাগজটা টেনে নিয়ে তার ওপর চোখ বোলানোর ভান করে বললে, আরে আরেকটা খবর আছে, সখারাম পারুই, বয়স কুড়ি, রেললাইন পার হয়ে চা-বাগানে যাবার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে। চা-বাগানের কুলি হিসেবে তার ঐ দিনই কাজে যোগ দেবার কথা ছিল। হাউ ট্র্যাজিক, তাই না শান্তনু?

এই বলে কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো পূর্ণ, তারপর আড়চোখে তাকিয়ে বললে, মানুষকে ভালবাসতে শেখ।

আমি অতশত বুঝি না, আমি যাদের ভালবাসি তারাও তো মানুষ। যাদের জন্যে কষ্ট পাই। সেই নিষ্পাপ মুখখানি, সেই কণ্ঠস্বর, 'দইওয়ালা, দইওয়ালা'; আমার মনে পড়ে গেল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রে আমি ছটফট করলাম রেণুর জন্যে। অরুণদার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু কেমন এক ভয় আমার বুকের ওপর চেপে বসেছিল।

আমি স্মৃতির মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে তন্নতন্ন করে খুঁজছিলাম, কখনো কিছু অস্বাভাবিক দেখেছি কিনা।

কে যেন একবার ব্যঙ্গ করে বলেছিল, ওরাই তো নরম্যাল, আমাদের এই সমাজে এত রকমের টানাপোড়েন, পাগল না হাওয়াটাই তো অ্যাবনরমাল। কথাটা মিথ্যে নয়। কলেজের কমনরুমে, আপিসে আপিসে সবাই সমাজ বলতে, সমাজ ব্যবস্থা বলতে বোঝে শুধ টাকা-পয়সা। অথচ পিসেমশাইকে দ্যাখো, মুখে যাই বলুন, রেণুর জন্যে ওঁর নিশ্চয় প্রচণ্ড অশান্তি। তবু আমাকে সাবধান করতে ভোলেননি। কারণ একটা কিছু রটে গেলে টুনটুনের বিয়ে দিতে পারবেন না। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো এই পচাধসা সমাজটাকে উল্টে দিতে, যেমন করে লাঙলের ফলা মাটি উল্টে দেয়।

পরের দিন আমরা সকলে মিলে ক্যারম খেলতে বসেছিলাম। আমি, অরুণদা, টুনটুন আর রেণু। সবাই খুব হৈ-চৈ করছিলাম। হাসাহাসি করছিলাম। যেন কোথাও কোন বিষাদের চিহ্ন নেই। টুনটুনের পাকা ঘুটি অরুণদার স্ট্রাইকার লেগে কোনো দুঃসাধ্য জায়গায় চলে গেলেই টুনটুন ওঁর পিঠে দুম্ দুম্ করে কিল বসিয়ে দিচ্ছিল। অরুণদা একবার বুঝি টুনটুন সম্বন্ধে কি একটা ফাজিল মন্তব্য করলেন, সঙ্গে সঙ্গে টুনটুন এত জোর চিমটি কাটলে, অরুণদা চিৎকার করে উঠলেন।

আসলে টুনটুন একেবারে ছেলেমানুষ। ও তখনই রেগে উঠছে, তখনই

কে'দে ফেলছে, আবার হো-হো করে হেসে উঠছে সামান্য কোন ব্যাপারে। সব মিলে বেশ একটা খুশির হাওয়া সমস্ত বাড়ি জুড়ে। রেণুও হাসছিল। দিব্যি স্বাভাবিক কথা বলছিল।

এরই ফাঁকে আমি একবার লক্ষ করলাম দরজার ওপাশে এসে একবার দাঁড়ালেন বাণীপিসীমা। খেলা দেখলেন দূর থেকে। ও'র মুখে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে উনি চলে গেলেন।

আমি জানি, উনি খেলা দেখছিলেন না। উনি নিশ্চয় দাঁড়িয়ে অরুণদা আর রেণুর সম্পর্কটা যাচাই করে নেবার চেষ্টা করছিলেন। মেয়ে-জামাইয়ের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোন চিড় ধরেছে কিনা বুঝতে চাইছিলেন। ও'র মনের ওপর থেকে খানিকটা মেঘ বোধহয় কেটে গিয়েছিল। আমারও। এই তো দিব্যি আগের মতই দেখছি রেণুকে। কোথাও কোন সন্দেহ ঠেকছে না।

কিন্তু একটা ব্যাপার প্রথম থেকেই আমার চোখে পড়ছিল। খেলার ফাঁকে, হাসিঠাট্টার ফাঁকে, অরুণদা এক-একবার আড়চোখে রেণুদিকে দেখছিলেন, খ‍ুঁটিয়ে দেখার মত করে। যেন কিছু খ‍ুঁজে বের করতে চাইছেন। আমার খারাপ লাগছিল। কারো মধ্যে ইনস্যানিটি দেখা দিলে তা কি খ‍ুঁজে বের করতে হয় নাকি! সে তো যে-কেউ বুঝতে পারবে। এমন একটা সন্দেহের শিকার হলে মানুষ তো আপনা থেকেই পাগল হয়ে যাবে।

আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল রোগটা রেণুর নয়, অরুণদার। আমার সে জন্যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ রাগ হচ্ছিল অরুণদার ওপর।

কিন্তু সেদিনই একটা ঘটনা ঘটে গেল দুপুরের দিকে। টুনটুন স্কুলে যায়নি অরুণদা এসেছেন বলে। আমাকেও কলেজে যেতে দিল না। রেণুও বলে উঠলো, একটা দিন নাই বা গেলে মনুদা, বন্ধুদের বদলে আজ নয় আমাদের সঙ্গেই আড্ডা দিলে। বলে হাসলো। ওর চোখের অনুনয়টা আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। থেকেই গেলাম।

টুনটুন বলেছিল, আমরা সকলে এক সঙ্গে খাবো মা; তুমিও।

বাণীপিসীমা লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলেন, ধমক দিয়ে বললেন, দূর বোকা!

আসলে টুনটুনটা বোকাই। বাণীপিসীমা কখনো জামাইয়ের সঙ্গে খেতে বসতে পারেন! তাছাড়া উনি তো কখনো টেবিলে বসে খান না, কারো সঙ্গেও না। নিজের রান্না নিজেই করে নেন, তাঁর বাসনকোসনও আলাদা। কারণ, বাড়িতে মুর্গীটুর্গী রান্না হয়, কিন্তু বাণীপিসীমা তার ছোঁয়াও খাবেন না। তাই একা একা যখন দুপুরে মাটিতে বসে ভাত খান, চুপচাপ, তখন বড় খারাপ লাগে। কেমন মনে হয়, বাণীপিসীমা যেন এ-বাড়ির লোকই নয়। অথচ সব কিছুর ওপর, এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের ওপর ও'র স্নেহ যেন অদৃশ্য চোখ বুলিয়ে যায়।

বাণীপিসীমা বললেন, বেশ তো. তোরা সবাই এক সঙ্গেই খাবি।

পিসেমশাই ঠিক সময়েই কোর্টে বেরিয়ে গেছেন। ও'র সেই ভেঙে পড়া অবস্থাটা আর নেই। ও'র কেমন বিশ্বাস হয়ে গেছে, অরুণদার ধারণাটা ভুল।

সকলের স্নানটান হয়ে যাওয়ার পর খাবার টেবিলটা যত্ন করে সাজালো টুনটুন। রবিবার ছাড়া এক সঙ্গে খাওয়ার তো পাট নেই এ-বাড়িতে। বাণী-পিসীমা তদারকি করছিলেন। সকাল থেকে নিজেই রান্না করেছেন, নিজেই পরিবেশন করতে বসে টুনটুনকে বললেন, সবাইকে ডাক। অরুণদা, আমি, টুনটুন, রেণু আর বাবুল—আমরা পাঁচজন। টেবিলে পাঁচখানাই চেয়ার ছিল, একটা

বোধহয় কেউ দরকারে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আমরা এসে বসলাম। বাণীপিসীমা কি একটা পরিবেশন করতে এসে ফিরে গেলেন। ঠাকুরকে বললেন, চেয়ারটা ও-ঘর থেকে নিয়ে এসো।

চেয়ারটা এনে রাখার পর বললেন, রেণুকে তোরা ডাকলি না, তোরা কি?

ঐ বাড়তি চেয়ারটা কেন আমরা জানি। রবিবারে যখন এক সঙ্গে খাওয়া হয়, তখনও বাণীপিসীমার ভুল হয় না। বাড়তি চেয়ার একটা রাখতেই হবে। অথচ অন্য সবাই প্রায় ভুলে থাকে। ওটা সুদীপদার জন্যে, ও'র বড় ছেলে, বিলেতে আছে। বিলেতে থাকলেও ও'র কাছে কাছে।

টুনটুন চিৎকার করে ডাকলো, দিদি, খাবি আয়।

বাণীপিসীমা নিজেও একবার চাপা গলায় ডাকলেন, রেণু।

কিন্তু রেণুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমরা চেয়ারে বসে বসে অপেক্ষা করলাম। রেণু হয়তো এখনি এসে পড়বে। হয়তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করছে, কিংবা বাথরুমে গেছে।

বাবুল বললো, দিদি তো তখন দেখলাম চান করে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

টুনটুন ওকে ডেকে আনতে গেল। দূর থেকে শোনা গেল 'দিদি দিদি' বলে ডাক দিচ্ছে।

আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি। আমি, অরুণদা, বাবুল। বাণীপিসীমা খানিক দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করলেন, তারপর অধৈর্য হয়ে নিজেই ডাকতে গেলেন।

'রেণু, রেণু' বলে বাণীপিসীমাও বারকয়েক ডাকলেন।

আর তখনই টুনটুন ফিরে এসে, শুনতে পেলাম, বাণীপিসীমাকে বলছে, দিদিকে কোথাও পাচ্ছি না মা। কোথায় গেল বলো তো।

আমি উঠে গেলাম ওর কথা শুনে। বললাম, কোথায় আর যাবে, ছাদে দেখেছিস? কিংবা নীচে গেছে হয়তো।

আমি নিজেও চিৎকার করে ডাকলাম 'রেণু, রেণু' বলে। টুনটুন দোতলার ঘরগুলো সব আরেকবার দেখে এলো। আমি ছাদে গিয়ে পড়ার ঘর, জলের ট্যাঙ্কের এদিকটা সব দেখলাম। কি মনে হতে আলসের ওপর ঝুঁকে নীচের রাস্তাটাও। তারপর আবার নেমে এলাম, সিঁড়ির দু' দুটো ধাপ লাফিয়ে নীচে নেমে গেলাম। বাবুল বোধহয় আমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো।

সকলেই তখন রেণুকে খুঁজতে শুরু করেছে! কি আশ্চর্য, এই তো দু' মিনিট আগেও সবাই তাকে দেখেছে। এর মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যেতে পারে!

নীচের তলার ঘর, পিসেমশাইয়ের চেম্বার, রান্নাঘর, বাথরুম কিচ্ছু বাদ গেল না। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম, সে তো অবাক। দিদিমণিকে এই তো একটু আগে সে দোতলায় দেখে এসেছে।

দোতলায় এসে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। টুনটুনও আমার সঙ্গে খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে আমি আর টুনটুন হাসাহাসিও করছি। কারণ, সত্যি সত্যি উধাও হয়ে গেছে, সে-কথা তো ভাবিনি। নিশ্চয় কোথাও আছে।

হাসতে হাসতে বললাম, কোথায় গেল বল তো?

টুনটুনও হাসলো, বলে উঠলো, ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি!

আমরা দুজনে একটার পর একটা ঘর ভাল করে খুঁজে দেখতে লাগলাম। বাণীপিসীমা তখনো থেকে থেকে ডাকছেন, রেণু, খাবি আয়।

তারপরেই আমরা দু'জনই অবাক হয়ে গেলাম। পিসেমশাইয়ের শোবার ঘরের নক্সাকাটা বড় আলমারিটার আর দরজার একটা পাল্লার ফাঁকে আধো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে চুপচাপ বসে আছে রেণু। ঠিক বাচ্চা ছেলেরা যে-ভাবে অবাক করে দেবার জন্যে লুকিয়ে থাকে সেইভাবে।

টুনটুন দেখতে পেয়েই হুল্লোড় করে হেসে উঠলো!—ও মা তুই এখানে লুকিয়ে আছিস!

ও ছুটে গিয়ে রেণুর হাত ধরে টান দিলো।

আমি বললাম, কি আশ্চর্য, তুমি লুকিয়ে আছো এখানে, আর আমরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।

বলে ওর মুখের দিকে তাকালাম। তাকিয়েই শিউরে উঠলাম।

আমি ওর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, এই রেণু, কি ছেলেমানুষি করছো তুমি, সব্বাই বসে আছে।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। মনে হলো, আমাদের কোন কথাই ওর কানে যাচ্ছে না। আমাদের ও দেখতেই পাচ্ছে না।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো, এই চোখ আমার চেনা। ঠিক এমনধারার চোখ আমি আরেকজনের দেখেছিলাম। সে অবিরাম ডেকে চলেছিল, 'দইওয়ালা, ও দইওয়ালা, আমাকে একটু দই দিয়ে যাও না।'

আমি ওকে আবার ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, রেণু খাবে চলো।

আর ও যেন আধা সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললে, ও হ্যাঁ।

কথাটার কোন মানেই হয় না।

টুনটুন ওকে টানতে টানতে নিয়ে চললো। টুনটুন তখন হো হো করে হাসছে। কারণ, ও ভেবেছে দিদি ওদের জব্দ করার জন্যে লুকিয়ে বসেছিল। ও যে রেণুর সম্পর্কে কিছুই শোনেনি, কিছুই জানে না।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, রেণু, তুমি লুকোতে গেলে কেন?

ও অবাক হয়ে গেল। কারণ ওর তখন সংবিৎ ফিরে এসেছে। শুধু বললে, আমি?

টুনটুন ভাবলো সেটাও রসিকতা।

খাবার টেবিলে এসে রেণু একেবারে অন্য মানুষ। একেবারে স্বাভাবিক। শুধু আমার তখন আর একটুও ক্ষিদে নেই। টুনটুন যত হাসতে হাসতে দৃশ্যটা বর্ণনা করছিল, বাণীপিসীমার মুখ ততই গম্ভীর হয়ে উঠছিল। কি দিতে গিয়ে ওঁর হাত থেকে হাতাটা পড়ে গেল। উনি সেটা ধুতে চলে গেলেন। শুধু লক্ষ করলাম, টুনটুনের কথায় অরুণদা কোন সাড়া দিচ্ছেন না। ওঁর মুখ বাণীপিসীমার মত গম্ভীরও হয়ে যায়নি। উনি শুধু চোখে-চোখে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যেন পিসেমশাইয়ের কাছে বলা কথাটার সায় চাইলেন আমার কাছে।

আমি মাথা নীচু করে খেতে শুরু করে দিলাম। চোখ তুলে রেণুর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অরুণদার দিকেও না।

৫

আমার কিছু ভাল লাগছিল না। রেণুর জন্যে অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হচ্ছিল। ও কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে নাকি। যেতে পারে? অরুণদার তো সেটাই ভয়। আমার অবশ্য তা মনে হয়নি। এক-আধটু ওরকম অনেকের থাকে। আমরা তো তাদের ছিটগ্রস্ত বলি। তার বেশি কিছু নয়।

আসলে দুপুরবেলা রেণুর ঐ লুকিয়ে থাকাটা উপেক্ষা করা যেত। ছোট ভাইবোনকে অবাক করার জন্যে কৌতুক হিসেবেও তো রেণু ওটা করে থাকতে পারতো। কিন্তু ওর লুকোনোর ভঙ্গিটাই আমাকে ভাবনায় ফেলেছে। ওর ঐ লুকোনোর মধ্যে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল। তাছাড়া, আমাদের কথা ওর কানে যাচ্ছিল না, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম। আর ঐ চোখ। ঐ চোখের দৃষ্টি ভুল হবার নয়। ও চোখ দেখলে মনে হয় তার সামনে পিছনে কোথাও কিছু নেই।

অথচ তারপরও সারাটা দিন ওকে লক্ষ করলাম। কোথাও কোন বিচ্যুতি নেই। এক সময় তো ও আমার সংগে অনেকক্ষণ গল্প করলো, পুরোনো দিনের নানান টুকরো টুকরো কথা বলে জিজ্ঞেস করলো, আমার মনে আছে কিনা। আমার কথা শুনে ও যখনই বুঝতে পারছিল আমার মনে আছে, সব মনে আছে, তখনই ওকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

কিন্তু আমি তখন একটা ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়ে গেছি। খাবার টেবিলে আমি অরুণদার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, ও'র কোথাও কিছু একটা খটকা লেগেছে। পিসেমশাই ফিরে এলে উনি কি বলবেন কে জানে। তখন হয়তো আমার ডাক পড়বে।—তুমি কি দেখেছো আজ ও'কে বলো না অনিমেষ। উনি হয়তো পিসেমশাইয়ের সামনেই বলবেন।

অথচ আমি তো পিসেমশাইকে দেখে বুঝতেই পেরেছিলাম, কি রকম ভেঙে পড়েছিলেন। সমস্ত বাড়িটা থমথম করছিল একটা গুমোট আবহাওয়ায়। কি অস্বস্তি, কি অস্বস্তি। ও'কে আবার সেই জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। আমার একটা কথায় বাড়িটা এখনই আবার অন্ধকারে ডুবে যেতে পারে। তাছাড়া বাণীপিসীমা তো তখন সবই শুনলেন টুনটুনের কাছে। আমি কেন সেই ভয়ঙ্কর কথাটা উচ্চারণ করতে যাবো। বাঃ রে, আমার ধারণাটা তো ভুলও হতে পারে। হয়তো ভুল দেখেছি।

কিন্তু পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে ডাক এলো না। সন্ধ্যের দিকে ডাকলেন অরুণদা নিজেই।—চলো অনিমেষ, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। সারাদিন বাড়ির মধ্যে।

আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। উনি ছাড়লেন না।

টুনটুন জানতো না, ও এসে পথ আগলে দাঁড়ালো।—কোথায় যাচ্ছেন? জামাই-বাবু, আমিও যাবো।

অরুণদা হেসে বললেন, তুমি সেজেগুজে তৈরী হয়ে থাকো, তখন বেরুবো। এক্ষুনি আসছি।

আমার কি রকম ভয়-ভয় করলো। কি জানি অরুণদা কি বলবেন। আমি তো বুঝতেই পারছি, উনি কিছু বলবেন বলে এভাবে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তায় ভিড়। আমরা একটা পার্কে এসে আবছা

অন্ধকারে একটা বেঞ্চ পেয়ে গিয়ে বসলাম। কাদের বাড়ির চাকর একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের চেন খুলে দিয়ে তাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছিল ওদিকটায়। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আর তাদের মায়েরা দূরে দূরে পালাতে লাগলো। শীর্ণ দেহ অথচ ঋজু চেহারার একজন অতিবৃদ্ধ লাঠি হাতে পার্কে ঢুকলেন, কয়েক পা এগিয়ে এসেই ছুটন্ত অ্যালসেশিয়ানটাকে দেখে ভয় পেলেন। গটগট করে আবার গেটে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমার নিজেরও একটু ভয়-ভয় করছিল, যদি এদিকে ছুটে আসে।

এখান থেকে উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বসবো কিনা ভাবছি, অরুণদা হঠাৎ বললেন, দ্যাখো অনিমেষ, আমি একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গিয়েছি। আমার মনের মধ্যে কি চলছে তুমি বুঝতেই পারবে না। ও'দের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, যেন আমিই কালপ্রিট।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি ঠিক করে ফেলেছি, আমি কোন কথাই বলবো না, শুধু চুপচাপ শুনে যাবো।

একটু চুপ করে থেকে অরুণদা আবার প্রায় দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বললেন, আমি কি করি বলো তো? প্রায় কান্নার মত শোনালো ও'র কথাটা।—রেণু তো আমার স্ত্রী, তার ভালমন্দ তো আমারই। ও'রা বুঝতে পারছেন না, বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু এখনই চিকিৎসা করালে হয়তো...

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, আপনার যখন সন্দেহ, আপনি নিজেও তো ডাক্তার দেখাতে পারতেন অরুণদা।

অরুণদা হাসলেন। বললেন, তুমি এখনো বিয়ে করোনি অনিমেষ, তুমি বুঝবে না। আমার নিজের ওপরই বা সেই ভরসা কোথায়। যদি আরো খারাপ হয়ে যায়, ও'দের না জানিয়ে করলে হয়তো ভাববেন আমিই তার জন্যে দায়ী।

অরুণদার মুখ দেখে মনে হলো উনি সত্যি কিছু ভাবছেন। অরুণদার কথায় কোন কপটতা আছে আমার মনে হলো না। অথচ বাণীপিসীমা সেদিন মায়ের মন্দিরে যেতে যেতে কত কি ভেবেছিলেন।

একটা কোন বিপদে পড়লেই মানুষ সহজেই কত বদলে যায়। বাণীপিসীমা তো সন্দেহ করেছিলেন, অরুণদার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। অরুণদাকেও বুঝতে পারছি না। তাঁর যখন খট্‌কা লেগেছে, উনি তো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে পারতেন। কে কি ভাববে, শ্বশুর-শাশুড়ী কিছু বলে বসবে কিনা, এ-ধরনের চিন্তা ও'র মাথায় আসছেই বা কেন। ও'রই তো স্ত্রী।

মাথার ভেতর থেকে রেণুর জন্যে চিন্তাটা আমি কিছুতেই সরিয়ে ফেলতে পারছিলাম না। কারো সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারলে শান্তি পাওয়া যেত। কিন্তু কার সঙ্গেই বা আলোচনা করি। কাউকে মুখ ফুটে বলতেও তো লজ্জা। কি না কি ভেবে বসবে।

অনেকদিন আগের কথা। যখন আমি এ-বাড়িতে এসে কলেজে ঢুকেছি, তিনটে মাসও পার হয়নি। প্রথম প্রথম আমার তো খুবই সঙ্কোচ ছিল, পরের বাড়িতে আছি, তাই বন্ধুরা কেউ বাড়ি আসতে চাইলে একটা-না-একটা অজুহাতে এড়িয়ে যেতাম। ভয় ছিল, পিসেমশাই তাদের আসা-যাওয়া পছন্দ করবেন না। তাই বলে রেখেছিলাম, আমি এ-বাড়িতে শুধুই আশ্রিত।

তবু সুশান্ত কি-ভাবে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে একদিন ডাকতে এসেছিল। আমি ছিলাম না। রেণুর তখনো বিয়ে হয়নি। ডাক শুনে বোধহয় রেণুই দোতলার বারান্দা থেকে উত্তর দিয়েছিল। আর সুশান্তর নিশ্চয় মাথা ঘুরে গিয়েছিল

রেণুকে দেখে।

বছর না ঘুরতেই সুশান্ত কলেজ ছেড়ে দিয়ে বাপের ব্যবসায় গিয়ে বসলো। বন্ধুদের আড্ডায় নিছক রসিকতার ভঙ্গিতে সে রেণুর রূপের বর্ণনা দিয়ে বলে উঠেছিল, আমাদের মধ্যে অনিমেষটাই দিব্যি আছে মাইরি।

আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল। অনেকদিন পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে ভাল ভাবে কথাই বলতে পারিনি।

কিন্তু একটা ক্ষতি সে করেছিল। রেণুর সম্পর্কে যা আমি কোনদিন ভাবিনি, বিদ্যুতের মত তা কখনো কখনো আমার মাথার মধ্যে খেলে যেত। সেটা রেণুকে আমি কোনদিন জানতে দিইনি।

পূর্ণ কিংবা শান্তনুকে সে-জন্যেই কিছু বলা যাবে না। রেণুর জন্যে আমার কি কষ্ট ওরা তো বুঝতে পারবে না। হয়তো হেসে উঠবে। কিছু একটা জঘন্য কথাও বলে বসতে পারে। ওরা সেক্স ছাড়া কিছুই বোঝে না।

তবু আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা বলে না ফেললেও স্বস্তি নেই।

পরের দিন কলেজে আমি হঠাৎ বলে বসলাম, আচ্ছা পূর্ণ, মানুষ যখন পাগল হয়, তখন প্রথমেই কি হয় জানিস?

আমি আসলে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারিনি।

পূর্ণ গম্ভীরভাবে বললে, প্রথমে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়।

সবাই হেসে উঠলো। যেন দারুণ একটা হাসির কথা বলেছে ও।

অথচ আমি আসলে জানতে চাইছিলাম, কি কি উপসর্গ দেখে বোঝা যায়, সে পাগল হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ রেণু সম্পর্কে অরুণদার কাছে যা দু'চারটে কথা শুনেছি, নিজের চোখে যা দেখেছি, তা সত্যি পাগল হওয়ার লক্ষণ কিনা মিলিয়ে দেখতে চাইছিলাম। আমার তো ধারণা ছিল হঠাৎ কোন একটা আঘাত পেয়ে মানুষ দুম করে পাগল হয়ে যায়। অরুণদা দুঃখের হাসি হেসে বলে-ছিলেন, না অনিমেষ, সব সময়ে তা ঠিক নয়।

আমার বুকের মধ্যে সেই অসহ্য ব্যথাটা কেউ ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা করলো না। পূর্ণর রসিকতায় হেসে উঠে সবাই পাগলের গল্পে মেতে উঠলো। কে কোথায় কবে পাগল দেখেছে। যেন ব্যাপারটা শুধুই মজা উপভোগ করার।

—সেই পাগলটা মনে আছে শান্তনু? ইট হাতে মারতে আসছিল? পূর্ণ হাসতে হাসতে বললে।

শান্তনু হাসলো।—বাঃ রে, অনিমেষও তো ছিল সেদিন।

খেলা দেখে ফিরছিলাম। বাসে-ট্রামে প্রচণ্ড ভিড়। পূর্ণ হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললো, ভাগাভাগি করে আমরা ভাড়া দেব। জ্যামের জন্যে কিংবা ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে ছিল বলে গাড়িগুলো খুব ধীরে ধীরে চলছিল। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা নোংরা ছেঁড়া কাপড় পরা একটা পাগল হাতে ইট নিয়ে তাগ করছে আমাদের দিকে। একেবারে সামনাসামনি। ট্যাক্সিটা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে প্রায় দমবন্ধ করে ছিলাম আমরা, এক্ষুনি ইটখানা এসে হয়তো পড়বে গাড়ির মধ্যে। পাগলটার দিকে আমরা তাকাতেও সাহস পেলাম না। একটু একটু করে যেই না ট্যাক্সিটা ওকে পার হয়ে চলে এসেছে, অমনি পিছন ফিরে তাকিয়ে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। পাগলটা তখন পরের গাড়িগুলোকে ভয় দেখাচ্ছে।

পূর্ণর কথা শুনে তাই শান্তনু বলে বসলো, আরে ব্বাপ যা ইটখানা তুলেছিল।

দৃশ্যটা মনে পড়ে যেতে আমিও হেসে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার খুব খারাপ লাগলো। কোন পাগলকে নিয়ে এখন আর আমার হাসতে ইচ্ছে করছে না। এ যেন শ্মশানে দাঁড়িয়ে হেসে ওঠার মত। এই তো কিছুদিন আগে আমাদের এক প্রফেসর মারা যাওয়াতে শ্মশানে গিয়েছিলাম। সকলের মুখচোখ ভাবগম্ভীর, সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে। হঠাৎ পূর্ণ পুরুত বামুনকে নিয়ে কি একটা রসিকতা করলো, আমি হেসে ফেললাম। সেদিন নিজের হাসিটা নিজের কানেই খারাপ লেগেছিল। আজও ঠিক তেমনি লাগলো।

সত্যি, পাগলদের জন্যে কারো কোন সহানুভূতি নেই। ইট তুললে আতঙ্ক, ওদের শুধু ভয় পায় সবাই। বিপদ পার হয়ে গেলে দেখে হাসে। কেউ বোধহয় ভালবাসতে পারে না।

রেণু, তোর যাই হোক, আমি তোকে ভালবাসবো।

এ বাড়িতে এসে রেণুই ছিল আমার প্রথম সহায়। ওকে দেখেই আমি প্রথম অবাক হয়েছিলাম। ঐ বয়সে কোন অচেনা মেয়েকে দেখলে আমার বড় সঙ্কোচ হতো। নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতাম, কথা বলতে পারতাম না। আর ছেলেবেলায় চেনা কোন মেয়ে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর হঠাৎ আবার এই বয়সে দেখা হয়ে গেলে কেমন যেন অচেনা-অচেনা ভান করে সরে যায়। বুঝতে পারতাম, লজ্জা বা সঙ্কোচ তার দিকেও। অথচ রেণু কেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছুটে এসেছিল। 'এই মনুদা, তুমি অ্যাত্তো বড় হয়ে গেছ!' সামান্য একটা কথা, কিন্তু তার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতার সুর ছিল।

ওর ফর্সা সুন্দর মুখে একটা লালচে আভা ছিল, জোড়া-ভ্রূর সুন্দর চোখ, আর ও খুব সাজতে ভালবাসতো। প্রথম প্রথম গল্প করতে করতে অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতেই আমি ওর মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকেছি। হয়তো ভাল লাগতো বলে। কিংবা তখনো আমার মধ্যে একটা মফঃস্বলী সরলতা ছিল।

একদিন ও হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো।—আমার দিকে এরকম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছো কেন? তুমি কি!

আমি নিজেও সচেতন ছিলাম না। ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলাম। বলতে পারলাম না, তুই যখন হেলেদুলে অনর্গল কথা বলিস, তখন তোর দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে।

পরে সেদিনের কথা ভেবে আমি খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। রেণু কিছু ভেবে বসেনি তো! না; ও কিচ্ছু ভাবেনি, ওর ভাববার সময়ই ছিল না। তাছাড়া ওর মন ছিল খুব নরম, বহতা নদীর মত নির্মল।

ওর যত গল্প তখন শুধু দাদাকে নিয়ে। ছোটখাটো খুঁটিনাটি যে-কোন একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলেই হলো। সেটাই সাত কাহন করে হেসে নেচে সকলকে বলা চাই। 'সেবার দাদা কি করেছিল, মনে আছে মা, সেই রথের মেলায়?' সুদীপদাকে আমি দেখিনি, কিংবা ছেলেবেলায় দেখে থাকলেও ভুলে গেছি। রেণুর কিন্তু দাদার সম্পর্কে খুব গর্ব ছিল। দাদার চিঠি এলে বাড়িতে উৎসব পড়ে যেত। আর তক্ষুনি তক্ষুনি তার জবাব দেওয়া চাই।

আমার কাছে যখন ওর দাদার গল্প করতো তখন মনে হতো, ওর সারা মুখে কে যেন খুশির ক্রীম ঘষে দিয়েছে। কখনো বাণীপিসীমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো, জানো মনুদা, এ বাড়িতে তো আমাকে কেউই ভালবাসে না, বাবা না, মা না, টুনটুন বাবুলও না। শুধু একজন আমাকে ভালবাসে—দাদা।

বাণীপিসীমা শুনে হাসতেন, স্নেহের হাসি। ওঁর শুনতে ভালই লাগতো।

কারণ সারাক্ষণ ও'র মন জুড়ে থাকতো ও'র বড় ছেলে। সুদীপ। তাঁকে আমি শুধু ছবিতেই দেখেছি। বাণীপিসীমার ঘরে, রেণুর টেবিলে।

রেণু ও'র পুজোআর্চা ব্রতপার্বণ নিয়ে মাঝে মাঝে হাসিঠাট্টা করতো, কিন্তু ষষ্ঠীর দিন বাণীপিসীমা যখন দেয়ালে দই-হলুদের ফোঁটা দিতেন বড় ছেলের উদ্দেশে, তখন রেণু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো।

একবার সুদীপদার চিঠি এলো, সে কি আনন্দ রেণুর। আমাকে পড়ে পড়ে শোনালো। আবার একবার বাণীপিসীমাকে। হাসতে হাসতে বললে, দাদা বাংলা ভুলে যাচ্ছে মা। তিন তিনটে বানান ভুল। বাণীপিসীমাও হাসলেন, চিঠিটা নিয়ে আরেকবার পড়ার নাম করে তার ওপর হাত বোলালেন। সেটা তক্ষুনি কেড়ে নিয়ে পিসেমশাইকে দেখাতে ছুটে গেল রেণু।

ফিরে এসে উত্তর দেবার জন্যে এয়ার-লেটার খুঁজলো তন্ন তন্ন করে। কখন ফুরিয়ে গেছে লক্ষ করেনি। চাকরটাও তখন বেরিয়ে গেছে। ওর মুখ দেখে আমার খুব মায়া হলো। এর আগেও দেখেছি সুদীপদার চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে ও থাকতে পারে না। তাই আমি বললাম, অত মুখ গোমড়া করে থাকতে হবে না, আমি এনে দিচ্ছি।

সে-কথা শুনে ওর মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আমি রেণুর জন্যে কিছু একটা করে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছিলাম।

সেদিন কাছাকাছি ডাকঘরে না পেয়ে জি পি ও অবধি গিয়ে এয়ার-লেটার নিয়ে এসেছিলাম, আবার নিজেই গিয়ে ডাকে দিয়ে এসেছিলাম। সেদিন আমার খুব ভাল লেগেছিল।

সুশান্তর নোংরা রসিকতায় আমি একদিন রেগে গিয়েছিলাম বলে ও ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, অনিমেষ তো মেয়েদের ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করে।

কথাটা হয়তো খুব মিথ্যে বলেনি।

সে-জন্যেই আমি মনে মনে চাইছিলাম অরুণদার সব সন্দেহ যেন মিথ্যে হয়ে যায়। এক এক সময় আমি আবার অরুণদাকেই সন্দেহের চোখে দেখছিলাম। আমি তো শুনেছি হঠাৎ কোন একটা আঘাত পেয়েই এ-রকম ঘটে যায়। সেই আঘাতটা অরুণদাই দিয়ে বসেননি তো?

বিয়ের পর কি ঘটেছে না ঘটেছে আমরা তো কিছুই জানি না।

পার্কের বেঞ্চিতে বসে অরুণদা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিলেন, দুঃখ কি জানো অনিমেষ? রেণুর কথা ভেবে ভেবে আমার মনের শান্তি নেই, রাতে ঘুমোতে পারি না। অথচ কাউকে বলতে গেলেই সে ভাববে আমিই কালপ্রিট। আমিই তাকে পাগল করে দিয়েছি।

কি আশ্চর্য, আমি নিজেও তো মাঝে মাঝে সে কথা ভাবছি। মনে হচ্ছে, অরুণদাই দায়ী। তা না হলে উনি আমাকেই বা এতক্ষণ একথা বোঝাতে চাইছেন কেন।

যতক্ষণ কলেজে, বন্ধুদের সঙ্গে, ততক্ষণ তবু কখনো-সখনো ভুলে থাকতে পারছিলাম, ফেরার পথে দুশ্চিন্তাটা আবার চেপে বসলো। নানারকম উদ্ভট কথা আমার মনে হতে লাগলো। হঠাৎ একবার বিদ্যুতের মত একটা কথা আমার মনের মধ্যে খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি লজ্জায় ভয়ে শিউরে উঠলাম। আচ্ছা, আমি যেমন অরুণদাকে দায়ী ভাবছি, তেমনি অরুণদা আবার আমাকেই দায়ী ভাবছেন না তো! সেই জন্যেই কি আমাকে এত সব শোনালেন? ভাবতেও তো পারেন। আমি তো একটা বাইরের লোক। পিসেমশাই তো নিজের মুখেই

বলেছেন, আমি একজন আউটসাইডার।

আমি বাড়ির কাছাকাছি এসেই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলাম। কিন্তু বাড়ি ফিরে যে এমন একটা খবর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, জানতাম না।

এ-ক'দিনে আমি তো সত্যি সত্যি বাইরের লোক হয়ে গেছি। শুধু কি আমি? সকলেই। পিসেমশাই আবার আগের মত মক্কেল নিয়ে বসছেন। আগের চেয়ে রাত করে দোতলায় উঠে আসছেন। বেশ বুঝতে পারছি, উনি বাণীপিসীমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছেন। বাণীপিসীমাও যেন অরুণদাকে এড়িয়ে চলতে চাইছেন। আসলে কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। আর রেণুর সঙ্গে ও'রা যদিও বা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন, তবু মাঝখানে একটা কাচের দেয়াল থেকে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি, রেণুই প্রকৃতপক্ষে এখন আউটসাইডার হয়ে যাচ্ছে।

আমিও বোধহয় রেণুকে এড়িয়ে যেতে চাইছি।

প্রতিদিনের মত আমি খাবার খেয়ে নিয়ে ছাদের ঘরে টুনটুনকে পড়াতে চলে গেলাম। রেণুর খোঁজও নিলাম না।

আর পড়তে বসে টুনটুন বেশ আতঙ্কের চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, আজ কি হয়েছে জানেন, মনুদা?

আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম।

ও ফিসফিস করে বললে, দিদি আজ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করেছে। নতুন করালাম আমার সেই ম্যাক্সিটা? পরবো বলে বের করে রেখে মুখে সাবান দিতে গেলাম, ব্যস্, ফিরে এসে আর খুঁজেই পাই না। শেষে বের হলো দিদির স্যুটকেশ থেকে, লুকিয়ে রেখেছিল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ফিসফিস করে বললে, কিছুতে স্যুটকেশ খুলতে দিচ্ছিলো না, বাবা যেই ধমক দিয়েছে, অমনি কী রেগে গেল দিদি। মুখ-চোখ এমন হয়ে গেল তাকানো যায় না। কি চিৎকার চেঁচামেচি করছিল ভাবতে পারবেন না।

যেন কিছুই নয় এমন ভাব করে আমি টুনটুনকে ধমক দিলাম, এখন পড়ো তো তুমি। ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না।

৬

আর কারো সন্দেহ রইলো না। অবিশ্বাস করে যে বিপর্যয়কে দূরে সরিয়ে চোখের আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন পিসেমশাই আর বাণীপিসীমা, তা চোখের সামনে একটা বিশ্রী চেহারা নিয়ে উপস্থিত হলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল রেণু ক্রমশই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে।

ও এমন এক একটা কাণ্ড করে বসছিল যা প্রথম ছিল শুধু বিস্ময়। আমরা কেউই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ও কেন এ-সব করে বসছে। কেন তুচ্ছ সব জিনিস ও হঠাৎ লুকিয়ে রাখতে চায়। বাড়ির সব গোপন জায়গাগুলোর সঙ্গেই যেন ওর বন্ধুত্ব। কখনো আলমারির পিছনে, কিংবা আলমারির মাথায়, টাঙানো ছবির আড়ালে, কয়লা রাখার জায়গায়, হঠাৎ টুকটাক কোন একটা জিনিস ও লুকিয়ে ফেলে। খুঁজে বের করে ফেললেই ওর চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। ওর মুখেচোখে যেন রক্ত ফেটে পড়ে, প্রাণপণ শক্তিতে সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে।

বাবুল ওর প্যান্টের বেল্ট খুঁজে বের করে ফেলতেই রেণু প্রচণ্ড শক্তিতে বাবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন ও অন্য মানুষ।

আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম টুনটুনের ম্যাক্সি পোশাকটা লুকিয়ে রাখার মধ্যে কোন জেলাসি কাজ করেছে। টুনটুনকে ও হয়তো ওটা পরতে দিতে চায় না। টুনটুনের সঙ্গে অরুণদার মেলামেশাটা ও হয়তো সন্দেহের চোখে দেখছে। কিন্তু বোঝা গেল ও-সব কিছু নয়। আসলে ও কেন যে লুকিয়ে রাখে, কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না। কেনই বা সেদিন নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল!

ধরা পড়ে যাওয়ার পরেই ও কেমন গুম্ হয়ে বসে থাকতো। কারো সঙ্গে কথা বলতো না। কেমন ভয়ে গুটিসুটি হয়ে করুণ মুখ করে থাকতো। এক এক সময় ওর ঠোঁট নড়তো, কিন্তু কিছু বলতো কিনা বোঝা যেত না। আর ঠিক তখনই ওর চোখে সেই ঘোলাটে দৃষ্টিটা দেখতে পেতাম। আমার তখন ভীষণ কষ্ট হতো। সেই মেয়েটির কথা আমার মনে পড়ে যেত। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে যে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থেকে অনর্গল বলে যাচ্ছিল: দইওয়ালা, ও দইওয়ালা, আমাকে একটু দই দিয়ে যাও না।

তারপরই একসময় দেখা যেত ও একেবারে স্বাভাবিক। তখন ও আনন্দে খুশিতে মেতে থাকতো। হৈ চৈ করতো ভাইবোনদের সঙ্গে। সিনেমা দেখতে যেত। ফিরে এসে একদিন পুরো গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিল। ওর কথার মধ্যে এতটুকু অসঙ্গতি খুঁজে পাই নি।

ও যখন স্বাভাবিক, তখন ওকে জিজ্ঞেস করেও কিছু জানা যেত না। বাণী-পিসীমা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। রেণু বিশ্বাসই করে নি ও কিছু লুকিয়ে রাখে।

একদিন ওর কাণ্ড দেখে টুনটুন আর বাবুল হেসে উঠেছিল। আমি ওদের একটা কড়া ধমক দিয়ে চুপিচুপি বলেছিলাম, তোমরাই যদি ওকে নিয়ে হাসা-হাসি করো, বাইরের লোকেরা তো হাসবেই। ওর জন্যে কি তোমাদের একটুও মায়া হয় না।

ধমক শুনে টুনটুনের চোখে কান্না এসে গিয়েছিল। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, একটু একটু করে রেণু বাইরের লোক হয়ে যাচ্ছে। একজন আউটসাইডার।

এর মধ্যে দু' দুবার পিসেমশাই আর অরুণদা ওকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার কি বলেছেন না বলেছেন আমি কিছুই জানতাম না। জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় নি। শুধু শুনেছিলাম, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে বললেই ও ভীষণ রেগে যেত।

রেণু অরুণদার একটা কথাও শুনতে চাইতো না। শুধু পিসেমশাইকে একটু ভয় করতো।

আমি তাই ওর কথায় অবাক হয়ে গেলাম।

একদিন আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়বার চেষ্টা করছিলাম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো বলে বইটা সবে বন্ধ করেছি, খুট করে দরজায় একটা শব্দ হলো। ধীরে ধীরে দরজা খুলে কে যেন নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকলো বুঝতে পেরেই আমি ফিরে তাকালাম। রেণু সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ওপর আঙুল রেখে আমাকে ইশারায় চুপ করতে বললো।

ওর হাবভাব দেখে আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। কৌতূহলে আমি তখন

বিছানার ওপর উঠে বসেছি।

ও দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলো। আমি সেজন্যে আরো ভয় পেয়ে গেলাম। এক্ষুনি যদি কেউ এসে পড়ে, অরুণদা কিংবা বাণীপিসীমা, কি ভেবে বসবে কে জানে।

আমার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ওকে ঘর থেকে বের করে দিতে। কিন্তু পারলাম না। তখন আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

রেণু আস্তে আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এলো। খাটের পাশে বসে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, এই, ওরা আমাকে পাগল সাজাতে চাইছে। জানিস্, ও একবার আমাকে পাগল করার জন্যে কি একটা খাইয়ে দিতে গিয়েছিল। আমি খাই নি। তোকে সব বলবো, সব বলবো।

বলেই ও আবার পা টিপে টিপে চলে গেল। দরজা খুললো, বন্ধ করলো খুব সাবধানে। যাতে শব্দ না হয়।

আমাকে 'তুই' বলা পাগলামি নয়, ও কখনো কখনো 'তুই' বলতো। আসলে প্রায় তো বন্ধুর মতই ছিলাম।

আমার সমস্ত গা ছমছম করে উঠলো। আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো। ওকে তো এই মুহূর্তে একটুও অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো না।

আমি তখন বিভ্রান্ত। কি করবো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। তা হলে কি আমি পিসেমশাইকে গিয়ে এখনি বলবো। অরুণদার ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ হলো। লোকটাকে নৃশংস খুনী মনে হলো। রেণু হয়তো জানে না, সত্যিই ওর অগোচরে অরুণদা কিছু খাইয়ে-টাইয়ে দিয়েছেন।

পরক্ষণেই আমার মনে পড়লো, বইয়ে পড়েছি. পাগলরা এমন অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে। ওদের মাথায় এমন এক একটা বদ্ধ ধারণা ঢুকে যায়। সেজন্যেই তো ভয়, রেণু আমার নামেও না বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে ফেলে।

আমি মনে মনে বললাম, রেণু তুই আমার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠছিস। আমিও তোকে ভয় পেতে শুরু করেছি। ইট-হাতে সেই পাগলটাকে যেমন ভয় পেয়েছিলাম। পিসেমশাই এখন তোকে দেখে বিরক্ত হচ্ছেন। আমি স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ দেখেছি তাঁর মুখে।

আর বাণীপিসীমা তোর মতই সবকিছু লুকোতে চাইছেন। তোর মতই!

ওঁদের শোবার ঘরের একটা জানালা থেকে পাশের বাড়ির ভিতরের বারান্দা দেখা যায়। বাণীপিসীমা ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির মিত্তিরগিন্নীর সঙ্গে দুপুর বেলা গল্প করেন। সংসারের কথা, জিনিসপত্রের দাম, ছেলেমেয়ের অসুখ। সুদীপদার চিঠি এলে খবর দেন। কতদিন দেখেছি।

টুনটুন ঐ জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। মেয়েটার ঐ এক স্বভাব, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে পারে না। তখনই আয়নার সামনে, তখনই বারান্দায়। ওর আজকাল চুল উঠছে, এখানে ওখানে চুল উড়ে বেড়ায়। সেদিন পিসেমশাইয়ের ছানায় একটা চুল পড়েছিল, খুব রাগারাগি করেছিলেন।

আমি জানতাম ও বকুনি খাবে।

কাগজ পড়ছিলাম, বাণীপিসীমা এসে ওকে দেখে বেশ রাগের গলায় বললেন, এই টুনটুন, পর্দা ফেলে দে। আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াবি যা।

টুনটুন বুঝতে না পেরে জানালার পর্দা নামিয়ে দিল, তারপর অনুযোগের স্বরে বললে, বাঃ রে, এখানে দাঁড়ালে কি হবে কি?

বাণীপিসীমা চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, এখুনি চোখোচোখি হলে হয়তো কিছু জিজ্ঞেস করে বসবে।

অর্থাৎ রেণুর কথা।

আমার মনে পড়লো, রেণু এখানে আসার আগে উনি ঘন্টার পর ঘন্টা ও'র সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেছেন। এখন তার সঙ্গে চোখোচোখি হতেও ভয়। যদি কিছু জিজ্ঞেস করে বসে।

আমার নিজেরই অবাক লাগছিল, যে-কোন মানুষ এমনিতে কত স্বাভাবিক, অথচ কোথাও কিছু একটা ঘটে গেলে রাতারাতি কেমন পাল্টে যায়। বাণী-পিসীমাও বোধহয় বদলে যাচ্ছেন।

কত মিশুকে ছিলেন, আশেপাশের বাড়ির সকলের সঙ্গে কত ভাব ভালবাসা ছিল। মিস্তিরবাড়ির গিন্নী খুঁটনাটি খবর নিতেন, সুদীপদার খবর জানতে চাইতেন বলে বাণীপিসীমা তাঁর কত প্রশংসা করেছেন। অথচ এখন বলে উঠলেন, ওখানে দাঁড়াস না, এখনি কি সব জিজ্ঞেস করে বসবে।

সেদিন পিসেমশাইয়ের কে এক আত্মীয় বেড়াতে এসেছিল। ছেলে কোলে নিয়ে এক ভদ্রমহিলা। বাণীপিসীমাকে দেখে মনে হলো সে যেন চলে গেলেই বাঁচেন। তার সঙ্গে কথাবার্তাও ভাল করে বললেন না। এক রকম তাড়িয়েই দিলেন তাকে। রেণু এসেছে সে-খবরটাও জানতে দিলেন না।

এক এক সময় আমার তাই রেণুর জন্যে কষ্ট হতো, এক এক সময় বাণী-পিসীমার জন্যে।

আর যখনই একা থাকতাম, রাজ্যের চিন্তা এসে মাথার মধ্যে জট পাকাতো। জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আমি রহস্যটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতাম। স্মৃতির মধ্যে হাতড়ে বেড়াতাম যদি চাবিকাঠিটা হঠাৎ পেয়ে যাই। সেটা খুঁজে পেলেও কোন লাভ হবে কিনা জানতাম না। কারণ ডাক্তারের কাছে যাবার সময় একদিনও ও'রা আমাকে সঙ্গে নেন নি।

কিন্তু স্মৃতির মধ্যে রেণুকে খুঁজতে গেলেই আমি নিজেকে দেখতে পাই। তখন সেটা মধুর স্মৃতি হয়ে যায়।

ঐ তো ও সকাল বেলায় কলেজে যাবার সময় আমার ঘরের কড়া নেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। জানালা থেকে আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। ও একবার ফিরে তাকালো।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় আমি ওর হাত চেপে ধরলাম, কারণ ও আমাকে দেখেই পালাতে যাচ্ছিল। বললাম, রোজ রোজ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিস কেন?

ওর মুখের চেহারা কেমন করুণ দেখালো। বললে, তুমি খুব রাগ করেছো, না মনুদা? বেশ তো, আর কোনদিন করবো না।

ও এমনভাবে বললো কথাগুলো, আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। আমি তো ভাবি নি ও এমন করুণ মুখ করে কথা বলবে। নেহাৎ একটা ইয়ার্কির ঢঙে আমি যেন ওকে জব্দ করতে চেয়েছিলাম। ওর স্বভাবে তো এ সময় হেসে উঠে বলার কথা: খটাখট খটাখট করে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে আমার বেশ মজা লাগে।

'তুমি খুব রাগ করেছো, না মনুদা? বেশ তো, আর কোনদিন করবো না।' একথার কি-ই বা জবাব দিতে পারি। হয়তো বলে উঠতে পারতাম, 'না না, রাগ করবো কেন।' কিন্তু আমি এতই হতভম্ব হয়ে গেলাম, কিছু বলতেই পারলাম না। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

এখন আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখছি রেণু সম্পর্কে আমার কি কোন দুর্বলতা ছিল? কিংবা আমার সম্পর্কে রেণুর? আমি কি কখনো তাকে কোন আঘাত দিয়ে ফেলেছি। আমার মন বলছিল, অরুণদা, অরুণদাই হয়তো আসল কালপ্রিট। এখনো ভাল মানুষ সাজতে চাইছেন। হঠাৎ মনে হলো অরুণদা কোন অত্যাচার-টত্যাচার করতো না তো? সে-সব তো জানার উপায় নেই। অরুণদার আর কারো সঙ্গে আগে থেকেই প্রেমফ্রেম ছিল কিনা কে জানে। সে-রকম কোন শক্‌ পেয়েও তো পাগল হওয়া সম্ভব। অনেকে হয়, শুনেছি। অরুণদা যদি সত্যি তেমন নির্দোষ হন, তা হলে বাণীপিসীমার মনে প্রথম দিন এমন খটকা লেগেছিল কেন? নিজের জামাইকে কেউ অকারণে সন্দেহ করতে পারে! তাছাড়া, রেণুর সেদিনের কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস না হলেও কখনো কখনো মাথার মধ্যে ঘুরতো। অত গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে ও যে কথাগুলো বলে গিয়েছিল, তার মধ্যে কিছু থাকতেও তো পারে। পাগল বলে সব কথাই কি তার উড়িয়ে দিতে হবে নাকি।

আমার হঠাৎ মনে হলো পিসেমশাইকে কথাগুলো বলা দরকার। ওর মধ্যে কিছু সত্যি আছে কিনা উনিই বিচার করে দেখুন। তা না হলে নিজের ওপরই একটা দায়িত্ব রয়ে যায়। 'জানতে যখন, বলো নি কেন!' এমন কথা তো পিসে-মশাই একদিন বলে বসতে পারেন। কিন্তু পিসেমশাইকে বললেই হয়তো উনি আবার অরুণদাকে সে-কথা বলে দেবেন। তখন অরুণদা আমার সম্পর্কে কি ভাববেন। দ্যাখো, ছেলেটাকে মন খুলে সব কথা বললাম, এখন সেও আমাকে বিশ্বাস করছে না।

স্মৃতির ভেতর থেকে নানান ঘটনা টেনে টেনে বের করতে গিয়ে একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম, এই এতদিন বাদেও।

ঠিক মনে নেই, কি একটা কেনার জন্যে এসে ধরলো, এই চলো না, একবার নিউ মার্কেটে নিয়ে যাবে।

সেদিন ওর মুখে-চোখে খুব একটা ফুর্তির ভাব, সুদীপদা বিলেত থেকে ওর জন্যে টুকিটাকি উপহারের একটা প্যাকেট পাঠিয়েছিলেন। নকল পাথরের গয়না-টয়না। সেজন্যেই বোধহয় একটা টাসল কিংবা রুপোর জালিহার কিনতে নিউ মার্কেট যেতে চেয়েছিল।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, কলেজে পড়ছিস, একা একা যেতে পারিস না?

রেণু রাগ দেখালো। বললে, যেতে হবে না তোকে। তারপর আমার অপ্রতিভ ভাব দেখে হেসে উঠলো। বললে, দাঁড়া না, বিয়েটা হয়ে গেলে দেখবি, সব সময় বরের সঙ্গে ঘুরবো। তোর সঙ্গে কোথাও যাবো না।

আমি হেসে উঠেছিলাম।

কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরছি, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন। বাস থেকে নেমে বাড়ি আসতে অনেকখানি তো হাঁটতে হয়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আরো একটু বাড়লো। আমরা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম। রাস্তার দু'পাশে বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে ভিড় করে লোক দাঁড়িয়ে পড়ছিল দোকানের দরজায়, বাড়ির বারান্দার নীচে।

চুল ভিজে যাবে বলেই হয়তো রেণু হাঁটতে হাঁটতে শাড়ির আঁচলটা মাথার ওপর ঘোমটার মত টেনে দিলো। আমরা দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করেও পারছিলাম না, পায়ে চটি ছিল দু'জনেরই, কাদার ছিটে লাগছিল কাপড়ে।

ওর ঘোমটা টানা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠাট্টা করে বললাম, লোকগুলো সব তোকে বোধহয় বউ ভাবছে।

সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠলো, আহা রে, তোমাকে তো একদম বাচ্চা ছেলে ভাবছে, তোমার আবার বউ!

নিজেকে ভীষণ অপ্রতিভ লাগলো। আমি অস্বস্তিতে কোন কথা বলতে পারলাম না। কারণ আমি সে কথা ভেবে তো বলি নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, ঘোমটার জন্যে লোকে ভাবছে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বউ ভাবছে, এমন কথা আমি ঠাট্টা-ইয়ার্কির সুরেও বলতে পারি ও ভাবলো কি করে।

পরে মাঝেমাঝে ভেবেছি এ-ধরনের একটা কথা ও ভাবলো কেন। ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেছে, এ-রকমের কথা রেণু কি কখনো ভাবে নাকি? জানতে চাই নি, জানতে সাহসও ছিল না।

এখন সে-সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। না কখনোই না, রেণুর জন্যে আমার সে-ধরনের দুর্বলতা কোনদিনই ছিল না। রেণুরও না।

কিন্তু রেণুর জন্যে আমার কষ্ট হয়। কষ্ট হবারই কথা। সুদীপদা যদি এই খবর পান, ওঁর তো হাজার গুণ বেশী কষ্ট হবে। হয়তো পড়াশুনো স্থগিত রেখে ফিরে চলে আসবেন।

অথচ সকলের কষ্ট হয় না কেন।

সকালের ঘটনাটার পর আমার তাই খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে আমি নীচের তলার কলঘরে এসে চোখমুখ ধুই, দাঁত মাজি। তার ওপাশে উঠোনের দিকে একটা কল আছে। সেখানে বসে বসে লক্ষ্মীর মা এ-সময় বাসন মাজে। বাসন মাজার ঠিকে ঝি সে। তরতর করে বাসনগুলো মেজে দিয়ে চলে যায়। ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করে, দিনের দিন পোড়া কড়াই আমি মাজতে পারবো নি। একটা না একটা কিছু নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে সে ঝগড়া করবেই। তার চেঁচামেচি দোতলা পর্যন্ত পেঁছয়।

পিসেমশাই একদিন রেগে গিয়ে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন। বাণীপিসীমাকে বলেছিলেন, মাইনে হিসেব করে ওকে এক্ষুনি বিদেয় করে দাও।

বাণীপিসীমা শুধু শুনেছিলেন, কোন সাড়া দেন নি। ঠিকের ঝিগুলোকে উনি ভয় পান। জানেন, একটা বিদেয় করলে আরেকটা পাওয়া কত শক্ত। যে আসবে তাকেই ভাঙিয়ে দেবে।

আমি টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে দাঁত মাজতে গিয়ে থেমে গেলাম। প্রতিদিন তো এ-সময় লক্ষ্মীর মা ঝগড়া করে, চেঁচামেচি করে। কিন্তু অবাক কান্ড। মনে হলো, ঠাকুর আর লক্ষ্মীর মা যেন চাপা গলায় গল্প করছে। 'দিদিমণি দিদিমণি' কথাটা শুনেই আমার কেমন কৌতূহল হলো। আমি কলঘরের জানালাটা খুলে দিলাম। এবার ওদিকের কথা স্পষ্ট শোনা গেল। আমি কান পেতে শুনলাম। ওরা জানেও না আমি এখানে আছি। এ-সময় বাণীপিসীমা নীচে নামেন না, তাই খুব নিশ্চিন্ত।

ওরা রেণু সম্পর্কে আলোচনা করছিল। মনে হলো, ঠাকুরই ওকে খবরটা দিয়েছে। রেণুর কথায় লক্ষ্মীর মা খুব হাসছিল। যেন কত বড় একটা মজার ব্যাপার।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে উঠছিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে ঠাকুরের মুখে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিই। লক্ষ্মীর মায়ের গালে একটা প্রচন্ড চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু অক্ষম রাগ। আমি কিছুই করতে পারলাম

না। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

কাউকে বলতেও পারলাম না। কিন্তু সারাদিন ধরে ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে রয়েই গেল।

এখন মনে হচ্ছে, রেগে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। ওরা তো মজা পাবেই! হঠাৎ পূর্ণর সেই সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ানো সেই ঘোলাটে চোখের কিশোরী মেয়েটির জন্যে আমার করুণা হয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল, আর তা শুনে পূর্ণ বিজ্ঞের মত বলেছিল, ওটা ক্লাস কনসাসনেশ। কে জানে, পূর্ণই হয়তো সমাজকে চিরে চিরে দেখতে শিখেছে।

৭

খুব মিহি সুরে কে গান গাইছিল।

নোট টুকে নেবার জন্যে আমি শান্তনুর খাতাটা নিয়ে এসেছিলাম, ওটা ফেরত দেওয়ার তাড়া ছিল। তাড়া অন্য কারণেও। ফেরত দিতে দেরী করলে, বা আনতে ভুলে গেছি ওজুহাত দিতে দিতে একদিন শান্তনু হয়তো বাড়িতে এসে হাজির হবে।

একে এ-বাড়িতে আমি তো শুধুই একজন আশ্রিত। কোন্ ছেলেবেলার সম্পর্ক ধরে বাণীপিসীমা আমার পিসীমা, বন্ধুদের ভাল করে বোঝাতেও পারিনি। ওদের তো অনেকের নিজের পিসীমার সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। তাছাড়া, পিসেমশাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল বলেই না উনি আমাকে এখানে থেকে পড়াশুনো করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ঘরের ছেলের মত ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু আমারও তো কতগুলো দায়িত্ব আছে। পিসেমশাইয়ের পছন্দ অপছন্দ সবই খুব স্পষ্ট। আমার তো ধারণা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ায় ও'র রীতিমত আপত্তি আছে। অতএব তারা বাড়িতে এলে কি মনে করবেন, কে জানে। আর ওরা সবসময় মুখে লাগাম দিয়ে কথা বলতেও জানে না। পরোয়াও করে না। আসলে ওদের তো কারো সম্পর্কে শ্রদ্ধা নেই। আমি সেজন্যেই চাই না যে, ওরা কেউ আমার বাড়িতে আসুক।

সঙ্কোচ আরেকটা কারণেও। পিসেমশাইয়ের চেম্বার ছাড়া তো পৃথক কোন বসবার ঘর নেই। কারণ সুদীপদা বিলেত যাওয়ার পর বসবার ঘরখানা ও'র ক্লার্কের ঘর হয়ে গেছে, দিবারাত্রি সেখানে খটাখট টাইপ চলে। অন্য সময় তালা-বন্ধ থাকে। অথচ বন্ধুদের তো দোতলায় আমার ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না। ও'রা কিছু মনে করবেন, আর আমিও চাই না। তখন বন্ধুরা হয়তো ভাববে এ-বাড়িতে আমি নিতান্তই একজন আশ্রিত, আমার এখানে কোন পোজিসন নেই।

আমি তাই শান্তনুর খাতা থেকে নোটগুলো তুলে নিচ্ছিলাম, যাকে বলে একাগ্রমনে, কোন কিছুর দিকে কান ছিল না।

হঠাৎ তন্ময় ভাবটা বোধহয় কেটে গিয়েছিল। খুব মিহি সুরের একটা গান ভেসে আসছে শুনতে পেলাম। সুরের ফালিটা ঠিক যেন একটা শুকনো লতার মত। কে গাইছে। টুনটুন? বাঃ। ওর গলাটা তো বেশ মিষ্টি। মিষ্টি এবং করুণ।

আমি অল্পক্ষণ কান পেতে শুনলাম। আরো ভাল করে শুনতে ইচ্ছে হলো

এবং ওকে বাহবা দিতে। উঠে পড়ে গানের সুর যেদিক থেকে আসছিল সেই-দিকে এগিয়ে গেলাম টুনটুনকে খোঁজার জন্যে।

এঘর ওঘর করে কাছাকাছি পৌঁছতেই বুঝতে পারলাম, টুনটুন নয়।

আমি স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে, যাতে রেণু আমাকে দেখতে না পায়। হ্যাঁ, রেণুই গাইছিল। দেখলাম। মেঝের ওপর বসার ভঙ্গিটা বড় সুন্দর লাগলো। বাঁ হাতের ওপর ভর দিয়ে দুটি পা সুন্দর করে বিছিয়ে ও বসে আছে, আঁচলটা কাঁধের ওপর দিয়ে এসে মেঝেতে লুটোনো। বড় সুন্দর আর বড় করুণ লাগছিল ওকে। শান্ত মিহি গলায় ও গাইছিল। গানের কথাগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। কিন্তু একটা চাপা দুঃখ যেন তার মধ্যে রয়েছে।

আমি সেখান থেকে সরে এলাম। এই চাপা দুঃখটাই তো আমি খুঁজে বের করতে চাইছি।

ওর দুঃখ-কষ্ট, ওর মধ্যে কি চাপা আছে আর কেউ তো জানতে চাইছে না। সকলেই এক একটা দিকে একটা কিছুকে ধরবার চেষ্টা করছে। অরুণদার এখনো বিশ্বাস, চিকিৎসা করে ও সেরে যাবে। আহা, তাই যেন হয়। অনেকেই তো ভাল হয়ে যায়।

কিন্তু আমি অবাক হয়েছিলাম পিসেমশাইয়ের কথা শুনে। দু' একটা আলোচনা এখন ও'রা আমার সামনেই করেন।

বাণীপিসীমা আলমারি খুলে আমাকে টাকা দিতে যাচ্ছিলেন। বাবা কলেজের মাইনে এবং হাতখরচের যে টাকা পাঠান, আমি তা ও'র কাছেই রাখতে দিই। দরকার মত চেয়ে নিই।

সেই সময় পিসেমশাইয়ের জুতোর শব্দ পেলাম। উনি ঘরে ঢুকেই পিসীমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, রেণুর একটা কুষ্ঠী করাতে দিচ্ছি। আমার জুনিয়ার সত্যেন বলছিল, একজন ভাল জ্যোতিষীকে চেনে...

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। দ্যাখো দ্যাখো, সেই শক্ত-সমর্থ ঋজু চেহারার মানুষটা, যে এ-সবে একেবারেই বিশ্বাস করে না, মন্দির-টন্দির যার চোখে শুধু ক্রাউড, সেই মানুষটা কত দুর্বল হয়ে গেছে।

আমাকে একদিন বলেছিলেন, দেখো, আমার যখন মক্কেলরা আসে তখন রেণু যেন হুট্ করে গিয়ে ঢুকে না পড়ে। তাহলেই যেন ও'র সম্মান যাবে! আমার খুব খারাপ লেগেছিল। অথচ চিন্তাটা ও'র মাথার মধ্যে আছেই, কষ্টও। তা না হলে জুনিয়ারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবেন কেন।

বাণীপিসীমা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, যেন যে-কেউ যা-কিছু বলবে, তাতেই ও'র সম্মতি আছে। তারপর উদাস গলায় বললেন, অনেকে তো বলে তিরোলের বালা পরলে...

পিসেমশাই ও'র খাটের মাথার কাছে যে ছোট্ট বুক কেসটা আছে তার ভেতর কি খুঁজছিলেন। ফিরে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, যাওয়াই যে একটা ঝামেলা...

অর্থাৎ ও'র তাতেও আপত্তি নেই।

আমি টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে চলে এলাম। আমি বলতে পারতাম, আমি তো আছি পিসেমশাই, আমি নিয়ে যাবো। কিন্তু বলতে পারলাম না। আসলে ঐ-সব বালা মাদুলি তাবিজে আমার বিশ্বাস নেই। যত বুজরুকি। ঐসব করতে গিয়ে হয়তো কেস আরো খারাপ হয়ে যাবে, মিছিমিছি সময় নষ্ট। এটা বিজ্ঞানের যুগ।

আমার একবার হাসি পেল। কি জানি পিসেমশাইয়ের বয়সে পেঁছে হয়তো আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করবো। কলেজেই দেখেছি, আমার বয়সের অনেকেও বিশ্বাস করে।

আচ্ছা, রেণু কি কোনদিন বিশ্বাস করতো? একদিন ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি হাত দেখতে জানো?

—হ্যাঁ, জানি। বলে ওর হাতটা টেনে নিয়েছিলাম। নিয়ে বলেছিলাম, রঙ ফর্সা, সুন্দরী বলা চলে, মাঝারি হাইট, হাতে পাঁচটা করে আঙুল, হাতটা বেশ নরম।

ও হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। তারপর হাসি থামিয়ে বলেছিল, এই না, সত্যি করে দেখো...

আমি যে হাত দেখতে জানি না, ও বিশ্বাসই করেনি। আমি তাই মজা করার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম। তারপর হেসে উঠে বলেছিলাম, তোর তো প্রেমট্রেম হবে রে!

ও হেসে ফেলেছিল, কিন্তু ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিল, সত্যি?

এখন মনে হচ্ছে, ওর বোধহয় প্রেমট্রেম করার ইচ্ছে ছিল। বাঃ রে, ও বয়সে কার না থাকে। তবে সত্যি সত্যি কাউকে ভালবেসে ফেলেছিল কিনা জানি না। একটা ব্যাপারে তো একবার সন্দেহও হয়েছিল।

তেমন গভীর কিছু নিশ্চয়ই হয়নি, হলে তো বিয়ের সময় বেঁকে দাঁড়াতো। তবে বলা যায় না। বাইরে এত হাসি হৈ-চৈ, এমন সপ্রতিভ কথাবার্তা বললে কি হবে, ও ছিল দারুণ চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

আমি ভেবেছিলাম ওকে জিজ্ঞেস করবো, কাউকে অলরেডি ভালবাসিস নাকি? তার আগে ও আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসলো। বললে, সত্যি করে বলো মনুদা, তুমি কাউকে ভালবাসো না?

আমি ইচ্ছে করে খুব গম্ভীর হয়ে গেলাম। বললাম, আমার ওপর অনেক দায়িত্ব। বাবা তো আর দু-তিন বছর পরেই রিটায়ার করবে। আমি ওসব কথা ভাবিই না।

ওকে খুব বিষণ্ণ দেখালো। আহত চোখদুটো নামিয়ে নিল ও। হয়তো আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে। কিংবা সেই অবস্থার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে এই লজ্জায়।

এই সব কথা এখন আমার কেনই বা মনে পড়ছে। কেনই বা ঘুমন্ত স্মৃতি-গুলো খুঁজে খুঁজে তুলে আনছি। এই তো একটু আগে ও করুণ কান্নার মত সুরে গান গাইছিল। তখন আমার বুকের মধ্যে একটা দমবন্ধ হওয়া কষ্ট অনুভব করেছি। আর এখন আমি যেন ওকে একটা অপারেশন টেবিলের ওপর ফেলে দিয়েছি। আমি, অরুণদা, পিসেমশাই, বাণীপিসীমা—সকলের চোখই এখন দক্ষ সার্জেনের চোখ। মানুষটা হারিয়ে গেছে। শুধু শরীরের কোথায় সেই যন্ত্রণার উৎস, আসলে বুকের পাঁজরের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে চাইছি।

ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে অরুণদা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন।—তোমার কিছু মনে পড়ে কিনা একটু ভেবে দেখো তো অনিমেষ। মনের দিক থেকে কখনো কিছু...

আমার শুনতেও খারাপ লেগেছিল। কি বলতে চাইছেন অরুণদা। উনিও

কি কলেজের বন্ধু সেই সুশান্তর মত হয়ে গেলেন নাকি। ডাক্তার যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি তো বরং রেণুর কথাগুলো বলে দেবো। অরুণদা সম্পর্কে রেণুর সন্দেহের কথা। বিষটিষ কি যেন খাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি অবশ্য এখন আর বিশ্বাস করি না। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল সত্যি হতেও পারে।

যাক্‌গে, রেণুর কথা এখন আর আমার ভাবতে ভাল লাগছে না। ভাবতে গেলেই নানান ঘটনা এসে মাথার মধ্যে হুটোপাটি শুরু করে দেয়। মাথাটা কেমন ভার ভার লাগে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না।

পূর্ণ আর শান্তনু বেশ আছে কিন্তু। ওদের তো ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভাবতে হয় না, অতীত নিয়ে কোন লজ্জা নেই। আমার বাবাকে দেখলে, এক এক সময় ভয় হয়, ওরা হয়তো হাসাহাসি করবে। পূর্ণর বাবা বড় চাকরি করেন বিদেশী ফার্মে, শান্তনুদের নিজেদের বাড়ি। তাছাড়া বড় বড় লোক ওদের আত্মীয়, পাশ করলেই চাকরি। শান্তনু তো দিব্যি সুশ্রী ঐ মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করছে। একদিন বাস-স্টপে অপেক্ষা করছিল। আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অচেনা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই কেমন হৃৎকম্প হয়। হয়তো গলাফলা কেঁপে যাবে, গুছিয়ে কথা বলতে পারবো না, আব মেয়েটা হয়তো শান্তনুর কাছে পরে খুব হাসাহাসি করবে আমাকে নিয়ে।

কারো সঙ্গে আলাপ করতে সাহস না হলে কি হবে। আমার কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে, শান্তনুর মত আমারও কেউ থাকবে। আমাকে সে খুব ভালবাসবে। অমনি এসে অপেক্ষা করবে।

পূর্ণ রসিকতা করে বলবে, দারুণ জুটিয়েছিস মাইরি।

আমি হাসবো। তখন আর ওকে অভব্য মনে হবে না। কারণ, সেই মেয়েটির সঙ্গে তো আমিও এই ধরনের দু' একটা স্মার্ট কথাবার্তা বলবো। একটু অভব্য না হলে কেউ তো স্মার্ট মনে করে না। আর আমি মেয়েটার সঙ্গে ঘুরবো, রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে, পরেশনাথে, আউটরামে। ও বুকে বই চেপে হাঁটবে, কিংবা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ও অনর্গল কথা বলবে, কিংবা হাসবে। ও ঘাড় হেলিয়ে আমার কথা শুনবে, কিংবা আমার দিকে তাকাবে। এক একসময় ওর আঙুল আমার হাত ছুঁয়ে দেবে। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ও আমার বুকের বোতামে হাত রেখে বলবে, এই শোনো! আমার ওকে ছুঁতে ইচ্ছে করবে, চুমু খেতে, আলতো ভাবে ওর বুক ছুঁয়ে যেতে। একটু লজ্জা, একটুখানি রাগ মাখিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকাবে, কিংবা তাকাবে না। যে যার নিজের বাসে উঠে চলে যাবার সময় একটার পর একটা বাস চলে যাবে, কেউই বাসে উঠতে চাইবো না।

দূর, এসব আমার হবেই না। এসব আমাদের জন্যে নয়। কিন্তু কাল রাত্রে যে স্বপ্নটা দেখলাম, বড় অদ্ভুত। মেয়েটার মুখটা ঘুম ভাঙার পর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। একটা দিঘির পারে দাঁড়িয়ে রয়েছি, শান বাঁধানো ঘাট নেমে গেছে অনেক নীচে অবধি, তার পর জল। ঘাটের পারে দুটো না তিনটে নগ্ন স্ট্যাচু, পাথরের। মেয়েটা এলো, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে সুন্দর কোন স্ট্যাচুটা? মেয়েটা ঘাটের নীচের দিকে আঙুল দেখালো। ফাটলের দিকে। মানে, ঘাটের সব শেষ ধাপে শুধু একটা পাথর কে সরিয়ে নিয়েছে, জল দেখা যাচ্ছে সেখানে। মেয়েটা হঠাৎ ডাইভ দেবার মত করে ঝাঁপ দিল। ব্যস্, জলের মধ্যে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারবার সেই মেয়েটার মুখটা ভাববার চেষ্টা করছি। মনে পড়ছে না। অর্থ

খুঁজে বের করার চেষ্টা করিনি। স্বপ্নের কি মানে থাকে নাকি।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, স্বপ্নের ঐ মেয়েটা ঝুমা নয়তো? সামনের বাড়ির মেয়েটার নাম ঝুমো। ঝুমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর একরাশ বাঁশ জমা হয়েছে। সকালে ছিল না। সেগুলো দেখেই ঝুমার কথা মনে হলো।

কিন্তু বাঁশগুলো কে জড়ো করলো? বাড়ি সারাবে নাকি ওরা, না কি রঙ করবে?

রেণু ঝুমাকে একেবারে পছন্দ করতো না।

আমি একদিন জানালায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। রেণু খুব রেগে গিয়েছিল। 'না, ওর দিকে তাকাবে না।'

অথচ এক সময় ঝুমো নাকি ওর খুব বন্ধু ছিল।

ব্যাপারটা আজও আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

তখন তো সুদীপদা সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানিই না। রেণুর কাছে শুনে শুনে তাঁর সম্পর্কে আমার দারুণ কৌতূহল।

রেণু নানান মজার কথা বলছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল দাদাকে নিয়ে ওর খুব গর্ব, ওরকম মানুষ নাকি হয় না। 'জানো রাত বারোটায় সিনেমা দেখে ফিরলো, পরের দিন পরীক্ষা। বাবা খুব রাগ করেছিল।' আবার তখনই: 'দাদার কি গানের গলা তুই ভাবতে পারবি না।' কিংবা: 'একবার পোল ভল্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, ইন্টার-কলেজ স্পোর্টসে।' এমনি সব অবাক করা কথা বলে যেতে যেতে হঠাৎ ছেলেমানুষের মত হেসে উঠতো, দাদার কোন ছেলেমানুষি কাণ্ডের কথা বলে। 'আমি তো ক্লাস নাইনে, দাদা আমাকে একটা ছোট্ট অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কিছুতেই পারছে না, ঘেমে নেয়ে কি রেগে গিয়েছিল। অথচ দাদা অঙ্কে লেটার পেয়েছিল।' সে-কথা মনে পড়তে তার হাসি আর থামে না।

তারপর হঠাৎ ঝুমোদের বাড়ির দিকে ইশারা করে বলেছিল, 'ঐ রাক্ষুসীর ধারণা দাদা ওকে বিয়ে করবে।'

তারপরই চুপ করে গিয়েছিল, আমি প্রশ্ন করেও আর কিছু জানতে পারিনি।

সে-জন্যেই কিনা জানি না। ঝুমা সম্ভবত সুদীপদাকে ভালবাসে, বা পরস্পর পরস্পরকে। রেণুর রাগটা সেজন্যেও হতে পারে। দাদাকে নিয়ে যার এত গর্ব, বৌদি করে সে নিশ্চয় আরো অনেক সুন্দরী মেয়ে আনতে চায়। ঝুমাকে ও হয়তো দাদার অযোগ্য মনে করে। কিংবা দাদা কাউকে ভালবাসবে, কারো সঙ্গে প্রেম করবে, রেণু হয়তো তা চায় না। বিয়ে করে নিয়ে আসা বৌকে ভালবাসলেও তো অনেকে শুনেছি সহ্য করতে পারে না। দাদাকে অনেকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে রাখতে চায়।

ঝুমোদের বাড়ির সামনে জড়ো করে রাখা বাঁশগুলো আমার মাথার মধ্যে রয়েই গিয়েছিল।

টুনটুন বলে উঠলো, ওমা, তুমি শোনোনি? ঝুমাদির তো বিয়ে। ছাদে প্যাণ্ডেল হবে বলে এনে রেখেছে।

ঝুমাদির তো বিয়ে! কথাটা শুনে আমি কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম! সঙ্গে সঙ্গে সুদীপদার জন্যে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। সুদীপদা কি বিলেতে খবর পাবে, জানতে পারবে? তাহলে তো সে বেচারী কষ্ট পাবে। ঝুমা নিশ্চয় তাকে চিঠি লিখতো। লিখে হয়তো জানিয়েছে। যারা ভালবাসে,

ভালবাসতে পায়, তাদের ওপর অদ্ভুত মমতা হয়। সন্দীপদাকে ছবিতে ছাড়া দেখিনি, ঝুমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি। তবু ওদের ভালবাসা আমি অনুভব করতে পারতাম। সেটা ছিঁড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, এ-খবর শুনে আমি একটু বেদনা অনুভব করলাম।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হলো, এটা তো বেশ ভাল খবর। ঝুমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সন্দীপদার সঙ্গে তা হলে তো আর ঝুমার বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে না। রেণু নিশ্চয় এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। রাক্ষুসীর হাত থেকে দাদাকে বাঁচাতে পেরেছে ভেবে ও হয়তো এবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য ঐ ব্যাপারটাই যদি ওর মানসিক বিকৃতির কারণ হয়ে থাকে। আমার এক-একবার সন্দেহ হয়েছে, তাও হতে পারে।

একবার ভেবেছিলাম অরুণদাকে সে-কথা বলবো। কিন্তু বলতে গিয়েও বাধো-বাধো ঠেকেছে।

বরং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওঁর জিজ্ঞেস করার ভঙ্গি দেখে মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল। শালা! যেন জানে না, ওর মা রেণুকে কত জ্বালিয়েছে। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে যেতেই সারা শরীর জ্বলে উঠলো।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, বিয়ের বেশ কিছুদিন পর রেণুদির একখানা চিঠি এলো বাণীপিসীমার নামে। লেটার-বক্সে ডাকপিওন চিঠিটা দিয়ে যেতেই আমি দেখতে গেলাম, বাবার চিঠি কিনা। দেখলাম রেণুর হাতে লেখা ঠিকানা, বাণী-পিসীমার নামে। আমি ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাণীপিসীমাকে দিলাম। উনি তখন পিসেমশাইয়ের জন্যে ছানা আর ফলের প্লেট দুটো নিয়ে চলেছেন।

হাত জোড়া থাকলে উনি তো বলেন, খোল্ না তুই, পড়ে শোনা।

কিন্তু রেণুর চিঠিটা খুলতে তো বললেনই না। উপরন্তু তাড়াতাড়ি একটা প্লেট মীটশেফের মাথায় নামিয়ে রেখে চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিলেন।

রেণু কি লিখেছে না লিখেছে জানার এমনি একটা সাধারণ কৌতূহল আমার ছিলই। অর্থাৎ রেণু ভাল আছে কিনা। তাই ঘুরঘুর করছিলাম, বাণীপিসীমা নিজে থেকেই যাতে বলেন।

কিন্তু একটু পরেই মুখচোখ দেখে কি-রকম ভয় পেয়ে গেলাম। বলেই ফেললাম, 'কি হয়েছে বাণীপিসীমা? কিছু খারাপ খবর?'

বাণীপিসীমা কেমন ম্লানভাবে বললেন, 'অরুণের মাকে দেখে, বাবা, এরকম মনেই হয়নি।'

৮

পাড়ার স্টেশনারি দোকানটায় ব্লেড কিনতে গিয়েছিলাম। ঝুমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শুনেছি উনি বড়সড়ো সরকারি অফিসার। পাড়ার কারো গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেট দরকার হলে ওঁর কাছেই যায়। ঘাড়ে-গর্দানে থপথপে চেহারা ভদ্রলোকের, গালে থলথলে মাংস, চৌকো মুখ। মুখে সবসময় চুরুট লেগেই আছে। যখন হাঁটেন মনে হয় রাস্তাটা ওঁর, দোকানের কাউন্টারে দাঁড়ালেন এমনভাবে যেন আর সব খদ্দেররা মানুষই নয়।

ভদ্রলোককে আমি একটুও পছন্দ করি না। মুখেচোখে একটা অহঙ্কারী

ভাব আছে বলে নয়, আসলে সকলকে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। বলে। পাড়ার লোকগুলোও তেমনি, কাউকে ডেকে কথা বললে তারা যেন বর্তে যায়। হেঁড়ে গলায় যখন কথা বলেন, আশপাশের লোক শুনতে পায়। অর্থাৎ শুনিয়ে শুনিয়েই বলেন, ভাবটা এই যে, সকলে শোনো, আমি কথা বলছি।

দোকান থেকে থপথপ করে তিন ধাপ নেমে এলেন। আমি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। ও'কে আমি একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলি। দু' একদিন দু' একটা প্রশ্ন করেছেন, আমি হ্যাঁ না বলে কেটে পড়েছি।

ভদ্রলোক ফুটপাথে নেমেই বললেন, অনিমেষ যে, শোনো শোনো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি দোকানেই আমাকে লক্ষ করেছেন। এবার ঘাড় না ফিরিয়েই বললেন। অবশ্য উনি ঘাড় ফেরাতে পারেন বলে মনে হয় না।

থপথপ করে হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, পাড়ায় সব বলাবলি করছে, র‍্যাদার একটা রিউমার বলতে পারো, খবরটা কি সত্যি?

ফুটপাথ দিয়ে যারা যাচ্ছিল ফিরে তাকালো, এমন বাজখাঁই গলা। ঝুমা তো দিব্যি সুশ্রী। এমন লোকের ওরকম মেয়ে হয় কি করে।

পাড়ায় বলাবলি করছে শুনেই আমার ভেতরটা কেঁপে উঠলো। অথচ তখন আর পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই।

এক পা এগিয়েই থেমে পড়ে বললেন, ও'র বড় মেয়ে, ঐ যে ঝুমার বন্ধু, তার নাকি মাথায়...ইটস্ ভেরি স্যাড।

'ঐ যে ঝুমার বন্ধু' বলার সময় পাশে বাঁ হাত ছুঁড়ে আঙুল দেখাতে গিয়ে রাস্তার একজনের গায়ে খোঁচা দিলেন, আর 'তার নাকি মাথায়' বলবার সময় বাঁ হাতের তর্জনীটা মাথার ওপর তুলে ঘোরালেন।

ইচ্ছে হল লোকটাকে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিই। সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠলো। একটা পরিবারের দুঃখের লজ্জার ভয়ের কোন ব্যাপারকে এভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিযে হাটের মাঝে কেউ বলতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

আমি অবাক হবার ভান করলাম।—মাথার? কৈ, জানি না তো।

—অ। সত্যি নয় তাহলে? যাক্ রিলিভড্। আমিও বিশ্বাস করিনি, বুঝলে। পাড়ার লোক সব...

থপথপ থপথপ করে উনি এগিয়ে গেলেন, কারণ আমি তখন ও'কে এগিয়ে দেবার জন্যেই আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করেছি।

লোকটার বাড়িতে দুদিন বাদে বিয়ে। সে-সব চিন্তা নেই, কোন বাড়িতে কার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে ঠিক জানা চাই। তাও পিসেমশাইকে জিজ্ঞেস করলেই হয়, তা না রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাকে। অনর্থক আমাকে একটা ঝামেলায় ফেলা। এরপব পিসেমশাইকে যদি বলে, অনিমেষ ছোকরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল...ব্যস, পিসেমশাই ভাববেন আমিই খবরটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি। পিসেমশাই কোথায় সাবধান করে দিয়েছেন বাবা-মাকেও যাতে না জানাই, এদিকে পাড়ার লোক সব ঠিকই জেনে গেছে। কিন্তু কিভাবে জানলো? ও'রা তো সব সময় চাপা গলায় কথাবার্তা বলেন। কি জানি, হয়তো ঝুমার মা কোনদিন এসেছিলেন। তারপর হঠাৎ মনে হল বাসনমাজার ঝি লক্ষ্মীর মায়ের কীর্তি নয় তো!

ভাবলাম আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে। রেণুকে যতই চাপা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক্ না কেন, ও হয়তো কোন সময়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে ছিল।

আমার হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, এত লুকোচুরির দরকারই বা কি। অসুখ-বিসুখ হলে লোকে তো ইনিয়েবিনিয়ে সাতকাহন করে শোনায়। তেমনি এটাও তো একটা রোগ। বলে দিলেই তো হয়। তা হলে আর এত অস্বস্তি থাকে না।

পাগল কে, রেণু? না বাড়ির সবাই? রেণু একদিন টুনটুনের চুলের রিবনটা লুকিয়ে রেখেছিল, একদিন বাবুলের প্যান্টের বেলট্। টুনটুনের সবুজ ম্যাক্সি কিংবা পিসেমশাইয়ের চশমা লুকোনো যদি পাগলামো হয়, তাহলে এ বাড়ির সবাই পাগল। এরা তো রেণুকেই লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

একদিন রেণু পিসেমশাইয়ের চেম্বারে চলে গিয়েছিল। তখন অবশ্য মক্কেলরা ছিল না। শুধু ও'র ক্লার্ক ছিল। তার সামনেই পিসেমশাই ধমক দিলেন, এখানে কেন? ওপরে চলে যাও। বেশ আদেশের স্বরে বললেন, আর রেণুও সুড়সুড় করে চলে গেল, কেমন চোর-চোর মুখ করে। আমার খুব মায়া হয়েছিল।

তার পরই তো একদিন উনি আমাকে বলেছিলেন, দেখো রেণু যেন এখানে এসে ঢুকে না পড়ে। ঢুকে পড়লেই যে ও'র মর্যাদার হানি হবে।

আমি লক্ষ করছিলাম, রেণুর ওপর ও'রা সকলেই একটু একটু করে বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এত দুশ্চিন্তা এবং দুঃসহ কষ্ট ছিল ও'দের, এখন ক্রমশই সে-সব ডুবে যাচ্ছে। ওকে চোখের সামনে দেখতে পেলেই পিসেমশাই ধমক দেন।—এই রেণু এ-ঘরে কি করছিস? এখান থেকে যা।

ভাবি রেণুর দিকে তাকাবো না। না তাকিয়েও তো পারি না। ওর খেয়ালিপনা দেখলে মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয়ে হয়ে আসে।

ভিতরের বারান্দাটা আসলে একটা প্যাসেজ, আমার ঘরের দিকে যাবার রাস্তা। তার এক কোণায় দু' চারটে পুরনো ফার্নিচার পড়ে আছে, বেতছেঁড়া চেয়ার, পায়াভাঙা টুল, পরিত্যক্ত একটা বেঞ্চ একধারে। তার পাশ দিয়ে আমার ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। ধুলোটে কোণটায় চোখ পড়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

রেণু গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, নিজের মনেই হাসছে। ওর কোলে একটা বড় মোমের পুতুল, একটা হাত তার ভাঙা। বাবুলের ছোটবেলার কোন পুতুল হয়তো, অনেকদিন থেকে ওটা পড়ে থাকতে দেখেছি। সেটাকেই কোলে নিয়ে সাজাতে বসেছে রেণু, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। আত্মভোলা আনন্দে ও তাকে সাজাচ্ছে আর হাসছে। তাকে কি যেন বলছে। টুকরো টুকরো নানান রঙের কাপড় জোগাড় করে এনেছে কোত্থেকে, তারই একটা লাল টুকরো দিয়ে পুতুলটার মাথায় একবার ঘোমটা টেনে দিলো। কি যেন বললো বিড়বিড় করে, নিজের মনেই হাসলো। এখন ও খুশি, দারুণ খুশি। কারণ ও এখন আবার অপ্রকৃতিস্থ।

এ তবু ভালো। তুই যে ভাল থাকলেই আমার চোখ ঠেলে কান্না আসে।

এই তো একটু আগে পিসেমশাই কোর্ট থেকে ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন।

পিসেমশাই খাটে শুয়ে ছিলেন। কোর্ট থেকে ফিরে এ-সময় উনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন। সন্ধ্যে হতে না হতেই তো আবার মক্কেলদের নিয়ে বসতে হবে।

ও'কে খুব ক্লান্ত লাগছিল। নিজেই হাত দিয়ে নিজের মাথাটা টিপছিলেন।

বললেন, দ্যাখো তো ওখানে অ্যানাসিন আছে কিনা।

ও'র ডাক শুনেই কিনা জানি না, রেণু এসে দাঁড়ালো, কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলো বাবার দিকে। ও তখন একেবারে স্বাভাবিক মানুষ।—বাবা, তোমার শরীর খারাপ?

পিসেমশাই ওর দিকে তাকালেন। সংক্ষেপে বললেন, হুঁ।

রেণু তাঁর দিকে এমন মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, মনে হলো, বাবার শরীর খারাপের জন্যে ওর খুব উদ্বেগ। ও বাবার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। শান্ত অনুযোগের স্বরে বললে, তোমার তো দিনরাত কাজ আর কাজ, একটুও তো বিশ্রাম নাও না।

ওর কথার মধ্যে এমন একটা আন্তরিক সুর ছিল, যেন ওর হৃৎপিণ্ডই কথা বলছে।

পিসেমশাই কোন উত্তর দিলেন না। ওঁর মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছিল, রেণুর উপস্থিতি উনি পছন্দ করছেন না।

এই তো সেদিন ওর মুখের ওপরই বলে বসলেন, তুই এত নোংরা থাকিস কেন বল তো?

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। ও যখন স্বাভাবিক থাকে, তখনো ও উদ্ভট পোশাক পরে থাকে। আসলে ও জামা কাপড় বদলাতেই চায় না। হয়তো দু' তিনটে ব্লাউজ পরে থাকে, এক একটা এক এক রঙের। কখনো মাথায় একগাদা ক্লিপ, কিংবা একরাশ ফিতে।

পিসেমশাই কোন কথা বললেন না দেখে ও এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর প্রায় ভিক্ষে চাওয়ার মত করে বললে, মাথা ধরেছে তোমার? বাবা, আমি একটু টিপে দেবো?

বলে ও হাতটা বাড়িয়েছিল, পিসেমশাইয়ের কপাল ছুঁয়েছিল বোধহয়। পিসেমশাই সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে দিলেন।—না না, দিতে হবে না।

রেণুর সারা মুখ কেমন অপ্রতিভ দেখালো। যেন বুকের মধ্যে গুমরে ওঠা ব্যথাটা অনেক কষ্টে ও সহ্য করছে। সারা মুখ কালো হয়ে গেল ওর।

পিসেমশাই নিজের মনেই যেন বললেন, যা নোংরা হয়ে থাকিস, দুর্গন্ধে কাছে টেকা দায়।

রেণু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমার তখন চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল।

সব সত্যি, সব সত্যি। ও নোংরা। ওর গায়ে দুর্গন্ধ, কারণ ও স্নান করতে চায় না। জোর করে রাঙাপিসীমা স্নান করান। আমার নিজেরও এক-এক সময় অসহ্য ঠেকে। কিন্তু আমার মনে হলো, পিসেমশাই ওকে মাথা টিপতে দিলে ওর ভীষণ আনন্দ হতো। আসলে ও যে সব্বাইকে ভালবাসতে চাইছে। সক্কলের ওপর ওর এখন ভীষণ মায়া। কিন্তু ও বুঝতে পারছে না, এখন আর কেউ ওকে ভালবাসতে পারছে না। ওর ভালবাসা নিতেও পারছে না।

ওকে তাই এখন পুতুল নিয়ে খেলতে দেখে আমার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ভালও লাগলো।

রেণু তখন পুতুলটাকে সাজাচ্ছে। তার সঙ্গে কথা বলছে। আর কি তৃপ্তির হাসি ওর মুখে। দমবন্ধ করা কষ্টের মধ্যে মনে মনে বললাম, তুই আর মানুষকে ভালবাসতে যাস না। আর তখনই আমি ভাবলাম, পাগলদের চেয়ে অসুখী বোধহয় আর কেউ নেই। তারা বাবাকেও ভালবাসতে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেল। অরুণদাকেও ও বোধহয় ভালবাসতে পায়নি।

অবশ্য বিরক্ত হবার মতই কাণ্ডকারখানা করছিল ও। দিব্যি সুস্থ লোকের

মত কথাবার্তা বলে মাঝে মাঝে, কিন্তু চালচলন কেমনধারার যেন। আর চেহারাও বদলে যাচ্ছিল। অমন যে সুন্দর চেহারা, ফর্সা রঙ, এর মধ্যেই একটা কালচে ছাপ পড়ে গেছে। চোখের কোল বসে গিয়ে কালো দুটো রিং হয়ে গেছে। যখন ভুরু কুঁচকে হঠাৎ রেগে গিয়ে তাকায়, দেখলে ভয় হয়। চোখের চারপাশ তখন কুচকুচে কালো হয়ে ওঠে।

সত্যি কথা বলতে কি, এখন আর ওকে লুকোনো সম্ভব নয়। ওর চেহারায় চলনে-বলনে এমন একটা খ্যাপাটে ভাব এসে গেছে যে, যে-কেউ দেখলেই সন্দেহ করবে। তারপর অদ্ভুত সব কান্ড করে। চুলে একরাশ ক্লিপ আঁটে, লাল নীল সবুজ পাঁচ-সাতটা ফিতে জড়ায়। বাণীপিসীমা একদিন জোর করে খুলে দিতে গিয়েছিলেন।

সে প্রায় ধ্বস্তাধস্তি। বাণীপিসীমাও জোর করে খুলে দেবেন, রেণু কিছুতেই খুলতে দেবে না। শেষে রেগে গিয়ে ঠাস করে জোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। দিয়েই উনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, হাতটা ওঁর তখন থরথর করে কাঁপছে।

চোখে জল এসে গিয়েছিল ওঁর। নিজের মনেই যেন বলে উঠলেন, ছি ছি! আমি তোকে মারলাম? আমি তোকে মারলাম? আমি যে কখনো তোর গায়ে হাত তুলিনি রে। তখন বাণীপিসীমার দু'চোখ জলে ভাসছে।

আর রেণু? ওর কানেই যাচ্ছে না ওসব কথা। রেণু তখন ফিতেগুলো সযত্নে পাট করছে, আর মুখে বিড়বিড় করছে। ফিতেগুলো ওর চোখে তখন মূল্যবান কোন সামগ্রী।

বেশ বুঝতে পারছিলাম, বাণীপিসীমার বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা দ্বন্দ্ব চলছে। একদিকে মায়ের মন, অসহ্য দুঃখ কষ্ট। আরেকদিকে ওর বিরক্তিকর সাজপোশাক, নোংরামি।

সেটা বাণীপিসীমার নিজের যত না খারাপ লাগতো, তার চেয়ে বেশী লাগতো পিসেমশাই ওকে সহ্য করতে পারছিলেন না বলে। আমার অনেকসময় সন্দেহ হয়েছে, রেণুর ওপর ওঁর রাগটা আসলে পিসেমশাইয়ের ওপর ওঁর অসহায় ক্ষোভ।

তাই রেণু যখন ঘুমিয়ে থাকতো, তখনই বরং বাড়িটায় শান্তি ফিরে আসতো। সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করতো।

একজন কম্পাউন্ডার এসে ইনজেকসন দিয়ে যেত মাঝে মাঝে। আর রাত্রে কি একটা ওষুধ খাওয়াতে হতো। বোধহয় ঘুমের ওষুধ।

ও কিছুতেই খেতে চাইতো না। আমি একদিন চেষ্টা করেছিলাম, অনেক বুঝিয়েছিলাম। পারিনি। অরুণদা যেদিন আসতেন, অরুণদাকে দেখলেই ও রেগে যেত। রাগে ফুঁসতো। ভয় পেত একমাত্র পিসেমশাইকে।

রুক্ষ কঠিন গলায় পিসেমশাই এসে বলতেন, ওষুধ খেয়ে নে। বলে টেবিলে রাখা পিলটা তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। আর ভীতু ভীতু মুখ করে রেণু ওষুধটা খেয়ে নিতো, একটাও কথা বলতে সাহস পেত না।

পিসেমশাই আবার তর্জনী দেখিয়ে আদেশ করতেন, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বি যা।

ও চলে যেত, বাণীপিসীমা সঙ্গে গিয়ে ওকে শুইয়ে দিয়ে আসতেন।

সেদিন বাণীপিসীমার জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, গায়ে হাতে ব্যথা। উঠতে পারছিলেন না।

আমি বললাম, আপনাকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

বাণীপিসীমা শুনলেন না। দেয়াল ধরে ধরে গেলেন, আমি পিছনে পিছনে। দেখলাম, রেণু শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। আর বাণীপিসীমা তখন কি স্নেহের চোখে ওর দিকে তাকালেন, পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে কত মমতার হাতে ওর চারপাশে মশারি গ‍ুঁজে দিলেন।

ও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু ক'দিন থেকে আমার যে কেন ঘুম হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। অনেক রাত পর্যন্ত আবোল-তাবোল কত কি যে ভাবি তার ইয়ত্তা নেই। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। এক একদিন ইচ্ছে হয়, রেণুর ঘুমের ওষুধের শিশি থেকে একটা ট্যাবলেট নিয়ে খেয়ে দেখি। তা হলে হয়তো ঘুম হবে।

ঘুম না এলেই নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঠিক করে ফেলি, সুদীপদাকে সব কথা জানিয়ে একটা চিঠি দেব। ও'রা তো কেউ তাঁকে জানাবেন না, আমি যদি লিখি? ও'দের ধারণা, ছেলেটাকে মিথ্যে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। কিন্তু সুদীপদাকে রেণু এত ভালবাসে, সুদীপদা যদি একবার ফিরে আসেন, তা হলে তাঁকে দেখে রেণু তো সুস্থ হয়েও উঠতে পারে।

সুদীপদা অবশ্য ফিরে এলে কষ্ট পাবেন। ঝুমার বিয়ে তো তখন হয়ে যাবে। আর ঝুমার বিয়ে হয়ে গেছে জানলে নিশ্চয় মনে দুঃখ পাবেন। আচ্ছা, সত্যি কি তাই? ঝুমার কথা তখন হয়তো ভাবতেই পারবেন না। রেণুকে দেখে তো বরং আরো বেশী শক্ পাবেন। নাকি উনিও বিরক্ত হবেন পিসেমশাইয়ের মত। আচ্ছা, কোনটা বেশি আঘাত দেবে ও'কে। ঝুমার বিয়ে, না রেণু? প্রেম বলতে ঠিক কি বোঝায় আমি যে জানিই না। আমাকে তো কেউ সে-ভাবে ভালবাসেনি।

—প্রেম ব্যাপারটা ঠিক কি রকম রে? আমি একদিন শান্তনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

পূর্ণ হেসে উঠে বললে, একটা পে'য়াজ। খোসা ছাড়াচ্ছিস, খোসা ছাড়াচ্ছিস, তারপর দেখলি আর খোসা নেই। তখন সেটা মুখে ফেলে চিবোলেই বাপ্‌স রে কি ঝাঁঝ, চোখে জল, কান ঝাঁ ঝাঁ।

শান্তনু হাসতে হাসতে বলেছিল, বুঝবি না। মনে হবে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকি, সব সময় তার কথা ভাবতে ইচ্ছে করবে, সে আমার কথা ভাবছে শুনতে ভাল লাগবে।

আমার বিশ্বাস হয়নি। আমার তো সবসময় রেণুর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করতো, সবসময় তার কথা ভাবতাম। এখনো তো ভাবছি। তার জন্যে কষ্ট পাচ্ছি।

একবার কলেজের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম মাসখানেক পরে। রেণু হাসতে হাসতে বললে, বাব্বা বাঁচালে, কি ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল বাড়িটা।

আমি বললাম, আহা রে, আমার কথা যেন তোর মনে ছিল।

রেণু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো, কি যেন খ‍ুঁজলো। তারপর গাঢ় গলায় বললে, আমি সবসময় তোমার কথা ভেবেছি।

সেজন্যেই তো মনে হচ্ছে শান্তনু জানে না। কিংবা বোঝে না। প্রেম নিশ্চয়ই অন্য কিছু।

আচ্ছা, সুদীপদার সঙ্গে কি ঝুমার প্রেম ছিল? গভীর প্রেম? একটু একটু করে রেণুর কাছে যা শুনেছিলাম, তাতে তো আমার তাই ধারণা হয়েছিল।

রেণু অবশ্য কোনদিনই গল্প করে বলেনি। ঝুমার কথা ও বলতে চাইতো না। কোন প্রসঙ্গে হঠাৎ এসে গেলে, রেগে গিয়ে ও এমন সব গালাগালি দিয়ে বসতো, আমি হেসে ফেলতাম। ও তখন আরো রেগে যেত। ঝুমা কখনো 'রাক্ষুসী', কখনো 'বিচ্ছিরি স্বভাবের মেয়ে,' কখনো 'ওর নাম মুখে আনতেও ঘেন্না হয়।' অথচ ব্যাপারটা কি আমি বুঝতে পারতাম না। অথচ টুকটাক কথা যা বলতো, সেগুলো জুড়ে জুড়ে আমি গল্পটা তৈরী করে নিয়েছিলাম। এটুকু বুঝতাম, ওদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ছিল। হয়তো এখনো আছে। হয়তো সুদীপদা জানেই না ঝুমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। জানলেও কিছু করার নেই।

আর ঝুমা? ও বেচারি আর কি করবে। ঐ দাম্ভিক বাপটার কাছে ওসব হৃদয়-টিদয়ের কোন দামই নেই। শুনলেই হয়তো আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে। কথা বলার সময় লোকটা যেন নিঃশ্বাস চেপে স্রেফ গলা থেকেই শব্দগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়, মুখের ভেতর দিয়ে উচ্চারণ করলে যে লালিত্য থাকবে, উনি যে একজন কেউকেটা বোঝানো যাবে না। হয়তো সেভাবেই হেঁড়ে গলায় বলবেন, প্রেমফ্রেম ভুলে যাও, বাঁ হাতের তর্জনী তুলে হুকুম দেবেন, ঝুমা, পিঁড়িতে বসবে যাও।

ভদ্রলোকের স্ত্রী কিন্তু ভালমানুষ টাইপের। দেখে অন্তত তাই মনে হয়। উনি অত স্বামীর পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নন। দেখেছি, ফেরিওয়ালা ডেকে আম কিংবা কলা কেনার জন্যে নীচে নেমে আসেন, দরদস্তুর করেন।

ঝুমাকে সকালে একবার দেখেছি। তখন ওকে তেমন দুঃখী-দুঃখী মনে হয়নি। সেজন্যে আমার একটু খারাপই লেগেছিল। ওটা ওর ভান কিনা বুঝতে পারিনি। হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্যে রেণুকে দেখাতে চায় সুদীপদার জন্যে ওর মনে কোন দুর্বলতা নেই।

কিন্তু তাই বা কি করে বলি। ওরা তো জেনে গেছে। আমি ঝুমার বাবার সামনে যতই ভাল অভিনয় করে থাকি না কেন, উনি আমার কথা কখনোই বিশ্বাস করবেন না। মিথ্যে কথাটা বলার জন্যে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কিংবা ভদ্রলোক একদিন না একদিন তো জানতে পারবেনই। তখন আমার সম্পর্কে ও'র ধারণাটা খুব খারাপ হবে। তাতে অবশ্য যায়-আসে না। আমি তো আর ও'র কাছে সার্টিফিকেট নিতে যাচ্ছি না। পিসেমশাইয়ের অমন গণ্ডা গণ্ডা গেজেটেড অফিসার জানা আছে। কিন্তু একটা লোক যদি আমাকে মিথ্যেবাদী বলে জানে, তার সামনে দিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত করতেও অস্বস্তি।

কিন্তু অস্বস্তি তো বাণীপিসীমার বেশী।

ডেকরেটরের লোকরা বাঁশগুলো ছাদে তুলছিল। ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে দু' তিনটে লোক লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে দিচ্ছিল নীচে। নীচের লোকরা বাঁশের গলায় ফাঁস বেঁধে সেটাকে খাড়া করছিল। ওপরের ওরা টেনে টেনে তুলে নিচ্ছিল।

বাণীপিসীমা একবার দেখে গেলেন। উনি এখন আর একেবারেই বারান্দার দিকে আসতে চান না। পাছে ঝুমার মা ডেকে বসেন, কিছু জিজ্ঞেস করেন। মিত্তিরগিন্নীর দিকের জানলাটাও বন্ধ হয়ে গেছে। রেণুকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে গিয়ে নিজেই বন্দী হয়ে গেছেন। এখন ও'র কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই।

বারান্দার রেলিঙে হাত রাখতে গিয়ে হাতে কি লাগলো, চ্যাটচেটে। আমি হাতটা ধুয়ে আসার জন্যে ভিতরের দিকে গেলাম।

বাণীপিসীমা আলনায় কাপড় গুছোচ্ছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন,

টুনটুন কোথায় শুনে এসেছে, ও বাড়ির ঝুমার বিয়ে। এই এক ফ্যাসাদ।

আমি চুপচাপ হাতে সাবান দিতে লাগলাম।

উনি আবার বললেন, মা-মেয়ে নিশ্চয় নেমন্তন্ন করতে আসবে।

আমি বলতে পারলাম না, ঝুমার বাবা ইতিমধ্যেই শুনেছেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। ও'র দুর্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়ে লাভ কি।

বাণীপিসীমা আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি, কেউ বাড়িতে আসবে খবর পেলেই উনি কি-রকম অস্বস্তি বোধ করেন। কেউ এলে ও'র সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যায়। কারণ ও'র ব্যবহার তখন বাইরে থেকে খুবই খারাপ লাগে। মনে হয়, যেন গলাধাক্কা দিয়ে উনি তাকে বের করে দিচ্ছেন। আসলে উনি সবাইকে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে নিজেই আউট-সাইডার হয়ে গেছেন। বাইরের লোক।

সেজন্যেই তো চিঠি লিখে বাবাকে আসতে নিষেধ করলাম। বাবা লিখেছিল, একবার দেখা করতে আসবে। কিন্তু এবার এলে যে অন্যরকম ব্যবহার পাবে, আমি জেনে গিয়েছি। তখন বাবা হয়তো অপমানিত বোধ করবে। তার চেয়ে বেশী অপমানিত বোধ করবো আমি নিজে। লিখে দিয়েছি, এসো না। বাবার কাছেও একটা মিথ্যে অজুহাত দিয়েছি। লিখেছি, ছুটিতে যখন বাড়ি যাবো তখন সব বলবো। আমারই তো বাবা-মা, তাদের বললে পিসীমাদের কোন ক্ষতি হতে পারে না। আর রেণু যদি ততদিনে ভাল হয়ে যায়! আহা, তাই যেন হয়।

কিন্তু আমার মন বলছিল, ওরা কেউ ওকে ভাল হতে দেবে না।

একদিন পিসেমশাইকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি, রেণুকে একবারটি তাঁর মাথা টিপে দিতে দেননি বলে। বিরক্তি চেপে রেখে উনি তো কয়েকটা মিনিট রেণুকে সহ্য করতেও পারতেন। চোখ বুজে থাকলেই তো ও'র উদ্ভট কিংবা হাস্যকর বেশবাস দেখতে পেতেন না। 'তোর গায়ে যা দুর্গন্ধ', যেন কোলকাতার রাস্তায় ও'কে কখনো দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয় না। আমাদের এই গলির বাঁকটাই তো পার হওয়া দুঃসহ।

সেদিন ভেবেছিলাম, ভাগ্যিস বাণীপিসীমা দেখেননি, রেণুকে পিসেমশাই কিভাবে তাড়িয়ে দিলেন। দেখলে কষ্ট পেতেন। আমি তো দেখেছি, রেণুর ওপর ও'র কত মায়া, রেণুর জন্য ও'র কত কষ্ট।

বুঝতে অসুবিধে হয়নি, রেণুর জন্যেই উনি সত্যনারায়ণ পুজো দিতে চাইছেন।

আগের দিনই বাণীপিসীমা আমাকে বলে রেখেছিলেন।—কাল বাড়িতে সত্যনারাণ পুজো দেবো, লক্ষ্মী ছেলে আমার, খুব সকাল সকাল পুজোর বাজারটা করে দিবি বাবা।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলাম। তারপর মার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলেছিলাম, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে পিসীমা। মা যখনই সত্যনারায়ণ দিত, আমাকেই পুজোর বাজার করতে হতো। বাবা করলে মার পছন্দ হতো না।

বাণীপিসীমা খুব হাসলেন।

আমি খুব সকাল সকাল বাজার করে দিলাম, বাণীপিসীমা যা-যা বলে দিয়েছিলেন। আটা, খেজুর, বাদাম, কলা, নাসপাতি, আঙুর, পান-সুপারি।

পুরুত বামুনকে খবর দেওয়াই ছিল। তিনি তখনো আসেননি।

ফিরে এসে দেখলাম, বাণীপিসীমা স্নান করে পুজোর ঘর ধুয়েটুয়ে রেখে-

ছেন। তিনি ঠাকুরঘরে পুজোর বঁটি পেতে ফল কাটতে বসলেন। একটা পিতলের গামলায় আটা আর চিনি ঢেলে রাখলেন। একটা বড় জামবাটিতে দুধ।

বাণীপিসীমা কিছু বলেননি, তবু বুঝতে পারলাম, সত্যনারায়ণ আসলে রেণুর জন্যে।

রেণুকে সকাল থেকেই খুব স্বাভাবিক দেখছি। অস্বাভাবিক শুধু পোশাক-পরিচ্ছদে। এই গরমেও একটা ফুলহাতা গরম কাপড়ের ব্লাউজ পরেছে। বাণী-পিসীমা বলে বলে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এত গরমেও গরমের জামা পরবে, কখনো ফুলহাতা ব্লাউজ। একদিন তো ওর পায়ের কাছে চোখ যেতে হেসে ফেলে-ছিলাম—দু-দুটো সায়া। একটা কালো, একটা সাদা।

বাণীপিসীমা ফল কাটছিলেন, আমি দেখছিলাম।

রেণু এসে দাঁড়ালো।—আজ সত্যনারায়ণ দেবে, না মা?

বাণীপিসীমা হাসলেন, মেয়ের মুখের দিকে সস্নেহে তাকালেন। বললেন, হ্যাঁ রে।

তারপর বললেন, তুই বোস ওখানে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন।

রেণু তবু দাঁড়িয়ে রইলো। ওর মুখ হাসি-হাসি।

বাণীপিসীমা একটা লাল পাড় গরদের শাড়ী পরেছিলেন, যেটা পরে উনি আমার সঙ্গে মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলেন।

রেণুর মুখ কেন হাসি-হাসি বুঝতে পারলাম। ও বাণীপিসীমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে উঠলো, মা, তোমাকে না ঠিক ঠাকুর-ঠাকুর লাগছে। মা দুগ্‌গার মত।

বাণীপিসীমা শব্দ করে হেসে উঠলেন। রেণু আজ এতখানি প্রকৃতিস্থ বলেই হয়তো উনি এত খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, ঠাকুর-ঠাকুর তো লাগবেই, আমি যে তোর মা। অন্য কেউ দেখলে, ভাববে বাড়ির ঝি।

—ইস্। তোমাকে যে দেখবে সেই ঠাকুর বলবে। রেণু বললে।

তারপর মৃদু হেসে বললে, তোমার কোলে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, এমন মা-মা লাগছে।

আমার সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল মা-মেয়ের কথা শুনে। কতদিন যেন রেণুকে এভাবে দেখিনি।

ঠিক তখনই রেণু বলে বসলো, এতসব পুজোর জোগাড়, তোমার কষ্ট হবে মা। আমি একটু করে দিই।

বাণীপিসীমা হেসে বললেন, না না, তুই ওখানে বস তো।

রেণু শুনলো না। ঘরের মধ্যে এক পা বাড়িয়ে বললো, বাঃ রে, তোমার কষ্ট হবে, আমি বরং সিন্নিটা গুলে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে যেন আঁৎকে উঠলেন বাণীপিসীমা। বললেন, না না, ও আমি করে নেব। তুই চুপ করে বোস।

রেণু করুণ মুখ করে বললে, তুমি আমাকে কিছু করতে দিচ্ছো না। সিন্নিটা দিই না গুলে।

এবার বাণীপিসীমার গলার স্বর কেমন রুক্ষ হয়ে উঠলো। বললেন, তুই সিন্নিতে হাত দিলে কেউ খাবে না, যা বড় বড় নখ তোর হাতে।

রেণুর মুখ মুহূর্তের মধ্যে কেমন রক্তহীন হয়ে গেল। ওকে বড় অপ্রতিভ দেখালো। বিবর্ণ মুখে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও চলে গেল।

৯

সামনের বাড়িতে সকাল থেকেই সানাই বাজতে শুরু করেছে। তখনো ছাদের প্যাণ্ডেল বাঁধা শেষ হয়নি। শুধু বাঁশ বেঁধে একটা কাঠামো খাড়া করেছে, আর ত্রিপল নিয়ে টানাটানি করছে ডেকরেটারের লোকেরা। ঝুমাদের বাড়ির বুকে স্তূপীকৃত হয়ে আছে ইলেকট্রিকের তার, টুনি বালব, খানকয়েক সিলিং ফ্যান। ত্রিপল টাঙানো হয়ে গেলেই ওগুলো লাগাতে শুরু করবে। ইলেকট্রিকের মিস্ত্রিরা ত্রিপলওয়ালাদের তাড়া দিচ্ছে। ভিতরের দিকে কোথাও ভিয়েন বসেছে, রান্নার গন্ধ আসছে।

সানাই বাজছে দরজার সামনের রোশন-চৌকিতে। ওটা এখনো শালু দিয়ে ভাল করে মোড়া হয়নি।

ঝুমার বিয়ে এ-কথা শোনার পর থেকে আমার কেমন ভয়-ভয় করছিল। রেণুর ওপর এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। ঝুমা তো ওর কাছে রাক্ষুসী। যে দাদাকে নিয়ে ওর এত গর্ব, তার সঙ্গে ঝুমার সম্পর্কটা ও বোধহয় কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু সে-জন্যেই কি ও খুব বড় কোন আঘাত পেয়েছিল?

আমি একদিন বলেছিলাম, তুই ওকে এত রাক্ষুসী রাক্ষুসী বলিস কেন?

ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নীচু করেছিল। অনেক চেষ্টা করে কি যেন বলতে চেয়েছিল।—তুমি জানো না। ও ভীষণ খারাপ, ভীষণ খারাপ।

আমি হেসে উঠেছিলাম।

ও রেগে গিয়ে প্রাণপণে কয়েকটা কথা ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল। বাড়িতে কেউ নেই, ও দাদার কাছে এসেছিল কেন? কেন এসেছিল? ও তখন রাগে ফেটে পড়ছে।

মুখে চোখে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে ও বললে, ইস, সেদিন যদি হঠাৎ না ফিরে আসতাম। আমার নিজের ওপরই ঘেন্না হয়ে গেছে সেদিন থেকে। শেষের দিকে ওর গলা কেঁপে গিয়েছিল।

বলতে বলতে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তাই একবার আমার মনে হলো এই চাপা ঘৃণাটাই ওকে এ-রকম করে দেয় নি তো? ঘৃণা কার প্রতি? ঝুমা, না সুদীপদা? সুদীপদার জন্যে এত গর্ব, সে-জন্যেই বেশি আঘাত পেয়েছিল কি!

আমি আর কোনদিন ওর কাছে ঐ প্রসঙ্গ তুলিনি।

আজ ঝুমার বিয়ে। সানাই বাজছে। আজ তো ওর খুশি হওয়ার কথা। দাদা ঝুমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে চিরকালের জন্যে।

কিন্তু ওকে তেমন খুশি-খুশি দেখাচ্ছে না। হয়তো নিজের ভয়েই ও আজ গুটিয়ে আছে।

পিসেমশাই কাল বলছিলেন, কাল তো ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার দিন।

অরুণদা বসেছিলেন। মাথা নীচু করলেন।—আপনার মেয়ে বলছিল, ওষুধের ঝিমুনির জন্যে বড় কষ্ট হয়। অরুণদা এমন ভাবে কথাগুলো বললেন, মনে হলো, উনি নিজেও যেন কষ্ট পাচ্ছেন।

পিসেমশাই চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বললেন, অপারেশন করলে তো এর চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট। যে রোগের যা চিকিৎসা।

পিসেমশাই একবার অপারেশন করিয়েছিলেন। কথায় কথায় সেটা শুনিয়ে দেন। যেন কত বড় একটা বীরত্ব। কিন্তু কোনটায় ঢের বেশি কষ্ট তা তো আমার জানা নেই।

আমি দেখছি, সকাল থেকেই রেণু মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকছে। সেটা ঐ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে বলে, না অন্য কোন কারণে! ঝুমার বিয়ের জন্যে ওর কি মন খারাপ হয়ে যেতে পারে!

ওর তো তখন বয়স কম। সেই রাগ কিংবা ঘৃণা বোধহয় অভ্যেসের মত হয়ে গেছে। অথচ এখন হয়তো ও মনে মনে ওদের ক্ষমা করে। হয়তো দাদার জন্যে দুঃখ হয়।

কাল ও'রা নেমন্তন্ন করতে এলেন, ঝুমাও এল মায়ের সঙ্গে। কি ভাগ্য, তখন রেণু একটুও অস্বাভাবিক ছিল না। বাণীপিসীমা ওর হাতে পায়ে ধরে আগেই ভদ্র করে রেখেছিলেন, পোশাক-আশাক। ঝুমার মায়ের চোখে প্রথমটা কৌতূহল এবং সন্দেহ ছিল। ঝুমারও। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ও'দের সন্দেহ চলে গেল।

—রেণু, তুমি নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু।

রেণু ঘাড় নেড়েছিল।

ঝুমার বাবা হাতে একরাশ হলুদ-ছোপ নেমন্তন্নর চিঠি নিয়ে দেশের অবস্থা সম্পর্কে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বেশ চিৎকার করে করে। ও'র ঐ গলার স্বরের জন্যে বাবুল আর টুনটুন ঠাট্টা করে বলে, লোকটার পেটের মধ্যে নির্ঘাৎ একটা মাইক্রোফোন ফিট করা আছে।

ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই যে অনিমেষ, কোন এক্সকিউজ শুনবো না, যাবে কিন্তু।

বলেই পিসেমশাইকে বললেন, এ ব্রিলিয়ান্ট বয়।

না, আমি না।

উনি তখন আমার কথা ভুলেই গেছেন। নিজের হবু জামাইয়ের প্রশস্তি করছিলেন।—লীডস থেকে এসেই গাভমেন্টে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঝুমা আর ঝুমার মা নেমে আসতেই চলে গেলেন। বললেন, চলি, পাড়ার সবই বাকি।

বাণীপিসীমা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, বাঁচলাম। আমার যা ভয় হচ্ছিল। ওরা কিন্তু লোক সত্যি ভাল।

আমার হাসি পেল। কিছু বলতে পারলাম না। আমি জানি, ওরা যদি সন্দেহ করতো, রেণু সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতো, বাণীপিসীমা বলতেন, এমন বিচ্ছিরি স্বভাব ওদের, অভদ্র, অভদ্র।

এর মধ্যে যে ঝুমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, রেণুর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে কথা তো আমি বলি নি। বলতে পারি নি। পিসেমশাইয়ের মুখ দেখেও বোঝা গেল, সে-কথা উনি আর তোলেন নি।

কিন্তু এখনো একটা সমস্যা রয়ে গেল। রেণু তো ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে বিয়ে বাড়িতে যেতে পারবে না। ও'দেরও যাবার মন নেই। তবু যেতে হবে।

শুধু টুনটুনের খুব ফুর্তি।

ও তো সব সময়েই ফ্রক, ম্যাক্সি কিংবা বেলবটম পরে। এক-আধদিন শাড়ি

পরে, কিন্তু গুছিয়ে পরতে পারে না। ভাল করে হাঁটাচলা করতে পারে না। অথচ ওর শাড়ি পরার খুব সখ।

ও বললে, মা, আমাকে একটা ভাল শাড়ি দেবে কিন্তু।

বাণীপিসীমা ধমক দিলেন, শাড়ি দিই আর তুমি ছিঁড়ে নিয়ে এসো।

রেণু টুনটুনের ঘাড়ে হাত রেখে ওকে আদরে জড়িয়ে ধরলো। টুনটুন অস্বস্তি বোধ করলো। ও রেণুর কাছেই আসতে চায় না।

রেণু বুঝতেও পারলো না, ও খুব আদর করে বললে, আমার বেনারসীখানা দেবো, পরবি তুই। কি সুন্দর যে তোকে লাগবে!

বেনারসী পরতে পাবে শুনে টুনটুনের মুখ উজ্জ্বল হলো।—সত্যি দিবি তুই? এনেছিস?

রেণু ছেলেমানুষের মত ওকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললে, দেবো, দেবো। এনেছি। আমি নিজের হাতে তোকে সাজিয়ে দেবো আজ, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো আজ, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো দেখিস...

আর সঙ্গে সঙ্গে টুনটুন ওকে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দিলো। মাগো, তুই দিবি সাজিয়ে, তার চেয়ে আমার বেনারসী চাই না। তুই যা নিজে সেজে থাকিস, দেখলেও ঘেন্না।

সঙ্গে সঙ্গে রেণুর মুখ কালো হয়ে গেল। বোঝা গেল ও খুব অপমানিত বোধ করছে। ওর চোখ ঠেলে জল এসে যাচ্ছে।

রেণু কিন্তু কিন্তু করে বললে, না রে সাজাবো না। একটু থেমে করুণ সুরে উপযাচক হয়ে বললে, সাজাবো না, তুই তা হলে আমার বেনারসীটা নিবি তো? আমি বলছি দেখিস, তোকে খুব সুন্দর মানাবে।

আমি হয়তো কেঁদে ফেলতাম। আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। আমি সরে এলাম সেখান থেকে।

শুনতে পেলাম, বাণীপিসীমা বেশ আদরের গলায় বলছেন, আজ তো বেশ সভ্যভব্য লাগছে তোকে, এমনি থাকলেই তো পারিস।

আমারও বলে উঠতে ইচ্ছে করলো, রেণু তুই এমনি থাকলেই তো পারিস। তা হলে তুই সব্বাইকে ভালবাসতে পাবি। তোকে কেউ হয়তো ভালবাসবে না, কিন্তু তোর ভালবাসা নিতে পারবে।

ভালবাসা নিতে পারাও তো অত সহজ নয় আমি জানি।

একটা ক্ষীণ সন্দেহ তো আমার মনের মধ্যে রয়েই গেছে। তা না হলে আমি মাঝে মাঝে এত ভয় পাই কেন! রেণুর ওপর যখন সবাই বিরক্ত হয়ে উঠছে একটু একটু করে, তখন আমার বুকের মধ্যে কেন এমন একটা ব্যথা গুমরে ওঠে। কেন দিনরাত ও আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। কেন ঘুমোতে পারছি না।

আজ ক'দিন ধরেই আমার ঘুম আসছে না। ক্লান্তিতে যদি বা তন্দ্রার মত আসে, হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আর সারা রাত ঘুম আসতে চায় না। শরীরের মধ্যে মাথার মধ্যে কি যে হয়, উঠে কলঘরে গিয়ে ঘাড়ে কপালে চোখেমুখে জল দিয়ে আসি।

আসলে আমাকে একটা রোগ পেয়ে বসেছে। সখের গোয়েন্দার মত আমি যেন একটা রহস্যের কিনারা করতে চাইছি। অথচ আমার তো ভাববার কথা নয়, আমার ওপর সে ভারও কেউ দেয়নি। ও'রা তো আমার সঙ্গে পরামর্শও করেন না, নিজেরাই ডাক্তার দেখাচ্ছেন, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাচ্ছেন। তাঁরই কাজ এ-সব খুঁজে বের করার। কিংবা, কি জানি, এসবের চিকিৎসা ঠিক কি ধরনের,

আমার তো ধারণাও নেই। তবু আমি জানতে চাইছি কেন? গল্প-উপন্যাসে তো কত কি পড়েছি। কিন্তু সে-সব তো নিছক বানানো গল্প। সেখানে পরিষ্কার বোঝা যায় কেন পাগল হয়েছিল, শেষের দিকে এমন একটা ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে সে আরোগ্য লাভ করে। যেন পাগল হওয়ার ব্যাপারটা এতই সরল।

,বই-পড়া বিদ্যে নিয়ে এক একজন এমন ভাবে বলে, যেন বিজ্ঞান সব জেনে গেছে।

আমি ও-সব কিছুই জানি না। আমি শুধু চোখের সামনে একজনকে দিনের পর দিন দেখছি। কি ভাবে সে বদলে যাচ্ছে। কি ভাবে তার চেহারা বদলে যাচ্ছে। আমি লক্ষ করছি, রেণু দ্রুত স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠছে, ওকে দেখলেই মনে হয় ওর শরীরে প্রচন্ড শক্তি। এক এক সময় বেশবাসে ও অসতর্ক থাকে, তখন চোখ সরিয়ে নিতে হয়।

অরুণদার আশঙ্কা ও যে-কোন মুহূর্তে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে, ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও সে-রকম ভয় হয়েছে। আমার ক্ষীণ সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, তখন রেণু কি বলে বসবে কে জানে। উন্মাদের প্রলাপ বলে তখন নিশ্চয়ই কেউ সেটা উড়িয়ে দেবে না। হয়তো আমার দিকেই আঙুল দেখিয়ে সবাই বলে বসবে, এই ছেলেটাই অপরাধী।

কিন্তু আমি তো কোন আঘাত দিইনি। বরং ভয় ছিল কখন আঘাত দিয়ে ফেলবো।

অরুণদা বলেছিলেন, অনিমেষ, তুমি ভেবে দ্যাখো তো, ও কি কখনো কোন আঘাত পেয়েছিল, এমন কিছু কি কখনো ঘটেছিল, যেটা ওর মনের মধ্যে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছে।

আমি তখন ভিতরে ভিতরে রেগে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল অরুণদা আমাকেই সন্দেহ করছেন। একটা ক্ষীণ সন্দেহ আছে বলেই তো আমি ভেবেছিলাম, অরুণদা আমার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করছেন।

কিন্তু বাঃ, আঘাত তো ও পেয়েছিলই। প্রচন্ড আঘাত। সুদীপদার কাছ থেকে।

রেণুর বিয়ের দিনটা আমার মনে পড়লো।

এ বিয়েতে ওর একটুও সম্মতি ছিল না। ও কেমন মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রেণু থাকবে না, রেণু চলে যাবে, এ-কথা ভাবতেও আমার ভাল লাগতো না।

ও তো নিজের ঘরটিতে থাকতো, নিজের ঘরেই পড়াশুনো করতো। আমি আমার নিজের পড়াশুনা নিয়ে, কিংবা ছাদের ঘরে টুনটুন আর বাবুলের পড়ার টেবিলে। কিন্তু রেণু বাড়িতে আছে, এ-ঘরটার মধ্যেই, তাই কি এক ধরনের তৃপ্তি ছিল। ওর গলার স্বর শুনতে পেলেই বুঝতাম, ও আছে।

ও কখনো কখনো বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেত। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে আসার পর খুব খারাপ লাগতো। মনে হতো সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা।

ও একবার মামাবাড়ি গিয়ে দিনকয়েক কাটিয়ে এসেছিল। কি দুঃসহ কষ্ট গেছে সেই ক'দিন। ভীষণ একা-একা লেগেছিল আমার।

কিন্তু সে-কথা কোনদিন ওকে বলতে পারিনি। বললে, ও হয়তো হেসে উঠে বলতো, তুমি কি আমার প্রেমে পড়ে গেলে নাকি! কিংবা, কি জানি, হয়তো আমার দিকে ক্রুদ্ধ চোখ তুলে বলে বসতো, এরকম কথা তুমি কোনদিন আমাকে

বলো না।

যেন কাউকে ভালবেসে না ফেললে তার অভাবে একা-একা লাগতে পারে না। কি জানি, আমি নিজেকেই ভুল বুঝিয়ে এসেছি কিনা।

বিয়ের আগে ও যখন মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকছিল, আমার নিজেরই তো কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

ও একদিন হঠাৎ এসে হাজির হলো আমার ঘরে। মনে হলো, ও কি যেন বলতে চায়। টেবিলের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে রেণু হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো আমার দিকে। চোখে চোখ রেখে তাকালো। ওর ঠোঁট কাঁপছিল, আমার মনে হলো ওর চোখে কান্না চাপা আছে।

হঠাৎ বললে, তুমি বলো না মাকে, রেণু এখন বিয়ে করবে না।

আমি হেসে উঠে বললাম, কেন, পাত্র তো শুনেছি খুব ভাল।

রেণু আমার চোখের দিকে তাকালো। কি যেন জানতে চাইলো।

মুহূর্তে অদ্ভুত একটা আনন্দে আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। আমার মনে হলো আমি কি যেন জানতে পেরেছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সেই চিঠিখানার কথা। আরেকটু হলেই আমি হয়তো ভুল করে বসতাম।

আমি তাই হেসে উঠে বললাম, কার জন্যে অপেক্ষা করবি? কে সেই ছেলেটি, যাকে চিঠি লিখেছিলি?

—চিঠি? ও অবাক হলো। তারপর কি মনে পড়তেই ও আমার দিকে কেমন ভাবে যেন তাকালো। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা ঘৃণা দুলছিল।

ও ধীরে ধীরে বললে, কার জন্যে আর অপেক্ষা করবো? দাদার জন্যে। দাদা কত দুঃখ পাবে বলো তো!

কথাটা বাণীপিসীমার কাছেও বলেছিল।

বলেছিল, দাদা ফিরে আসুক, তারপর। দাদা থাকবে না আমার বিয়েতে, আমি ভাবতেই পারি না।

শেষ অবধি ও বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। বাণীপিসীমার নিজেরই মন খারাপ, সুদীপদার অনুপস্থিতিতে রেণুর বিয়ে ওঁরও ভাল লাগছিল না।

পিসেমশাই ওদের হাবভাব দেখে একটু বিচলিত বোধ করছিলেন ক'দিন থেকেই। একবার বলেছিলেন, সুদীপের আসা মানে তো অনেকগুলো টাকা। একবার বলেছিলেন, ছুটি পাবে কিনা কে জানে।

শেষে হঠাৎ একদিন বললেন, সুদীপকে লিখেই দিলাম।

তারপর যেদিন সুদীপদার চিঠি এলো, রেণুর কি আনন্দ। দাদা আসবে, দাদা আসবে। যেন ওর কাছে পৃথিবীতে এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই। 'দেখলে তো মা, আমার বিয়েতে দাদা কখনো না এসে পারে?'

আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। সুদীপদাকে কখনো দেখিনি, শুধু রেণুর কাছে তাঁর কথা শুনে শুনে মনে হচ্ছিল কতদিনের চেনা, এবার তাঁকে দেখতে পাবো। সুদীপদা নিশ্চয় আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবেন, এ আবার কে? তা অবশ্য নয়, রেণুর চিঠিতে আমার কথা কিছু না কিছু থাকতোই, ও তো দেখিয়েছেও আমাকে সে চিঠি।

বিয়ের দু' একদিন আগেই সুদীপদার এসে পড়ার কথা। রেণুর মুখে তখন কেবল দাদা আর দাদা। সব সময় যেন আগ্রহে কান পেতে আছে। কখন ডাক-পিয়নের চিঠি আসে। কোন প্লেনে আসবে তার খবর নিয়ে।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিনটাও এসে গেল। রেণুর তখন সব আনন্দ উবে গেছে। কি এক গভীর দুঃখে ও যেন ভেঙে পড়েছে। মুহূর্তে মুহূর্তে কেবলই দাদার কথা জিজ্ঞেস করছে। ওর চোখ ভিজে এলো, 'দ্যাখো মা, দাদা এখনো এলো না, দাদা কি আসবে না?'

আমার বেশ মনে আছে, বিয়ের পিঁড়িতে বসেও ও টুনটুনকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল, এই, দাদা আসেনি?

রেণুর মাসীমা ওর কানের কাছে গিয়ে বললেন, বিয়ের পিঁড়িতে বসে কাঁদতে নেই।

ও মুখ নীচু করে ছিল, ওর দু' চোখ তখন কান্নায় ভরা।

আমার খুব কষ্ট হয়েছিল ওর জন্যে। সুদীপদার ওপর রাগ হয়েছিল। তখন তো জানতাম না, সুদীপদা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কি একটা গোলমালে আসতে পারেন নি।

পিসেমশাই বলেছিলেন, তার আর দোষ কি। এ তো এমন নয় যে টিকিট কেটে ভিড়ের মধ্যে ট্রেনে উঠে পড়লেই হলো।

সুদীপদা দুঃখ করে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন রেণুকে। কিন্তু সে-চিঠি তো এসেছিল বিয়ের ক'দিন পরে।

আজ এতদিন বাদে বিয়ের দিনের রেণুর মুখখানা মনে পড়ছে। কান্নায় ভরা মুখ থমথম করছে। এ বিয়ের সঙ্গে ওর যেন কোন প্রাণের যোগ নেই। শুভদৃষ্টির সময় ও কিছুতেই চোখ তুললো না। যেন দুটো পাথরের হাতে ওরা মালা ধরিয়ে দিয়েছে। দুটো হাত তখন ওর প্রাণহীন। মালাটা পরাতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি কে মালার সুতোটা আবার বেঁধে দিল।

আমার সেদিন ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। কেন জানি না, আমার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কেউ জানে না, ছাদ থেকে নেমে আমি আমার ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছিলাম। বোধহয় রেণুর কষ্ট দেখে। নাকি নিজেরই কষ্টে!

১০

মানুষের জীবনটাই তো আঘাতে আঘাতে পরিপূর্ণ, কিন্তু কোন্ আঘাত এক-জনকে পাগল করে তুলতে পারে, তা কি কেউ জানে?

সুদীপদা এলো না, সেটাই কি ওর কাছে প্রচণ্ড আঘাত? কিন্তু আমার মন বলছিল, ঐ কান্নার মধ্যে অন্য কি আছে। পাথরের মত প্রাণহীন হাতই কি ঐ মালাটা ছিঁড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী? জানি না, জানি না, ভাবতে গেলে আমার মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণী ঝড় ওঠে। কান গরম হয়ে ওঠে।

কে যেন কানের কাছে বলতে শুরু করে, রেণুর জন্যে তোমার এত মায়া? পিসেমশাই তাকে কাছে এসে মাথা টিপে দিতে দেননি, সেজন্যে তাঁকে তোমার খুব নির্দয় মনে হয়েছিল? বেচারী বাবার একটু সেবা করতে চেয়েছিল, তাও পায়নি বলে। বাণীপিসীমা ওকে সত্যনারায়ণের সিন্নি মেখে দিতে দেননি, তাই তুমি কষ্ট পেয়েছিলে। টুনটুন ওর বেনারসী শাড়িখানাই নিতে চায়নি, ও উল্টো

কিছু সাজিয়ে দেবে এই ভয়ে। মুখের ওপর বলেছিল, তুই খ্যা সেজে থাকিস! সকলেই নির্দয়, তোমারই যত করুণা! কিন্তু তুমিই তো আসল কালপ্রিট।

আমি অন্ধকারে বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসলাম। না, না, আমি নই। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলেই আমি এসব কি আজেবাজে চিন্তা করি।

আমার মাথা তখনো ঝিমঝিম করছে। আমি অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টুলের ওপর রাখা জলের গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে জল খেলাম। নিজের মনকেই বললাম, সুদীপদা দায়ী, সুদীপদা। যখন বাড়িতে কেউ ছিল না, ঝুমা কেন ওঁর কাছে এসেছিল? রেণুর নিষ্পাপ অনাঘ্রাত ফুলের মত মন সেদিন কি কিছু দেখেছিল? কতখানি আঘাত পেয়েছিল আমি জানি না। কিংবা সুদীপদা ওর বিয়েতে এলেন না, সেই আঘাতই কি ও মনের মধ্যে পুষে রেখেছে? না কি অরুণদা?

কিন্তু রেণুকে এখন আর কেউ ভালবাসবে না। বাবুলও না। ও বারবার এক একজনের কাছে ছুটে যাবে, মায়া মমতা ভালবাসা নিয়ে। কিন্তু ওর ভালবাসা কেউ চায় না, সকলেই বিরক্ত হয়। ওর ওপর সবারই ঘৃণা। এমন অদ্ভুত সেজে থাকিস কেন? তুই তো স্নান করতে চাস না। নোংরা, নোংরা।

বাবুলের ইস্কুলের সময় হয়ে গেছে তখন। বাণীপিসীমা এসে ওকে খাইয়ে দেন, মাছের কাঁটা বেছে দেন। বাবুল ওর ইউনিফর্ম পরে টেবিলে এসে বসেছে, রেণু এসে বললে, আয় ভাইয়া, আজ তোকে খাইয়ে দিই।

বাবুল কেমন ভয়-ভয় চোখে ওর দিকে তাকালো।

রেণু হেসে ওর গালে চুমু খেতে গেল। ও বিরক্তিতে গাল সরিয়ে নিল।

বাবুল কি তেমনি ছোট্টটি আছে নাকি, তাকে চুমু খেতে গেলে তার অস্বস্তি তো হবেই। আসলে ওটা যে বিরক্তি কিংবা ঘৃণা হতে পারে, রেণু তা বুঝতে পারলো না। ও যে বুঝতেই পারে না ওকে কেউ চায় না, কেউ চায় না।

বাবুল অস্বস্তিতে গাল সরিয়ে নিতেই রেণু হেসে উঠলো, যেন কত বড় একটা কৌতুক। ও বাবুলকে জড়িয়ে ধরলো জোর করে, ওর গালে গাল ঘষলো, তারপর হাসতে হাসতে বললে, কেন, আমি কি ভাইয়া তোকে খাইয়ে দিতে পারি না নাকি?

বাঁ হাতে বাবুলকে জড়িয়ে ধরে রেখে ডান হাতখানা ও বাড়িয়ে দিলো বাবুলের থালার ওপর। আদর করে খাইয়ে দেবে বলে ভাত মাখতে গেল। বাণীপিসীমা যে-ভাবে ভাত-ডাল মেখে ওকে রোজ খাইয়ে দেন, সেইভাবে। রেণুর তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, ওর আঙুলে বড় বড় নখ, নখের মধ্যে ময়লা। হাত ভাল করে ধুয়ে আসেনি। ঐ তো এক রোগ ওর, বলে বলে বাণীপিসীমাও ওকে শুধরে দিতে পারেন নি। কাদা পায়ে বিছানায় উঠে বসে, কয়লাঘাঁটা হাত ধুতে ভুলে যায়। উদ্ভট সাজপোশাক করে, তাও নোংরা। স্নান ওর কাছে একটা বিভীষিকা। ওর সবকিছুতে মলিনতা, হৃদয় ছাড়া।

ও বাবুলকে খাইয়ে দেবার জন্যে যেই থালায় হাত দিয়েছে, অমনি বাবুল প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দু'হাতে থালাটা সজোরে ছুঁড়ে দিলো। ঝনঝন ঝনঝন শব্দ করে থালাটা মেঝের ওপর ছিটকে পড়লো। থালার ভাত ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।
—খাবো না, খাবো না আমি। তোমার হাতে খেতে আমার ঘেন্না করে।

ওর হত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে চেয়ার থেকে লাফিয়ে পালাতে গেল বাবুল, আর পায়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও। চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

বাণীপিসীমা ছুটে এলেন। দেখলেন। বাবুলের দিকে ছুটে গেলেন। তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন, তুই কেন ওদের কাছে যাস, তোকে ওরা কেউ চায় না, তবু কেন যাস। তুই পাগল, পাগল, তুই আমাদেরও পাগল করে ছাড়বি। তুই মরে যা, তা হলেও শান্তি।

বাণীপিসীমার মুখ থেকে এ-ধরনের কথা বের হয়ে আসতে পারে, আমি কখনো ভাবিনি। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

রেণু লজ্জিত মুখে মাথা নীচু করে বকুনি শুনছিল। ও হঠাৎ চোখ তুলে বাণীপিসীমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। তাকিয়ে রইলো। ও কি, ও কি, আমি দেখতে পেলাম ওর চোখ ভয়ঙ্কর হয়ে যাচ্ছে। ও কি বাণীপিসীমাকে মারবে নাকি? না, এবার ওর চোখ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। অসহায়, অর্থহীন, ঘোলাটে। এখন আর ও ভয়ঙ্কর নয়, শুধুই করুণার পাত্র।

রেণু পাগল, রেণু পাগল। শিশুর চেয়েও অবোধ। কাণ্ডজ্ঞান নেই, বোধ-বুদ্ধি নেই। ওকে নিয়ে সবাই তটস্থ। ওর ওপর সবাই বিরক্ত, কখন কি করে বসে। নিষেধ করলে ওর জিদ চেপে যায়।

এই তো সেদিন একটা বিশ্রী ব্যাপার করে বসেছিল।

আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম, ও ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। পিসেমশাই মক্কেলদের নিয়ে নীচে বসে আছেন, ওঁর গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম, কোন মক্কেলকে রেগে-রেগে কি যেন বোঝাচ্ছেন চিৎকার করে। রেণু এ-সময় নীচে নামছে কেন।

আমি ওকে ডাকলাম। ও শুনতেই পেল না, কি যেন ভাবতে ভাবতে নেমে গেল। আমি ওর পিছনে পিছনে নেমে এলাম। পিসেমশাইয়ের সেদিনের কথাটা মনে পড়লো, 'দেখো, এ সময় ও যেন এসে না হাজির হয়।'

আমি ওকে আটকাবার চেষ্টা করলাম, 'যাস না'। ও ঠেলে সরিয়ে দিলো আমাকে। কি প্রচণ্ড শক্তি তখন ওর শরীরে! ও পিসেমশাইয়ের চেম্বারে ঢুকে গেল।

পিসেমশাই নিশ্চয়ই চিৎকার করে উঠবেন ওকে দেখে।

রেণু ঘরে ঢুকলো, কেমন আত্মভোলার মত। দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে, বইয়ের শেলফগুলোর দিকে তাকালো। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কি যেন পর্যবেক্ষণ করছে। কপাল কুঁচকে কি যেন ভাবছে, কিংবা পিসেমশাইয়ের কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করছে।

মক্কেলরা চমকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। পিসেমশাই দেখলেন, কিন্তু কিচ্ছু বললেন না। যেন উপেক্ষা করতে চাইলেন। যেমন তর্ক করে বোঝাচ্ছিলেন মক্কেলকে তেমনি ভাবেই একটানা কথা বলে গেলেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। রেণুকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন মক্কেলদের উপস্থিতি বুঝতেই পারছে না। আর পিসেমশাইকে দেখে মনে হলো উনি যেন রেণুকে দেখতেই পাচ্ছেন না। কিন্তু তাঁর ভুরু দেখে বোঝা গেল একটা বিস্ফোরণ চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন।

রেণু দেখলো, ঘরের মধ্যে অকারণ ঘোরাফেরা করলো, তারপর হাতের মুঠিতে কি ছিল সেটা শেলফে লুকিয়ে রেখে এলো নিজে থেকেই। আমি জানি ওটা কিছুই নয়, তুচ্ছ কিছু।

রেণুর জন্যে এখন আর আমারও কোন মায়া নেই। ও অসহ্য হয়ে উঠেছে, অসহ্য। ও যেন প্রতিজ্ঞা করেছে এ বাড়ির সম্মান, মানমর্যাদা সব মাটিতে মিশিয়ে দেবে। টুনটুনের স্কুলের বন্ধুরা একদিন এসেছিল। টুনটুন বারণ

করেছিল, তবু ও তাদের কাছে অকারণে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঐ উদ্ভট পোশাকে। টুনটুন বুঝতে পেরেছিল বন্ধুরা চোখে চোখে হাসাহাসি করছে। বাণীপিসীমার কাছে ও লজ্জায় কেঁদে ফেলেছিল সেদিন।

বাণীপিসীমা শুধু মুখ বুজে দেখে গেছেন, শুনে গেছেন। সকলের বিরক্তি, সকলের রাগ ওঁকেই বিদ্ধ করেছে। সেদিন পিসেমশাই মক্কেলদের বিদায় দিয়ে ওপরে উঠে এসে বাণীপিসীমাকে বলেছিলেন, তোমার মেয়ের জন্যে আমি আর কোথাও মুখ দেখাতে পারবো না। 'তোমার মেয়ে'।

আমি জানি বাণীপিসীমা কেন এতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কেন চিৎকার করে বলে উঠলেন, তুই মরে যা, মরে যা, তা হলেও আমার শান্তি। রেণু হয়তো বুঝতে পারে নি, কিন্তু আমি জানি ঐ তীব্র অভিশাপের মধ্যে লুকোনো ছিল রেণুর প্রতি তাঁর প্রচন্ড মমতা। কারণ ঐ অভিশাপ ওঁর বুক নিঙড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু আমি? আমিও কি ওর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছি? জানি না। কিন্তু আমার মন বলছে, রেণুর ওপর বিরক্ত হওয়ার অধিকার আমার নেই। সে জন্যেই হয়তো এ-রহস্যের হদিস খুঁজে বের করতে আমার এত ভয়। কিন্তু কেন, কেন? আমি তো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি। দক্ষ গোয়েন্দার মত প্রতিটি সূত্র জুড়ে জুড়ে আমি অপরাধী কে, জানবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। তবে কি...

সেই দিনটার কথা মনে পড়লো। ক'দিন থেকেই আমি বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে পড়েছিলাম। রেণু তখন কলেজে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় সেদিনও ও আমার দরজার কড়া নেড়ে দিয়ে গেছে। আমার ইচ্ছে হয়েছিল বিছানা থেকে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখবো। এই ভোর বেলায় ওর মুখে এমন একটা শান্ত শ্রী থাকে, আমার দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু শরীরে তখন প্রচন্ড ব্যথা, উঠতে ইচ্ছে হলো না। গায়ে জ্বর, মাথা ভার-ভার। আমার তাই বোধহয় ভীষণ একা-একা লাগছিল।

আমি অপেক্ষা করছিলাম, বারবার ঘড়ি দেখছিলাম, রেণু কখন ফিরে আসবে। শেষে এক-সময় রেণুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। যদি কোন বইটই থাকে, সময় কাটানোর মত।

ওর টেবিলে এলোমেলো হয়ে বইখাতা ছড়ানো ছিল, একপাশে এক থাক বই সাজানো। আমি বইগুলো টেনে টেনে নিয়ে পাতা উল্টে দেখছিলাম, পছন্দ মত একটা বই নিয়ে আসবো ভেবে। আর তখনই একখানা বইয়ের ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ খসে পড়লো।

কোন আগ্রহ ছিল না, তবু ভাঁজ খুললাম। খোলার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

একখানা চিঠি। রেণুরই লেখা। মনে হলো চিঠিটা লিখতে লিখতে ও বোধহয় শেষ করার সময় পায় নি। কিন্তু এ চিঠি কাকে লিখছিল রেণু? আমার মনের মধ্যে তখন অসীম কৌতূহল। প্রতিটি শব্দ যেন আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছিল। কার উদ্দেশে লেখা তাও জানবার উপায় নেই। তবে কি এত হাসি-ঠাট্টা সরল আনন্দের আড়ালে থেকে রেণুর মন কাউকে ভালবেসে ফেলেছে। কে সে? কে? কার কাছে রেণু এমন উপযাচক হয়ে প্রেম নিবেদন করতে চাইছে? বিস্ময়ে কৌতূহলে আমি তখন অভিভূত। আমার হাত কি তখন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল? মনে নেই। আমার শরীরে মনে তখন কি কোন ঈর্ষার বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল? জানি না।

আমি ধীরে ধীরে সেই অসমাপ্ত প্রেমপত্রটি আবার ভাঁজ করে বইখানার মধ্যে রেখে দিলাম। রেণু, তোর ওপর আমার কোন রাগ নেই। তুই যাকে ভালবাসিস, ভালবাসতে চাস, এ চিঠি লিখে শেষ করে তার কাছেই পাঠিয়ে দিস। আমি কাউকে জানতে দেবো না, তুই নির্ভয়ে থাক। তোকেও জানতে দেব না।

বইটা রেখে দিয়ে শূন্য মন নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে। কিন্তু তখনো আমার মাথার মধ্যে চিঠির একটা লাইন বারবার ঘুরছে: 'তুমি তো কোনদিনই মুখ ফুটে বলবে না', 'তুমি তো কোনদিনই মুখ ফুটে বলবে না'।

সে কে আমি জানি না। কার উদ্দেশে লিখেছিল, বুঝতে পারি নি। কিন্তু ঐ চিঠি যে আমি দেখেছি, সে-কথাও কোনদিন ওকে জানতে দিতে চাই নি। তবু ওর বিয়ের আগে ও যেদিন হঠাৎ এসে বললে, তুমি বলো না মাকে, রেণু এখন বিয়ে করবে না, তখন সেই চিঠির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। রেণু আমার চোখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিল যেন কি জানতে চায়। আর তখনই আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, কার জন্যে অপেক্ষা করবি? কে সেই ছেলেটি, যাকে চিঠি লিখেছিলি? ও অবাক হয়ে গিয়েছিল, ও তো জানতো না, বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ওর চিঠিখানার কথা আমি জানি। ওর চোখের মধ্যে কি যেন ছিল, আমি ভয় আর আনন্দে কেঁপে উঠেছিলাম। কারণ আমার একবার একটু-খানি সন্দেহ হয়েছিল, বুকের মধ্যে হঠাৎ অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছিল, কিন্তু রেণু সেটাকে পায়ে মাড়িয়ে বলে উঠলো, কার জন্যে আবার, দাদার জন্যে। তবু আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছার স্বপ্ন গুমরে গুমরে উঠতো: 'তুমি তো কোনদিনই মুখ ফুটে বলবে না'।

আমি জানি না, এতদিন ধরে আমি নিজেকে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছি কিনা। আমি জানি না রেণু কেন বারবার যে কোন তুচ্ছ জিনিস, একটা চুলের কাঁটা কিংবা ফিতে, একটা শার্টের বোতাম কিংবা শতছিন্ন রুমাল, এত সাবধানে এত সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখতে চায়। একদিন কেন আলমারির আড়ালে নিজেকেই লুকিয়ে রেখেছিল!

এই তুচ্ছ জিনিসগুলো কি অনেক বড় কোন জিনিসের প্রতীক!

কিন্তু আমি তো ওকে কোন আঘাত দিই নি। আঘাত দেবার প্রশ্নও ওঠে না। ওকে যদি কেউ আঘাত দিয়ে থাকে সে তো সুদীপদা। কিংবা ঝুমা। সুদীপদা ওর বিয়েতে এল না কেন। নাকি পিসেমশাই? সুদীপদার চিঠি, তাঁর আসার কথা, শেষমুহূর্তে না আসতে পারার অজুহাত, এসবই বানানো নয় তো? আমার নিজেরও মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়েছে। মনে হয়েছে কয়েক হাজার টাকা যাতায়াত খরচ বাঁচাবার জন্যে সবটাই পিসেমশাইয়ের অভিনয় নয় তো? কিন্তু সুদীপদা কি ঐ প্রবঞ্চকের ভূমিকা নিতে রাজী হবেন? কে জানে। কিন্তু আমি অরুণদাকে এত নির্দোষ ভাবছি কেন? আসলে উনিই যে কোন আঘাত দিয়ে বসেন নি, আমি জানবো কি করে?

এখন তো আমার মনে হচ্ছে এরা প্রত্যেকেই দায়ী। পিসেমশাই, বাণীপিসীমা, টুনটুন, বাবুল এবং আমিও। একটা পাগলের জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে এরাও তো মাঝে-মাঝে পাগলের মত কথা বলে ফেলে, পাগলের মত ব্যবহার করে ফেলে। আর অরুণদা? অরুণদার মত নির্মম মানুষ আমি দেখি নি।

সেদিন ডাক্তারের কাছে যাবার কথা, ঝুমার বিয়ের দিন, রেণু কিছুতেই যেতে চাইছিল না। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে শুনলেই ওর প্রচণ্ড ভয়। ও ওদের কাছে থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এমন আতঙ্কের

স্বরে কেঁদে উঠলো, আমি সহ্য করতে পারি নি। যেন আমিই ওর শেষ আশ্রয়।
ও কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো, আমি যাবো না, আমার ভয় করে, আমার ভীষণ কষ্ট হয়।

ওর চোখে তখন কি আতঙ্ক। চিৎকার করে বলে উঠলো, ওদের একটুও বিশ্বাস করো না। আমাকে বিষ খাইয়ে পাগল করে দিতে চায়!

আর সেই মুহূর্তে অরুণদা নির্মম গলায় বললেন, তোমাকে তা হ'লে পাগলা গারদেই দিতে হবে দেখছি।

পিসেমশাইকে ঠিক সেই রকমই নির্মম লাগলো। হৃদয়হীন, নির্দয়।

ওঁর জুতোর আওয়াজ পেয়েই বুঝতে পারলাম, মক্কেলদের বিদায় দিয়ে উনি ওপরে উঠে আসছেন। কিছুক্ষণ আগে দেয়ালঘড়িতে রাত দশটার ঘন্টা বেজে গেছে। চারিদিক নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম। উনি এসেই হয়তো আমাকে ধমক দেবেন। বলবেন, তোমাকে বলেছিলাম না, এ-সময় ওকে আমার ঘরে যেতে দিও না। উনি তো জানেন না, রেণুর শরীরে এখন প্রচণ্ড শক্তি, ও অক্লেশে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে।

হাত মুখ ধুয়ে এসে পিসেমশাই খাবার টেবিলে বসলেন।

বাণীপিসীমা দাঁড়িয়ে রইলেন। ওঁর খাবার সময় বাণীপিসীমা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

খেতে খেতেই পিসেমশাই বললেন, ওকে হাসপাতালে দেওয়াই ভাল। বাড়িতে রেখে নিয়মমত চিকিৎসা করানো অসুবিধে।

বাণীপিসীমা অবাক হয়ে বলে উঠলেন, হাসপাতালে?

পিসেমশাই চুপ করে থেকে বললেন, মানে, ঠিক অ্যাসাইলাম নয়। ডাক্তার বোসের একটা ছোটখাটো নার্সিং হোম গোছের...

বাণীপিসীমা কিছু বললেন না। বুঝলেন কিনা জানি না। আমি বুঝতে পারলাম পিসেমশাই কি বলতে চাইছেন। উনি আসলে পাগলা-গারদ কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। পারছেন না। ভাগ্যিস উনি একটু ঘুরিয়ে বললেন। অরুণদা সেদিন ক্ষোভে কিংবা রাগে বলে উঠেছিল, পাগলা-গারদ। আমার কানে কথাটা অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়েছিল। অত্যন্ত নোংরা। কারা আবিষ্কার করেছিল কথাটা? সুস্থ মানুষ? যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে? রেণুর মত যারা সাজ-পোশাকে আচার-ব্যবহারে একটুও নোংরা নয়, তারা? কিন্তু অরুণদা কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন কি করে?

—ডাক্তার বোসও তাই বলছিলেন। খেতে খেতে পিসেমশাই আবার বললেন।

আমি বাণীপিসীমার দিকে তাকালাম। উনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কোন কথা বললেন না। ওঁর দু'চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল কি কথা বলতে চায় পিসেমশাই টের পেলেন না।

১১

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, সারা বাড়িতে একটা চক্রান্ত চলছে। আমার চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে হলো, তোমরা মেয়েটাকে একটু ভালবাসা দাও। ও তো আর কিছুই চায় না, ওকে শুধু একটু ভালবাসতে দাও।

অনেকদিন আগে দেখা সেই দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে প্রায়ই ভেসে ওঠে। একটি নিষ্পাপ সরলতার কিশোরী মুখ জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে শূন্যতার ঘোলাটে দৃষ্টি, সে অবিরত বলে চলেছে, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা আমাকে একটু দই দেবে, দইওয়ালা আমাকে একটু দই দিয়ে যাও না। সেও বোধহয় রেণুর মতই এমনি ভালবাসার কাঙাল ছিল।

পূর্ণ বলেছিল, এর নাম ক্লাস কনসাসনেশ। আমাদেরই একজন মনে হয় বলেই তো তার জন্যে আমাদের সহানুভূতি, আমাদের সমবেদনা।

পূর্ণ, তোর কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে, সেদিন মনে হয়েছিল। তোকে আজও আমি মুখ ফুটে বলতে পারছি না। কারণ আমিও যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিকার হয়ে গেছি নিজের অজান্তেই। আমি তাই এখনো গোপন করতে চাইছি। যেদিন আর উপায় থাকবে না, যেদিন সবাই জেনে যাবে সেদিন আমি তোর কাছে সব বলবো, সব। বলতে পারবো, জানিস পূর্ণ, রেণু--যার কথা একবার সুশান্ত বলেছিল—সে পাগল হয়ে গেছে। কেন হলো বল তো? আমি সেদিন তার কথা তোর সংগে আলোচনা করতেও পারবো।

পূর্ণ, তুই না বলেছিলি, আমাদেরই একজন মনে হয় বলেই আমাদের দুঃখ, আমাদের সমবেদনা। কিন্তু রেণু তো আমাদেরই একজন, সত্যি সত্যি আমাদের। তার বাবা-মা ভাই-বোন সকলের। তবু একটু একটু করে কিভাবে সে যেন বাইরের লোক হয়ে গেছে তুই দেখে যা।

আমার নিজের সব সময়েই সে-কথাটা মনে হয়। কি আশ্চর্য, ঠিক যখনই রেণুকে সবচেয়ে আপন করে নেওয়ার প্রয়োজন তখনই সকলে তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছে। যখনই তাকে ভালবাসা দেবার কথা, তখনই তার ভালবাসা কেউ নিতেও চায় না। একটা পরিচ্ছন্ন বিছানার ওপর তাকে একটা ঘৃণ্য কীটের মত মনে করতে শুরু করেছে সকলে। অথচ আমি তো কাউকেই দোষ দিতে পারছি না। কারণ পিসেমশাই, বাণীপিসীমা, টুনটুন, বাবুল, অরুণদা, হয়তো আমিও, সেই অদ্ভুত সমাজের মানুষ, যে সমাজে সবাই শুধু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। একটি অপ্রকৃতিস্থ মানুষ আছে, বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে, এই লজ্জায় তাই সব মানুষগুলোই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে।

এক এক সময় আমার তাই সশব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে করে, পিসেমশাই, আপনি বদ্ধ পাগল। বাণীপিসীমা, আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। টুনটুন, তুই কি উন্মাদ হয়ে গেলি নাকি? বাবুল তুই তো এইটুকুন বাচ্চা, তুই কি করে বড়দের মত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেলি।

আর আমি? আমিই বা রেণুকে এত ভয় পাচ্ছি কেন? কারণ, আমিও বোধহয় কিছু লুকোতে চেয়েছি। এতদিন ধরে রেণুর মতই নিজের কাছেও লুকিয়ে এসেছি। রেণু তো একটা পাগল। কখন কি করে বসে, কখন কি বলে বসে তার ঠিক নেই। আমার তো ভয় সে-জন্যেই। ও হঠাৎ কখন পিসেমশাইকে,

কিংবা বাণীপিসীমাকে, অরুণদাকে কিংবা ডাক্তার বোসকে ওর সেই গোপন দুঃখের কথা, ওর সেই অনুচ্চারিত গোপনতা প্রকাশ করে ফেলবে, এই ভয়।

অথচ আমি জানি, আমরা সবাই জানি, একমুঠো সরষে ভিক্ষে দেবার মত মৃত্যুহীন কোন বাড়ি নেই। গোপন দুঃখ কিংবা গোপন লজ্জা প্রতিটি মুখের আড়ালে। অথচ একটু ভাবলেই মনে হয়, কত তুচ্ছ সেই সব লুকোনো দুঃখ কিংবা লজ্জা। একটা জামার বোতাম কিংবা চুলের কাঁটার মত, পিসেমশাইয়ের জুতোর ফিতে কিংবা বাবুলের প্যান্টের বেল্টের মতই তুচ্ছ। আর সে-সব লুকোতে লুকোতে মানুষগুলো পাগল হয়ে যায়। পাগলের মত ব্যবহার করে।

অথচ আমি তো ওদের দোষ দিতে পারি না। আমরা তো শুধু লুকোতেই শিখেছি। আর এমনি ভাবে আমরা অপ্রকৃতিস্থ মানুষের একটা সমাজ গড়ে তুলেছি। যে সমাজে চরম দুঃখ শেষ অবধি গোপন লজ্জা হয়ে যায়।

পূর্ণ একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, আমরা মধ্যবিত্তরা মাইরি অদ্ভুত মানুষ। আমাদের যখন কান্না পাবার কথা তখন আমরা লজ্জা পাই। দুঃখ কষ্ট অনুভব করার মত অবসরও আমাদের নেই। সংসারে অভাব থাকলে, ছেলে খারাপ হয়ে গেলে, মেয়েকে তার স্বামী না নিলে, স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলে, মদ্যপ স্বামী রাত কাটিয়ে ফিরলে কেঁদে হাল্কা হবারও উপায় নেই। শুধু লুকিয়ে রাখো, লুকিয়ে রাখো।

ঠিকই বলেছিল পূর্ণ। আমাদের সব দুঃখ কষ্ট ঐ পিসেমশাইয়ের পায়ের একজিমার মত, মোজা পরে ঢেকে রাখো। দারিদ্র্য ঢেকে রাখার মত।

সংসারকে আমরা সব সময় একটা পরিচ্ছন্ন চেহারা দিতে চাই। হাসির আড়ালে কান্না গোপন করে রাখি। রেণুকে নিয়ে সেজন্যেই তো এঁদের এত দুশ্চিন্তা।

পিসেমশাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। টুনটুন এসে বললে, বাবা ডাকছে আপনাকে। শোবার ঘরে আছে।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমার কেমন ভয়-ভয় করলো।

আমি গিয়ে চুপচাপ দাঁড়ালাম। অরুণদা মুখ নীচু করলেন। কেউ কারো মুখের দিকে তাকালো না।

পিসেমশাই কি বলবেন, বোধহয় ঠিক করতে পারছিলেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাণীপিসীমার চোখের দিকে না তাকিয়ে বললেন, তুমি তো কিছুই বলছো না।

বাণীপিসীমার মুখ থমথম করছিল। খাটের বাজুতে হাত রেখে উনি ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, তোমরা যা ভাল মনে করো।

অরুণদা যেন নিজেকেই সাহস দেবার জন্যে বললেন, অনেকেই তো ভাল হয়ে যায়।

পিসেমশাই একবার আমার দিকে তাকালেন। ওঁর মুখে নিঃসন্দেহ ব্যথার ছাপ। আস্তে আস্তে বললেন, ওকে অ্যাসাইলামে দেওয়াই ভালো, কি বলো। ওখানে তবু ঠিকমত চিকিৎসা হবে। ডাক্তার বোস বলছেন, ভাল হয়ে যাবে।

ভাল হয়ে যাবে। কথাটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগলো। সত্যি তো, আজকাল অনেকেই ভালো হয়ে যায়। আহা, বেচারী রেণুও যেন ভাল হয়ে যায়।

আমি ভেবেছিলাম, একটা চক্রান্ত। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পিসেমশাইয়ের মুখে দুঃসহ ব্যথা থমকে আছে।

অরুণদার গলা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালো। বাণীপিসীমা খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলাচ্ছেন।

অরুণদা কেবল বললেন, অনিমেষ, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমরা তো রেণুকে সামলাতে পারবো না।

কথাটা শুনেই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। এর চেয়ে কষ্টের কাজ যেন আর নেই। পিসেমশাই যতই কথাটাকে ভদ্র করার জন্যে 'অ্যাসাইলাম অ্যাসাইলাম' বলুন, একদিন তো 'হাসপাতাল' বলেছিলেন, তবু হৃদয়হীন কোন মানুষের আবিষ্কার সেই 'পাগলা-গারদ' কথাটা একটা ভয়ঙ্কর ছবি ফুটিয়ে তুললো। মনে মনে বলে উঠলাম, রেণু, আমি পারবো না, পারবো না। তোকে আমি কি করে নিজের হাতে পাগলা-গারদের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসবো! তা হলে যে আমি নিজেই পাগল হয়ে যাবো রে।

কিন্তু পিসেমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম। আমি বলতে পারলাম না, না পিসেমশাই, আমি পারবো না।

এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ আমাকে করতে হবে, আমি ভাবি নি কোনদিন। কেউ কি কখনো করেছে? অনেক স্বামী হয়তো তার স্ত্রীকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে, কারণ তার আশা থাকে তাকে ফিরে পাবার। কিন্তু যাকে মনে মনে গোপনে ভালবেসে এসেছি তাকে পাগলা-গারদের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসা কি সম্ভব নাকি। আমি পারবো না, পারবো না।

সেজন্যেই এখন আমি অরুণদার দুঃখও বুঝতে পারছি।

রেণু, এখন যে আমি সব জানি, সব জানি। তোর প্রতিটি কথা এখন আমার কাছে স্পষ্ট। তোর বইয়ের মধ্যে পাওয়া সেই অসমাপ্ত চিঠি কাকে দিতে চেয়েছিলি আমি জানি। তোর মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল, কোনদিন তুই প্রকাশ করতে পারিস নি। আমার মতই।

ওঁরা সেই ক্ষত কোথায় আছে খুঁজে বের করতে চাইছেন। পিসেমশাই, অরুণদা, ডাক্তার বোস, সকলেই। কিন্তু কেউ কোনদিন সেটা খুঁজে পাবে না। কারণ, আমি তো কাউকেই সে-কথা বলতে পারবো না। বলতে পারবো না, আমিই সেই কালপ্রিট।

আর সেজনোই আমাকে এই দুঃসাধ্য ভূমিকা নিতে হয়েছে।

একজন অসুস্থ রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তবু সহজ। কারণ সে জানে তার কি হয়েছে। রেণু যে নিজেই জানে না ও অসুস্থ।

সেই প্রথম ডাক্তারের কাছে যাবার দিনে ও চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে একবার এসে দাঁড়িয়েছিল।—আমার কি হয়েছে? আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে কেন? আমার তো কিছুই হয় নি।

আমি ওর কথার কোন জবাব দিতে পারি নি।

ও বলে উঠেছিল, কেউ কিছু বলছে না কেন আমাকে? তুমিও কিছু বলছো না কেন? মনুদা, তুমি অন্তত বলো, তুমি বলো।

আমার সেদিন চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এখন রেণু জানে ও অসুস্থ, কিন্তু বিশ্বাস করে না। একবার বলেছিল, তোমরা—অরুণদা, বাবা, ওরা সবাই আমাকে পাগল সাজাতে চাইছে কেন বল তো? আমার তো কিছু হয় নি। তারপর একটু থেমে আমার চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চেয়েছিল। এবং হঠাৎ আমার দু'কাঁধে দু'খানা প্রচণ্ড শক্তির হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিয়েছিল।—মনুদা, তুমি, তুমিও আমাকে পাগল

সাজাতে চাইছো নাকি?

ওর দু'চোখ সেদিন জলে ভেসে গিয়েছিল।

সেই আমি, যার ওপর এত বিশ্বাস, ওকে দিয়ে আসবো। কোথায়! নির্বাসনে? নাকি জন্মান্তরের দরজায়?

আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ও'দের প্রত্যেকের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। রেণুর জন্যে ও'রা কষ্ট পাচ্ছেন ঠিকই, ও'দের মনে একটা আশা উ'কি দিচ্ছে, রেণু ভাল হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও'দের আরেকটা কষ্ট। কারণ পিসেমশাই, অরুণদা, বাণীপিসীমা সকলেই নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছেন। ও'রা জানেন ও'রা রেণুকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছেন। তখন এই পরিচ্ছন্ন বাড়িটার মধ্যে কিছু লুকিয়ে রাখতে হবে না। ও'দের তখন আর পদে পদে ভয় লজ্জা দুশ্চিন্তা থাকবে না।

আমাকে যেতে হবে ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমি তো কখনো এত অসহায় বোধ করি নি। এমন একটা নির্মম কর্তব্য আমাকে করতে হবে, আমি কোন-দিন ভাবি নি।

অরুণদা এসে বললেন, ট্যাক্সি এসে গেছে, ট্যাক্সি এসে গেছে।

বাণীপিসীমা একটু আগে রেণুর সি'থিতে শাঁখায় সি'দুর ঠেকিয়েছেন, শাল-পাতায় মোড়া মায়ের মন্দিরের সি'দুর। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তার মাথায় পুষ্প ছু'ইয়ে দিতে গিয়ে বাণীপিসীমা কে'দে ফেললেন, আঁচলে চোখ মুছলেন।

বিয়ের পর যেদিন প্রথম রেণুকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন, সেই দিনটার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

পিসেমশাই বললেন, চল্ রেণু, দেরী হয়ে যাবে।

আর তখনই রেণু বলে উঠলো, আমি যাবো না, যাবো না, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

ও ছুটে এসে আমাকে আঁকড়ে ধরে বললে, মনুদা, তুমি আমাকে আটকে রাখো, ওরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছি, ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে।

পিসেমশাই হাসবার চেষ্টা করলেন।

অরুণদা বিরক্তি চাপলেন। বললেন, তুমি অনিমেষকেই জিজ্ঞেস করো-না, আগের মতই ডাক্তারকে দেখিয়েই তো ফিরে আসবো।

রেণু আমার চোখের দিকে তাকালো। আমি বললাম, হ্যাঁ তাই, আমিও তো যাচ্ছি। ঠিক ফিরিয়ে আনবো।

রেণু আমার কথা বিশ্বাস করলো।

আমরা সেই বাড়িটার সামনে এসে পে'ছিলাম। পিসেমশাই মীটার দেখে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

নীচের ঘরখানায় ডাক্তার বোস বসে আছেন, অরুণদা দেখালেন। রাস্তা থেকেই জানালা দিয়ে ও'কে দেখতে পেলাম।

নিশ্ছিদ্র লোহার ফটকটা খুলে দিতেই আমরা ভিতরে ঢুকলাম। নীচের ঘরেই ডাক্তার বোস বসেছিলেন। দেখে বোঝাই গেল সমস্ত ব্যবস্থা আগে থেকে করা আছে।

কয়েকটা ফর্ম নিয়ে পিসেমশাই আর অরুণদা দেখলেন, পড়লেন, সই করে

দিলেন।

ডাক্তার বোস রেণুর সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, তুমি থাকো মা, আমি কথা দিচ্ছি তুমি ভাল হয়ে যাবে।

আর তখনই রেণুর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। ওকে কেমন অসহায় দেখালো।

আমার নিজেকেও।

আমরা একসময় নিঃশব্দে উঠে এলাম। আর দুটো লোক আমাদের পিছনে সেই নিশ্ছিদ্র বিরাট লোহার ফটকটা বন্ধ করে চাবি লাগালো। আমি শব্দ শুনতে পেলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে রেণুকে শেষবারের মত দেখবার জন্যে আমি ফিরে তাকালাম।

ফিরে তাকানোর প্রয়োজন ছিল না। রেণু তখন জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে অসহায়ের মত বলছে, বাবা, বাবা, ওর কথা শুনে তুমি আমাকে পাগল ভাবলে, তুমি আমাকে পাগলা-গারদে দিয়ে গেলে! ও কাঁদছে আর অরুণদাকে বলছে, তুমি আমার স্বামী, শেষে তুমি আমাকে পাগল সাজাতে চাইছো। কিন্তু আমি পাগল নই। পাগল নই। আপনারা সকলে বিশ্বাস করুন। আশে-পাশে রাস্তায় যারা ছিল, ও এক একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি পাগল নই! তারপর আমার দিকে কেমন অসহায়ের মত তাকিয়ে বলে উঠলো, মনুদা, মনুদা, শেষে তুমিও আমাকে ঠকালে. তুমিই আমাকে পাগলা-গারদে ঠেলে দিয়ে গেলে!

আমার মনে হলো আমার মাথায় কে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত হানলো।

বাড়ি ফিরে আমার সন্দেহ হলো, আমি নিজেই কি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছি। তা না হলে পিসেমশাই. বাণীপিসীমা, অরুণদা, টুনটুন, সবারই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেন মনে হচ্ছে সকলেই কত নিশ্চিন্ত!

হৃদয়

আমাদের বাড়িতে বাবার দিকে তাকানোর কারও সময় নেই। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাবার এখন মাত্র দু'বছর কেটেছে। সেজন্যেই কিনা জানি না, সকলেই নিজেকে নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি বিয়ে-থা করিনি, ব্যাচেলর মানুষ, বলতে গেলে আমারই তো সংসারের দিকে চোখ পড়ার কথা নয়। তবু এক-একদিন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিতে হয়েছে, নিজেও সরে গেছি। কারণ, সে-সময় নিজেকে কেমন অপরাধী-অপরাধী লাগে, বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হয়। অথচ অপরাধটা কি নিজেও বুঝতে পারি না।

সেবার মেজ জ্যাঠাইমা কি একটা উপলক্ষে কোলকাতায় গঙ্গাস্নানে এসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন, শোন খোকা, আর তো কেউ তোর বাবার দিকে দেখে না, তুই তো বিয়ে-থা করিসনি, তুই অন্তত দেখিস। কি হয়ে গেছে রে মানুষটা!

কোন উত্তর দিইনি, কারণ এ-সব উপদেশ-টুপদেশ শুনতে আমার ভাল লাগে না। যে-কথা ভাবলে আমার নিজেরই কষ্ট হয় তা কেউ মনে পড়িয়ে দিলে খারাপ লাগারই কথা।

আমার এক-একদিন মনে হয়েছে, এ-বাড়ির ছাদটা আমাদের অধিকারে থাকলে বাবা সকাল-সন্ধ্যে একটু পায়চারি করতে পারতো। ছাদ নেই, তাই আপিস থেকে ফিরে এই সেদিনও ক্লান্ত মানুষটা বিছানায় চুপচাপ রুগীর মত পড়ে থাকতো, কিংবা বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজের ভাবনায় ডুবে থাকতো। মাথার ওপর তেতলায় অন্য ভাড়াটে, তাদের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নেই। থাকলে ছাদটা ব্যবহার করা যেত। রিটায়ার করার পর অন্তত বাবাকে এমনভাবে চুপচাপ বসে থাকতে হ'ত না।

প্রথম প্রথম দৃশ্যটা খুবই দৃষ্টিকটু লাগতো। আজকাল সয়ে গেছে।

কলেজের পার্ট শেষ করে আমাকে অনেকদিন বেকার বসে থাকতে হয়েছিল, এখন একটা চাকরি করি, কিন্তু মাইনেপত্তর বলার মত নয়। কিন্তু ঐ চাকরিটা পেয়েই আমি কৃতার্থ বোধ করেছিলাম।

মা আমার ছোটভাই নবেন্দুর কাছে খবর পেয়ে হাসি-হাসি মুখ করে এসে বলেছিল, হ্যাঁ রে খোকা, তুই চাকরি পেয়েছিস আমাকে বললি না! মা'র মুখে-চোখে দিব্যি অভিমান ফুটে উঠলো। আহত অস্পষ্ট স্বরে মা বললে, তোর বাবা যে তোর জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির, সে যে শুনলেও শান্তি পাবে।

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখ তুলে তাকাতে পারলাম না। আমি জানি, মা নিজের কথাই বললো। নিজের কথাগুলো মা কখনো বুঝি বা স্পষ্ট করে বলে না, কোন ব্যাপারে মা'র যেন নিজস্ব কোন মতামত নেই। অথচ আমি জানি দুর্ভাবনা মা'রও কম ছিল না, শুভেন্দু কি করছে কেউ জিগ্যেস করলে আমার যত না অস্বস্তি হ'ত, মা'র চোখে তার চেয়ে বেশি সঙ্কোচ দেখতে পেতাম।

আমার ছোটভাই নবেন্দুর কাছ থেকে খবরটা পেয়ে মা নিশ্চয় খুব শান্তি পেয়েছিল। আর এমন একটা সুখবর চেপে যাওয়ার জন্যে অভিমান হওয়ারই কথা। আমি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে শুধু হাসবার চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু রাত্রের টিউশনি যে আমি ছাড়িনি, এবং কেন ছাড়িনি সেটুকু যদি একবার ভেবে দেখতো তাহ'লে আমার ওপর ওদের এই অভিমান দূর হ'য়ে যেত।

বাবার কাছে গিয়ে চাকরির কথাটা বলতে আমি সাহস পাইনি। মনে একটা ভয় ছিল, গিয়ে দাঁড়ালেই বাবা হয়তো ভীষণ খুশী হয়ে উঠবে, তারপর জিগ্যেস করবে, তা মাইনেপত্তর কত? তখন আর মাইনের অঙ্কটা মুখ ফুটে বলতে পারবো না। আমি বাড়ির বড়ছেলে, পড়াশুনোয় আমিই তো ভাল ছিলাম। আমার ওপরই ওদের আশাভরসা ছিল। অথচ আমার মেজভাই সুখেন্দু, ছোট-ভাই নবেন্দু কত চটপট ভাল চাকরি পেয়ে গেল। তখন থেকে আমি নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে গেছি। টিউশনিটা আমাকে আরো ছোট করে দিচ্ছিল। নবেন্দু একদিন বলেও ফেলেছিল, ওটা তুমি ছেড়ে দাও রাঙাদা, ওতে কোন ইজ্জৎ নেই। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। মনে মনে বলেছিলাম, তোরা তো জানিস না, আমার চাকরিটাতেও কোন ইজ্জৎ নেই। তারপর হঠাৎ মনে হয়েছিল, তুই তো দিব্যি বউ-ছেলে নিয়ে সংসার করছিস, আমার কে আছে, সন্ধ্যেটা কাটবে কি করে!

এটা কি কোন যুক্তি হ'ল। বিয়ে-থা করিনি বলে আমার কেউ নেই, নাকি সেজন্যেই আমার সব আছে। বাবা-মা, ভাইবোন, ভাইদের সংসার।

আর তো কেউ বাবার খবর নেয় না। রিটায়ার করা মানুষটা চুপচাপ বসে থাকে, কখনো-সখনো বইয়ের পাতা ওল্টায়, সকালের খবরের কাগজ সন্ধ্যেবেলাও তার কাছে বাসি হয় না। মা তবু ঝি-চাকরকে বকাবকি করে সময় কাটায়, রোদ পড়তে না পড়তে কাছে-কোথায় ভাগবত পাঠ হয় সেখানে গিয়ে বসে। মাঝে মাঝে সুখেন্দুর কাছে তীর্থে যাবার বায়না ধরে।

এমনি করেই চলছিল, হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটবে আমরা কেউই ভাবিনি। বাবার কোন হার্টের রোগ আছে আমাদের কোনদিন মনে হয়নি। তার একটা কারণ কি এই যে, আমাদের বাড়িতে বাবার দিকে তাকানোর কারো সময় ছিল না। বাবা চুপচাপ যখন বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে গা হেলিয়ে বসে থাকতো, সে-দিকে তাকালেই বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হ'ত, কারণ এক পলকের জন্যে তাকালেই মনে হ'ত বৃদ্ধ মানুষটার সমস্ত মুখে শুধু চাপ চাপ কষ্ট আঁকা আছে।

টিউশনি থেকে ফিরতে আমার একটু দেরীই হয়েছিল। ছাত্রের অঙ্কের পরীক্ষা তার পরের দিন। কিন্তু কি এমন দেরী। তখনো তো নবেন্দুরা সিনেমা থেকে ফেরেনি।

ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিলাম। হঠাৎ একটা চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। এরকম আতঙ্কের চেঁচামেচি কখনো শুনিনি। আমি দৌড়ে, দু'দুটো ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছি। আমার মেজভাই সুখেন্দু ওপর থেকে ছুটে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। 'রাঙাদা শিগগির ওপরে যাও', বলেই পাশ কাটিয়ে ছুটে নেমে গেল। আর তখনই মাকে দেখতে পেলাম সিঁড়ির মাথায়।

'খোকা, শিগগির আয়। তোর বাবা কেমন করছে।' বলতে বলতে মা দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলো। মা'র মুখেচোখে তখন ভয় আর কান্না।

আমি দৌড়ে ছুটে গেলাম—বাবার শোবার ঘরে, বারান্দায়, তারপর খাবার টেবিলে। মা খাবার টেবিলের কথা বোধ হয় চিৎকার করে বলেছিল, ভয়ে ভাবনায় আমি শুনতে পাইনি কিংবা বুঝতে পারিনি।

নমিতা, আমার ছোটবোন, বাবাকে ধরে দাঁড়িয়েছিল।

আমার মুখ ফুটে বেরুল, স্টুপিড। সুখেন্দুর উদ্দেশে।

আমি ছুটে গিয়ে একখানা তোষক টেনে নিয়ে এলাম খাট থেকে। পাশেই বিছিয়ে দিতে বললাম নমিকে।

আমি তখনো জানি না বাবার কি হয়েছে। শুধুই অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা। চোখের তারা দুটো কেমন অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেছে। সমস্ত শরীর নমিতার গায়ে ঢলে পড়েছে, বাবার মোটাসোটা চেহারার ভার ও যেন ধরে রাখতে পারছে না।

আমি বাবাকে ধরে রইলাম, তোষকটা পাতা হবার পর সবাই মিলে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম। নমিতা গিয়ে একটা বালিশ নিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, নমি, ডাক্তারবাবুকে ফোন করেছিস?

ও ঘাড় নেড়ে জানালো, না। তারপর বললে, মেজদা তো গেল, পাড়ার ডাক্তারকে ডাকতে!

আমি তখনো বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি। তবে একটা সন্দেহ উঁকি দিল, স্ট্রোক নয় তো! আমার চোখের সামনে কখনো কারো স্ট্রোক হয়নি। ঠিক কি যে হয় আমি নিজেও জানি না। অন্যের যখন হয়েছে কানে শুনেছি। কিন্তু সে-ঘটনা আমাকে স্পর্শও করেনি। প্রথমটা কিভাবে বোঝা যায় জানতেও চাইনি। স্ট্রোক তো আজকাল আকছার হয়, ওটা শুধুই খবর। এখন এটা একটা আতঙ্ক, একটা সমস্যা।

মা কাঁদতে কাঁদতে বললে, খৈ আর দুধ খাবে বললো, এক চামচও খেতে পারেনি। সবে তুলেছে মুখের কাছে, হাত থেকে চামচটা পড়ে গেল, মাথাটা ঝুঁকে পড়লো, চোখ দুটো কেমন হয়ে গেল...হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো মা, হ্যাঁ রে কি হয়েছে কিছু বুঝছিস, সুখু এল না কেন এখনো!

আমি টেলিফোনের কাছে ছুটে গেলাম। যাক্, তবু চাবি দেওয়া নেই। ওটা সুখেন্দুর টেলিফোন, সবাই যখন-তখন ফোন করে, চার্জ বেশি লাগে, তাই রেগে গিয়ে মাঝখানে চাবি দিয়ে রেখেছিল।

সুখেন্দু তখনই ফিরলো। হতাশভাবে বললে, ডাক্তারবাবু নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, আমাদের বাড়ির ডাক্তার, ডাক্তার দে'র নম্বরটা গাইডের ওপর লিখে রাখা উচিত ছিল। এই তাড়াহুড়োর সময় নম্বর খোঁজা এক ঝামেলা। যাক্, পাওয়া গেল। অনেক কষ্টে কানেকশন পেলাম। প্রতিটি মুহূর্ত পার হচ্ছে আর আমরা অধৈর্য হয়ে উঠছি। 'হ্যালো, ডাক্তার দে আছেন?'

উত্তর শুনেই আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ওরা বুঝতে পারলো।

মা বলে উঠলো, কি হবে-রে তাহলে?

আমি বুঝতে পারলাম, মা ভেঙে পড়ছে। ডাক্তারবাবু নেই, কলে বেরিয়ে গেছেন, একথাটাও আমি স্পষ্ট করে বলতে পারলাম না।

সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললাম, হাসপাতাল, হাসপাতালেই নিয়ে যাই, কি বলিস!

সুখেন্দু ঘাড় নাড়লো, নমিতার দু' চোখ ভাসিয়ে জল। মা'র মুখের দিকে আমি তাকাতেই পারলাম না।

পি জি—পি জি-তেই নিয়ো চলো। সুখেন্দু বলে উঠলো।

ওর আবার নতুন নাম হয়েছে, এস এস কে এম, তাই না! আমি টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললাম।

নমিতা বলে উঠলো, সুধার দাদাকে বলবো, ওদের গাড়িতে করে...

যদি স্ট্রোক হয়ে থাকে, স্ট্রোকই, বুঝতে পারছি, তাহলে তো গাড়িতে শোয়ানো যাবে না।

তবু বললাম, দ্যাখ একবার বলে...

না, পি জি'র নম্বরটা পেয়ে গেলাম। 'শুনছেন, একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবেন, এক্ষুনি...স্ট্রোক হয়েছে...

ও প্রান্ত বললে, এখানে তো অ্যাম্বুলেন্স নেই, ওয়ান ও টুতে বলুন। ওখানে বললেই চলে যাবে।

মা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে, থরথর করে কাঁপছে সেই হাতটা।

আমি কিই বা সান্ত্বনা দেব।

ডায়াল করতে করতে পেয়ে গেলাম।

ফোনে ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে মাকে বললাম, অ্যাম্বুলেন্স আসছে।

হঠাৎ পাখাটার দিকে চোখ যেতেই সুখেন্দুকে বললাম, এত স্পীডে পাখাটা ঘোরা কি ভাল!

নিজেও তো জানি না, ওতে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কিনা। আচ্ছা, এসময় দোকান থেকে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে এলে হয় না! যে-কোন মারাত্মক অসুখে তো অক্সিজেন দেয় শুনেছি। কিন্তু এখন কি আর ওষুধের দোকানটা খোলা পাবো!

আমি বাবার কাছে গিয়ে নাড়ি দেখার চেষ্টা করলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার নিজেরই তখন মাথা ঘুরছে।

আমরা সবাই এক-একবার করে এসে বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি, অ্যাম্বুলেন্স আসছে কিনা দেখছি। নমিতা সেই যে সুধার দাদাকে বলতে গেছে এখনো ফেরেনি। একটা মানুষ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ আমাদের কিছুই করার নেই। অপেক্ষা করা ছাড়া। মা তো সেই যে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবার মাথার কাছে বসে আছে, বসেই আছে।

নিজেকে কখনো এত অসহায় লাগেনি। যখন বেকার ছিলাম, একটা গ্লানি ছিল। এখনো আছে মাইনে অল্প বলে। অথচ এখন আমি একেবারে অকর্মণ্য। আমার নিজের যেন কিছুই করবার নেই। শুধু অপেক্ষা করো।

ঠিক এই সময়েই নমিতার পিছন পিছন সুধাদের বাড়ি থেকে অনেকে ছুটে এল। 'আসছে, সুধার দাদা আসছে গাড়ি বের করে নিয়ে।'

ওরা এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো বাবার দিকে তাকিয়ে। নমিতার কাছে ওদের নিশ্চয় শোনা হয়ে গেছে, কেউ কিছু জিগ্যেস করলো না। কে শুধু বললে, হার্টের কাছে ম্যাসাজ করলে হ'ত না!

আমার হঠাৎ মনে পড়লো, হাসপাতালে যেতে হলে কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। আমি নিজের অজান্তেই নিজের পকেটে হাত দিলাম।

তারপর সুখেন্দুকে বললাম, কিছু টাকা নিতে হবে, আছে তোর কাছে?

ও তাচ্ছিলোর ঘাড় নেড়ে বললে, নিয়েছি।

আর তখনই মা যেন আমার দিকে একবার তাকালো। সেই তাকানোর মধ্যে কোন ঘৃণা ছিল কিনা আমি জানি না। তুই তো বাড়ির বড় ছেলে, এখন চাকরি পেয়েছিস, বাপকে হাসপাতালে দেবার জন্যে ক'টা টাকাও তুই নিতে পারছিস না। না, মা নিশ্চয়ই এসব কথা ভাবেনি। কিন্তু আমি যে নিজেই ছোট হয়ে আছি,

এ ক'টা টাকাও যে আমার কাছে এখন নেই।

কে যেন বারান্দা থেকে চিৎকার করে উঠলো, অ্যাম্বুলেন্স আসছে, অ্যাম্বুলেন্স।

সুখেন্দু ছুটে নেমে গেল।

আর মা শব্দ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। নমিতাও।

আমার তখন আর কোন মনের জোর নেই। আমার মনে হচ্ছিল হাসপাতালেই হয়তো বাবাকে দিয়ে আসতে হবে।

একটু পরেই স্ট্রেচার হাতে অ্যাম্বুলেন্সের লোকরা এল। বাবাকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে ওরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো। আগে আর পিছনে আমরা।

মা'র গলা শুনলাম, আহা, আস্তে আস্তে সাবধানে নিয়ে চলো, লাগবে যে। আসলে সিঁড়িতে যদি কোথাও ঠোকা লাগে এই ভয়।

সুধার দাদা তখন গাড়ি বের করেছে।

আমি অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে উঠতে বললাম, মা, তোমরা গাড়িতে এসো।

মা শুনলো না। তখনই লক্ষ করলাম মা'র হাতে একটা হাতপাখা। সারাটা পথ বাবাকে ছুঁয়ে রইলো। যেন ছুঁয়ে না থাকলেই কেউ বাবাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। একটা হাত বাবার বুকের ওপর, অন্য হাতে অবিরাম হাতপাখা নাড়ছে মা।

অ্যাম্বুলেন্সের আবছা অন্ধকারে বসে আমার বুকের ভেতরটা দুরদুর করে কাঁপছিল। যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটে যায়, মা'র মুখের দিকে তখন আর তাকানো যাবে না। মাকে তখন আমরা কি করে সামলাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

স্ট্রেচারে করে বাবাকে যারা তুলে আনলো তারা আমার পাশেই বসেছিল, নিজেদের মধ্যে কি কথা বলছিল, তার একটা বর্ণও আমার কানে যাচ্ছিল না। আবছা অন্ধকারে আমি বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। মা'র মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

অ্যাম্বুলেন্স তখন চলতে শুরু করেছে, কিন্তু কি আস্তে আস্তে। আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, একটু তাড়াতাড়ি চালান ভাই। যারা স্ট্রেচার বয়ে এনেছিল তাদেরই একজন বললে, হার্টের পেশেন্ট বলেই আস্তে যাচ্ছে, ঘাবড়াবেন না, ঠিক পেঁৗছে যাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হাসপাতালে পেঁৗছে গেলাম। অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে দাঁড়ালো একেবারে ইমারজেন্সির সামনে। পিছনে পিছনে সুধার দাদার গাড়ি করে নমিতা আর সুখেন্দু।

আমি ভেবেছিলাম ইমারজেন্সিতে অনেকক্ষণ দেরী করবে। অনেক দিন আগে একবার একটা অ্যাক্সিডেন্টের কেস নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। তখন তো অনেক দেরী করেছিল। যেন ফর্ম ভর্তি করা, টাকাপয়সা দেওয়াটাই বেশী জরুরী, মানুষের জীবন বাঁচানোর চেয়ে।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচারওয়ালারা বাবাকে নামালো না, শুধু নিজেরা নেমে পড়ে ইমারজেন্সিতে এসে দাঁড়াতেই আমিও ডাক্তারের কাছে ছুটে গেলাম। উদ্বেগের গলায় আমি কি বললাম, নিজেই জানি না। তিনি একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, একবার মা'র মুখের দিকে। আমি অনুনয়ের কণ্ঠে বলে উঠলাম, বাবাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।

বাবাকে দ্রুত কি-সব পরীক্ষা করলেন তিনি।

ধীরে ধীরে আমার দিকে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন, এটা কি থার্ড অ্যাটাক?

আমি ভেঙে পড়া গলায় বললাম, বোধহয়। তারপরই কি মনে হতে বলে উঠলাম, ঠিক জানি না।

ডাক্তারের চোখে এক নিমেষের মধ্যে বিরক্তি কেঁপে গেল। ঈষৎ শ্লেষের সুরে তিনি বললেন, আপনি তো বললেন, আপনারই বাবা!

অর্থাৎ থার্ড অ্যাটাক কিনা জানো না, কিরকম ছেলে তুমি? বাপের এটুকু খবরও রাখো না।

কিন্তু বাবার হার্টের কোন রোগ আছে আমরা তো জানতাম না। বাইরে থেকে কখনো তো কিছু বোঝা যায়নি। তবু, থার্ড অ্যাটাক কিনা এই প্রশ্নের জবাবে আমার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল—'বোধহয়'। আমি তো শুনেছি থার্ড অ্যাটাকই সবচেয়ে ভয়ের, তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে, যাতে চিকিৎসার একটুও দেরী না করে বসেন উনি, আমি ঐ উত্তরটা দিয়ে বসলাম। পরক্ষণেই হয়তো ভয় হলো, থার্ড অ্যাটাক বলার ফলে যদি কোন ভুল চিকিৎসা করে বসে, তাই হয়তো শুধরে দেবার জন্যে বললাম, ঠিক জানি না।

আপনি তো বললেন, আপনারই বাবা! ডাক্তারের কথায় হয়তো শ্লেষ ছিল না, তবু সেটা আমার বুকের মধ্যে এসে বিঁধলো। আমি অন্যদিকে মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখলাম, সুখেন্দুর পিছনে দাঁড়িয়ে নমিতা অঝোরে কাঁদছে। আর আশ্চর্য, মা কেমন সান্ত্বনার মত নরম করে তার কাঁধে একখানা হাত রেখে বললে, কাঁদিস না, চুপ কর; ও তো ভাল হয়ে যাবে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম, মা কি করে এত শক্ত হলো, আমি যে নিজের পায়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

ঠিক তখনই ডাক্তারবাবু স্ট্রেচারওয়ালাদের কি যেন বললেন, বোধহয় ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার কথা। ওরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে স্টার্ট দিল। আমরা সবাই সেদিকে পা বাড়িয়েছিলাম। উনি আবার বললেন, একজন থাকুন।

আমি সুখেন্দুকে বললাম, ফর্মটর্ম কি ফিলআপ করতে হবে, তুই থাক্।

আসলে বাবার জন্যে উদ্বেগ, তাড়াতাড়ি গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাব জন্যেই, নাকি হাত পেতে ওর কাছ থেকে টাকাটা নিতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছিল বলে? আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, বাবার জন্যে আমি তো কখনো কিছু করতে পারিনি, অন্তত হাসপাতালে ভর্তি করার টাকাটাও আমি যদি দিতে পারতাম!

আমরা প্রায় ছুটতে ছুটতে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে পিছনে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি। কেবলই মনে হচ্ছিল, দেরী হয়ে যাচ্ছে, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

তখনই আমার মাথার মধ্যে একটা কথা এসে ধাক্কা দিল। ডাক্তারবাবুর সেই কথাটা। এটা কি থার্ড অ্যাটাক? মুহূর্তের জন্যে সেই পরিচিত দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বাবার মুখ। বারান্দার ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে মানুষটা চুপচাপ বসে আছে, মুখে চাপা কষ্টের ছাপ।

থার্ড অ্যাটাক, থার্ড অ্যাটাক। একটা কি আমি নিজেই? জানি না।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একটা বেডে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বাবাকে। ডাক্তার আর নার্সের দল পর পর কি যেন করে যাচ্ছে।

'আপনারা সরে যান, বাইরে গিয়ে দাঁড়ান', কে যেন বললে। মা নড়লো না, বেডের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। আমি আর নমিতা পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর সেখান থেকেই উঁকি দিয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, বাবাকে বাঁচানো যাবে কিনা। ডাক্তার আর নার্সদের মুখে ঈষৎ দুশ্চিন্তা দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে উঠছিল। যে-কোন একজনের মুখে

নিশ্চিন্তভাব দেখলেই মন বলে উঠছিল, বাঁচানো যাবে, বাঁচানো যাবে। ঠিক তখনই ওয়ার্ডবয়টা বললে, 'সরে যান, ও টি-তে যাবে।' ও টি মানে তো অপারেশন থিয়েটার। কথাটা শুনেই কেমন ভয় পেয়ে গেলাম।

করিডরে দাঁড়িয়ে আমি তখন ক্লান্ত অবসন্ন। হঠাৎ সুখেন্দুর কথায় আমি ফিরে তাকালাম। পাশেই সুধার দাদাকে দেখে বলে উঠলাম, তুমি! হাত তুলে রিস্টওয়াচে সময় দেখে চমকে উঠলাম। এত সময় চলে গেছে? বললাম, রাত অনেক হয়েছে, তুমি ফিরে যাও ভাই। বরং নবেন্দুকে খবরটা দিয়ে দিও।

যেন নবেন্দুকে খবর দেবার মত কেউ নেই সেখানে। মুহূর্তের জন্যে নবেন্দুর ওপর আমার ভীষণ রাগ হলো। নবেন্দু আর জয়ার ওপর। সুধার দাদা কি ভাবছে কে জানে। যখন অ্যাম্বুলেন্স এল বাড়ির দরজায়, সুধারা ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছিল, বোধহয় সুধা একবার জিগ্যেস করেছিল, রাঙাদা, ছোড়দা কোথায়? আমি স্পষ্ট করে বলতে পারিনি, সিনেমায় গেছে। এখন তো সুধার দাদা ফিরে গিয়ে বলবে, বাপ হাসপাতালে, ছোটছেলে বউকে নিয়ে সিনেমা দেখছে। হয়তো হাসাহাসি করবে। আমি মনে মনে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলাম নবেন্দুর গালে। পরক্ষণেই মনে হলো, আহা, ও বেচারীদের কি দোষ। ওরা কি করে জানবে আজকেই বাবার স্ট্রোক হতে পারে। স্ট্রোক, স্ট্রোকই তো বলে? বাবার এটা কি হার্ট অ্যাটাক, নাকি সেরিব্রাল কিছু? ডাক্তারদের একবার জিগ্যেস করেছিলাম, ওঁরা বোধহয় শুনতে পাননি, কিংবা জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। একজনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখেছিলাম। তিনি পেশেন্টকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, আমাদের কথার যে উত্তর দেননি তার জন্যে আমার কোন রাগ নেই।

আমি বারবার করিডরের ওপ্রান্তের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আশা করছিলাম নবেন্দু আর জয়া এসে পড়বে। সংগে হয়তো তিলুকেও আনবে। নবেন্দুর চার বছরের মেয়ে তিলু। নাকি তাকে খাইয়েদাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবেই আসবে বলে এত দেরী হচ্ছে।

কে জি আর পড়াশুনোর ফাঁকে তিলু যখনই বাবার কাছে যেত, বাবার মুখের সব কষ্টের রেখাগুলো সরে যেত। তিলুই বলতে গেলে আমাদের বাড়ির হৃৎপিন্ড। ছন্নছাড়া বিস্বাদ জীবনের একমাত্র আনন্দ। অথচ, বাবাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসার সময় আমরা কেউই তিলুর কথা ভাবিনি। ও বোধহয় ঝি কমলার মায়ের কাছে ছিল। নাকি সুধার কাছে। জয়া আর নবেন্দু কি সেজন্যেই রাগ করে আসছে না? বাঃ রে, বাড়িতে হঠাৎ কারো স্ট্রোক হলে তখন কি ওসব দায়দায়িত্বের কথা মনে থাকে!

বাবাকে ওরা কোথায় যেন নিয়ে গেল। একজন নার্স বেরিয়ে আসতেই আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। কাঁচুমাচু মুখে জিগ্যেস করলাম, ডাক্তারবাবু কি বললেন, বাঁচানো যাবে তো! নার্স আমার মুখের দিকে তাকালেন, প্রথমটা নির্বিকার ভাবে, তারপর আমার মুখের চেহারা দেখে একটু নরম হলেন। বললেন, দেখছেন তো সব ব্যবস্থাই হচ্ছে।

আমি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলাম, অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল কেন?

উনি মৃদু হাসলেন, বললেন, পেস মেকার লাগাতে হবে না?

ওঁর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা নিশ্চিন্ত ভাব ছিল। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েই ভরসা পেলাম।

করিডরের এক কোণায় একটা টুল ছিল, আমি মাকে ধরে বসিয়ে দিলাম। একটা হাত মা'র কাঁধে রেখে মাকে ধরে রইলাম। মাথা ঘুরে পড়ে না যায়।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঘন্টা দুয়েক তখন কেটে গেছে। অথচ আমরা সেই একই জায়গায়।

আমি বোধহয় তিলুর কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খুট খুট জুতোর শব্দে চমকে ফিরে তাকালাম করিডরের ওপ্রান্তে সিঁড়ির বাঁকটার দিকে। প্রথমটা ভেবেছিলাম কোন নার্স বোধহয়। কিন্তু চোখ পড়তেই বিস্ময়ে আনন্দে একটা শিহরণ খেলে গেল। আমি সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকালাম। সুখেন্দুও দেখেছে। ওর মুখে কোন খুশীর ছায়া পড়লো, না, অস্বস্তির, আমি বুঝতে পারলাম না।

২

বাড়িতে একটা গুরুতর অসুখ মানেই যেন একটা প্রকাণ্ড উৎসব। সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমার। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের খবর দিতে হবে। না দিলেই যেন মস্ত অপরাধ। মামাবাবুর এতবড় একটা অসুখে একটা খবর দিলে না, তোমরা কি গো! অথচ খবর দিলেই হুড়মুড় করে অনেকে এসে পড়বে, তাদের চা-জলখাবার, কারো রাতের খাওয়া। রান্নার ঠাকুরটা সামলাতে না পেরে মেজাজ দেখাবে। তখন আর দুশ্চিন্তা রুগীকে নিয়ে নয়, অতিথি আপ্যায়নের। কেউ আবার বলে বসবে, বাড়িতে ভীষণ ঝামেলা, কিংবা ছেলের পরীক্ষা, যেতে পারছি না রে, কিন্তু একবার করে খবরটা দিয়ে যাস, কেমন থাকে। এর নাম সামাজিকতা।

ছেলেবেলায় নবেন্দুর একবার খুব অসুখ হয়েছিল। আমার মনে পড়লো। বাবার কি দুর্ভাবনা তখন ওকে নিয়ে। রাত জাগা, নবেন্দুর মাথায় আইসব্যাগ ধরে বাবা বসে আছে, বসে থাকতে পারছে না। মা জোর করে আইসব্যাগটা ছিনিয়ে নিলো, তুমি অসুখে পড়লে কে দেখবে। আসলে মাকে দেখেও বোঝা গেল জেগে থাকতে পারবে না, বাড়িতে যত লোকের আনাগোনা হয়েছে মাকেই তো দেখতে হয়েছে সবদিক। তখন ক্লান্ত। আমি মাকে হাত ধরে উঠিয়ে দিতে গেলাম, ওঠো তো, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি আছি। মা কেঁদে ফেললো। বললে, হ্যাঁ রে তোরা কেউ কি আমাকে নবুর কাছে একটু বসতে দিবি না, সারাদিন শুধু ঝি-চাকরের মত খেটেই যাবো! আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, সত্যি, এত আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনায় মা তো সারাদিন একবারও বসতে পায়নি নবেন্দুর কাছে, এসেছে, কপাল ছুঁয়েছে, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেছে।

নবেন্দু আর জয়ার আসতে দেরী হচ্ছিল বলে সেজন্যেই আমার রাগ। মনে মনে ওর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম। জয়া জানে না, কিন্তু তুই তো জানিস।

আমরা উদ্বেগে করিডরে পায়চারি করছিলাম, পা টিপে টিপে। জুতোর শব্দ হলে ডাক্তাররা হয়তো এখানেও দাঁড়াতে দেবে না। বলবে নীচে গিয়ে অপেক্ষা করতে।

খাকি পোশাকের ওয়ার্ডবয়টা এই সময় বেরিয়ে এল।

মা কি ছেলেমানুষ হয়ে গেছে, ওয়ার্ডবয়-এর হাতখানা ধরে কি-সব অনুনয়-বিনয় করছে। যেন ও ডাক্তার। ওয়ার্ডবয় অস্বস্তিতে হাসছে। নাকি এসব দেখতে ও অভ্যস্ত। মা এখন ওকে ছুঁয়েছে, অনুনয় করছে, কিন্তু স্থির জানি বাড়ি গিয়েই স্নান করবে। অবশ্য ঠিক সে-জন্যে নয়, তিলু যখন হলো, নার্সিং হোমে, তখন তো মা প্রতিদিনই স্নান করতো নার্সিং হোম থেকে ফিরে। ওটাকে ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক বলবো কি করে। যতই হোক্ হাসপাতাল তো।

কাঁচাপাকা চুল, খুব ফর্সা রঙ সৌম্যদর্শন একজন ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, ওদিকে কোথায় যেন চলে যাচ্ছিলেন, আমি উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। মা আমার পিছনে পিছনে। আমি কিছু প্রশ্ন করার আগেই উনি বলে উঠলেন, উই আর ডুইং আওয়ার আটমোস্ট, এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না।

উনি চলে গেলেন, আর অপরেশন থিয়েটারের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি উঁকি দেবার চেষ্টা করলাম। কিছুই স্পষ্ট করে দেখা গেল না। শুধু একরাশ যন্ত্রপাতি, রবারের নল, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ঝোলানো বোতল ইত্যাদি। সমস্ত ব্যাপারটা মিলেমিশে যেন একটা ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে।

পাছে কেউ এসে আমাদের ধমক দেয়, আমরা পা টিপে টিপে সরে এলাম। আর তখনই রীণার দিকে মা'র চোখ পড়লো। অবাক আমিও হয়েছিলাম। ও কি করে খবর পেল। কেউ কি ফোন করে ওকে জানিয়ে দিয়েছে, সুধাদের কেউ? কিন্তু ও এসেছে এটাই আশ্চর্য। তা হলে কি আমবা যতটা ভাবছি ততখানি নয়! রীণাকে নিয়েই আমাদের বাড়িতে অনেক অশান্তি, অনেক দুর্ভাবনা।

মা রীণাকে দেখেই ছুটে গেল। ওকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে মা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। আমি রীণার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কোন ভাবান্তর হয় কিনা। না, রীণার তেমনি গম্ভীর থমথমে মুখ। হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে। ওটা রীণার অস্বস্তি বা সংকোচ হতে পারে। সুখেন্দু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি বা নমিতাও তো ওর সংগে গিয়ে কথা বলিনি। আমি তো কথা বলতাম, জয়ার সংগেও বলি। সুখু আর নবুর কথায় মা তো অনেক কিছুই মেনে নিয়েছিল। আমাকেও মেনে নিতে হয়েছিল। রীণার কোন সংকোচ ছিল না, প্রথম প্রথম সংকোচ ছিল আমারই। এখন আছে, অন্য কারণে।

ঠিক তখনই নবেন্দু আর জয়া এসে হাজির হলো। জয়ার অত সাজপোশাক আমার ভাল লাগলো না। সংগে সংগে মনে পড়ে গেল ও তো সিনেমায় গিয়েছিল। সেই পোশাকেই এসেছে। হয়তো বদলানোর সময় পায়নি।

নমিতাকে ধমকের সুরে নবেন্দু কি যেন বলছে চাপা গলায়। আমি এগিয়ে গেলাম।

—কি রে, খবর দেয়নি কেউ তোদের, এত দেরী হলো! আমি বললাম।

নবেন্দুর মুখে অভিমান থমথম করছে। ও অভিমানের স্বরেই বললো, তিলুর কথাটা তোমরা কেউ ভাবলে না, সুধাদের বাড়িতে ওকে দিয়ে এলেও তো পারতে।

জয়া ধীরে ধীরে অনুযোগ করলে, ঝি কমলার মা ওকে নিয়ে কোথায় আড্ডা দিতে গিয়েছিল, আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান। ঠাকুর বললে, কমলার মা'র সংগে বেরিয়ে গেছে।

আশ্চর্য, এতক্ষণ আমি ওদের ওপর রাগ করছিলাম। এখন ওদের মুখচোখ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছি কি উদ্বেগের মধ্যে ছিল ওরা। আমি তো বিয়ে-থা করিনি, আমার ছেলেমেয়েও নেই। সেজন্যেই বোধহয় বাবার জন্যে আমার এত চিন্তা, এত কষ্ট। তিলু হারিয়ে গেছে ভেবে বাবার অসুখটা ওর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু নবেন্দু, ভেবে দ্যাখ, এই উৎকণ্ঠা নিয়েই কিন্তু বাবা তোকেও মানুষ করেছেন। এমন ভাবনা কতবার ভাবতে হয়েছে।

'এটা কি থার্ড অ্যাটাক?' ইমার্জেন্সির ডাক্তার জিগ্যেস করেছিলেন।

করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাসপাতালের পরিচিত সেই গন্ধটা নাকে এসে লাগলো। নাকি ঐ গন্ধটা সম্পর্কে এতক্ষণে আমি সচেতন হলাম! ঐ গন্ধটার মধ্যেই যেন উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ লুকিয়ে আছে। ঐ গন্ধটা যেন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ এবং মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ মানুষের মাঝখানে উৎকণ্ঠার অদৃশ্য দেয়াল একটা।

বাবার হার্টের রোগ থাকতে পারে একথাটা আমরা কেনই বা ভাবিনি। মানুষটা যে ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল সেটা তো আমরা সবাই বুঝেছিলাম। বার্ধক্য, বার্ধক্যই তো এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ তার চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে, যার সঙ্গে মানিয়ে চলা কঠিন। সে শুধু দেখে আর কষ্ট পায়, একটু একটু করে একলা মানুষ হয়ে যায়। কারণ সে যে শুধু ভালবাসতেই জানে।

সুখেন্দুর জন্যে বাবার খুব কষ্ট, আমাদেরও।

সুখেন্দুর জন্যে বাবা আর আমি মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। তার জন্যে কখনো কখনো আমার নিজেকে অপরাধী লাগে।

বাড়িতে কেউ আমার বিয়ের কথা তোলেনি। কেনই বা তুলবে, আমি যে তখনো রোজগেরে ছেলে হয়ে উঠতে পারিনি, চাকরি-বাকরি ছিল না। বিয়ের গোপন ইচ্ছে ভিতরে ভিতরে কার না থাকে। আমারও ছিল। আমি নিঃশব্দে একজনকে ভালবাসতাম। ভালবাসা পরমার্থ হতে পারে, কিন্তু তাকেও টাকার পায়ে দাঁড়াতে হয়।

সুখেন্দু চটপট একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেল। এমন একটা সুখবরে সারা বাড়িতে তখন উল্লাস। আমাকেও সেই উল্লাসের ভাগ নিতে হলো।

মা এসে বললে, শুনেছিস খোকা, সুখু একটা চাকরি পেয়ে গেছে, ভাল চাকরি।

আমি নিরাসক্ত ভাবে বললাম, তাই নাকি! কোথায়?

মা বললে, সে-সব ছাই আমি কি বুঝি নাকি। সুখুকে জিগ্যেস করিস, তোর বাবা জানে।

আমি আর কোন কথা বলিনি, বলতে পারিনি। মা নিশ্চয় আমার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল, তাই আর কথা বাড়ায়নি। বরং সেদিন রাত্রে খাবার সময় সামনে বসে আমাকে একটু বেশি আদর করে খেতে দিয়েছিল। আমার তখন ক্ষিদে চলে গেছে। কেউ যদি এটাকে ঈর্ষা বলে, বলার কিছু নেই। আমার নিজের তো ধারণা, আমার ঈর্ষা হয়নি। বরং সমস্ত পরিবারের কথা ভেবে একটু সান্ত্বনাই পেয়েছিলাম। তবে স্বীকার করতেই হবে, নিজেকে খুব অপমানিত লেগেছিল। যেন আমি একটা অপদার্থ। কারণ তার আগেই বাবার রক্ত-জল-করা টাকা নিয়ে ছোট একটা ব্যবসা করতে গিয়ে বেশ কিছু লোকসান

দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নিয়েছি। একে-ওকে ধরেও একটা চাকরি জোটাতে পারিনি। কারণ তখন বাজারে চাকরি ছিলই না। যখন সিচুয়েশনস্ ভ্যাকান্টে বিজ্ঞাপন বাড়লো তখন সবাই ইয়াং চায়, আমরা তো না পেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, আমাদের জন্যে আর কে ভাবে। শুধু নিজের হাতখরচা চালানোর জন্যে টুইশনিটা করতাম, তাই রক্ষে।

সেই তখন থেকেই হয়তো বাবার ভিতরে ভিতরে ক্ষয় শুরু হয়েছিল।

আবার একটা আঘাত যে পাবো আমি নিজেও ভাবিনি। মাসের শেষে সুখেন্দুর মার হাতে কত কি তুলে দিত আমি জানতাম না, জানতে চাইওনি। শুধু প্রথম মাসে, মা যে-শাড়িটা পরেছিল, সেটা দেখিয়ে মা হাসি-হাসি মুখে বলেছিল, শাড়িটা সুখু দিয়েছে রে! আমি দেখে বলেছিলাম, বাঃ খুব সুন্দর তো, ওর পছন্দ আছে। মা হেসেছিল, তুই যাই বলিস, এসব হালফ্যাশান আমার ভাল লাগে না। কথাটায় মা আমাকে একটু খুশী করতে চেয়েছিল। আমি যে মাকে এর আগে দু-দু'বার শাড়ি দিয়েছি, একবার ব্যবসা শুরু করার সময়, একবার টুইশনির টাকা বাঁচিয়ে, একটা খুব চওড়া জরিপাড় শাড়ি। টকটকে লালের ওপর সোনালী জরি। মা'র খুব পছন্দ হয়েছিল, কোথাও যেতে আসতে ওটাই পরতো। দু'একজন খুব নিকট-আত্মীয় শাড়ির পাড়ের প্রশংসা করতেই মা বলেছে, খোকা দিয়েছে। আমার শুনে খুব ভাল লাগতো, আর ইচ্ছে হ'ত একটা খুব ভাল চাকরি পেয়ে যেতে। তা হ'লে মাকে আমি আরো অনেক কিছু দেবো।

কিন্তু সে-সব স্বপ্নই রয়ে গেল। তার বদলে একদিন লজ্জায় অপমানে আমার সমস্ত মুখ সাদা হয়ে গেল। একটা তুচ্ছ ঘটনায়।

সন্ধ্যের সময় আমি সবে বাড়ি ফিরেছি। এবাড়ির একতলা আর দোতলা আমাদের, অনেককাল আগে নেওয়া বলে ভাড়া কম। তেতলায় অন্য ভাড়াটে। ওরা ছাদটা ব্যবহার করতে পায়। বলেছি না, ছাদটা থাকলে বাবা সকাল সন্ধ্যে একটু পায়চারি করতে পারতো। কাছেপিঠে পার্কও নেই যে সেখানে গিয়ে বেঞ্চে রিটায়ার্ড লোকদের পাশে বসে গল্পগুজব করে কাটিয়ে আসবে। একটু ফাঁকা হাওয়া, একটু সবুজের ওপর চোখ বোলাতে পেলে বাবা এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতো না। বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে আসতে হ'ত না।

যা বলছিলাম, ঐ ছাদটা থাকলে আমি সেদিন ছাদেই পালিয়ে যেতাম।

বাড়িতে ঢুকতেই দেখি নীচে বসার ঘরে খুব হাসাহাসি হইহল্লা। আমি উঁকি দিয়েই ওপরে উঠে চলে এলাম। দেখলাম, বেশ ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা, মানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবা গল্প করছে হেসে হেসে। বাবা তখনো রিটায়ার করেনি, আপিসের লোকদের তো দেখেছি সব প্যান্ট-কোট পরে আসতো। তাই একটা কৌতূহল হলো ওরা কেন এসেছে জানবার।

দোতলায় উঠে এসেও দেখি খুব হাসাহাসি। সুখেন্দু কেমন লাজুক লাজুক মুখ করে হাসছে। মা হাসছে, ছোটভাই নবেন্দু হাসছে, নমিতা হাসছে।

কানে এল, নমিতা বলছে, না বাবা দরকার নেই, শেষে আমার সিনেমার টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। মেজদা, দেখো বাপু, তুমি তখন কিপটে হয়ে যেও না।

দেখলাম সুখেন্দু রাগ দেখাবার জন্যে ওর চুল ধরে টেনে দিলো।

আর আমাকে দেখেই ওদের হাসাহাসিটা কেমন যেন মিইয়ে গেল। একে একে ওরা সবাই সরে গেল ওখান থেকে।

কিছুক্ষণ পরে নমিতাকে একা পেয়ে আমি ডাকলাম, এই নমি শোন!

ও মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ালো।

আমি জিগ্যেস করলাম, ওরা কারা?

নমিতা হাসবার চেষ্টা করেও হাসতে পারলো না। বললে, মেজদার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছে।

একটু থেমে সত্যি হেসে ফেললো। বললে, এখন থেকে কথা বলে রাখছে শুধু ওরা, বাবা তা বলেই দিয়েছে তোমার বিয়ের পর সে-সব কথা।

আমি হেসে বললাম, তাই বুঝি!

আমি যদিও হাসলাম, নমিতা আমার মুখ দেখে কিছু বুঝলো কিনা জানি না, ও সরে গেল আস্তে আস্তে।

আমার নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছিল। লজ্জায় অপমানে কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল। তখনো আমার এমন কিছু বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়নি। আমিও যে তখন বিয়ের জন্যে হা-পিত্যেশ করছি তা নয়। তবু আমি নিজের কাছেই যেন ছোট হয়ে গেলাম। এই অপমান আর লজ্জা থেকে বাঁচবার একটাই উপায়।

আমি দুম্ করে গিয়ে মাকে বললাম, মা শোনো, একটা কথা আছে।

মা চোখ তুলে তাকালো। মা'র চোখে প্রশ্ন।

আমি বললাম, সুখেন্দুর বিয়ে দিয়ে দাও তোমরা। আমি আগে বলিনি তোমাদের, আমি কিন্তু কোনদিনই বিয়ে করবো না।

মা অবাক হয়ে বললে, সে কি রে! তাই কি কখনো হয়।

হাসতে হাসতে বললাম, সবাইকে বিয়ে করতে হবে কেউ কি মাথার দিব্যি দিয়ে গেছে নাকি। আমি অনেককাল আগে থেকেই ভেবে রেখেছি। আমি কোন-দিন বিয়ে করবো না।

সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। ইনুকে নিয়ে আমি এখনো স্বপ্ন দেখি। কিন্তু মা আমার কথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে বসলো।

৩

শেষ অবধি আমাদের করিডরেও দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না।

তখন রাত দেড়টা। মেট্রন এসে বললেন, আপনারা এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন, বাড়ি চলে যান। শুধু একজন থাকুন।

আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ওঁকে খুব নির্দয় মনে হলো। এ-সময় কেউ বাড়ি চলে যেতে পারে? যেখানেই যাও হাসপাতালটা তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেই বা কি লাভ। তাছাড়া হঠাৎ যদি কিছু একটা হয়, কিংবা ওষুধপত্তর ইত্যাদি কিছু প্রয়োজন হ'লে ও'রা খবর দেবেন নাকি। হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের একটুও বিশ্বাস নেই। কত কি তো শুনি, কাগজে বেরোয়।

মা অনেক অনুনয়-বিনয় করলো, মেট্রন নাছোড়বান্দা। ঠিক সেই সময়েই ডাক্তার সাহা বেরিয়ে এলেন। ওয়ার্ডবয়টার কাছেই বোধ হয় ও'র নাম জেনে-ছিলাম। ই সি জি করবেন, না এমনি কি একটা বলেছিল সে। মা উৎকণ্ঠার

স্বরে তাঁকে জিগ্যেস করলো, কেমন আছে ও ডাক্তারবাবু! আমি জানি এ-প্রশ্নের কোন মানেই হয় না। তবু তো আমরা না জিগ্যেস করেও পারি না।

ডাক্তার সাহা বললেন, আমরা তো যথাসাধ্য করবোই, কিন্তু এখনই কিছু বলতে পারছি না। অন্তত আটচল্লিশ ঘন্টা না গেলে...হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একজন কেউ থাকুন, চলে যাবেন না।

তারপর আমার দিকে ফিরে উনি কি-সব বোঝাতে চাইলেন। ই সি জি, প্রেসার, পেস-মেকার বা ঐ ধরনের কি-সব অচেনা শব্দ এবং সংখ্যা। আমি তার কি বুঝি!

ডাক্তার সাহা আবার বললেন, একজন কেউ থেকে বাকী সব চলে যান এখন, বরং টেলিফোনে খবর নেবেন।

মনে পড়লো ফর্মে টেলিফোন নম্বরটা লিখে দিতে বলেছিলাম সুখেন্দুকে।

—দিয়েছিস তো? ওকে জিগ্যেস করলাম।

ও ঘাড় নাড়লো।

ডাক্তার সাহা বললেন, আপনিই থাকছেন তো? তা হ'লে এনকোয়ারিতে গিয়ে বসুন, দরকার হ'লে খবর দেবো।

'একজন কেউ থাকুন'। আমরা থাকতেই চাইছিলাম। কিন্তু উনি নিজে থেকে প্রথমেই একজনকে যখন থাকতে বললেন তখনই আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। এতক্ষণ ওঁদের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, এখন মনে হলো, তবে কি কোন আশাই নেই!

আমরা আর-কোন উপায় নেই দেখে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলাম। আর তখনই লক্ষ করলাম রীণা কখন নিঃশব্দে চলে গেছে।

নমিতাকে জিগ্যেস করলাম, কখন চলে গেল রীণা? ওকে দেখছি না তো!

নমিতা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, বউদি তো তখনই চলে গেছে, আসার কি দরকার ছিল জানি না।

এটুকু রাগ ওদের হবারই কথা। আমারও তো মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগ হয় ওর ওপর। ও আমাদের সংসারের একটা লজ্জা। একটা আতঙ্ক।

আমি নিজের মনেই বললাম, খবর পেল কি করে কে জানে!

—জিগ্যেস করেছিলাম, বললো না। শুধু বললে ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

—ন্যাকামি! নমিতার কথায় উষ্মা।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। সুখেন্দুর কানে গেলে অস্বস্তি লাগবে ওর। ওরই তো সবচেয়ে বড় লজ্জা।

শেষে নবেন্দু আর জয়ার সঙ্গে নমিতাও চলে গেল। সুখেন্দুও। আমি আর মা থেকে গেলাম, যতক্ষণ থাকা যায়।

মাঝরাত্রির নিঃশব্দ পরিবেশে হাসপাতালের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম। দূরে কোথায় একটা ট্যাক্সির হর্ন শুনলাম। নবেন্দুরা বোধহয় ট্যাক্সি পেয়ে যাবে, হাসপাতালের কাছে পাওয়া যায়।

অনেক দূরের কোন ওয়ার্ডে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ। একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকলো। আমাদের ওয়ার্ডের ওপর তলায় কার একটা খুট খুট খুট খুট জুতোর শব্দ। হয়তো কোন নার্স, কিংবা মেট্রনের। ডাক্তারদের জুতোর শব্দ অন্যরকম, তার মধ্যে কেমন একটা আত্মবিশ্বাস আছে।

হঠাৎ ওপরে কোথায় দু-তিন জোড়া জুতোর দ্রুত হেঁটে যাওয়ার শব্দ কানে

আসতেই ভয় পেয়ে গেলাম। দেখলাম মা সোজা হয়ে বসে শব্দটার মধ্যে কোন আতঙ্ক আছে কিনা বোঝবার চেষ্টা করছে। একবার কি পা টিপে টিপে ওপরে গিয়ে দেখে আসবো? সাহস হলো না।

নবেন্দু আর জয়া যেন পা বাড়িয়েই ছিল, দিব্যি একবার বলতেই চলে গেল। অবশ্য ওদের দোষ দেওয়া যায় না। তিলুকে রেখে এসেছে সুধাদের বাড়ি, তাছাড়া এখানে আসার আগে তিলুকে পায়নি বলে ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। হয়তো সুধাদের বাড়িতে দিয়ে এসেও দুশ্চিন্তাটা রয়েই গেছে।

সুখেন্দু অবশ্য যেতে চায়নি। হঠাৎ মনমেজাজ খারাপ হয়ে গেল বলেই হয়তো চলে যেতে রাজী হলো। রীণাকে দেখে ও একটুও খুশী হয়নি। বেশ তো ভুলে ছিল, হয়তো দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে।

রীণা যে এল এটাই আশ্চর্য।

বাবা যত্ন করে বাগানটা সাজাতে চেয়েছিল। বাড়িটাকে। কোনদিন নিজের জন্যে একটা বাড়তি পয়সা খরচ করেনি। প্রথম প্রথম সুখেন্দুর জন্যে বাবার কি গর্ব ছিল। রীণার জন্যেও।

বাবার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল ছিল। খুব মজার মজার কথা বলতো এক-এক সময়। হাসতো এবং হাসাতো। কিন্তু জানতাম তার আড়ালে একটা কষ্ট আছেই।

গাছ যত বড় হয়, ডালপালা সব ততই পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু গুঁড়িটার সঙ্গে তাদের যোগ থাকে। এটা বাবারই কথা। বলেছিল, মানুষের বেলা ঠিক উল্টো।

ছোট পিসীমা একবার দেখা করতে এসে বাবাকে বলেছিল, আমি জানি সুখুর জন্যে তোমার বড় কষ্ট।

অর্থাৎ সুখেন্দুর জন্যে। এখন কষ্ট না লজ্জা কোনটা বেশী কে জানে।

বাবা হেসে উঠেছিল ছোট পিসীমার কথায়।—মানুষের সংসার হলো বোটানিকসের বটগাছ, বুঝলে কিনা। গুঁড়িটা নেই, কিন্তু গাছটা দিব্যি ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা সংসারটা গড়ে তুলতে চেয়েছিল এমনভাবে যাতে গুঁড়িটা না থাকলেও বটগাছটা থাকে। সেজন্যেই বোধহয় নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিল। সরতে সরতে বারান্দার ঈজিচেয়ারে ঠাঁই নিয়েছিল বাবার অস্তিত্ব।

কিন্তু চিরকালই তো বাবা এরকম ছিল না। এ বাড়িতে তখন বাবার কথাই ছিল আইন। বাবার মতামতই শেষ কথা।

বাঙালী ঘরে বেকার ছেলের সঙ্গেও বিয়ে দেবার মত মেয়ের বাপের অভাব হয় না। তাই আমার জন্যেও দু'চারজন আনাগোনা করছিল। আমি নিশ্চিত রাজী হতাম না। কিন্তু আমার মতামত জানবারও কেউ চেষ্টা করেনি। বাবা নিজেই বিরক্তির সঙ্গে তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমি জানতাম ওটা বিরক্তি নয়, অস্বস্তি। আমি যে কিছুই করি না এটা নিশ্চয় বাবার কাছেও ছিল খুবই লজ্জার।

সুখেন্দু চাকরি পাওয়ার পর বাবার লজ্জাটা কমলো, কিন্তু আমার জন্যে কষ্ট বাড়লো বোধহয়। বিশেষ করে সুখেন্দুর বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো যখন থেকে।

মা'র কাছে কথাটা বোধহয় বাবা শুনেছিল।

—খোকা শোন্। হঠাৎ বাবা একদিন আমাকে ডেকে বসলো।

আমি মাথা নীচু করে বাবার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ওটা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা নয়, আমার বিনয়ও নয়। যদিও আত্মীয়স্বজনরা তাই মনে করতো। পিতৃভক্ত ছেলে হিসেবে আমার প্রশংসা করতো। ওরা তো জানে না যে-ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি, রোজগার করে না, সে কারোর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না। তার সঙ্কোচ একসময় বিনয় হয়ে যায়।

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবা স্থির গম্ভীর স্বরে বললে, তোমার মা যা বলছে তা কি সত্যি? তুমি সুখেন্দুর বিয়ে দিতে বলেছো?

আমি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলাম, হ্যাঁ, বলেছি।

কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হলো বাবা এই উত্তরই চাইছিল, উত্তরটা পেয়ে বাবা যেন খুশী হ'ল।

—তা হ'লে তোমাকেই তো ব্যবস্থা করতে হবে। বাবা ধীরে ধীরে বললে, আমার পক্ষে তো এই বয়সে ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়।

মা বোধহয় ঘরের ভেতর আলনায় কাপড় গোছানোর অজুহাতে আমাদের কথা শুনছিল, হাতে একখানা শাড়ি কোঁচাতে কোঁচাতে হাসি মুখে বেরিয়ে এসে তাকালো আমার দিকে। হাসতে হাসতে বললে, তোরা যা না দুজনে, মেয়ে দেখে আয়।

আমি বুঝতে পারলাম ভেতরে ভেতরে ব্যাপারটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আমাকেও তাই হাসতে হ'ল। বললাম, বেশ তো, যাবো।

সেই রাত্রে আমার ভাল ঘুম হ'ল না। আমার মাথার মধ্যে তখন প্রচন্ড দুশ্চিন্তা। কারণ আমার নিজের জীবনেও একটা সমস্যা ছিল। একটা সহজ সমাধানও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে-পথে পা দিতে আমার ইচ্ছে হয়নি। কিংবা সাহস।

ইনুর সঙ্গে আমার ভাব-ভালবাসা তখন পুরোনো হয়ে আসছে। তখন আর আপিস ছুটির পর এখানে-ওখানে দেখা করতে হয় না, সিনেমা দেখতে দেখতে চেনা কাউকে দেখে ইনু আতঙ্কের স্বরে 'সর্বনাশ' বলে ওঠে না। নিঃসঙ্কোচে ও তখন আমাকে ওর দাদা-বউদির সংসারে নিয়ে যায়, ওর ঘরে বসে গল্প করে, চা আনে, বউদির সঙ্গে হাসাহাসি করে আমাকে নিয়ে। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, ওর দাদা-বউদি আশা করছে একদিন না একদিন আমি একটা চাকরি পাবো, ইনুকে বিয়ে করবো। তা হলেই ওরাও দায় থেকে পরিত্রাণ পাবে।

কিন্তু ইনু বোধহয় অধৈর্য হয়ে উঠছিল। ও মাঝে মাঝেই বলতো, আমার তো একটা চাকরি আছে, তোমার এত ভয় কিসের দুজনের সংসার ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো আমি। দাদা তো চেষ্টা করছে তোমার জন্যে, চিরকাল তো কেউ বেকার থাকে না।

আবার এক-একদিন হতাশ হয়ে বলতো আর তো বুড়িয়ে গেলাম চাকরি করতে করতে। বলেই হেসে উঠতো। বলতো, চাকরি পেলে একটা কম-বয়েসী মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রো, আমি তো টিপিক্যাল কেরানী হয়ে গেছি, এখন আর রোমান্স-টোমান্সও কিছু নেই।

কথাগুলো এতই সত্যি যে প্রতিবাদ না করে উপায় ছিল না। মৃদু হেসে আমি বলতাম, তোমাকে আমার কিন্ত এখনো সেই কমবয়েসীই লাগে। কখনো বলতাম, এত লোভ দেখিয়ো না, তুমি রোজগার করে আনবে আর আমি বসে বসে খাবো, এর চেয়ে আরামের আর কি আছে!

কিন্তু একটা কথা আমি ওকে স্পষ্ট করে বলতে পারতাম না। কারণ ও

নিজেই যে স্পষ্ট করে বলেছিল, দুজনের সংসার ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো। অর্থাৎ ও ভেবে নিয়েছিল বিয়ের পর আমরা দু'জনে কোথাও গিয়ে সংসার পাতবো। অথচ আমি জানতাম, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বাবা-মা'র সংসার ছেড়ে আমি কোনদিনই চলে যেতে পারবো না। আমি বড় জোর বিয়ে করে ইনুকে এ-বাড়িতেই নিয়ে আসতে পারি। ছোটখাটো যৎসামান্য একটা চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতেই আমি মনে মনে সে-কথা ভেবেছিলাম।

অথচ কোত্থেকে যে কি হয়ে গেল, পরিবারের সকলের কাছে আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্যেই আমি দুম করে বলে বসলাম, তোমরা সুখেন্দুর বিয়ে দিয়ে দাও, আমি কোনদিনই বিয়ে করবো না।

আমি তখন একটা দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি। বাবার মুখের দিকে তাকালে নিজেকে বড় বেশী দুর্বল আর অসহায় লাগে। কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারি এ-বাড়িতে বাবার মুখের দিকে তাকানোর অবসর কারো নেই। আমি যদি এ-বাড়ি ছেড়ে যাই তা হ'লে বাবা নির্ঘাৎ একেবারে ভেঙে পড়বে। আর সত্যি কথা বলতে কি, এখন ইনুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অভ্যাসের এবং কিছুটা কর্তব্য-বোধের: যৌবনের সেই উত্তেজনা কিংবা রোমান্স এখন আর নেই। নেই বলেই আমি তো ওকে ছাড়তে পারি না। ওর যে এখন আর খড়কুটো ধরারও বয়স নেই।

আমি তো সেদিন মাকে বলতে পারতাম, আমি পরে বিয়ে করবো, তোমরা সুখেন্দুর বিয়ে দিয়ে দাও।

তার বদলে আমি বলে বসলাম, আমি বিয়েই করবো না।

অর্থাৎ কোথাও একটা রাগ অভিমান ক্ষোভ ছিল। হয়তো বাবার বিরুদ্ধেই। এমন তো কত দেখেছি, বাপই ছেলের চাকরি জোগাড় করে দিয়েছে। আমার বন্ধুদের মধ্যেই দেখেছি। তারা এখন ট্রাউজার্সের পা দুখানা ফাঁক করে দাঁড়ায়, সিগারেট টানে, হাসে, বড় বড় কথা বলে।

সুখেন্দু যে কি করে এমন একটা ভাল চাকরি জোটালো বুঝতেই পারি না। কলেজে পড়ার সময় একটু-আধটু পলিটিক্স করতো, তার জন্যে বাবা কত বকুনি দিয়েছে। আমিও। আসলে আমি বোধহয় বাবার দলে পড়ে গেছি। ওরা অন্য দল—সুখেন্দু, নবু। ওদের সঙ্গে আমাদের অঙ্ক মেলে না। সে জন্যেই বোধহয় বাবা-মা'র ওপর আমার এত টান, বাবার জন্যে এত কষ্ট।

মার কথা শুনে বাবা বললে, কি রে যাবি তো!

আমি ঘাড় নাড়লাম। জিগ্যেস করলাম, কবে!

গিয়েছিলাম। কয়েক জায়গাতেই। শেষে রীণাকেই পছন্দ হ'ল। বাবারও। একদিন সুখেন্দুও ওর বন্ধুকে নিয়ে দেখে এল। খুব খুশী খুশী লাগলো সুখেন্দুকে।

বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম প্রথম মনে হত ওরা সুখী। শেষ অবধি ওরা যে বাবা-মা'র সুখও কেড়ে নেবে কে জানতো!

আমাদের এ বাড়িটা ভালই। দক্ষিণ খোলা দু'খানা মাঝারি মাপের ঘর আছে। দুটো ঘরেরই দক্ষিণে বে-উইণ্ডো। জোড়া জানালার ঐ নামটা আমি তখন জানতাম না। রাণীর মুখেই আমরা প্রথম শুনি।

বাকী আড়াইখানা ঘর দক্ষিণ পায় না।

আচ্ছা, আমার কি অপরাধ। আমি বাড়ির বড় ছেলে, আগেই বড় হয়েছি।

তখন সুখেন্দুরা কত ছোট। তাই দক্ষিণের দু'খানা ঘরের একটা বাবা-মা'র, আরেকখানা আপনা থেকেই আমার অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন আমি কলেজে, রাত জেগে পড়ি পরীক্ষার সময়, আলো জ্বালা থাকে অনেক রাত অবধি, তাছাড়া গরমের দিনে মাঝে মাঝে বাতাস বয়ে আসে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। ভাল ঘর থাকলে কে আর উত্তরের ঘরে যায়। একসময় সুখেন্দু আর আমি দুজনেই ও-ঘরে শুতাম। কলেজে ওঠার পর ও আলাদা ঘরে চলে গেল, আমার গার্জেনি ওর তখন আর সহ্য হ'ত না। আর আমিও গার্জেনি করার সাহস পেতাম না। যে টাকা রোজগার করে না তার আবার মতামত বলে কিছু থাকতে পারে নাকি! তার উপদেশকে কে দাম দেবে। তার যুক্তিকে কে গ্রাহ্য করবে। আমি ঠিক জানি না, ওদের ভাবভঙ্গিতে সেটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কিনা। কিংবা, এমনও হতে পারে, ওদের সঙ্গে আমার মিল নেই বলেই ওরা আমার কথাকে তেমন আমল দিত না। আর আমার মনের কোণে একটা দুর্বলতা ছিল বলে আমি গার্জেনি করতে সাহস পেতাম না।

সুখেন্দুর বিয়েব কিছুদিন পরেই একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলো। আমি অবশ্য তাতে খুব বেশি বিচলিত হইনি।

মা যে কতখানি সঙ্কোচ নিয়ে কথাটা বলেছিল, ভাবলে বুঝতে পারি কথাটা বলার ইচ্ছে মার একটুও ছিল না।

মা একদিন আস্তে আস্তে বললে, হ্যাঁরে, তোর ঘরটা সুখুদের ছেড়ে দিবি, ওরা বলছে ও-ঘরটা বড্ড ছোট।

আমার তখনই মনে হ'ল এ-কথাটা আমার নিজেরই ভাবা উচিত ছিল। ঘর ছোট বলেই নয়, আমার ঘরখানা দক্ষিণের হাওয়া পায়, সুখেন্দু বিয়ে করেছে, ওদেরই তো ও-ঘরটা প্রাপ্য।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। বললাম, বাঃ রে, এটা তো অনেক আগেই আমারই বলার কথা।

আমার নিজের কাছেই লজ্জা হল। সুখেন্দু চাকরি পাওয়ার পরই আমার বলা উচিত ছিল ওকে, তুই এ-ঘরে চলে আয়। না, ও বোধহয় তখন রাজী হ'ত না। এখন নেহাত অসুবিধা হচ্ছে বলেই তো মাকে বলেছে। এর জন্যে রাগ করার কোন মানে হয় না। তবে, এতদিন ধরে এ-ঘরটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাছাড়া নবেন্দু বা নমিতা না অন্য কিছু ভেবে বসে। বিশেষ করে আত্মীয়স্বজনরা। তারা তো এমনিতেই হয়তো বলে, ছেলেটা একেবারে অপদার্থ।

আমি সেদিনই আমার খাট খুলে ফেললাম, একটা ছোট্ট টেবিল আর একখানা চেয়ার—বারান্দায় বের করে আনলাম।

নমিতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওর চোখে আমার জন্যে একটু মায়া। মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে দেখিনি। শুধু থমথমে গলায় মা বললো, এত তাড়া-হুড়োর কি ছিল, বলেছে বলেই...

সুখেন্দু যখন কুলি ডেকে বিয়েতে পাওয়া ওর আলমারি আসবাবপত্তর খাট বিছানা একে একে ঢোকালো আমার ঘরখানায়, তখন ও কিন্তু একবারও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। মা'র মুখের দিকেও না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ও ভিতরে ভিতরে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে। নিজের কাছেই নিজেকে ছোট লাগছে ওর। আমি তো ভাবছি, ছোটপিসী এসে কোনদিন বলবে, 'কি রে, তোকে এ-ঘরে সরিয়ে দিলো!' আর সুখেন্দুও কি ভাবছে না, ওকে গিয়ে বলতে পারে, 'হ্যাঁ রে, শেষে বড় দাদাকে তাড়ালি এ-ঘর থেকে। ওর বউ-ছেলে নেই, একা

মানুষ, ঘরখানাও রইলো না?'

যাকেই বলুক, অপমান তো আমাদেরই, এই বাড়ির। বাবা-মার।

এ-সব কি বাবার মনে গিয়ে লাগেনি!

ডাক্তাররা শুনে হয়তো হেসে উঠবে। বলবে, এগুলো হৃদয়ের ব্যাপার, হৃৎপিন্ড অন্য বস্তু, তার চিকিৎসা অন্য পদ্ধতিতে। দেখলেন না, হাতের ভেন্ কেটে পেস-মেকার যন্ত্র বসানো হলো। ঐ যে পর্দায় ছবি দেখলেন, কাটা ঘুরছে, নড়ছে, মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্‌স্ রেট, ই সি জি সব আমাদের নখদর্পণে এনে দিচ্ছে। এটা শরীরের কলকব্জার ব্যাপার, আপনি মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছেন।

—আরে একি, আপনারা এখানে বসে কেন?

নার্স ভদ্রমহিলা কখন নীচে নেমে এসেছেন লক্ষই করিনি। তাঁর কথায় চমকে উঠলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, ওখানে এনকোয়ারিতে গিয়ে বসুন, এনকোয়ারিকে জানিয়ে রাখবেন কোথায় বসছেন। দরকার হলে আপনাকে তো আমরা পেতামই না, এখানে বসে থাকলে।

তিনি দ্রুত পায়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।

আমি আর মা ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে আরো বেশি উদ্বেগ নিয়ে এনকোয়ারিতে এলাম। নতুন হার্ট পেশেন্ট, বুঝলেন, আমাদের থাকতে বলেছেন, ঐ জায়গাটায় বসছি। বাবার নাম, নম্বর বললাম। বাবা তো এখন একটা নম্বর হয়ে গেছে। ঠিক আছে, বসুন।

কিন্তু থাকতে বললেন কেন ডাক্তার সাহা! আমরা তো থাকতেই চাইছিলাম। তবে কি সত্যিই খুব ভয়ের। শুধু মৃত্যুর খবরটা জানানোর জন্যেই থাকতে বললেন? নাকি কিছু যদি এনে দিতে হয়। এত রাত্রে কোথায় কি পাবো? হাসপাতালে তো সবই আছে। ব্লাড দেওয়ার তো কোন প্রশ্ন উঠছে না।

পেস-মেকার একটা যন্ত্র, হার্টকে চালু রাখে, এটুকুই শুনেছি। আচ্ছা, হাতের শিরা কেটে ওটা বসানোর সময় কি খুব কষ্ট পেয়েছে বাবা? অ্যানাসথেটিক দিলে তো রুগী টেরই পায় না। অবশ্য অ্যানাসথেটিক দিয়ে শিরা কাটে কিনা তাও জানি না। ধরে নিলাম দেবে, তবু শিরা কাটার কষ্টে আমার সারা শরীর শিউরে উঠলো। পরক্ষণেই ভাবলাম হাতের শিরা কাটলে রক্ত বন্ধ হবে তো!

এই অসহায়ভাবে অপেক্ষা করা যে কি যন্ত্রণা! এ-রকম অসহ্য কষ্ট কখনো পেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। মা কি করে যে স্থির হয়ে রয়েছে ভেবে পাচ্ছি না। আসলে বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে স্থির হয়ে রয়েছে। ভেতরে নিশ্চয় তোলপাড়।

আমি মা'র মুখের দিকে তাকালাম। মা চোখ বুজে রয়েছে। বুঝেছি, মা চোখ বুজে কাকে দেখতে পাচ্ছে। সমস্ত বিপদ-আপদে মা'র কাছে যে একমাত্র ভরসা, তার পায়েই মনে মনে প্রণাম জানিয়ে মা বোধহয় প্রার্থনা করছে। হাসপাতাল আর কালী মন্দির, দুটোতেই মা'র সমান বিশ্বাস। হয়তো আমাদের সকলেরই। যে-কোন একটিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে কেউ বসে থাকতে পারে না।

কিন্তু দুটোকে পরস্পর-বিরোধী দুটো শক্তি ভাবলেই যত সমস্যা। তা ভাবছি কেন! দুটোই একই, এমনও তো হতে পারে। বাবার চিকিৎসা তো হচ্ছে এখন হাউস সার্জেনদের হাতে, বিশেষ করে ঐ তরুণ ছেলেটি কি যত্ন নিয়ে কত সতর্ক-ভাবে একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছিল, আর যাঁর ওয়ার্ড, এ ওয়ার্ডের ডাক্তার বিশ্বাসকে টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে। এদের দুজনের ওপরই তো আমরা বিশ্বাস রেখেছি। মানুষ এবং ঈশ্বরকে পরস্পর-বিরোধী না ভাবলেই

তো সব সমস্যা চুকে যায়।

৪

এনকোয়ারির জানালায় গিয়ে শেষ খবর জেনে এসেছিলাম রাত তিনটের সময়। তারপর তন্দ্রা মত এসেছিল, নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। কিসের শব্দে যেন সচকিত হয়ে উঠলাম। কিংবা মা হয়তো ডেকে ঘুম ভাঙালো। চোখ মেলে তাকিয়েই অস্বস্তি লাগলো। নিজের কাছেই। ছি ছি, এ সময় ঘুমিয়ে পড়া উচিত হয়নি।

তখন কাচের শার্সি দিয়ে ম্লান রুপালি আলো আর ফিকে অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে ভোর উঁকি দিচ্ছে। এ সময়টাকেই বোধহয় ঊষা বলে। বেশ একটা স্নিগ্ধ বাতাস এঁকেবেঁকে এসে আমাদের ছুঁয়ে গেল।

মা বললে, একবার ওপরে গিয়ে খবর নিলে হয় না!

আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম, এখন ওপরে একবার যেতে দেবে কিনা জিগ্যেস করতে। লোকটা আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছে কিনা কে জানে। হয়তো ভাবছে, কি পিতৃভক্ত ছেলে দ্যাখো, এত উৎকণ্ঠা, এত উদ্বেগ, এদিকে দিব্যি এরই ফাঁকে ঘুমিয়ে নিলো। ও কেন, মা কি বিশ্বাস করবে আমি সত্যি ঘুমোইনি, শুধু শরীরের অবসাদে মাঝে মাঝে তন্দ্রার মত আসছিল! কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলেই বাবার জন্যে উদ্বেগ এখন আরো বেশি।

'না, যাওয়া যাবে না।'

মা বললে, চল না, চুপিচুপি গিয়ে ঘুরে আসি। কে আর দেখছে!

বললাম, তাই চলো।

হাসপাতালের এইসব ব্যাপারগুলো আমার একটুও পছন্দ নয়। হৃৎপিণ্ড নিয়ে ওদের কারবার, অথচ হৃদয় বলে কোন বস্তু নেই। শুধু নিয়ম আর নিয়ম। ওসব সাহেবী নিয়ম, ডিসিপ্লিন, বাধানিষেধ—ওদের দেশেই চলে। ছেলের কাছে বাবার জন্যে কি উদ্বেগ, স্ত্রীর কাছে স্বামীর অসুখ মানে যে কি, তা ওদের দেশের লোক কি বুঝবে! অথচ তাদের নিয়মগুলো নির্বিবাদে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া চাই। আমি তো শুধু একটুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাও ক্লান্ত বলে। কম ঝড় বয়ে গেছে নাকি গতকাল সন্ধ্যে থেকে!

—উনি সারা রাত পেশেন্টের দিকে চেয়ে! এক মিনিট বিশ্রাম নেন নি। নার্স ভদ্রমহিলা হাউস-সার্জেনকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে বললেন।

আমরা ভেবেছিলাম ওপরে আসার জন্যে ধমক খাবো। তার বদলে তিনি মাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, এখন অন্তত ভাবনার কিছু নেই, মা, আপনি বাড়ি চলে যান। নটার সময়, ডাক্তার বিশ্বাস আসবেন, তখন বরং

ঠিক তখনই নবেন্দু এসে পড়লো। একাই। ভোর না হ'তেই ও প্রথম ট্রামেই চলে এসেছে। বোধহয় রাত্রে ঘুমোতে পারেনি। তা না হলে এত সকালে ও এল কি করে! ওর তো সাড়ে সাতটার আগে ঘুম ভাঙে না।

নবেন্দু বললে, তোমরা চলে যাও, মেজদা এখনই এসে পড়বে!

নার্সের কথায় মা সান্ত্বনা পেয়েছিল। তবু বললে, একবারটি দেখবো শুধু।

যেন ছোট্ট শিশুর আবদারের গলায় বললে মা।

নার্স মৃদু হেসে বললে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে আসুন।

মা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো। কিছুই তো দেখা গেল না, এমন কি বাবার মুখটাও না। তবু ঐ বেডটা দেখেও যেন শান্তি।

আমরা ফিরে এলাম।

ভোরবেলার বাসে-ট্রামে কতদিন কলকাতা দেখিনি। এই ঠাণ্ডা বাতাসের চামর দুলিয়ে ক্লান্তি দূর করেনি কেউ কোনদিন। আঃ, কারো ওপর নির্ভর করতে পারলে বুকের ভার কত হাল্কা হয়ে যায়। হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের মতই মা যখন ভাগবতপাঠ শুনতে গিয়ে ভগবানের ওপর নির্ভর করে সব ভুলে থাকে, তখনো নিশ্চয় এমনি শান্তি পায়।

নবেন্দুটা একটা ইডিয়ট। ওর এ-সবে কোন বিশ্বাস নেই, ঠাকুর-দেবতা পুজোআর্চা ওর দু'চোখের বিষ। পুরোপুরি বিশ্বাস তো আমিও করি না। কিন্তু তা ব'লে মা'র সঙ্গে এ সব নিয়ে ঝগড়াও করি না। নবেন্দু ছেলেবেলা থেকেই অন্যরকম। কথায় কথায় মাকে খোঁটা দেয়। মা ব্যথা পাবে জেনেও ও এমন সব কথা বলে বসে যে মা ভয় পেয়ে যায়। ভয় নবেন্দুর জন্যেই। পাছে ঠাকুরদেবতা নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি করার ফলে ওর কোন ক্ষতি হয়।

তখন তো নবেন্দু কলেজে পড়ে, দিনরাত আড্ডা দেয়, আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে। তখন থেকেই মা'র ঠাকুরঘর। নিত্যদিন পুজোআর্চা, ব্রতপার্বণ, আরো কত কি। পুজোরী বামুনের আনাগোনা চলতই।

নবেন্দু ওসব দেখলেই বিরক্ত হ'ত। মাকে আঘাত দিয়ে কথা বলতো।

একদিন রেগে গিয়ে বললে, কেন এসব করো বলো তো, এসব করে কি পাও?

মা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু সেদিন হঠাৎ ক্রুদ্ধ চোখে নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললে, তুই তো দিনরাত আড্ডা দিস, কি পাস তুই আড্ডা দিয়ে?

আমার সেদিন হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল, যদিও মা'র এই বাড়া-বাড়িটা আমারও পছন্দ ছিল না।

নবেন্দু থ হয়ে গিয়েছিল, কোন জবাব দিতে পারেনি। তারপর 'ওঃ, তাই বলো, ওসবও আড্ডা' বলে চলে গিয়েছিল। আসলে পালিয়েছিল ও।

নবেন্দুকে আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারিনি। ঠিক বললাম না। আসলে বলতে চাই, ওকে আমি তখন একটুও পছন্দ করতাম না। ওর পোশাক-পরিচ্ছদও না। পোশাক দেখলেই বোঝা যায় ওরা কত বদলে যাচ্ছে। প্যান্ট-কোট তো বাবাও পরেছে। আপিসের পোশাক হিসেবে। বাড়ি ফিরেই বাবার অন্য চেহারা। ধুতি-পাঞ্জাবি। কখনো খালি গায়ে। সুখেন্দুও খানিকটা সভ্যভব্য, আমাদের চোখে। নবেন্দুর কিন্তু চুলের এবং ট্রাউজার্সের ছাঁট অন্যরকম, হাঁটাচলায় অতখানি স্মার্ট না হলেও চলে, কথাবার্তায় একটু বিনয়ী হ'লে কি দোষ হতো! আমাদের পরিবারে কেউ মেয়েবন্ধু নিয়ে এসে বাড়িতে বসে আড্ডা দেবে, আমরা তো ভাবতেই পারি না।

বাবা মুখ ফুটে নবেন্দুকে কিছু বললো না। আমাকে একদিন ডেকে বেশ জোর গলায় বললে, হ্যাঁ রে, এসব কি চলছে?

মাকে দেখেই সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিলাম। আমি চাপা দেবার জন্যে বললাম, আস্তে বলো মা, মেয়েটা শুনতে পাবে।

বসার ঘরে নবেন্দুকে একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে দেখে একটু আগেই

আমি উঠে এসেছি। হয়তো নবেন্দুরই কলেজের বন্ধু।

বাবা গলা নামালো না।—তুই বলে দিবি ওকে, আমার বাড়িতে ওসব চলবে না। না পোষায় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

আমি কিন্তু মরমে মরে গেলাম বাবার কথা শুনে। বাবা কি পাগল হয়ে গেল নাকি। দিনকাল বদলে গেছে বাবা কি জানে না? ও মেয়েটি তো নিছক বন্ধু হতে পারে। হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে ওকে বাড়িতে আসতে বলবে কেন। প্রেমফ্রেম হ'লে তো প্রথম প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করবে। আমরা তো তাই করতাম। আমি। আমি আর ইনু।

ছি ছি, মেয়েটি যদি শুনতে পায়, যদি জানতে পারে ওর এ বাড়িতে আসায় বাবার এত আপত্তি, তা হলে কি ভাববে আমাদের সম্পর্কে। ভাববে আমরা সেই পুরোনো দিনেই পড়ে আছি। একটা সহজ ব্যাপারকে সহজভাবে নিতে পারি না।

আমি ধীরে ধীরে বাবার কাছ থেকে সরে এলাম। কি জানি, কাছে থাকলেই বাবা হয়তো আবার চেঁচামেচি করবে।

নিজের ঘরে এসে সকালের কাগজটায় আরেকবার চোখ বোলানোর চেষ্টা করছি. টের পেলাম. মা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাঁধের ওপর মা'র হাতের স্পর্শ পেতেই ফিরে তাকালাম।

মা ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললে, শোন, রাগারাগির কথা নয়। তুই বুঝিয়ে বল নবুকে। আমার তো আরেকটা মেয়ে রয়েছে, নমির বিয়ে দিতে হবে, ও চোখের সামনে যদি এইসব দেখে...

যেন চোখের সামনে দেখলেই মেয়ে আজেবাজে কাউকে বিয়ে করে বসবে!

চোখের সামনে যদি এইসব দেখে! কি বলতে চাইছে মা? আমি তো এই-মাত্র দেখে এসেছি, সেন্টার-টেবিলের ওপর একরাশ বই নামানো রয়েছে। পুরোনো ধুলো-জমা শোফাটার ওপর দু'পা গুটিয়ে কেমন ঘরোয়াভাবে বসে গল্প করছে মেয়েটি। এর মধ্যে আপত্তির কি দেখলো মা!

অবশ্য এ সব একটু দৃষ্টিকটু লাগারই কথা। নবেন্দুটা তো একটা ইডিয়ট, ও তো জানে বাবা এ সব ব্যাপারে কত গোঁড়া। ও কেন মেয়েটিকে বারণ করে দেয়নি। পবক্ষণেই মনে হলো, কি জানি, মেয়েটি নিজেই হয়তো আসতে চেয়েছে। তখন কি বলবে নবেন্দু? মেয়েটির বাড়ি হয়তো আমাদের মত নয়। সম্পর্কটা হয়তো প্রেমের নয়. নেহাতই কলেজের বন্ধু। কি বলবে নবেন্দু? আমাদের বাড়িটা খুব গোঁড়া, বাবা কিছু মনে করবে, তুমি এসো না! না, সেক্ষেত্রে তুমি বলবে না। বলবে, আপনি আসবেন না। কি আশ্চর্য, তা কি বলা যায় নাকি। তা হ'লে তো মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠবে। হয়তো কলেজের আর সকলকে বলবে সে-কথা।

ঐ মেয়েটিই জয়া।

সে বছর বিজয়ার দিন ও উপরে উঠে এল নমিতার সঙ্গে। নবেন্দু তখন বাড়িতে ছিল না।

এসে বাবাকে, মাকে ও প্রণাম করলো। আমাকেও। বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেই সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমি জয়া। যেন আর কোন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

বাবার মুখ দেখে মনে হলো, বাবা খুব খুশি হয়েছে। ওর সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে, নাকি ঐ হাসতে হাসতে 'আমি জয়া' বলার জন্যে! তা নয়। ঐ যে নিঃসঙ্কোচে এসে বাবাকে প্রণাম করলো বলেই হয়তো। আমার মনে হলো,

প্রণামের কাছে হার মানে না এমন বৃদ্ধ বোধহয় কমই আছে।

ইমার্জেন্সির ডাক্তার জিগ্যেস করেছিলেন, এটা কি থার্ড অ্যাটাক?

এখন মনে হচ্ছে বাবাকে আঘাত আমরা কে দিইনি! আপনাদের ডাক্তারিশাস্ত্রে হৃৎপিন্ডকে বড় বেশি ঠুনকো আর নড়বড়ে মনে করেন আপনারা। মাত্র তিনটে অ্যাটাক হলেই মনে করেন সামলানো দায়। হৃৎপিন্ডের বদলে হৃদয়কে ই সি জি করার কোন যন্ত্র যদি আপনাদের থাকতো, নিঃসন্দেহে অবাক হয়ে যেতেন আপনারা। বাঁধানো দাঁত, বাতে পঙ্গু, শনের মত সাদা চুল বৃদ্ধদের মধ্যে থেকে যে কোন একজনকে রাস্তা থেকে টেনে এনে সেই যন্ত্রের সামনে বসিয়ে দিন না, দেখবেন পর্দায় একটার পর একটা মুখ ভেসে উঠছে—ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, কখনো কখনো আপনাদেরই কেউ। সবারই হাতে ধারালো ছুরি, বুড়োটাকে ছিন্নভিন্ন করছে।

বাবাও ঐ বুড়োদের একজন।

একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। তখন নবেন্দু তো সদ্য কলেজের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। ও বয়সে মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তার জন্যে কারো যে দুশ্চিন্তা থাকতে পারে ভাবেই না।

কি একটা খুব ভাল খেলা ছিল। নবেন্দু তো ছোটবেলা থেকেই খেলা-পাগল। বিশেষ করে ফুটবল হলে তো কথাই নেই। আমি ওসব ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ কোনদিনই পাইনি। যখন বয়েস কম ছিল তখনো না। কিন্তু নবেন্দুকে দেখেছি, যখন ইস্কুলে পড়ে, তখনো ছুটির পর বাড়ি ফিরে সকালের খবরের কাগজটা মেঝের ওপর বিছিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তো। খাওয়াদাওয়ার কথা ওর মনেই থাকতো না। মা বারবার বলতো, আগে দুধটা খেয়ে নে নেবু। দুধের গ্লাস ঠান্ডা হয়ে যেত, ও পড়ছে তো পড়ছেই। বাবা একদিন অবশ্য ওর এই পড়ার নেশাটার খুব প্রশংসা করেছিল। বাবা তো জানতো না, ও শুধু খেলার পাতাটাই পড়ে। আমার অভ্যাস ঠিক উল্টো, আমি আবার ও পাতাটাই বাদ দিয়ে যাই। ওসব ঘাম জ্যাবজেবে ধস্তাধস্তি আমার ভাল লাগে না।

সেদিন বোধ হয় খুব একটা রোমহর্ষক ফুটবল খেলা ছিল। দেখতে যাবে বলে বাবার কাছ থেকে টাকাও আদায় করেছিল। বাড়িতে সবাই জানতো ও খেলা দেখতে গেছে, সেজন্যে ওকে নিয়ে কারো চিন্তাও ছিল না।

বাবা একবার শুধু এমনিই জিগ্যেস করেছিল, কই রে, নবু ফিরলো না?

তখন রাত আটটা সাড়ে আটটা হবে। ওর পরেও তো ও কোন কোনোদিন ফিরেছে, তাই দুর্ভাবনার কোন কারণও ছিল না।

তারপর এক সময় বাবা হঠাৎ আমার ঘরে ছুটে এল।—খোকা, ওরা কি বলা-বলি করছে জিগ্যেস কর তো!

চিৎকারটা আমার কানেও এসেছিল, কিন্তু আমি কান দিইনি।

নগেনবাবুর ওটাই স্বভাব, বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে-কোন বিষয় নিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করা। গলা শুনেই বুঝতে পারলাম, কমলদাকে ধরেছেন, ওঁর সামনের বাড়ির। কমলদা অবশ্য একটু নীচু গলাতেই কথা বলছিলেন, যে-কোন সভ্যভব্য মানুষ তাই করে। নগেনবাবুর কি একটা ব্যবসা আছে, কি ব্যবসা কে জানে। তবে গলার স্বর থেকেই বোঝা যায় ব্যাকের টাকায় খুব ফুলে-ফেঁপে উঠছেন। কান পেতে শোনার দরকার অবশ্য হ'ল না, হেঁড়ে গলায় তখনো চেঁচাচ্ছেন—ছবি, ছবি, গোলটা যা দিল-না, একেবারে ছবির মত।

বাবা বলছিল, তুই গিয়ে একবার জিগ্যেস করে আয় না। আমি তবু গা

করলাম না। আমার জানালা থেকে তেরছা ভাবে তাকালে নগেনবাবুকে দেখা যায়, সেভাবে কথা বলা যায় না।

আবার নেমে যেতে হবে বলেই নয়, লোকটাকে একটা কথা বলে যে চলে আসবো তার উপায় নেই। ছিনে জোঁকের মত ধরে রাখবে, আর অনর্গল কথা বলে যাবে। ব্যাটা সব ব্যাপারে যেন ফরমান দিচ্ছে, ওর কথাটাই শেষ কথা। এমন বিষয় নেই যার ওপর মতামত দেবে না, পৃথিবীটাকে যেন কড়ে আঙুলের ডগায় ধরে বনবন করে ঘোরাতে পারে।

শেষ অবধি বাবার কথায় আমাকে যেতেই হ'ল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো কারো সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা যায় না। নিজেকে কেমন তুচ্ছ আর নগণ্য মনে হয়। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে গাড়িতে বসা কোন চেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার মত। সেটা অবশ্য অপরের হয় কিনা জানি না, আমাদের বাড়ির আবার সবাই তো একটু উঁচু হাইটের!

আমি গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নগেনবাবুর বারান্দার দিকে তাকালাম। বড় সাইজের বেঢপ পাকা পেঁপের মত মুখে সাদা পুরুষ্ট গোঁফ, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উল্টো পিঠ দিয়ে এক পাশের গোঁফ সমান করতে করতে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, মারামারি মানে? ওকে কি মারামারি বলে নাকি? কম দিন তো খেলা দেখছি না হে, আই অ্যাম এ লাইফ মেম্বার, ঐ ঠেলাঠেলি করে টিকিট কাটলাম আর ফুরুৎ করে ঢুকে গেলাম...

উঃ, অসহ্য।

খেলার মাঠে সাংঘাতিক কি মাবামারি হয়েছে ও-কথাই উনি নাকি একটু আগে কমলদাকে বলছিলেন। বাবা বারান্দায় বসে শুনেছে। তাই বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, শুনে আয় তো কি বলছিলেন।

অসহায়ের মত তাই ঘাড় বাঁকিয়ে ওঁর দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে ওঁর ফালতু কথাগুলো শুনতে হচ্ছিল। উনি এক মুহূর্ত থামতেই আবার প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম।—কাকাবাবু, খেলার পর কি কেউ ইনজিওরড্...

নগেনবাবু আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। আবার শুরু করলেন, সে-কথাই তো বলছি হে, খেলার মাঠ তো তোমার আপিসে গিয়ে ফ্যানের তলায় বসে কেরানী বাবুদের পান চিবোন নয়, হাজার হাজার লোক যেখানে এত একসাইটেড হয়ে খেলা দেখছে, সেখানে দু'চারটে মারামারি, আমি তো লাইফে এ-সব কম দেখিনি...

অনেক কষ্টে, অনেক আজেবাজে কথা শোনার পর জানা গেল, একজন বোধ-হয় মারা গেছে, কয়েকজন ইনজিওরড্।

বাবাকে বলতেই বাবার কি দুশ্চিন্তা। মা তো কেঁদেই ফেলে আর কি। আমার একটুও ভয় হয়নি। আমি বললাম, আড্ডা দিচ্ছে কোথাও, ঠিক ফিরে আসবে।

কিন্তু সাড়ে দশটা বেজে গেল, তখনো ফিরলো না নবেন্দু।

আমরা তখন খেয়েটেয়ে নিয়েছি, বাবাই শুধু খেলো না। কেবল ঘড়ি দেখছে আর বলছে, সাড়ে দশটা তো বেজে গেল রে।

আমারও তখন একটু চিন্তা হচ্ছে। এত রাত তো করে না ও।

বাবা হঠাৎ আলনা থেকে শার্ট তুলে নিয়ে মাথায় গলাতে গলাতে বললে, খোকা আয় তো একবার, এভাবে বসে থাকার মানে হয় না।

বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি ডাকলো বাবা, উঠে বসলো। বললে, চল, একবার হাস-

পাতালগুলোর খবর নিয়ে আসি।

তখন আমারও ভয়-ভয় করছে। আবার নবেন্দুর ওপর রাগও হচ্ছে। বাবার উদ্বেগ যে কতখানি বুঝতে পারলাম, বাবা ঝট করে ট্যাক্সি ডাকলো বলে। নিরুপায় না হ'লে বাবা কখনো ট্যাক্সি চড়তো না। একদিন তো চায়ের দোকানে বসে বন্ধু-দের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম, তখন সকালেও চায়ের দোকানে আড্ডা দিই, বাবাকে দেখলাম, আপিসের পোশাক পরে একটা ভিড়ের ট্রামে ওঠবার চেষ্টা করছে। বুড়ো মানুষটা আমার চোখে তখনই বুড়ো, কোন রকমে পাদানিতে পা রাখলো, হ্যাণ্ডেল ধরলো। আর দ্যাখো, আমি এখানে বসে সিগারেট ফুঁকছি। সারাটা দিন আমার মন খারাপ লেগেছিল ঐ দৃশ্য দেখে। বাবার মত অনেস্ট লোকটার এই হাল, আর নগেনবাবু দু'দুখানা গাড়ি হাঁকাচ্ছে। আমি অবশ্য কঠোর পরিশ্রম করছি না বলে উন্নতি হচ্ছে না।

যাই হোক, সেদিন আমরা একটার পর একটা হাসপাতালে খোঁজ নিলাম। রেজেস্ট্রি খুলে নাম দেখালো, নবেন্দুর নাম পেলাম না। শম্ভুনাথ, রামকৃষ্ণ, পি জি কোথাও না। একজনের নাকি নাম পাওয়া যায়নি, কিন্তু বয়সের পার্থক্য অনেক। ডাক্তাররা অতখানি ভুল নিশ্চয় করবে না। ওপাড়ার হাসপাতালে যাবার আগে আরেকবার বাড়ি ফিরে দেখে আসা ভাল, আমিই বললাম। বাবা আশায় আশায় বললে, তাই চল্।

বাড়িতে ফিরে এলাম। ফিরেই দেখি, নবেন্দু মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে, মা, সুখেন্দু, এমন কি নমিতাও তাকে বকছে।

বাবা তো এসেই খুব চোটপাট করলো।

—তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান হবে না!

আর তখনই আমরা সবাই অবাক।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নবেন্দু বললে, আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তোমরা বুঝবে না।

ওর গলার স্বরে, ওর কান্নায় কি যেন ছিল, আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ধক করে উঠলো। ব্যর্থ প্রেম নয় তো? আমরা তো ভেবেছিলাম, খেলা দেখতে গেছে।

বাবার রাগ তখনো পড়েনি। ধমকের স্বরে বললে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

নবেন্দু তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সব জানা গেল একে একে। ওর বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট, ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল, তাই পার্কে গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছিল ও। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না।

কিন্তু কেন, এ-কথাটা কেউই জিগ্যেস করতে পারছিল না। আমার নিজেরই দম বন্ধ লাগছিল। জিগ্যেস করতেও সাহস হচ্ছিল না, কারণ মাসখানেক আগেই এপাড়ার একটি ছেলে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ভয় সেজন্যেই।

শেষে নবেন্দুই বলে ফেললো, কেন এত কষ্ট ওর, কেন মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। নিরুদ্বেগ হতে পারলাম বলেই হয়তো অত হাসি। হাসবারই কথা। নবেন্দুর প্রিয় ফুটবল টীম ওর চোখের সামনে বোকার মত গোল খেয়েছে। হেরে ভূত হয়ে গেছে।

প্রিয় টীম! একটা তো নাম শুধু। তার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগই ছিল না নবেন্দুর। শুধু একটা নামকে ভালবাসার মধ্যে কি যে পায় পাগল লোক-গুলো আমি বুঝি না। হয়তো খেলা দেখায় আমার কোন নেশা নেই বলে।

কিন্তু বাবার বেলায় তোর এই ভালবাসা গেল কোথায়! বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, বাবাকে বাঁচানো যাবে কিনা সেই চিন্তায় আমরা এখন বিব্রত, তুই এসেই কোথায় বাবার কথা জিগ্যেস করবি, উৎকণ্ঠা দেখাবি, তা নয়, শুধু তিলু তিলু করেছিস। কেন আসার সময় তার খোঁজ রাখিনি। আরে তিলুকে তো আমিও ভালবাসি। কিন্তু বাবার এই হার্ট-অ্যাটাক তোর কাছে কি কিছুই নয়!

নবেন্দুর ওপর আমার প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। রূঢ়স্বরে কিছু একটা হয়তো বলেও ফেলতাম। কিন্তু তখনই একজন নার্সকে আসতে দেখে আমি দু'পা এগিয়ে গিয়েছিলাম, যদি ওকে জিগ্যেস করে কিছু জানা যায়। কিন্তু নার্স খানিকটা এসেই বোধহয় কিছু মনে পড়তেই আবার ফিরে গিয়েছিল।

ভাগ্যিস, নার্সটাকে দেখে আমি নবেন্দুকে কিছু বলে ফেলিনি। এখন এই সক্কালবেলায় ও এসে হাজির হয়েছে দেখে বুঝতে পারছি, ওর মনের মধ্যেও উদ্বেগ আছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কিংবা কে জানে আসলে বাবার জন্যে ওর মনের মধ্যে কোন ভালবাসা নেই। কাল রাত্রে তো দেরী করে হাসপাতালে এসেছিল, তার ওপর বাবার অসুখ নিয়ে যখন এমন একটা কাণ্ড ঘটছে, তখন ও সিনেমা দেখছে একথা ভেবেই হয়তো ভোরবেলাতেই চলে এসেছে। যাতে কেউ ওকে অমানুষ না ভেবে বসে। আমাদের শুধু দেখানোর জন্যে। তোমরা ভাবছো তোমরাই বাবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছ, তা নয়। কিংবা সুধাদের দেখানোর জন্যে। সুধার দাদা তো অত রাত অবধি কাল ছিল, তাই নবেন্দু হয়তো লজ্জা পেয়েছে।

ওর লজ্জা বলে কিছু আছে, আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না।

ইমার্জেন্সির ডাক্তার জিগ্যেস করেছিলেন, এটা কি থার্ড অ্যাটাক!

নবেন্দু একাই যথেষ্ট। ও কি বাবাকে কম আঘাত দিয়েছে।

একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত মনে হয়। নবেন্দু, এই তো ক'বছর আগে, তখনও ওর ভাল করে গোঁফ ওঠেনি, তার প্রিয় ফুটবল টীম হেরে গেছে বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। ওর নাকি মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমরা অবশ্য হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, কিন্তু পরে মনে হয়েছিল ছেলেটার বুকের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ হৃদয় আছে। ও একটা ফুটবল টীমকে যখন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, ওর হৃৎপিণ্ডটা নিশ্চয় সোনা দিয়ে মোড়া।

ভুল ভেবেছিলাম। শুধু নবেন্দুকে দোষ দিলে কি হবে। সুখেন্দুও তাই। এ-যুগের বেশির ভাগ মানুষই তাই। বাবাদের সময়ে ছিল ঠিক উল্টো। নবেন্দুর ছিল ফুটবল টীম, আর সুখেন্দু রাজনীতি করতো। ও একা নাকি, রাজনীতি করতে গিয়ে পার্টির জন্যে প্রাণ দিতেও তো কত লোককে দেখলাম। আসলে এরা সবাই শুধু একটা নামকে ভালবাসতে পারে, তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। একটা ফুটবল টীমের নাম, কিংবা একটা পলিটিক্যাল পার্টির নাম এদের কাছে ভালবাসা পায়। কিন্তু একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে ভালবাসা দিতে পারে না। এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। রাস্তায় একটা মুমূর্ষু লোকের মুখে জল দেবার জন্যে কেউ এগিয়ে যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, পরিবারের মানুষের ওপর, বাবা-মা'র ওপর এদের সেই টান দেখি না কেন।

হয়তো ভুল করছি, আমি তো শুধু নবেন্দু আর সুখেন্দুকেই চোখের সামনে দেখে বিচার করছি।

বাবার ওসব টীম কিংবা পার্টির ওপর অত ভালবাসা ছিল না, কিন্তু মানুষকে ভালবাসতে পারতো।

৫

বাবা এই বাড়িটাকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অর্থাৎ, আমাদের পরিবারটা। ভাল বা মন্দ নিয়ে বাবার মনে কোন দ্বিধা না দ্বন্দ্ব ছিল না। যা এতকাল জেনে এসেছে তার বাইরে পা দিতে চাইতো না বলেই বাবাকে খুব গোঁড়া মনে হ'ত। অথচ গোঁড়ামি তো নবেন্দুরই বেশি। ও যা ভাল বোঝে, অর্থাৎ ওর যা মন চায়, তা থেকে এক চুলও নড়তে রাজী নয়। অথচ দেখেছি যতই রাগারাগি করুক, বাবা অনেক কিছু মেনে নিতে পারতো।

'আমি জয়া', এই কথা বলে ও চট করে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বাবা হেসে বললে, তোমরা এখনো পেন্নামটেন্নাম করো নাকি! ওসব তো আমাদের সময়েই ছিল।

জয়ার মুখে তখন মৃদু মৃদু হাসি। ও মাকে প্রণাম করলো, কিন্তু বাবার কথার কোন উত্তর দিল না। আমি জানি, অন্তত চটপটে স্বভাবের মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল ওর মুখে খুব সুন্দর কোন জবাব এসে গিয়েছিল। কিন্তু বেশি স্মার্ট দেখাবে বলেই ও সে-কথা বলেনি।

এই গোঁড়া মানুষটার মধ্যে কি আছে ভাবতে গিয়ে এখন বুঝতে পারছি। দুটো জিনিস আছে, যা আমাদের কারো নেই। অনন্ত ভালবাসা আর অসীম ক্ষমা। বোটানিকসের বটগাছের তুলনা দিয়েছিল বাবা। ঠিক সেইভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল আমাদের। গুঁড়িটা না থাক, থাকবে না একদিন, কিন্তু ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে গাছটা যেন থাকে। তেমনি বিরাট, অনবনত, সজীব।

সুখেন্দুর, আমার মেজভাইয়ের, তখনো বিয়ে হয়নি। তার জন্যে মেয়ে দেখতে যাওয়ার যে-কথা বলছিলাম, সে সব অনেক পরের কথা। তখন সুখেন্দুও আমার মতই ব্যাচেলার। কিন্তু ও তখন চাকরি পেয়ে গেছে। ওরা কিভাবে যে চটপট চাকরি পেয়ে যায় বুঝতে পারি না। একটা সন্দেহ অবশ্য আমার মনের মধ্যে আছেই। আমি তো বাংলা ইস্কুলে পড়েছিলাম। তার ফলে আমি ঠিক ওদের মত স্মার্ট নই। নিজের কাছেই নিজেকে বড়ো জবুথবু লাগে। ইংরিজি বলতে গেলে মনে হয় যেন নাটক করছি।

মা যখনই কারো ছেলের প্রশংসা করতো, কিংবা খবর দিতো কেউ ভাল চাকরি পেয়েছে, মা'র ওপরই আমার রাগ হয়ে যেত। যেন ইচ্ছে করে আমাকে খোঁটা দিচ্ছে। সেদিন ভাতের গ্রাস আমার গলায় আটকে যেত।

আমি একদিন তাই রেগে গিয়ে বললাম, বাংলা মিডিয়মে পড়িয়ে তোমরা তো আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছো।

বাবা কাছেই ছিল, দেখলাম বাবা ঝট করে মুখটা নামিয়ে নিল। বুঝলাম আঘাত পেয়েছে বাবা। আঘাত দিতেই তো চেয়েছিলাম।

বাবা ধীরে ধীরে জবাবদিহির গলায় বললে, তখন কি ছাই বুঝতে পেরেছিলাম। দেশ স্বাধীন হলো, তখন যে আমরা দেশ দেশ বলে পাগল। তাছাড়া, তখন কতই বা মাইনে!

বাবাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে আমার একটু অনুশোচনা হলো। আমি তো জানি, বাবার কোন উপায় ছিল না। আমার ছেলেবেলাটা অনেক অভাবের মধ্যে কেটেছে। ধাপে ধাপে বাবার মাইনে বেড়েছে, আর তার ফলে সব সুযোগ-সুবিধে পেয়েছে সুখেন্দু, এবং নবেন্দু আরো বেশি। ওদের তাই ইংরিজি

ইস্কুলে পড়াতে পেরেছে। ওদের ইংরিজি উচ্চারণই অন্যরকম। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলে, মনে হয় আত্মবিশ্বাসে একটা আইফেল টাওয়ার।

একদিন এই নিয়ে সুখেন্দুর সঙ্গে আমার জোর তর্ক হয়েছিল। ইংরিজি ছাড়া এদেশের নাকি কোন উন্নতি নেই।

আমি বললাম, পৃথিবীর তিনভাগ দেশ ইংরিজি ছাড়াই তো দিব্যি চালাচ্ছে।

ও হেসে উড়িয়ে দিল।

আশ্চর্য, বাবা কিন্তু আমার পক্ষ নিয়ে বলে উঠলো, ইংরিজি হলো আমাদের ভিক্ষের ভাষা। চাকরি ভিক্ষে চাইলেও ইংরিজিতে বলতে হবে, সাহায্য চাইলেও। যুদ্ধের সময় তোরা তো দেখিসনি, জুতোপালিশ ছেলেগুলো দিব্যি ইংরিজি বলতো।

সুখেন্দু রেগে গেল। বললে, ইন্ডাস্ট্রি কি এখন ইংরেজদের হাতে নাকি?

বাবা হেসে বললে, মনে মনে তারাও ভিখিরি, ব্যবসা ভিক্ষে করছে। একজন ইংরেজ বা আমেরিকান যখন আসে, সে এ দেশের ভাষা শিখে আসে না, আমরা যখন যাই ইংরিজি শিখে যাই। কারণ আমরা তো চাইতে যাই, শিক্ষাই হোক, চাকরিই হোক।

বাবার কথায় আমার সর্বদিক থেকে সায় নেই। যুক্তিটাও পুরোপুরি মানতে পারি না। কিন্তু বেশ বুঝতে পেরেছিলাম বাবার মনের মধ্যে 'দেশ' 'দেশ' ভাবটা রয়েই গেছে। অথচ কালের হাওয়ায় ইংরিজি ইস্কুলেই সুখেন্দুকে পড়িয়েছে।

অবশ্য সে জন্যেই সুখেন্দু চাকরি পেয়ে গেল আমি বিশ্বাস করি না।

চাকরি পেয়ে সুখেন্দু প্রথম মাসের মাইনেটা মা'র হাতে তুলে দিলো। হাসতে হাসতে বললে, সব দিলাম না কিন্তু।

মা খুব খুশি। সারা মুখ আলোর ফুল হয়ে গেল।

টাকাগুলো আমার সামনে না দিলেই পারতো ও। ওর তো বোঝা উচিত আমার খারাপ লাগবে। কারণ আমি তখনও বেকার।

আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুনি, প্রেম প্রীতি ভালবাসা সব নাকি টাকা-কড়ির ওপর নির্ভর করে। আমি বিশ্বাস করি না। মানুষকে এত ছোট ভাবতে আমার ইচ্ছে করে না।

মা যেদিন কাঁচুমাচু মুখে এসে আমাকে বললে, সুখু বলছিল—ঐ ছোট্ট ঘরে ওর অসুবিধে, তোর ঘরখানা ওকে ছেড়ে দিবি, সেদিন আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কথাটার মধ্যে যে সত্যি একটা যুক্তি আছে আমি তা ভেবে দেখতে চাইনি। সুখেন্দু তখন বিয়ে করেছে, আর আমি ব্যাচেলার মানুষ। আমি ভেবে বসলাম, বাবা-মা'র কাছে বেকার ছেলেটার কোন দাম নেই, তাব মান-মর্যাদার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমার ধারণা ছিল, সুখেন্দু ভাল চাকরি করে, ও বোধ হয় সংসারে অনেক টাকা দেয়। কোনদিন জিগ্যেস করতে পারিনি, কারণ আমি তখনো এই চাকরিটা পাইনি।

মা হঠাৎ একদিন আমার কাছে দুঃখ করলো।—তোর একটা কিছু হ'ল না রে।

আমি চুপ করে রইলাম।

মা বললে, তোর বাবার তো আবার রিটায়ার করার সময় হয়ে এল, কত টাকাই বা পেনশন পাবে।

তারপর একটু থেমে বললে, সুখু তো এখন মাত্র দুশো টাকা দেয়। কি করে যে চলবে!

আমি অতশত খবরই রাখতাম না। আমি সুখেন্দুর ওপর মনে মনে ভীষণ রেগে গেলাম। মাত্র দুশো টাকা! বিয়ে করলেই মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে যায় আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হয়েছিল। মনে মনেই বলেছিলাম, দেখো এবার, তুমি তো আমাকে দক্ষিণের ঘরখানা ওর জন্যে ছেড়ে দিতে বলেছিলে। আসলে ওকে সন্তুষ্ট করার এত ইচ্ছে কেন হয়েছিল তোমাদের, আমি কি বুঝিনি! তারপর, আমার নিজেরই খারাপ লেগেছিল। বাঃ রে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে বড় ঘর না হ'লে কি চলে।

আমি ভাবলাম, সুখেন্দু ইচ্ছে করেই এত কম টাকা দেয়। মা'র তো খরচের হাত, দিলেই খরচ করে ফেলবে, তাই হয়তো বেশি দেয় না। ও বেচারীকে দোষ দিচ্ছি কেন। একটু বুঝিয়ে বললেই হয়তো বুঝবে।

আমি সুখেন্দুকে গিয়ে বললাম, আমি তো চাকরিবাকরি কিছু জোগাড় করতে পারছি না, এত বড় সংসার, তুই একটু না দেখলে, মা চালাবে কি করে বল। মা দুঃখ করছিল।

কি হ'ল আমি জানি না। আমি তো ভাল ভেবেই বোঝাতে চেয়েছিলাম। উপদেশ-টুপদেশ দিতে যাইনি।

সুখেন্দু দুম করে আমার মুখের ওপরই বলে দিল, আমরা তো মাত্র দুটি প্রাণী, সারা সংসার আমি টানতে পারবো না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বাবা তখনও মাস গেলে মাইনে পায়। বাবার টাকাতেই সংসার চলে, সুখেন্দু চাকরি পাওয়ায় শুধু অভাব অনটন মিটছিল, আর কিছু নয়।

আমি সে রাতে ঘুমোতে পারিনি। সারা সংসার বলতে তো আমাকেই বুঝিয়েছে। আভাসে বলতে চেয়েছে, তুমি তো একটা পয়সাও দাও না। সবাই জেনে গেছে আমি অপদার্থ, শুধু নিজেই জানতাম না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে সেদিন আমি একবার অন্ধকারে কড়িকাঠের হুকটা কোথায় ভাববার চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য মুহূর্ত কয়েকের জন্যে।

বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত করা আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সপ্তাহে বিজ্ঞাপন খুঁজেছিলাম খুব মন দিয়ে, একসঙ্গে এগারোখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে তবে শান্তি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চাকরি পেলে পুরো মাইনেটাই মা'র হাতে তুলে দেবো। টিউশনি থেকেই হাত খরচ চালাবো। তবেই সুখেন্দুকে মুখের মত জবাব দেওয়া হবে। দ্যাখ, তুই কত ছোট। আমি অপদার্থ হতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয় আছে।

আমি বোধ হয় সুখেন্দুর ওপর অবিচার করছি। ওর কি হৃদয় বলে কিছু নেই? তার ভিতরটা তো আমরা দেখবার চেষ্টা করিনি, আমরা তো ভেবে নিই কেউ বিয়ে করলেই সুখী। ওর মনের ভিতরে কি চলছে আমরা তো কেউ খবর নিই না। আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সুখেন্দু অন্য কাউকে ভালবাসতো না তো! কিংবা রীণা?

রীণাকে আমাদের সকলেরই বেশ ভাল লেগেছিল। কিন্তু সুখেন্দু একটু একটু করে বদলে যাচ্ছিল বলে রীণাকেই আমরা সকলে দোষী মনে করতে শুরু করছিলাম। মা তো একদিন বলেই ফেললো, বউমা ওর মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে।

নমিতা একদিন অভিযোগ করলে, আমাদের বাড়ির কিছুই তো বউদির পছন্দ নয়।

আসলে আমাদের বাড়িটাই ছিল কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া, সাজানো গোছানোর বালাই ছিল না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বাবা পছন্দ করতো না, অথচ অতিরিক্ত অনেক কিছু জমে গিয়েছিল, যা বাড়িটাকে আরো কুৎসিত করে তুলেছিল। সেটা আমাদের কোনদিনই চোখে পড়েনি। বোধহয় দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

সুখেন্দুর বিয়ের পর ঝকঝকে পালিশ করা হালফ্যাশনের খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল এসে বাড়িটাকে কেমন যেন বেমানান করে তুললো।

হঠাৎ একদিন দেখলাম সেই দক্ষিণের ঘরখানা, যেটা আমি সুখেন্দুকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তার দরজায় সুন্দর একটা পর্দা ঝুলছে।

আমাদের বাড়িতে দরজা-জানালায় পর্দা দেওয়ার কোন রীতি ছিল না। বাড়িটা এমনই যে আব্রুর প্রয়োজনও হত না। বাবা তো একবার হাসতে হাসতে বলেছিল, এমনিতেই আলো-হাওয়া ঢুকতে পায় না, পর্দা দিয়ে সেটুকু আবার আটকে দেওয়া কেন।

আমি এসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। তবে কোন কোন সাজানো গোছানো বাড়িতে তো আমার আনাগোনা ছিল, দেখতে ভালই লাগতো। ইনুর দাদার বাড়িতে, ছাত্র পড়াতে গিয়ে, আত্মীয়স্বজন কারো কারো সংসারে।

দরজার পর্দাটা মার ভাল লাগেনি। ঠোঁট উল্টে বলেছিল, কত দেখবো! একদিন বললে, এদিকটায় একটুও হাওয়া আসে না।

আমার মনে হয়েছিল পর্দাটা মার কাছে একটা দেয়াল হয়ে গেছে।

দেয়াল তো একটু একটু করে উঠছিলই।

এর মধ্যে আমি কিন্তু খুব আপত্তির কিছু দেখিনি। সামান্য একটা পর্দা তো। হয়তো সুখেন্দুর সিগারেট খেতে অসুবিধে হয়। তাছাড়া নতুন বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী অনেকসময় একটু অসতর্ক থাকে। সেজন্যেই হয়তো।

কিন্তু ফল হয়েছিল এই, ঐ ঘরখানা সম্পর্কে সবারই একটা কৌতূহল। আমারও। তাছাড়া, আগে যেমন যে-কেউ দরকার পড়লেই সুখেন্দুর ঘরে ঢুকতো, কথা বলতো, বা কিছু জিগ্যেস করে আসতো, পর্দাটা দেওয়ার পর সেটা আর সম্ভব ছিল না। মা কিংবা নমিতা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকতো, কিছু বলতে হলে। 'সুখু, একবারটি শুনে যা', কিংবা, 'এই মেজদা, বাবা তোমায় ডাকছে'।

পর্দাটা হাওয়ায় দুলে উঠতে নমিতাকে একদিন ভেতরে উঁকি দিতে দেখেছিলাম। ও চায়ের কাপ নিয়ে যাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরটা দেখে নিল বোধহয়।

একবার সুখেন্দুর সঙ্গে কি একটা পরামর্শ করার ছিল, ও পর্দা সরিয়ে আমাকে ডাকলো। ওর ঘরে ঢুকলাম। তখনই ঘরের ভিতরটা দেখেছিলাম। রীণার রুচি আছে। জানালায় রঙিন পর্দার নকশা, বিছানার চাদরে ডিজাইন। খাটের পায়ে এক টুকরো সুন্দর কার্পেট। একপাশে রেডিওগ্রাম। কি ভাল যে লেগেছিল। আমার সেই অগোছালো ঘরখানা যে এত সুন্দর হতে পারে আমার ধারণাই ছিল না।

কিন্তু ঘর সাজালেই তো সংসার সুন্দর হয় না।

হঠাৎ একদিন ওর ঘর থেকে একটা তর্কবিতর্ক ভেসে এল। মা সচকিত হয়ে ঘাড় তুলে শোনবার চেষ্টা করলো। আমি উপেক্ষা করার ভান করলাম। মা হাসতে হাসতে বললে, কি হ'ল আবার দেখি। বলে উঠে গেল।

ওরকম একটু দাম্পত্যকলহ তো হয়েই থাকে। তাই প্রথম প্রথম আমরা

নির্বিকার ছিলাম। কিন্তু ক্রমশ আমাদের মন খারাপ হতে লাগলো। ঘরের পর্দা নোংরা হ'ল, কিন্তু সেদিকে যেন রীণার দৃষ্টি নেই। রীণার চেহারাও বিবর্ণ হতে লাগলো।

একবার ও বাপের বাড়ি গেল, ফিরতেই চায় না।

মা বললে, তোর বাবা লিখে দিচ্ছে, বউমাকে নিয়ে আসার জন্যে। যা সুখু, গিয়ে বউমাকে নিয়ে আয়, বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

সুখেন্দু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি দরকার, বেশ তো আছি।

অনেক বলা-কওয়ার পর সেবার সুখেন্দুকে রাজী করানো গিয়েছিল। কিন্তু কোথাও কোন চিড় খেয়েছে বলে বাবার মনে খটকা ছিলই। আমি বেশ বুঝতে পারতাম।

বাবার চশমার পাওয়ার তখন অনেক বেড়ে গেছে, খবরের কাগজটা দূরে সরিয়ে পড়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আমি তাই ভেবেছিলাম বাবা কাগজ পড়ছে।

হঠাৎ চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে কেমন একটা হতাশার গলায় বললে, কি যে হলো! সুখুর ঘরে আজকাল রেডিওগ্রামটাও চলে না।

বাবার ঘরে পুরোনো রেডিওটা ছিল। আমি বুঝতে না পেরে বললাম, চালিয়ে দেব রেডিওটা?

সুখেন্দুর রেডিওগ্রামটা আসার পর এটা চালানোর আর প্রশ্নই উঠতো না। কারণ বেশ একটু জোরেই চালাতো সুখেন্দু, সারা বাড়ি গমগম করতো, সারাক্ষণ গানে গানে ভরে থাকতো।

ভাবলাম বাবা হয়তো খবরটবর শুনতে চায়।

বললাম, চালিয়ে দেব রেডিওটা? অর্থাৎ বাবার ঘরের রেডিওটা।

বাবা চুপ করে থাকলো একটুক্ষণ, তারপর বিষণ্ণ গলায় বললে, না, শুধু বলছিলাম সুখুর ঘরে আজকাল রেডিওগ্রামটা চলে না।

আমি কিন্তু সেটা লক্ষ করিনি। শুধু রীণাকে কেমন শুকনো শুকনো দেখাতো। সুখেন্দুকে কেমন যেন অন্যরকম।

বাবার কথায় বুঝতে পারলাম, সুখেন্দুর জন্যে বাবার খুব কষ্ট! রীণার জন্যেও। এতদিন সকলের মনেই একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল, কিছুটা কৌতূহল। এখন বাবা কিছু একটা সন্দেহ করছে, ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছে। অথচ সুখেন্দু বা রীণাকে কিছু জিগ্যেস করতেও পারছে না।

বাবা তো রীণাকে খুব ভালবাসতো, রীণাও তখন দিব্যি হাসি-খুশি, বাবার কাছে কাছে, বাবাকে সকালে হরলিকস্ করে দেয় নিজের হাতে। তারপর কি যে হয়ে গেল!

আসলে ব্যাপারটা যে কি আমরা আজও বুঝতে পারি না।

তবু, রীণা, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। বাবার অসুখ শুনে তুমি হাসপাতালে ছুটে এসেছো। বাবার জ্ঞান ফিরে এলেই আমি বলবো, বাবা, রীণা এসেছিল তোমাকে দেখতে' ঐ করিডরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ভেবে দ্যাখো, এই এত রাত্রে, ও তো এসেছিল আমাদের মতই উৎকণ্ঠা নিয়ে।

সুখেন্দুর জন্যে তুমি এখন আর একটুও কষ্ট পেয়ো না।

৬

সারারাত উদ্বেগের মধ্যে হাসপাতালের এনকোয়ারি রুমে জেগে কাটাতে হয়েছে, শরীরে অবসাদ ছাড়া কিছু নেই।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম সুখেন্দু তখনো তৈরি হয়নি। মা বললে, দাঁড়া সুখু, যাস নে। আমি স্নানটা সেরে নিই, তোর সঙ্গে যাবো।

নমিতা এসে বললে, কিচ্ছু খাওনি কাল থেকে, কিছু খেয়ে যাবে কিন্তু।

মা কেমন থমথমে মুখে বললে, আমার কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না রে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, তুই বরং একটি ঘুমিয়ে নে খোকা।

আমি তখন সত্যি ক্লান্ত, অবসন্ন। শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাবার জন্যে উদ্বেগ যেন বেড়ে গেছে। হাসপাতালের চত্বরের মধ্যে যতক্ষণ ছিলাম, তবু একটা ভরসা ছিল। এখনই যদি কিছু একটা হয় আমরা তো জানতেও পারবো না। এতকাল, বাবা, তোমাকে আমরা কষ্ট দিয়ে এসেছি। আমাদের জন্যে তুমি যে কষ্ট পাও, বুঝতে পারিনি, বুঝতে চাইনি। এখন অন্তত তোমার জন্যে আমাকে, এই অপদার্থ ছেলেটাকে কিছু করতে দাও। কত কত অসুখে তো রক্ত দিতে হয়, হার্টের অসুখে কি রক্ত লাগে না? তা হ'লে অন্তত উদ্বেগ নিয়ে হাসপাতালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে কষ্ট করতে দাও। তাই মাকে বললাম, না মা, বাড়িতে আমার মন টিকবে না।

নমিতাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ও যেন আপনা থেকেই সংসারের সব দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। সুখেন্দুকে খাবার এনে দিল, সকালের চা। জয়াও ছোটাছুটি করছে। ভাঙা মাস্তুল এই বাড়িটার এখন অন্যরকম চেহারা। এ-সময় রীণাও যদি থাকতো! না, সে বোধহয় আর এ-বাড়িতে আসবে না। কিন্তু হাসপাতালে সে যখন খবর পেয়ে এসে দাঁড়ালো, আমরা কেউ তো তাকে আসতে বলিনি। খবর পেলো কি করে তাও জানি না।

—ন'টার সময় ডাক্তার বিশ্বাস আসবেন। আমি মাকে বললাম, তাঁর সঙ্গে তো দেখা করতে হবে। ওষুধ, ইনজেকশন কিছু যদি আনতে হয়!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল কিছু টাকা জোগাড় করা দরকার। হাসপাতালে ভর্তি করার টাকাকড়ি তো কাল সুখেন্দু দিয়েছে। কত লেগেছে তাও জানি না। ডাক্তার যদি কোন ওষুধপত্তর লিখে দেন, তখন আবার সুখেন্দু বা নবেন্দুর কাছে হাত পেতে নিতে লজ্জা করবে। ওরা তো মনে মনে বলবে, এখন তো তুমি চাকরি করো, এই ক'টা টাকা দিতে পারো না। কিন্তু আমার তো মাইনে হতে এখনো দেরী। দেরাজে তো মাত্র দশ-বিশ টাকা আছে, খুচরো নিয়ে।

মা'র হাতে কিছু আছে কিনা জিগ্যেস করতেও সঙ্কোচ হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেতেও লজ্জা। 'সে কি রে, তোরা তিন তিনটে ভাই চাকরি করিস!' সহকর্মীদের কারো কাছ থেকে ধার নেওয়া যায়, কিন্তু তাদেরও তো আমারই মত অবস্থা। তাছাড়া, তার জন্যে তো সময় চাই। দুপুরের আগে সম্ভব নয়। দুপুরে একবার আপিসে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। অবশ্য টেলি-ফোনেও বলা চলে, কিন্তু আমি নিজে গেলে, আমার রাতজাগা চেহারা দেখে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। সবচেয়ে খারাপ লাগছে আমার ঐ টিউশনিটার জন্যে! ওখানেও খবর দিয়ে আসতে হবে। বেচারী! ওর এখন পরীক্ষা চলছে। টেলি-ফোনেও ওঁদের খবর দেওয়া যায়। কিন্তু ওটা নিজের প্রয়োজনে আমি বড়

একটা ব্যবহার করি না। ওটা সুখেন্দুর।

একটা জায়গায় গেলে খুব সহজেই আমি কিছু ধার পেতে পারি। ইনুর কাছে। ইনুর নিজের কাছে না থাকলেও ও ঠিক জোগাড় করে দেবে। কিন্তু তার কাছে যাওয়া যায় না, চাওয়া যায় না।

এক সময় হয়তো পারতাম। তখন ওর সম্পর্কে কত আগ্রহ ছিল। ওর ওপর একটু অধিকার আছে জানতে পারলে নিজেকে খুশি-খুশি লাগতো। এখন কেমন একটা ক্লান্তি এসে গেছে। বোধহয় ইনুর নিজেরও। দেখা-সাক্ষাৎ নিতান্ত অভ্যাসের বশেই। কথাগুলোও এখন যেন এলোমেলো, অনির্দেশ।

চীনেবাদামের ঠোঙা হাতে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এল একদিন।—কতক্ষণ? ও ঠোঙাটা এগিয়ে দিলো।

—না, এই তো নামলাম বাস থেকে।

আগের মত একটা মিথ্যে কথাও বানিয়ে বলতে ইচ্ছে করে না। 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি' বললেও খুশি হয়ে উঠতো না। এটা কি শরীরের ক্লান্তি, না মনের, তাও জানি না। এখানে-সেখানে অপেক্ষা করতেও ভাল লাগে না।

ইনুরও বোধহয় তাই। অথচ একসময় ও দূর থেকে আমাকে দেখতে পেলেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতো, ওর মুখেচোখে এক ঝলক উজ্জ্বল আনন্দ উপচে পড়তো।

সিনেমা-হাউসের দেয়ালে আঁকা ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই ইনু হাঁটতে হাঁটতে বললে, গেলে হ'তা।

বললাম, নাঃ, ছ'টা বেজে গেছে।

—তা হলে চলো কোথাও গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক্।

—তাই চলো।

এরপর চা খেতে খেতে কিছু সাংসারিক খবব। দাদা-বউদি সম্পর্কে, কখনো আমার বাড়ির কথা। কিংবা ইনুর আপিসের কারো সম্পর্কে দুটো কটূক্তি।

এ এক অদ্ভুত সম্পর্কের মধ্যে আমরা বাঁধা পড়ে আছি। কারো মনে কোন আবেগ নেই, কোন বিষয়ে আগ্রহ নেই, অথচ দুজনের কেউ দূরে সরে যেতেও চাই না। উত্তাপহীন একটা অস্তিত্ব শুধু। একটা সপ্তাহ, কিংবা এক মাস দেখা না হলেও কেউ কারো জন্যে অধীর হয়ে উঠি না। কদাচিৎ ইনুর সন্দেহ হয়, অসুখবিসুখ হয়নি তো। ব্যস্, আর কিছু নয়।

সেই গঙ্গার ধার, লেকের পাড়, উদ্দেশহীন রাস্তা, সবই আছে আগের মত। বসি, গল্প করি, পাশাপাশি হেঁটে যাই। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ নেই, সেই তৃপ্তি নেই। অথচ অতৃপ্তিও না। সিনেমা দেখতে গিয়ে ওর হাতের ওপর হাত রাখতেও ভুলে যাই, ইনুও এখন আর আমার আঙুলে ওর আঙুল জড়ায় না।

ইনুদেব বাড়িতে গিয়ে কতদিন ওর খাটের দু'প্রান্তে আমরা দু'জনে বসেছি, দু'জনের হাতে দু'খানা বই। চুপচাপ কেটে গেছে। কিংবা ওর বউদি এসে গল্প জুড়েছে। হঠাৎ কোনদিন গিয়ে দেখেছি ওর দাদা-বউদি নেই। আমার অস্বস্তি লেগেছে, ওর একটুও না।

প্রথম যেদিন ও নিয়ে গেল, আমার কি লজ্জা, কি ভয়। অথচ ওর দাদা-বউদি কত সহজভাবে আলাপ করলো, যেন আমি ওর নিতান্তই পরিচিত জন, কিংবা বন্ধু। এক সময় উঠেও গেল। ইনু, মুখ টিপে হেসেছিল, চাপা গলায় বলেছিল, কি মশাই—বাঘ না ভালুক, খুব তো ভয় পাচ্ছিলে।

সেই দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

—কি ব্যাপার, বউদি তো জানে, আমি তো আজ আসবো বলেছিলাম।

একদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে ইনু ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। একটু আনন্দিতও।

ইনু চা করতে করতে বললে, ওরা তো জানে তুমি হার্মলেস। বলে ফিরে তাকিয়ে হাসলো।

কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে আমি আগের মত কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম না। দাঁড়ালেও, কিংবা ওর কাঁধে হাত রাখলেও ইনু আতঙ্কিত হওয়ার ভান করতো না।

—এখন তো আর বেকার নও, এখন আবার কি নতুন অজুহাত। একদিন নিস্পৃহ গলায় বললে। অর্থাৎ বিয়ের কথা। .

বললাম, বাড়িতে কথাটা ভাঙলেই হয়, দেখি।

ওর ঠোঁটে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার জন্যে আমার একটুও রাগ হ'ল না। কারণ আমি তো জানি, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। যদিও জিনিসটা এখন আর আমার কাছে কোন রোমান্স নয়। হয়তো ইনুর কাছেও নয়। কিন্তু যে-হেতু দীর্ঘকাল ধরে আমরা জেনে এসেছি ওটাই আমাদের গন্তব্য, সেজন্যেই আমি এখন আর নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি না। তাছাড়া, আমার ওপর আস্থা রেখেই তো ওর এতখানি বয়েস হয়ে গেছে, এখন ও বেচারী কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

ঐ একটাই জায়গা আছে, যেখানে গিয়ে আমি হাত পেতে চাইতে পারি। 'বাবার অসুখ, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে, হাতে কিছু নেই', বলে দু'-একশো টাকা চাইলে ও যেখান থেকে পারে এনে দেবে। কিন্তু ওখানে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করলো না।

সুখেন্দুর ওপর রেগে গিয়ে আমি একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি চাকরি পাই, মাসের পুরো মাইনেটাই মা'র হাতে তুলে দেবো। ও তো বেশ ভাল চাকরিই করে, মাইনেপত্তর ভালই, ওর কি কোনদিন মনে হয়নি সংসারে ওর অনেক বেশি দেওয়া উচিত, কিংবা ঐ ক'টা টাকা দেওয়া মানে মাকে অপমান করা। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর আমি যদি সব টাকা মা'র হাতে তুলে দিতাম তা হ'লেও মা কি বিশ্বাস করতো! আমি তো কারো কাছে মাইনের অংকটাই বলতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে আমারও কিছু কিছু টাকা জমানো উচিত ছিল, তা হ'লে এই সময়ে নিজেকে এত অসহায় লাগতো না। এখন তো সুখেন্দুরই জিত হবে, কিংবা নবেন্দুর। ওদের সব দোষ এখন সবাই ভুলে যাবে, কারণ ওরা এখন কথায় কথায় টাকা বের করে দিতে পারবে। 'কিছু টাকাকড়ি নেওয়া দরকার' আমি হাসপাতালে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলাম, আর সুখেন্দু কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, নিয়েছি! মা আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল একবার। কেন, কে জানে।

সুখেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে মা চলে গেল। বললে, তুই একটু ঘুমিয়ে নে খোকা, কথা শোন। তোর শরীর ভাল না থাকলে, কে সামলাবে সব, বল।

আমার কিন্তু ঘুম এল না। এ-সময় কি ঘুমনো যায় নাকি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার কেবলই বাবার কথা মনে পড়ছিল। মা'র কথাটাও: কে সামলাবে সব বল!

আমার চোখে জল এসে গেল। আমি হয়তো সুখেন্দু আর নবেন্দুর মত টাকা রোজগার করতে পারি না, কিন্তু আমার ওপরই বাবা-মা'র আস্থা সবচেয়ে

বেশি। এর আগেও দেখেছি। বিপদে-আপদে আমি যে সব সময় পাশে এসে দাঁড়াবো বাবা জানতো। তাই কিছু পরামর্শ করতে হ'লে আমারই ডাক পড়তো। এক এক সময় মনে হ'ত আমি বিয়ে করিনি বলেই বাবা-মা ধরে নিয়েছে আমি নিঃস্বার্থ। ওরা বিয়ে করে একই ছাদের নীচে আছে বটে, কিন্তু বাবা-মা বেশ বুঝতে পারে ওরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তা হ'লে আমি যেদিন ইনুকে বিয়ে করবো, বিয়ে তো করবোই, তখন কি বাবা আবার নতুন করে আঘাত পাবে। আমি তো সেজন্যেই একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছি।

অথচ নবেন্দুর এসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। ওরা বোধহয় নিজেদের আরো ভালভাবে চেনে। ওরা যা চায় স্পষ্ট করে বলতে পারে। আমি পারিনি, পারছি না, তাই দু'দিকের আকর্ষণ কিংবা কর্তব্যবোধ আমাকে ছিন্নভিন্ন করছে। এখন তো আমি চাকরি করি, স্বাবলম্বী। ইনুকে বিয়ে করে এখন তো এ-বাড়িতেই নিয়ে আসতে পারি। ও নিশ্চয় আপত্তি করবে না, বাবা-মা খুশিই হবে। অথচ সেই যে দুম্ করে বলে বসেছিলাম, 'সুখেন্দুর বিয়ে দিয়ে দাও মা, আমি বিয়েই করবো না', তারপর এমন একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি, মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারি না। বাবা-মা'র ওপর আমার অভিমান তো সেজন্যেই এক-এক সময় রাগ হয়ে যেত, ওরা কেন বলে না, খোকা, তুই এবার একটা বিয়ে কর। তাহ'লেই তো আমি ইনুর কথা বলতে পারি।

'জয়া মেয়েটাকে আমার কিন্তু বেশ ভালই লাগে', মা একদিন হাসতে হাসতে বাবাকে বললে। বাবা বললে, 'কি ভয়ই না তুমি পেয়েছিলে!'

আশ্চর্য, তখন আর নমিতার কথা মা'র মনে নেই। কিংবা ওটা নেহাত অজুহাত। নবেন্দুর সঙ্গে জয়ার মেশামেশি মা'র পছন্দ হয়নি তাই। কিন্তু আমার সন্দেহ অন্য।

নবেন্দু তো ছেলে ভালই, ভাল রেজাল্ট করেছিল। কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেখে ভয় পেত না। একটার পর একটা দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ড্যাশিং। আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব করে ভেবেচিন্তে। লোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই অন্তরঙ্গ হতে পারে।

ও হঠাৎ একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গেল।

সুখেন্দুর বেলায় মা-বাবা কি খুশি যে হয়েছিল! এবার আর তেমন কোন উচ্ছ্বাস দেখলাম না। আমাদের বাড়িতে তখন অশান্তি চলছে, রীণাকে নিয়ে। শেষ অবধি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে আমরা কেউই বুঝতে পারছি না।

জানি না, তখন তো মনে হ'ত রাণীরই সব দোষ। মা তাই ভাবতো।

আমার একবার সন্দেহ হয়েছিল, রীণাব সঙ্গে তুলনা করেই জয়াকে এত ভাল লেগে গেছে মা'র। রীণা তখন গম্ভীর-গম্ভীর, কারো সঙ্গে বড় একটা কথা বলতো না। আর জয়া ঠিক উল্টো, ও যখনই আসতো, হইহল্লা ফুর্তি। স্বতঃস্ফূর্ত। আমার সঙ্গে সামনাসামনি পড়ে গেলেই বলতো, রাঙাদা, কেমন আছেন! একদিন মেট্রোতে কি ইংরিজি ছবি এসেছে তার নাম বললো। বললে, দেখে আসুন, দারুণ ছবি!

ওর কথাবার্তা হাবভাব আমাব বেশ ভালই লাগতো। সেজনাই কি মা বলেছিল জয়া মেয়েটাকে আমার কিন্ত বেশ ভালই লাগে! না কি মাকে আর নমিতাকে একদিন দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গিয়েছিল বলে।

আমার ধারণা, মা তখনই একটু একটু বুঝতে পারছিল। নবেন্দু চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বুঝে গেল ছেলের ইচ্ছেকেই নিজের ইচ্ছে করে নিতে

হবে। কিংবা এমনও হতে পারে, সুখেন্দুটা কষ্ট পাচ্ছে, সুখেন্দুর জন্যে বাবা-মা'র কষ্ট। এ-ছেলেটা অন্তত সুখী হোক।

ছেলেদের ইচ্ছের কাছে বাবা-মা একটু একটু করে ঘরের কোণে সরে যাচ্ছিল।

কিন্তু নবেন্দু এত বোকা আমি জানতাম না।

বাবা খবরের কাগজ পড়ছিল। নবেন্দু আর জয়া দু'জনে একসঙ্গে এসে হাজির হ'ল একদিন। আমি জয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। ওর সিঁথির দিকে তাকিয়ে। ওর সিঁথিতে একেবারে টাটকা ডগডগে সিঁদুর। তাই ওদের দু'জনেরই মুখে কেমন ভয়-ভয় ভাব।

বাবাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেই বাবা মুখ তুলে তাকালো। বোধহয় প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর জয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই বাবা গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ নামালো।

আমি বুঝতে পারলাম বাবাকে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিয়েছে ওরা।

বাবা অনেকক্ষণ চুপচাপ। ওরা দুটিতে চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে বাবা মুখ তুললো, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। চোখের কোণায় দু'ফোঁটা জল।

বাবা সোজা হয়ে বসে চিৎকার করে উঠলো। বুকফাটা আর্তনাদের মত শোনালো কথাটা।—হ্যাঁরে, তোরা কি আমাকে মানুষ বলেও গণ্য করিস না! জয়া, তুমি তো আমাকে জানো।

বাবার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

নবেন্দু আর জয়া মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

বাবার হাঁটু কাঁপছে দেখতে পেলাম। রাগে না দুঃখে, জানি না। বাবা দীর্ঘশ্বাসের মত করে বললে, কেউ সুখী হতে চায় আমি তাতে বাধা দেবো, তোরা ভাবলি কি করে। বাবার সবল সুস্থ শরীর, দুম্ করে বুকের ওপর একটা কিল মেরে বললে, তোমরা কি মনে করো আমার এখানে হার্ট বলে কিছু নেই! তোরা আমাকে আগে বললি না কেন।

জয়ার দু'চোখ বেয়ে তখন ঝরঝর করে জল পড়ছে।

৭

কাল থেকেই ডাক্তার বিশ্বাসের ওপর আমার একটা রাগ রয়েছে। জানি, অক্ষম রাগ। ও'রই তো ওয়ার্ড। অর্থাৎ এ ওয়ার্ডের উনিই প্রধান। ডাক্তারদের খবর তো আমি বড় একটা জানি না, উনি নিশ্চয় বড় হার্ট স্পেশালিষ্ট। আমাদের তো দরকার হলেই, দরকার তো প্রায়ই হয়, তখন বাড়ির ডাক্তারকেই ডাকি। তাতেই কাজ চলে যায়। স্পেশালিষ্টদের খবরাখবর আমি কি করে জানবো। আপিসে কারো সংগে গল্পগুজবে দু-একটা নাম শুনি, ভুলে যাই। যে যাকে দেখাচ্ছে সেই তো তখন সবচেয়ে বড় ডাক্তার। এখন আরেকটা রোগ হয়েছে, নার্সিং হোম।

আপিসে সত্যেনদা সেদিন বলছিলেন, স্ত্রীকে নিয়ে ভাই নাজেহাল হয়ে গেলাম। চৌষট্টি টাকা ভিজিট ডাক্তার সেনের, এ লাইনে অবশ্য উনিই টপ্, এখন আবার ক্যালকাটা হসপিটালে দিয়েছি, খরচ তো জানোই।

জানি, সব জানি। নবেন্দু কাল একবার বলেছিল, মনে আছে, 'ক্যাবিন,

ক্যাবিনে দিয়েছো তো।'

চিকিৎসাটা কারো কাছে যেন আসল নয়। লোকে যেন মনে না করে আমরা অবহেলা করেছি। লোকে জানুক, খরচ করতে এরা কার্পণ্য করেনি। সত্যেনদা মানুষটা ভালই, সাতে-পাঁচে থাকে না, সাদামাটা পোশাকপরিচ্ছদ। পারলে লোকের উপকার করে। কিন্তু সেও বার বার বলেছে, ডাক্তার সেনই এ লাইনে টপ্। লাইনটা কি অবশ্য জিগ্যেস করিনি, স্ত্রীর অসুখ বলেই। ক্যালকাটা হসপিটালের নামটাও শুনিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীর জন্যে আমি যথেষ্ট খরচ-খরচা করছি, কিছু একটা হয়ে গেলে ভেবো না এই লোকটার অবহেলাতেই মারা গেল। নাকি, এরই ফাঁকে নিজের সংগতি আছে এ-কথাটাই সকলকে জানিয়ে দেওয়া। সত্যেনদা তো সম্প্রতি ভালো গ্রেড পেয়েছেন।

বোধ হয় ভুল করছি। নবেন্দু এসেই জিগ্যেস করেছিল, ক্যাবিন, ক্যাবিনে দিয়েছো তো!

ও নিশ্চয় সেজন্যে বলেনি। তা ছাড়া আমার নিজেরও তো ধারণা, কেবিনে রাখলে ভাল চিকিৎসা হয়, ডাক্তাররা বেশি যত্ন নেয়। কেন ধারণা, তাও জানি না। টাকাটা তো ওদের পকেটে যায় না, বেশি যত্ন নেবে কেন। টাকাপয়সাওয়ালা লোক-দের, মানে ভদ্রলোকদের সবাই সমীহ করে বলে? আমরাও তো করি। রাস্তায় ফিটফাট কোন ভদ্রলোক ফিট হয়ে গেলে ছুটে যাই, একটা ঠেলাওয়ালা অজ্ঞান হয়ে গেলে ভিড়ের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে চলে যাই নিজের কাজে।

না, তা নয়, কেবিনে তো আজেবাজে রুগী থাকে না। যাদের সমাজে বেশ প্রতিপত্তি আছে, টাকায় বা প্রভাবে, তাদের বাড়ির রুগীরাই তো কেবিনে থাকে। তাই ডাক্তাররা হয়তো যত্ন নেয়। গাফিলতি হ'লে এরা প্রতিবাদ করতে জানে, ওপর মহলে, কিংবা কাগজে চিঠি লিখে।

ডাক্তার বিশ্বাসকে ঐ হাউস সার্জেন ছেলেটি কেমন বিব্রতভাবে ফোন কর-ছিল। আমি তো ভেবেছিলাম, ডাক্তার বিশ্বাস সে-রাত্রেই একবার আসবেন রুগীকে দেখতে।

আমি একবার ভাবলাম ওকে বলি, ডাক্তার বিশ্বাসকে একবারটি আসতে বলুন না।

উনি এলে আমরা অনেকখানি ভরসা পেতাম। কিন্তু হাউস সার্জেনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সাহস পাইনি। টেলিফোনে যে-ভাবে কথা বলছিলো, বুঝতেই পেরেছি, আসতে বলার সাহস হবে না। কিন্তু ডাক্তার বিশ্বাস নিজে থেকেই কেন একবার এলেন না, রুগীকে চোখে দেখলে তিনি তো বুঝতে পারতেন চিকিৎসা ঠিক হচ্ছে কি না। বাঃ রে, সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর তাঁরও তো বিশ্রাম দরকার। ও সব যুক্তির কথা, অন্য সময় বুঝতে অসুবিধে হয় না। এখন আমার বাবার জীবনমরণ নির্ভর করছে তাঁর ওপর।

রাগটা সেজন্যেই।

ভেবেছিলাম, কিছু টাকা জোগাড় করার জন্যে একবার আপিসে যাবো। টাকাটা বাবার চিকিৎসার জন্যে দরকার নয়। ওটা নিজের আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্যে, সুখেন্দু আর নবেন্দুর কাছে। তা ছাড়া, বাবার ব্যাঙ্কেও টাকা আছে, মা-র সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। তবে এখন তো মাকে চেক সই করতে বলা যায় না। নিজেরই সম্মানে লাগবে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তার চেয়েও বড় কাজ আছে আপিসে।

সুখেন্দু আর মা সকালে যখন গিয়েছিল ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে এক মিনিটও কথা বলতে পায়নি। শুধু বলেছেন, এখন কিছু বলা যায় না, ফর্টি-এইট আওয়ার্স না গেলে বলা যাচ্ছে না।

এই ডাক্তারি ব্যাপারটা আমি বুঝি না। আমরা তো শুধু হিসেব করছি, অপেক্ষা করে আছি, কখন আটচল্লিশ ঘন্টা পার হবে। কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে কেউ কি সাত দিন পরে মারা যায় না? তা হলে ও-কথা বলে কেন। আর আমরাই বা ডাক্তারদের জিগ্যেস করি কেন। 'ভাল আছেন' বলার পরমুহূর্তেই তো রুগী মারা যেতে পারে। তবু ওঁদের মুখে আশার কথা শুনতে পেলে বড় শান্তি পাওয়া যায়। অন্তত ওঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন এটুকু জানতে পারলেও।

তাই আপিসে গিয়ে একবার খোঁজ নিতে হবে, ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে চেনাজানা কেউ আছে কি না। থাকলে তাঁকে নিয়ে একবার ওঁর বাড়িতে যেতে হবে। অন্তত একটা ফোন করাতে পারলেও কাজ হবে। তখন তো কেবিন পাওয়া যায়নি, ডাক্তার বিশ্বাসকে বলে যদি পাওয়া যায়। অন্তত উনি জেনে রাখুন আমরা কেবিনে দিতে পারি। শোনা তো যায়, চেনাজানা লোক না থাকলে কোথাও কিছু হয় না। সত্যি কিনা কে জানে। তা যদি হতো, এত লোক হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে আসে কি করে। তবু চেষ্টা করাই ভাল। হয়তো একটু বেশি যত্ন নেবেন ডাক্তার বিশ্বাস।

—এই বিনোদ, আমার তো চাকরি খুব বেশি দিনের নয়, কো-অপারেটিভ থেকে আমি কি কিছু লোন পাবো?

—ডাক্তার বিশ্বাস, ডাক্তার বিশ্বাসের চেনাজানা কেউ আছে সত্যেনদা?

আপিসে বেশিক্ষণ ছিলাম না, দু-দিনের বেশি ক্যাজুয়েল লীভ নিতেও সাহস হলো না, ফিরে এলাম। আসার আগে আপিস থেকেই ছাত্রের বাড়িতে একটা ফোন করে দিলাম। ছাত্রের মা কাঁদো কাঁদো, নিশ্চয় খুব রেগে যাবে। বলবে, লোকটার একটু দায়িত্বজ্ঞান নেই, পরীক্ষার সময় এইসব অজুহাত। হয়তো বিশ্বাসই করবে না।

বিশ্বাস করতো, যদি সশরীরে গিয়ে এখনই হাজির হতাম। আমার হাতে তো একটা দারুণ অ্যাসেট রয়েছে। সত্যেনদা দেখেই বলে উঠেছিলেন, এ কি চেহারা হয়েছে শুভেন্দু! রাত্রিজাগরণ আর উদ্বেগে নিশ্চয় চোখের কোল বসে গেছে, তার ওপর খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। দাড়ি কামাতে ইচ্ছেই করেনি।

বাড়ি ফিরতেই নবেন্দু বললে, আমি আর এ-বেলা যেতে পারছি না, আমার একটু কাজ আছে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে উঠলো। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। বাবাকে যদি একটা মাস ওখানে পড়ে থাকতে হয়, তোর, সুখেন্দুর, তোদের সকলেরই কাজ থাকবে। শুধু আমাকেই প্রতিদিন যেতে হবে। কারণ, মা যে জানে, আমিই একমাত্র ভরসা। মেজ জ্যাঠাইমা জানে আমার মত ছেলে হয় না। ছোট পিসী বলবে, তুই তো বিয়ে-থা করিসনি, তুই ছাড়া আর কে দেখবে।

কেন, সুখেন্দু তো বিয়ে করেও এখন আমারই মত। মা হয়তো বলবে, ও বেচারীর কত কষ্ট ভেবে দেখ। যেন আমার কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই।

সুখেন্দু সত্যি কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। আজকাল সামান্যতেই রেগে ওঠে। এক-এক সময় কি অভব্যের মত চিৎকার করে ওঠে।

রীণা আর সুখেন্দুর মধ্যে কি নিয়ে যে চিড় ধরলো আমরা কেউই বুঝতে পারি না। মা কিছু জানে কিনা জিগ্যেস করতে পারিনি। মা বলেনি কোনদিন।

বাবা একদিন চুপি চুপি আমাকে বলেছিল, হ্যাঁ রে, রীণাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় না? সবাই যে জিগ্যেস করে।

বাবার কোন্ কষ্টটা বেশি? সুখেন্দু অসুখী, সেটাই? চোখের সামনে একটা ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে অসহ্য দুঃখ তো আছেই। তা ছাড়া, এ নিয়ে লোকে নানারকম বলাবলি করছে। স্ক্যান্ডাল পেলে তো লোকে আর কিছু চায় না। লোক-লজ্জার দুঃখটাই কি কম নাকি।

মাঝখানে তো একটা উড়ো খবর শুনেছিলাম, রীণাদের বাড়ির সঙ্গে তার নাকি যোগাযোগ আছে, বলেছিল, ওরা তো ডিভোর্সের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আমি সেদিন ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলাম।

সে লজ্জা তো সুখেন্দুর নিজেরই আরো বেশি। এক-এক সময় ভয় হয়, পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো।

খাবার টেবিলে খেতে বসেছি একদিন। রবিবার। বাবা, আমি, সুখেন্দু, নবেন্দু—সবাই।

বাবা হঠাৎ বললে, রীণাকে কতদিন দেখিনি, যা না, গিয়ে নিয়ে আয়।

সুখেন্দু কোন উত্তর দিল না, মাথা তুললো না। বেশ শব্দ করে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলো। বেড়ালের বাচ্চাটা পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল মাছের কাঁটা খাবার লোভে। আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি। সুখেন্দু হঠাৎ ওটার পেটে সজোরে একটা লাথি মারলো। মা চিৎকার করে উঠলো, মরে যাবে রে, ও কি করলি। বেড়ালের বাচ্চাটা ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো।

বাবা আর খেতেই পারলো না। নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

জানি না, লাথিটা তুই হয়তো নিজেকেই মারলি, নিজেকেই মারতে চেয়েছিলি। কিন্তু স্টুপিড, বুঝতে পারিসনি, ওটা বাবার গায়ে গিয়েই লেগেছে।

ইমার্জেন্সির ডাক্তার জিগ্যেস করেছিল, এটা কি থার্ড অ্যাটাক?

ফুলেফলে সমৃদ্ধ একটি বৃক্ষ, এর বেশি তো বাবা কিছু গড়ে তুলতে চায়নি। তার বদলে আঘাতে আঘাতে মানুষটা নিজেই ক্ষয়ে গেল।

একটা সংসারকে সুন্দর করে তুলতে হলে কিসের প্রয়োজন? টাকার? আমি তো এক সময় তাই ভাবতাম। এখনো হয়তো ভাবি। কখনো কখনো মনে হয়, আমার ব্যর্থতাই বাবার জীবনে প্রথম আঘাত। কিন্তু সচ্ছলতা পেয়েও সুখেন্দু তো নিজের জীবনটাকেই সুখী করতে পারলো না। আমরা সকলের সঙ্গে সকলে এমনভাবেই জড়িয়ে আছি, কেউ একা সুখী হতে পারি না। এরই নাম সমাজ কিনা কে জানে।

সমাজ এমন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে আমাদের সকলকে ফেলে দিয়েছে, যেখানে আমরা নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে ঘুরছি, সুখী হবার পথ খুঁজছি। কিন্তু যতই নিজেকে একা মনে করি না কেন, সকলের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি এমন ভাবেই যে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। সকলে সুখী না হলে আমরা কেউ সুখী হতে পারি না।

নবেন্দু একদিন আমার কাছে ফিসফিস করে বলেছিল, রাঙাদা, শেষে আমাদের বাড়িতেও ডিভোর্স-টিভোর্স হয়ে যাবে না তো, লজ্জায় তখন আব মুখ দেখাতে পারবো না।

একটু থেমে বলেছিল, জয়া এক-একদিন জিগ্যেস করে, এত খারাপ লাগে।

আমাদের সুখী হবার কোন উপায় নেই। এই বাড়িটা যদি ভেঙে যায়, একদিন তো ভেঙে যাবেই, তখনো কেউ সুখী হতে পারবে না। কারণ, আমরা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি। ভেতরে ভেতরে যে সকলের মধ্যেই একটা ঘুমন্ত ভালবাসা রয়ে গেছে। এই লজ্জাই আমাদের ভালবাসা। ভালবাসি বলেই তো তাদের জন্যে এত সংকোচ।

আমার ধারণা ছিল, নবেন্দু খুব মর্ডান। ওকে এসব স্পর্শ করে না। ওরা তো আজকালকার ছেলে, ভালবেসে বিয়ে করতে ভয় পায় না, ভালবাসা উবে গেলে যে যার নিজের পথে চলে, জীবনটাকে নষ্ট করতে জানে না।

তা হলে আর নবেন্দুরা কতটুকু এগিয়েছে, যদি এটাকে এগোনোই বলা হয়। মুখে তোরা যতই বড় বড় কথা বল, সামাজিক বন্ধন থেকে তোদেরও মুক্তি নেই। সুখেন্দুর জীবনে যাই ঘটুক না কেন, তোর এত লজ্জা পাবার কি আছে। তুই তো সংসারের মধ্যে থেকেও নেই। তুই নিজেকে নিয়ে পৃথক অস্তিত্বের মধ্যে সুখ খুঁজছিস, তবু দেখবি দুঃখ তোকে তাড়া করে বেড়াবেই। যেখানেই যাস। আমরা সকলের সুখ ভাগ করে নিতে পারি না, কিন্তু যে-কোন একজনের কলংক আমাদেরও স্পর্শ করে।

আমাদের এই সমাজের চেহারাও একই রকম। আমাদের শুধু সমাজেব কলংক বয়ে বেড়াতে হয়, কারণ সমস্ত সমাজটাকে আমরা কেউ সুখী করতে চাইনি।

নবেন্দু, তোকে আমি সুখী ভেবেছিলাম, কিন্তু লোকলজ্জার কাঁটা তোকেও বিঁধছে। তুই কোথায় পালাবি।

বাবার কথা শুনে সেদিন আমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

বাবা নিজের বুকের ওপর দুম্ করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমাদের কি ধারণা, আমার এখানে হার্ট বলে কিছু নেই?

এখন মনে হচ্ছে, বাবার কোন হার্টের রোগ আছে আমাদের যে কোনদিন মনে হয়নি সেটা কোন অপরাধ নয়। আমরা তো সত্যিই কোনদিন ভাবিনি, নিয়মশৃংখলায় বাঁধা সংস্কারে আচ্ছন্ন এই রাশভারী মানুষটার বুকের মধ্যে হার্ট বলে কিছু আছে। সব গোঁড়া আদর্শবাদী মানুষগুলোকেই যা মনে হয়। পাছে কেউ ভুল করে বসে, কেউ দুঃখ পায়, এই ভয়েই তো তাদেব ব্যবহারে, তাদের বাইরের চেহারায় এমন একটা কাঠিন্য।

শেষ অবধি বাবা নিজেই উপযাচক হয়ে জয়াদের বাড়ি গেছে। রীতিমত প্যাণ্ডেল টাঙিয়ে শাঁখ বাজিয়ে জয়াকে এ-বাড়ির বউ করে নিয়ে এসেছে বাবা।

আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু একটা ক্ষীণ সন্দেহ আমার মনের মধ্যে রয়েই গেছে। সুখেন্দুর জন্যে বাবা বোধ হয় নিজেকেই অপরাধী ভাবতো। সেজন্যেই ভিতরে ভিতরে নিজের ধারণা পাল্টে ফেলেছিল। জানি না, হয়তো আমারই ভুল। বাবার বুকের ভিতরটা বোধ হয় চিরকালই এমনি নরম। আমরাই বুঝতে পারিনি।

নিজেকে চিরে চিরে দেখতে গিয়ে এখন অবাক লাগছে। এর পরও আমি কেন ইনুর কথা কোনদিন বলতে পারলাম না? আর তো কোন ভয় ছিল না। বাবা নিশ্চয় সম্মতি জানাতো, হয়তো খুশিই হতো। যাক, খোকা তা হলে শেষ অবধি বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

দিনে দিনে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে আমি কি নিজের একটা মুখোশ গড়ে

তুলেছি! আর সেই মুখোশটার জন্যে সকলের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়োতে কুড়োতে আমি কি একটা গন্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছি! তাই মুখোশটা খুলে ফেলতে আমার এত ভয়।

বাবাও তেমনি একটা রাশভারী মুখোশের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে বন্দী ছিল কিনা কে জানে। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই বোধ হয় তাই।

নবেন্দুর বিয়ের পর বাবা মুখোশ খুলে ফেলতে চাইলো, নাকি নতুন করে একটা মুখোশ পরলো বুঝতে পারিনি।

বাবা তখন চাকরি থেকে অবসর নেবার দিনটা এগিয়ে আসতে দেখছে।

বাবা হঠাৎ বলে বসলো, আমরা দুই বুড়োবুড়ি, হ্যাঁ রে, এত বড় ঘরখানা নিয়ে আমাদের হবে কি! বরং নবেন্দুকে বল এ-ঘরে আসতে।

যেন এতদিন বাবার ঘরখানা এত বড় ছিল না।

নবেন্দুর খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল। ও প্রথমটা রাজী হয়নি।

দক্ষিণের একখানা ঘর আমি সুখেন্দুকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিংবা বলা যায়, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাবা তখন খুব দুঃখ পেয়েছিল। কারণ, সুখেন্দু নিজের মুখেই সে-কথা বলেছিল মাকে। আর আমি তখনো চাকরি পাইনি, অপদার্থ। এখন একটা কম মাইনের চাকরি জুটেছে, কিন্তু বাড়িতে আমার কোন অর্থমূল্য নেই, ইমেজ নেই।

বাবা কি সেই ভয়েই ঘরখানা নবেন্দুকে ছেড়ে দিল? আমার এক-একবার সন্দেহ হয়েছে। এর পর তো শুধু পেনসনের টাকাই ভরসা। সে টাকায় এত বড় একটা সংসার চলবে না।

আসলে বাবার এই কান্ডটা দেখে আমার একটুও ভাল লাগেনি। মনে মনে বাবার ওপর রেগে গিয়েছিলাম। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা কি নবেন্দুকে খুশি করতে চাইছে। কিন্তু ঘরটা ছেড়ে দেওয়ার ফলে এ-বাড়িতে বাবা নিজেই যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে তা কি বুঝতে পারছে না! পরক্ষণেই মনে হয়েছে, আমি কি বাবার কথা ভাবছি, না নিজের কথা। এ-বাড়িতে বাবার চেহারাটা যত খাটো হবে, আমার মূল্য ততই তুচ্ছ, নগণ্য হয়ে যাবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবছিলাম, বাবার যদি মৃত্যু হয় তা হলে তো আমার কোন ইমেজই অবশিষ্ট থাকবে না। সেজন্যেই কি বাবার জন্যে আমার এত ভাবনা, এত কষ্ট!

হঠাৎ ইনুর কথা মনে পড়লো। আমি তো নিজের কষ্টের কথা ভাবছি, বাবার কষ্টের কথা ভাবছি। অথচ ইনুর কষ্টের কথা একবারও ভাবছি না। এখন আর ইনুর কোন কষ্ট আছে কি না তাও জানি না।

—তুমি তো এক সময় আমাকে ভালবাসতে, তাই না?

আমি হাসলাম।—ঠিক মনে করতে পারছি না।

—আমার কিন্তু একটু একটু মনে পড়ছে। আপিস থেকে বেরিয়ে রেড রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে আসছি, তোমার খেয়াল চাপলো বাসে উঠবো না।

আমি বললাম, ময়দানে কোথায় যেন বসেছিলাম।

—ঐ তো, ঐ জায়গাটায়। ইনু আঙুল দেখালো।

বললাম, হবে হয়তো, কত জায়গাতেই তো ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি। এখন সব মিলে-মিশে গেছে।

ইনু হাসলো।—এখন আমাদের স্মৃতিটাই ভালবাসা।

আমি বললাম, ভালবাসা একটা স্মৃতিই।

—আমাদের কাছে কিছুই নতুন রইলো না।

—হ্যাঁ, প্রেমটাকেও পুরোনো করে দিলাম। আমারই দোষ।

ইনু বললে, বিয়েটিয়ের কথা তোমার তো এখন আর মনেই হয় না।

বললাম, তুমি তো বলছো আর কিছুই নতুন রইলো না।

ইনু ক্লান্তভাবে হাসলো। বললে, আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আমরা ছাড়াও তো কেউ কেউ আছে। তারা শেষরক্ষা দেখতে চায়।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের মনেই হেসে উঠলাম। তার পরই সারা মন কেমন বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। আমি তো ইনুর দিকটা একবারও ভেবে দেখিনি। শুধু নিজের ক্লান্তির কথাটাই ভাবি। এমন তো হতে পারে ওর মনের মধ্যে ভালবাসা তখনো মরে যায়নি। আর আমি শুধুই কর্তব্যে বাঁধা। অথচ এক একদিন ওর সঙ্গ ভালও লাগে। বিবাহিত জীবনটাও এমনই কিনা কে জানে।

প্রেম ভালবাসা এসব এখন মূল্যহীন। ইনুর কাছে সামাজিক মর্যাদাই এখন সবচেয়ে বড় কথা। ওর দাদা-বউদি না মনে করে শুভেন্দু একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবঞ্চক। কিংবা ইনুটা বোকা, বোকা।

একটা মরা প্রেম নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করছি। সেটা যে কি কষ্টের ইনু হয়তো জানে না। কিংবা জানে। ওরও হয়তো সেই একই কষ্ট। তবু বলতে পারে না। আমরা কেউই কাউকে বলতে পারি না। কারণ, আমরা একজন অন্য-জনকে কষ্ট দিতে চাই না। বাঃ রে, সেটাও তো আরেক ধরনের ভালবাসা। রোমাঞ্চ, উৎসাহ, উদ্দীপনা নিভে যাওয়ার পর ধূপের গন্ধের মত সেটা থেকেই যায়। বার্ধক্যের ভালবাসার মত।

এখন আমার বুকের ওপর থেকে সব ভার নেমে গেছে, তাই ইনুর কথা ভাবছি। মা'র বিষাদক্লিষ্ট মুখে এক টুকরো হাসি ফুটেছে।

ডাক্তার বিশ্বাস বলেছেন, এখন ভালোর দিকে। সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এসেছে। পিক আপ করছেন, আমরা আশা করতে পারি, পেশেন্ট সেরে উঠবে।

কিন্তু ডাক্তার বিশ্বাস, আপনার পেশেন্ট শুধু ঐ একজন নয়। আমাদের প্রত্যেকের হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার মত কোন যন্ত্র কি আপনার আছে'

৮

বাবার জন্যে এখন আর কোন উদ্বেগ নেই। বাবা সেরে উঠছে। ধীরে ধীরে একটু-আধটু কথাও বলে। রোগপাণ্ডুর মুখে কখনো কখনো ক্লান্ত হাসি ফোটে।

ডাক্তার বিশ্বাস একদিন হাসতে হাসতে বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই, এ যাত্রায় আপনি বেঁচে গেলেন। কিন্তু ঐ পেস-মেকার আপনার আজীবন সঙ্গী হয়ে রইলো।

বাবা শুনে ম্লান হেসেছিল। একবার যেন একটা হাত তুলে বুকের কাছে ছুঁয়েছিল। অন্য হাতটা অবশ এবং স্থির হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। তার সঙ্গে কি সব ইলেকট্রোডের তার লাগানো, শিরার ভেতর দিয়ে নাকি গেছে। বইয়ের মাপের একটা চৌকো যন্ত্র কাছেই নামানো। এসব দেখলে ভয় হয়, বাবার কষ্ট হচ্ছে ভেবে কষ্ট হয়।

বেডের পাশে এখন আমরা গিয়ে বসি। যতটুকু সময় থাকা যায় ভিজিটিং আওয়ার্সে। টুল টেনে নিয়ে মাকে বসতে দিই। বাবার বেডের পাশে। মা ধীরে ধীরে কথা বলে, হাসে, কখনো রসিকতা করে কিছু একটা নিয়ে।

ডাক্তার বিশ্বাসের কথা শুনে আমরা চমকে উঠেছিলাম। উনি বুঝতে পেরে বললেন, না, না, ওটা নয়। ছোট্ট একটা পেস-মেকার, আমার হাতের বড় রিস্ট-ওয়াচটা দেখিয়ে বললেন, 'ধরুন ঐ রকম, বুকের কাছে বসিয়ে দেবো।' বলে হাসলেন।

ডাক্তার বিশ্বাস চলে যাবার পর আমাদের সামনেই মা বললো, তবে আর কি, বুড়ো বয়সে এবার সতীন নিয়েই থাকো।

আমরা একটু লজ্জা পেয়েছিলাম। জয়া খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

ও মাঝে মাঝেই আসে, একদিন এসেছিল তিলুকে সংগে নিয়েই।

বাবা তো তিলুকে ভীষণ ভালবাসে, কোন সময়ে আগে কাছছাড়া করতে চাইতো না। ওর জন্যে লজেন্স আনিয়ে রাখতো। নবেন্দু কিংবা জয়া কোন ব্যাপারে শাসন করতে গেলেই বাবা এসে ওদের ধমক দিতো তিলুর সামনেই। কিংবা তিলুকে কোলে নিয়ে সরে যেত সেখান থেকে।

আমি জানতাম বাবা আবার একদিন আঘাত পাবে। নবেন্দুর কাছ থেকেই। আমি বুঝতে পারছিলাম তিলু দু'রকমের ভালবাসার মাঝখানে পড়ে গেছে।

বাবা আগের মত কাউকে ভালবাসতে পারছে না বলে সমস্ত ভালবাসা তিলুর ওপরই ঢেলে দিতে চাইছে, অন্ধের মত। কিন্তু তিলুর ওপর নবেন্দু আর জয়ার ভালবাসা অন্য রকম। ওরা তিলুকে মানুষ করতে চায় নিজেদের মনের মত করে।

নবেন্দু একদিন নিষেধ করেছিল বাবাকে।—তুমি ওকে লজেন্স-টজেন্স দিও না, ডাক্তার বারণ করেছে।

বাবা তাই লুকিয়ে লুকিয়ে তিলুকে একটা লজেন্স দিয়েছিল। বাবার ঘরে আলমারির তাকে টফি আর লজেন্সের ঠোঙাটা আমি দেখেছিলাম। আমিও বলেছিলাম, ওরা যখন চায় না, দাও কেন ওসব তুমি। জানি না কি দুর্বলতা, বাবা আবার একদিন ওকে লজেন্স দিল। না দিয়েই বা পারবে কেন, তিলু যদি বাবার কাছে বার বার নড়বড়ে পায়ে ছুটে আসে, হাত পেতে দাঁড়ায় বাবা কি করবে! ওকে কি তাড়িয়ে দেবে, না তার কান্না দেখবে!

তিলু মেয়েটাও কি বোকা। ও লজেন্স মুখে পুরেই বারান্দায় বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। বাবা ছেলেমানুষের মত হাসতে হাসতে চাপা গলায় ওকে বললে, এই যাস না, তোর বাবা দেখতে পাবে।

মেয়েটা খুব খুশি খুশি মুখে তবু ছুটে বেরিয়ে গেল। আর সংগে সংগে একেবারে নবেন্দুর মুখোমুখি।

নবেন্দু খ্যাপার মত চেঁচিয়ে উঠলো, এই তিলু, দেখি, এদিকে, কি খাচ্ছিস?

আমি ওর রাগ দেখে বাঁচাতে গেলাম।

তার আগেই তিলুর মুখে আঙুল ভরে দিয়ে লজেন্সটা নবেন্দু বের করে নিলো। রেগে গিয়ে সেটা ভুঁইপটকার মত জোরে আছড়ে মারলো বারান্দার সিমেন্টে। সেটা দশটা টুকরো হয়ে দশ দিকে ছিটকে গেল। তিলু কেঁদে উঠলো শব্দ করে।

নবেন্দু যখন লজেন্সটা আছড়ে মারলো, বুঝতে পারলাম, ওর ভেতরের জমা হয়ে থাকা রাগটা বোমা হয়ে ফাটতে চাইলো।

বাবা বেরিয়ে এসেছে তখন, কেমন অপ্রতিভ মুখে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কোন দিন দেবো না।

ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বাবার জন্যে মায়া হয়েছিল। বাবার তো এখন ভালবাসার ধরনটাই ঐ রকম, বাবা কি করবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, নবেন্দু আর জয়ারও তো কোন দোষ নেই। ওরা কি শাসন করবে না? ডাক্তার যদি বারণ করেই থাকে। কি একটা লিভারের অসুখের কথা একবার শুনে-ছিলাম, কৃমিটিমিও আছে বোধ হয়।

মা সব শুনে শুধু বলেছিল, এতগুলো ছেলেমেয়ে মানুষ করলাম, ডাক্তার কি বেশি জানে।

ওটা কোন যুক্তি নয়। ওটা অন্ধ ভালবাসা। কিন্তু নবেন্দুকেও বলি, বাচ্চা মেয়েটার মুখের ভেতর থেকে লজেন্সটা বের করে না দিলে কি চলতো না। আসলে ওটা তোর রাগ। বাবার ওপর, কিংবা আমাদের সংসারের ওপর।

সে জন্যেই তোদের সময় হয়ে ওঠে না হাসপাতালে আসার, বেডের পাশে বসে বাবার সঙ্গে দুটো কথা বলার। প্রায়ই তোর কাজ থাকে, জয়া সংসার নিয়ে ব্যস্ত, তিলুকে নিয়েও।

—তোরা না যেতে পারিস, তিলুকে বরং নিয়ে যাই, ওকে দেখলে তোর বাবা কত শান্তি পায়। মা বলেছিল।

জয়া শান্ত ভাবেই বলেছিল, আমি তো নিয়ে যাই মা এক-একদিন, কিন্তু ঐটুকুন বাচ্চা, ওকে কি রোজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ভাল, কত রকম রোগ ওখানে।

নবেন্দুটা কেন যে অকারণ রেগে যায়। এভাবে বুঝিয়ে বললেই তো পারে।

কিন্তু হাসপাতালে বেশি দিন পড়ে থাকাও এক যন্ত্রণা। আমি তো বুঝি, সারা দিন বাবা কত আশায় আশায় থাকে। ভিজিটিং আওয়ার্সের সময় হলেই বাবার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাবা মনে মনে চায়, সমস্ত সংসারটা এখানে উঠে আসুক। সবাই বাবাকে ঘিরে বসে থাকলে তবেই খুশি। কিন্তু এখন আর সুখেন্দু প্রায়ই আসে না। নবেন্দুর প্রায়ই কাজ থাকে। বেশ বুঝতে পারি উদ্বেগ চলে যাওয়ার পর নিত্যদিন এই আসা-যাওয়া ওদের কাছে একটা বাজে ঝামেলা। মানুষটা কত আশায় আশায় থাকে সে-কথা ওরা ভাবেই না।

—হ্যাঁ রে, সুখেন্দু পর পর দু' দিন এল না কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু নয়তো, তোরা বুঝি লুকোচ্ছিস আমার কাছে।

মানুষটা অসুখ নিয়ে পড়ে থেকেও অন্যের অসুখ নিয়ে ভাবছে।

একদিন রুগ্ণ হাসি হেসে বললে, নবেন্দু আসছে না কেন, এখানে তো আর তিলুকে লজেন্স দিচ্ছি না।

আমার এ-সব শুনে বড় কষ্ট হ'ত। প্রথম প্রথম ওদের ওপর প্রচণ্ড রাগ হ'ত। মনে মনে বলতাম, অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। কিন্তু কয়েক দিন থেকে আমার নিজেরও বড় ক্লান্তি লাগছে। বড় একঘেয়ে। তাছাড়া ফিরতে ফিরতে দেরী হয়ে যায়, ছাত্রের বাড়িতে আর যাওয়াই হচ্ছে না। একদিন গিয়ে কোনরকমে বুঝিয়ে এসেছি। বুঝেছে কিনা কে জানে। হয়তো গিয়ে দেখবো, অন্য কেউ পড়াতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে অসুবিধে আমার আপিসেই। কতদিন আর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায়। তাড়াতাড়ি না বেরুলে বাবার কাছে সময় মত পৌঁছনো যায় না। বাবা হয়তো সেদিন ভেবে বসবে, এ ছেলেটাও আমাকে ছেড়ে দিল।

একটা বেডে তো বাবার চেয়েও অনেক বুড়ো একজন পেশেন্ট পড়ে আছে। সবারই কাছে কত লোক আসে, তারা হাসে, কথা বলে, চলে যায়। ঐ বুড়োটা ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে বড় মায়া হয়। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে দু' চারটে কথা বলেছিলাম। এক একদিন কেউ তাকে দেখতে আসে, আর সেদিন তার মুখে কেমন একটা জ্যোতি ফুটে ওঠে, কি এক স্বর্গীয় আনন্দ।

কিন্তু আমাকে তো একদিন ইনুর কাছে যেতে হবেই। সে কি ভাবছে কে জানে। অবশ্য খবরটা তাকে দিয়েছি। যদি বিশ্বাস করে।

বাবাকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম, তারপর তিন-চার দিন আমি তো দাড়ি কামাতেও ভুলে গিয়েছিলাম। তখন তো সারাক্ষণ উদ্বেগ, সব সময় ভয়-ভয়। খাওয়ায় রুচি ছিল না। দাড়ি কামানোর কথা মনে পড়েনি তা নয়, মনে পড়লেও ইচ্ছে হ'ত না। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ নিয়েই একদিন আপিসে গিয়েছিলাম। টাকার খোঁজে। ডাক্তার বিশ্বাসের চেনাজানা কেউ আছে কিনা খোঁজ নিতে। সত্যেনদা দেখে বলে উঠেছিল, কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার, শুভেন্দু। আমার বস্ যিনি সান্যাল সাহেব, তাঁর মুখেও উৎকণ্ঠা এবং সমবেদনা দেখতে পেয়েছিলাম। জানি না, রাত জাগার জন্যে কিংবা উদ্বেগে চোখের কোল বসে গিয়েছিল হয়তো। কিংবা দাড়ি না কামানোর জন্যেই।

দাড়িটাড়ি কামানোর পর এখন আর কেউ চট করে কিছু বিশ্বাস করবে না। ভাববে অজুহাত দিচ্ছি। ইনুও তাই না ভেবে বসে। ইনু আর যাই ভাবুক, আমাকে যেন অকৃতজ্ঞ না ভাবে। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে যাবার পর আমি অপেক্ষা করছিলাম, ডাক্তার বিশ্বাস একবার রাউন্ডে আসেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করবো আর কতদিন থাকতে হবে বাবাকে। কবে ছেড়ে দেবেন।

হাসপাতালে এটাই একটা যন্ত্রণা। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করা। তাঁর ওয়ার্ডের পেশেন্টদের দেখে বেরিয়ে যাবার সময়টুকুতে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, কোন ফাঁকে চলে যাবেন ঠিক নেই। কিছু জিগ্যেস করতে গেলেও থেমে দাঁড়ান না, হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেন, অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না, বার বার জিগ্যেস করতেও সাহস হয় না। হয়তো রেগে যাবেন। রেগে গেলে আমাদেরই ক্ষতি, আপনার হাতে যে আমরা একটা প্রাণ তুলে দিয়েছি।

ডাক্তার বিশ্বাসকে দেখতে পেয়েই আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম। উনি চিনতে পারলেন তাই দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, এই যে এসেছেন, শুনুন.

যেন আমি আসি না, খোঁজ করি না, দেখা করতে চাই না ওঁর সঙ্গে।

উনি বললেন, পেস-মেকারের কি করলেন?

আমি বিভ্রান্ত বোধ করলাম। বললাম, পেস-মেকার!

—সে কি, কেউ বলেনি আপনাকে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, কই, না তো!

ওঁর কপাল কুঞ্চিত হলো, বোধ হয় কারো ওপর রেগে গেলেন। কিংবা বলতে ভুলে গেছেন বলে নিজের ওপরই।

উনি বললেন, একটা পেস-মেকার আনিয়ে নিন, হাসপাতালেরটা তো আর দেওয়া যাবে না।

আমি তখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। ও-সব কথা তো আমাদের কেউ বলেনি আগে। কারো কাছে শুনিওনি। পেস-মেকার ব্যাপারটা কি তা তো

হাসপাতালে এসে জানলাম। হার্টের রোগ সম্পর্কে তো কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। কারণ, ঠিক এমনি কোন দুঃসংবাদ যখনই কেউ শুনিয়েছে, কিংবা তার সমস্যার কথা তখন শুধু একটা উৎকণ্ঠার ভান করেছি, অথবা নিছক মৌখিক সমবেদনা জানিয়েছি। তার কথাগুলো ভাল করে শুনতেও চাইনি। আমরাও তো সব সময় নিজের নিজের সমস্যার মধ্যেই বন্দী।

ডাক্তার বিশ্বাস ধীরে ধীরে বললেন, ও জিনিস কিন্তু এখানে পাবেন না, বিলেত থেকে আনাতে হবে।

চমকে উঠে বললাম, বিলেত থেকে?

আমি বিভ্রান্ত বোধ করলাম। কিন্তু আমাকে যেন আরো বিব্রত করার জন্যেই উনি একটা ব্যাঙ্কের নাম বললেন।—কালই ওখানে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে ব্যবস্থা করুন। ওরাই আনিয়ে দেবে। গাভমেন্টের সঙ্গে সে-রকমই ব্যবস্থা আছে। শুধু বলবেন, খুব তাড়াতাড়ি চাই।

হাউস সার্জেনকে সেই সময় ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে বললেন, দাও এখনই লিখেটিখে দিচ্ছি।

কিন্তু হাউস সার্জেন যে আমাকে পেস-মেকারের কথাটা বলেনি তার জন্যে উনি তাকে কিছুই বললেন না। আসলে ওঁরা সে-কথা কেউই আগে বলতে চাননি, কেন তাও বুঝতে পারছি। বাবা বেঁচে উঠবে কিনা সে-সম্পর্কে ওঁদের বোধ হয় সন্দেহ ছিল।

আমি কাগজটা নিয়ে চলে আসার আগে সঙ্কোচের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম, কত টাকা লাগতে পারে জানেন নাকি।

উনি বললেন, হাজার পাঁচেক, হাজার পাঁচেক লাগবে বোধ হয়।

এত টাকা! আমার সমস্ত মুখ কি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল! আমি কি ভিতরে ভিতরে খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম?

মা তো এসব কথা কিছুই শোনেনি, নীচে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, কোন খারাপ খবর না তো রে?

আমি হেসে বললাম, না না, ভাল খবর। ওঁরা খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।

তখনই আমি মাকে আসল কথাটা বলতে পারলাম না। কিন্তু না বলেও তো উপায় নেই। সুখেন্দু বা নবেন্দুর কাছে অত টাকা আছে নাকি! ওরা তো যা রোজগার করে পোশাক-আশাকের পিছনেই খরচ করে, এ ক' বছরে কত টাকাই বা জমাতে পেরেছে। ব্যাঙ্কে অবশ্য বাবার জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট, কিন্তু ওটা নামেই শুধু। মা তো কোনদিন চেক সই করেনি, এখন এই বিপদের সময় সই মেলাতে পারবে কিনা তাও জানি না।

আমার হঠাৎ একটা ক্ষীণ সন্দেহ হ'ল, থাকলেও ওরা দিতে চাইবে না। সুখেন্দু তো একবার রেগে গিয়ে বলেই ছিল, সারা সংসার ও টানতে পারবে না। এ কথার তো একটাই অর্থ। রাঙাদা এবং নবেন্দু—এরাও কেন সংসারের জন্যে সমান দায়দায়িত্ব নেবে না।

মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ওদের কাছে একটা অঙ্কের হিসেব শুধু। কারণ ওরা যে জীবনে সাকসেসফুল। আমার মত অপদার্থ মানুষগুলো কিছুই দিতে পারে না বলে শুধু ভালবাসা দিতে চায়।

আমি জানি, জানি, বাবার হৃৎপিণ্ড কিনে দেয়ার টাকাটা তোরা কেউ দিতে চাইবি না। কারণ, তোরা জানিস, ও টাকাটা বাবার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যাবে না। বড় জোর তোরা বলবি, একার পক্ষে ওটা কিনে দেওয়া সম্ভব নয়।

ইমার্জেন্সির ডাক্তার জিগ্যেস করেছিলেন, এটা কি থার্ড অ্যাটাক।

আমি তো স্বীকার করছি, আমরা তিন জনই দায়ী। আমিও। কারণ, আমি যে বাবার স্বপ্ন সফল করতে পারিনি। আমার জন্যে বাবার কষ্ট, বাবার লজ্জা।

সুখেন্দুর জন্যেও। রীণা চলে যাওয়ার পর ও তো এখন একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে। এই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা পৃথক মানুষ। রাগী না অভিমানী বুঝতে পারি না। ওর জন্যে আমাদের সক্কলের ভয়। বউদি ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু করে বসবে না তো, নবেন্দু বলেছিল। বাবা-মা ঐ একই আশংকায় রাত্রে ঘুমোতে পারে না, আমি জানি। সুখেন্দুর জন্যে কষ্ট, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ওদের কুরে কুরে খেয়েছে—লোকলজ্জা। আমাদের পরিবারে এসব তো কখনো হয়নি।

হাসপাতালে প্রথম দিন রীণাকে দেখে তাই খুশি হয়ে উঠেছিলাম। ভেবে-ছিলাম আমরা যা ভাবছি সব ভুল। সুধার কাছে খবর পেয়েই ও চলে এসেছিল কেন তা হলে। সুধাই তো বলেছে, ও ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল। ওদের বিয়ের পর পরই সুধা যে ওর খুব বন্ধু হয়েছিল, খবর তো ও দেবেই। কিন্তু তারপর রীণা আর একদিনও এল না কেন। এল না বলেই তো আমরা বাবার কাছে কথাটা ভাঙিনি।

আসলে, বাবার জন্যে রাণীর মনে হয়তো এখনো একটু ভালবাসা আছে, তাই না এসে পারেনি। কিন্তু সত্যি যদি ডিভোর্সের দিকে যেতে চায় তা হলে বারবার এলে আইনের দিক থেকে অসুবিধে আছে কিনা কে জানে। কিংবা নিজেই ভয় পাচ্ছে, বাবার জন্যে শেষে ওকে মত বদলে ফেলতে হবে।

সুখেন্দুকে আমি তবু বুঝতে পারি, নবেন্দুকে একটুও না। ও কি করে যে বদলে যেতে পারে ভেবেই পাই না। ওর তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল।

আমি জানতাম। নমিতা একদিন এসে আমাকে চুপি চুপি বলেছিল, রাঙাদা, ওরা কি বলাবলি করছিল জানো?

ওরা, অর্থাৎ নবেন্দু আর জয়া।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি বলছিল?

নমিতা ফিসফিস করে বললে, এখানে থাকলে নাকি বাবার আদরে আদরে তিলু মানুষ হবে না। তাই ওপাড়ায় কোথায় বদলি হবার চেষ্টা করছে।

আমি বুঝতে না পেরে হেসে উঠে বললাম, বদলি হলে হয়তো মাইনে-টাইনে বাড়বে। তার সঙ্গে তিলুর মানুষ হওয়ার কি আছে।

নমিতা আমতা আমতা করে বললে, আমাকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল। বুঝতে পারছো না? তখন বলবে যাতায়াতের অসুবিধে, ও পাড়ায় বাসা না করলে চলছে না।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। তুই এ-বয়সে বাবাকে এমন একটা আঘাত দিতে পারবি! বুকের ওপর দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বাবা তো তোদেরই বলেছিল, তোমাদের কি ধারণা আমার এখানে হার্ট বলে কিছু নেই। নবেন্দু, ভেবে দ্যাখ, বাবা নিজের দক্ষিণের ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে এ-বাড়িতে নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

আমি যা ভয় পেয়েছিলাম শেষ অবধি তাই হলো। আমি নমিতাকে তো বারণ করেছিলাম এ কথা কাউকে বলিস না নমি। আমি নিজেও কাউকে বলিনি।

কিন্তু বাবাই আমাকে একদিন ডেকে বললে, নবেন্দুর অতদূর যাতায়াত,

শরীর টিকছে না ওর, বেচারাকে বদলি করে দিয়েছে শুনেছিস তো।

আমি বাবার চোখের দিকে তাকালাম। দু চোখ বাধা মানছে না। বাবা তবু হাসবার চেষ্টা করলো। ধীরে ধীরে বললে, আমি বলেছি ওকে সেখানেই কাছা-কাছি একটা বাসা নিতে, ওদের তো দুখানা ঘর হলেই চলে যাবে'

আমি আর বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। বাবা আমাদের কাছেও ঢাকতে চাইছে। আমরা তো জানতাম, বাবা কখনো মিথ্যে কথা বলে না। আমার বুকের মধ্যে অসহ্য একটা কষ্ট পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে চাইলো। আমার দু চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তিলুর জন্যেই যা মনটা খারাপ হবে।

কিন্তু আমি তো জানি, ওটাও মিথ্যে। কারণ, তিলুর মধ্যেই তো বাবা নবেন্দুকে দেখতে পায়। নবেন্দু এখন আর বাবার ভালবাসা নিতে পারে না বলেই তিলুকেই বাবা সব ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে।

আমার মনে পড়লো, বাবার জন্যে একটা হৃৎপিণ্ড কিনে দিতে হবে। একটা যন্ত্র, যা বাবার ক্ষতবিক্ষত হৃৎপিণ্ডটাকে চালু রাখবে। পেস-মেকার, একটা পেস-মেকার চাই। না, সুখেন্দু কিংবা নবেন্দুর টাকায় কেনা পেস-মেকারটা বাবার বুকের ভেতর ধুক ধুক করে চলবে, ভাবতেও অসহ্য লাগছে।

না, না, আমি তোদের কাছে বাবাকে ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে দাঁড়াতে দেবো না। তোদের টাকায় কেনা একটা যন্ত্রকে বাবার হৃৎপিণ্ডের এত কাছাকাছি থাকতে দেবো না। তার চেয়ে আমি এমন একজনের কাছে গিয়ে হাত পাতবো, যে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিতে পারে পাছে বাবাকে আঘাত দিয়ে ফেলি এই ভয়ে। আমি জানি, সে আমাকে ফেরাবে না।

—ইনু, আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি, এই দ্যাখো।

ইনু হাসলো।—তুমি যখন আমার কাছ থেকে চলে যাও তখন তো আমার কাছেই থাকো। তোমার শরীরটাকেই তুমি শুধু নিয়ে যেতে পারো।

—বাঃ রে, আমি যখন চলে গিয়েছিলাম তখন তো তুমি আমার কাছে ছিলে না।

—ছিলাম, তোমার পাশে পাশেই, তুমি খুঁজে দেখোনি। ছিলাম বলেই তো তুমি আবার ফিরে এসেছো।

—না ইনু, তুমি ভুল করছো। এবার আমি তোমার কাছে শুধু একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

ইনু ম্লান হাসলো।—তোমার সব প্রার্থনাই তো আমি পূরণ করে এসেছি। তোমাকে আর কিছুই তো আমার দেবার নেই।

—আছে ইনু, একমাত্র তোমারই আছে। আমি তোমার হৃৎপিণ্ডটা চাইতে এসেছি, কারণ আমার একটা হৃৎপিণ্ডের বড় প্রয়োজন।

ইনু অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর নিঃশব্দে, কোন প্রশ্ন না করে ইনু ধীরে ধীরে তার দুটি স্বর্গীয় শ্বেতপদ্মের বুক উন্মুক্ত করে দিলো। বললে, নাও।

আমি তবু স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম।

ইনু হঠাৎ এবার ওর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে বের করে এনে আমার হাতের মুঠোয় তুলে দিলো। বললে, এই নাও।

আমি সেটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে চলে গেলাম। ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে। এই নিন ডাক্তার বিশ্বাস, আপনি একটা হৃৎপিণ্ড চেয়েছিলেন, আমি

পৃথিবী ঘুরে সবচেয়ে পবিত্র হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে।

৯

আমরা ভেবেছিলাম উদ্বেগের দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পেস-মেকার আনিয়ে দেওয়ার কথাটা শোনার পর আমার ওপর দিয়ে এ ক'দিনে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

আমি টাকা নিয়ে আবার সেই ব্যাঙ্কে ফিরে গেলাম।—এই নিন টাকা, কি একটা ফর্ম দেবেন বলেছিলেন, দিন ভর্তি করে দিচ্ছি।

ডাক্তার বিশ্বাস কি সব লিখে দিয়েছিলেন, আমি দেখে দেখে ফর্ম ফিল্‌আপ করলাম। কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে আমার হাত কাঁপছিল।

ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক সান্ত্বনা দিলেন, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন, দিন, কার্ডিও-লজিস্টের সার্টিফিকেট এনেছেন তো, ওটাও অ্যাটাচ করতে হবে, আমিই বরং মিলিয়ে নিচ্ছি।

আমি অনুনয়ের সঙ্গে বললাম, খুব তাড়াতাড়ি আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন দয়া করে, একটা জীবন এর ওপর নির্ভর করছে।

—এ কাজ তো আমরা প্রায়ই করছি, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন। কবে আসছে পাকা খবর কাল নিয়ে যাবেন।

—দেখবেন স্যার, যেন চাপা পড়ে না থাকে। আমি বললাম। আমার মুখ দিয়ে কেন জানি 'স্যার' বেরিয়ে গেল। আমি তো স্কুল কলেজ ছাড়ার পর কাউকে কখনো 'স্যার' বলিনি। অশিক্ষিতদের মুখেই তো ওটা মানায়। কিংবা শিক্ষিত ভিখিরিদের মুখে।

ভদ্রলোক সেজন্যেই বোধ হয় ফর্মটা পড়তে পড়তে তেরছা চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন।—প্লেনে চলে আসবে, দু'একদিনের মধ্যেই। কাস্টমস্ থেকে ছাড়িয়ে আনবেন সঙ্গে সঙ্গে।

কাস্টমস্! আমি শুনেই বিব্রত বোধ করলাম।

উনি হাসলেন।—চিন্তার কিচ্ছু নেই, কোথাও কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। পেস-মেকার-এর চেয়ে জরুরী আর তো কোথাও কিচ্ছু নেই।

বুকের ভেতরের ঐ হার্টের ধুকধুক শব্দটার চেয়ে জরুরী এই পৃথিবীতে আর কি-ই বা আছে। আমরা সবাই জানি। সে জন্যেই তো বাবাকে নিয়ে গিয়ে প্রথম যখন ইমার্জেন্সিতে দাঁড়ালাম, ইমার্জেন্সির ডাক্তার এক মিনিটও সময় নষ্ট করলেন না, হার্টের ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। চিকিৎসা শুরু করতেও দেরী হলো না। ইনুও দেরী করেনি এক মুহূর্ত, বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে বের করে দিতে। ব্যাঙ্কের ভদ্রলোকও বললেন, পেস-মেকার-এর চেয়ে জরুরী আর তো কোথাও কিছু নেই।

অথচ এরা সকলেই অন্য সময় অন্য রকম। একবার তো হাসপাতালে একটা অ্যাকসিডেন্ট কেস নিয়ে আসতে হয়েছিল, তখন পেশেন্টের চেয়ে ফর্ম ভর্তি করা, টাকা জমা নেওয়া, এগুলোই দেখছি আর্জেন্ট। কারণ সেই অ্যাকসিডেন্টটা ও'দের চোখে তেমন গুরুতর মনে হয়নি। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে তো হামেশাই ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে আছে। তার সঙ্গে তখন যেন ঐ হার্টের ধুকধুক আওয়াজটার কোন সম্পর্ক থাকে না।

এঁদের দোষ দিচ্ছি কেন। আমাদের এই পরিবারের মধ্যেও তো সকলের মুখেচোখে কত উদ্বেগ, কত দুশ্চিন্তা, বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়। অথচ ঐ মানুষটা যতদিন বাড়ির একটা কোণে ঈজিচেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো, চুপচাপ, চোখের সামনে এক একজনের কষ্ট দেখে নিজে কষ্ট পেত, তখন আমরা কেউই তো জানতে চেষ্টা করিনি ধুকধুক আওয়াজটা থেমে যেতে চাইছে কিনা।

পেস-মেকার হাতে পেয়েই আমি এয়ারপোর্ট থেকে ছুটতে ছুটতে ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে গেলাম।—এই নিন ডাক্তার বিশ্বাস, এসে গেছে। আপনি একটা পেস-মেকার আনাতে বলেছিলেন।

আমার চেয়ে সুখী এখন আর কেউ নেই, আমার চেয়ে পবিত্র। ইনু আমাকে নিষ্পাপ করে দিয়েছে, কোন প্রশ্ন করেনি, ওর মনে এক মুহূর্তের জন্যেও কোন দ্বিধা ছিল না। আমি সুখী, বাবার জীবন বাঁচানোর জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলাম। পেরেছি। সুখেন্দুরা নিশ্চয় ভাববে, রাঙাদাকে দেখে মনে হয়নি, দ্যাখো, এত টাকা তো ওর কাছে ছিল। নবেন্দু ভাববে সংসারে দিতে হবে বলেই ওরকম ভান করতো। তা না হলে কোথায় পেল এত টাকা। ভাবুক। সুখেন্দুর কাছে, নবেন্দুর কাছে বাবাকে ঋণী থাকতে হলো না। এমনকি আমার কাছেও না। এমন একজনের কাছে যে বাবার মতই পবিত্র। নিঃসংশয় ভালবাসায়।

হাসপাতালে বাবাকে দেখতে গিয়ে বেডের ধারে বসেছি, একবার ইচ্ছে হয়েছে পরম মমতায় ওটা ছুঁয়ে দেখতে। বাবার বুকের ওপর, হৃৎপিণ্ডের বড় কাছাকাছি, উঁচু হয়ে আছে, এখনো ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা। ওটা হৃৎপিণ্ডকে চালু রাখছে।

ডাক্তার বিশ্বাস হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ওটা আপনার আজীবন সঙ্গী হয়ে গেল।

বাবা ম্লান বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, আজীবন!

অর্থাৎ আমার আর জীবন ক'টা দিনের।

মা বিষণ্ণ মুখেও হেসেছিল।

তারপর বাবাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে এসেছি। বাবা এখন সুস্থ। বাবার বুকের ওপর পেস-মেকার যন্ত্রটা বসানো। ওটা চব্বিশ ঘন্টার সতর্ক প্রহরী। ও সব সময় হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজটা কান পেতে শোনে। উৎকণ্ঠিত পিতার মত।

হাসপাতালের নার্স মৃদু হেসে বলেছিল, এবার আপনার ছুটি।

শুনে বাবার মুখ খুশিতে ভরে গিয়েছিল। বাবা তো প্রায়ই বলতো, এভাবে আর কতদিন পড়ে থাকা যায়। অর্থাৎ, এভাবে একা-একা। কারণ, বাবা হয়তো স্বপ্ন দেখতো বারান্দার ঈজি-চেয়ার ঘিরে সারা সংসারটা ঘন হয়ে বসবে আবার, বাবার সব শূন্যতা ভরিয়ে দেবে।

তবু নার্সের কথায় বাবা বিষণ্ণ গলায় বললে, আমার আবার ছুটি!

হাউস সার্জেন বয়সের তুলনায় একটু বেশি গাম্ভীর্য নিয়ে নানান উপদেশ নির্দেশ দিয়েছিল।—এরপর আবার সিঁড়ি ভাঙতে যাবেন না যেন। তারপর নির্ভয় করবার জন্যে বললে, এখন আর আপনার কোন অসুখ নেই।

অসুখ নেই! হাউস সার্জেন আর কতটুকু জানে।

এখন তো আমরা বাবাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। 'একটু-আধটু পায়চারি করবেন।' হাউস সার্জেনের কথাটা কোন কোনদিন মনে পড়ে যায় আমার। কিন্তু আমাদের তো মাথার ওপর কোন ছাদ নেই। মনে হতেই হঠাৎ যেন কথাটা অন্য একটা অর্থ নিয়ে সামনে এসে হাজির হয়।

যখনই বারান্দার দিকে চোখ যায়, দেখি ঈজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বাবা চুপচাপ বসে আছে। সকাল-সন্ধ্যা। ওখান থেকে সামনের তিনতলা বাড়িটার ছাদের আলসে ঘেঁষে এক ফালি আকাশ দেখা যায়, কখনো ঈষৎ নীল, কখনো অন্ধকারে তারা ছড়ানো। বাবা কেমন উদাস উদ্‌ভ্রান্ত চোখে সেদিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে।

আবার এক-একদিন উত্তরের কুঠরীতে, বিছানায় শুয়ে যে-কোন শব্দ কিংবা কথা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করে। 'রীণার গলা মনে হল যেন, এসেছে নাকি', কিংবা 'নবু কি কিছু বলছে।'

দিনের পর দিন বাবা ঐ ঈজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকবে, সকাল-সন্ধ্যা, চব্বিশ ঘন্টা ঐ উত্তরের কুঠরী কিংবা এই বারান্দায় বসে বসে সংসারটা দেখবে।

আমি জানি, একটার পর একটা দৃশ্য বাবার চোখের সামনে দিয়ে ঘটে যাবে, বাবা শুধু অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকবে। কারণ, বাবার বুকের মধ্যে এখন একটা কৃত্রিম যন্ত্র। একটা কৃত্রিম হৃৎপিন্ড।

একে কি তোরা বাঁচা বলিস। এর নাম টিকে থাকা, দু'হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরা, আগলে থাকা। কিন্তু কাউকেই আগলে রাখা যাবে না। দেখছিস না, কত দ্রুত সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে। সমাজ, সংসার, আদর্শ।

মানুষটাকে আমরা গোঁড়া নীতিবাগীশ প্রাচীনপন্থী ভেবেছিলাম। আদর্শ-বাদী। কিন্তু মানুষটা স্বপ্ন দেখতো, সুখী নিখুঁত সম্পূর্ণ একটি সংসারের। কারণ, তার মধ্যে একটা প্রচন্ড ভালবাসা ছিল।

সমাজে কোথাও ভালবাসা-টালবাসা নেই, থাকবে না। স্বপ্ন, আদর্শ, কিছু না। কারণ, আঘাতে আঘাতে তার হৃৎপিন্ডটাই ক্ষয় হয়ে গেছে। ঐ ধুকধুক আওয়াজটা পেস-মেকারের, একটা কৃত্রিম যন্ত্রের। ওটা হৃৎপিন্ডের নয়।

বাবা একদিন ঠাট্টা করে কাকে যেন বলেছিল, বোটানিকসের বটগাছেব মত সংসারটা গড়ে তুলতে চাই। গুঁড়িটা না থাকলেও ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে গাছটা থাকবে মাথা তুলে। বিশাল, ছায়াঘন শান্ত পরিচ্ছন্ন।

বাবা বারান্দার ঈজি-চেয়ারে বসে থাকবে চুপচাপ, দিনের পর দিন। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করবে সুখেন্দুর ঘরে রেডিওগ্রাম চলছে কিনা। কিংবা তুচ্ছ কোন ব্যাপার নিয়ে সুখেন্দু হঠাৎ আহাম্মকের মত চিৎকার করে উঠলে বাবা সচকিত হয়ে উঠবে। তারপর ভাববে আর ভাববে।

একদিন হয়তো বাবা খুব নীচু কন্ঠস্বরে আমাকে ডাকবে, খোকা শোন্।

আমি গিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াবো।—কিছু বলছো।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবে। বোধ হয় কথা বলতে কষ্ট হওয়ার জন্যে। কিংবা কিছু একটা বলতে সঙ্কোচ।

তারপর ধীরে ধীরে বলবে, তুই একদিন রীণার কাছে যাবি? গিয়ে বল না, বাবা তোমাকে দেখতে চায়।

আমি চুপ করে থাকবো। 'বাবা, চেষ্টা তো আমরা কম করিনি', একথা বলতে পারবো না।

বাবা কি যেন ভাববে, হঠাৎ বলে উঠবে, রীণার বাবার কাছে আমাকে একবার নিয়ে চল্ না।

আমি চমকে উঠবো।—কি বলছো তুমি? একবার তো গিয়েছিলে।

বাবার তো কোথাও যাওয়া চলবে না। বাবা শুধু বারান্দার ঈজি-চেয়ারে বসে থাকবে।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, ছেলেটা মরে যাবে খোকা। ও হয়তো পাগল হয়ে যাবে, আমাকে কেন বাঁচালি।

আমি বাবাকে স্তোক দিয়ে সেখান থেকে সরে আসবো। ভাবতে চেষ্টা করবো, কেন এমন হলো। ব্যাপারটা কি আমরা কেউই জানি না। ওরা তো কোনদিনই কিছু বলেনি। ওরা কি কাচের মানুষ, চিড় ধরলেই দু' টুকরো হয়ে যায়। জানি না।

তিলু নড়বড়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে বাবার কাছে আসবে। ঈজি-চেয়ারের হাতল ধরে বাবার মুখের দিকে তাকাবে। বাবা ওর ছোট্ট হাতখানা জরাজীর্ণ শিরা-ওঠা হাতে মুঠো করে ধরবে, বলবে, আয় তিলু, আর তোকে লজেন্স দেবো না। কোন ভয় নেই, তোর বাবার কাছে তোকে মার খেতে হবে না।

তিলু ছুটে-দৌড়ে বাবার কাছে পালিয়ে আসবে। ঈজি-চেয়ারের চওড়া হাতলের ওপর উঠে বসার চেষ্টা করবে। বাবা ওর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বলবে, তিলু যাও ভাই, এখন গিয়ে পড়াশুনো করো, তোমার বাবা তা না হলে বকুনি দেবে, আমাকেও বকবে।

তিলু বাবার ভয়-পাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকনো করে ফিরে যাবে প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে। বাবার খুব কষ্ট হবে।

আমি একদিন বাবার কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে মিথ্যে করে বলবো, কি কাণ্ড, বাবা, আমাদের আপিসে, আমার চেয়েও বয়সে বড়ো, একজন বিয়ে করছে।

বাবা বলবে, তোর আর কি এমন বয়েস, তুইও কর না। তোর মা শান্তি পাবে।

আমি হাসবো শুধু।—কি যে বলো।

বাবা বারান্দার ঈজি-চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে থাকবে। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসবে। মা বারান্দার আলোটা জেবলে দিয়ে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসবে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে। অনেকদিন পরে মা'র হাতে উলের গোলা, বোনার কাঁটা দেখতে পাবো। মা নিজেই বলবে, তিলুর জন্যে বুনছি। শুনে আমার খারাপ লাগবে, কারণ আমি জানি জয়া বা নবেন্দুর ওসব পুরোনো ডিজাইন পছন্দ হবে না। হয়তো বলবে, আজকাল কত ভাল ভাল প্যাটার্ন হয়েছে। সেজন্যেই হয়তো ওটা পরাতেও চাইবে না। ওরা তো শুধু ডিজাইনটাই দেখে।

মা বসে বসে একমনে বুনবে। হয়তো বলবে, আমাকে একদিন চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল্ না।

তারপর বুনতে বুনতে টুকটাক দু' একটা কথা বলবে।

আর বাবা হঠাৎ জিগ্যেস করবে, তুমি আজকাল ভাগবত শুনতে যাও না!

মা হাসবে, কি করে যাবো বলো।

বাবা বলবে, কেন, সন্ধ্যের সময় তোমার আর কি কাজ।

মা মুচকি হাসবে, তারপর বলবে, তুমি সতীন নিয়ে ঘর করবে, আর আমি কি সেখানে গিয়ে শান্তিতে বসতে পারবো।

বাবা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বুকের ওপর হাত বোলাবে। যেন পেস-মেকারটাকে আদর করছে, এমনিভাবে।

এক সময় জয়া আসবে বেশ ছিমছাম পোশাকে। সাজগোজ করলে ওকে খুব সুন্দর দেখায়। ওর মুখের হাসিটা বেশ মিষ্টি। ওকে দেখেই বাবার মুখে কেমন একটা তৃপ্তি ফুটে উঠবে।

বাবার ঈজি-চেয়ারের পাশে গিয়ে ও দাঁড়াবে, হাতে এক বাটি দুধে ভেজানো কর্ন-ফ্লেক।

মা মোড়াটা জয়াকে এগিয়ে দিয়ে বলবে, বসো না তুমি।

জয়া মোড়ায় বসে চামচে করে বাবাকে খাইয়ে দেবে।

মা হেসে বলবে, সেবা পেয়ে পেয়ে তুমি আলসে হয়ে যাচ্ছো, খাওয়াটাও নিজে পারো না।

জয়াকে দেখে আমার একটুও ভাল লাগবে না। বাবা-মা'র খুশি-খুশি ভাব আমাকে বিমর্ষ করবে।

খাওয়ার পর চুপচাপ বসে থাকবে বাবা, মা'র সঙ্গে টুকিটাকি কথা বলবে, কিংবা সকালের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বার চেষ্টা করবে।

কোনদিন হয়তো মেজ-জ্যাঠাইমা বেড়াতে আসবে। এসে নিজের দুঃখের কথা সাত কাহন করে বলবে, আমরা তার খবর রাখি না কেন, বাবার এত বড় অসুখটা হলো, কেমন থাকলো, জানাবে তো তোমরা।

তারপর এক সময় থেমে বলবে, হ্যাঁরে যখনই আসি, সুখেন্দুর বউকে দেখি না কেন।

মা কথাটা এড়িয়ে যাবে, বাবা কোন জবাব দেবে না। আমি ভাববো, বুড়িটা গেলে বাঁচি।

কোনদিন ছোটপিসি আসবে বাবাকে দেখতে। এসে নানান ধানাই-পানাই করে শেষে বলবে, জয়ার মত বউ হয় না।

বাবা উত্তরের ছোট কুঠরীটায় শুয়ে থাকবে চুপচাপ। ও ঘরে আলো-হাওয়া ঢোকে না বলে বাবার কোন অভিযোগ থাকবে না। বাবা শুধু মাঝে মাঝে বুকের ওপর হাত বোলাবে। বুকের ওপর পেস-মেকার বসানো। হৃৎপিণ্ডটা তাই ধুক-ধুক করে চলবে।

আর তখন, নবেন্দু একদিন এসে দাঁড়াবে বাবার কাছে, মাথা নীচু করে, মুখ নীচু করে। কথাটা বলতে ওর খুব সঙ্কোচ হবে। মুখ দেখে বুঝতে পারবো ওর বুকের মধ্যেও একটা অসহ্য যন্ত্রণা ও লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

নবেন্দু ধীরে ধীরে বলবে, ওপাড়ায় আমার ব্যাঙ্কের কাছাকাছি একটা বাসা পেয়েছি।

বাবা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাবে, উঠে বসবার চেষ্টা করবে।

নবেন্দু আর কোন কথা বলতে পারবে না। আসলে ও তো জানে, তিলুর লজেন্স, পড়াশুনো, আদর দেওয়া, এসব কোনটাই সত্যি নয়। শুধু বাবাই বুঝতে পারেনি।

নবেন্দু মুখ কাঁচুমাচু করে বলবে, বাড়িওয়ালা খুব তাড়া দিচ্ছে, অ্যাডভান্স দিয়েছি, তবু খালি ফেলে রাখতে চাইছে না।

বাবার মুখ থমথম করবে, কোন কথা বলতে পারবে না। তারপর শক্ত হবার চেষ্টা করে বলবে, একটা ভালো দিন দেখে যাস যেন।

একটু থেমে বলবে, তিলুকে একবার পাঠিয়ে দে।

নবেন্দু চলে যেতে পেয়ে বেঁচে যাবে। আর তখনই আমি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখবো, দু' চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। বাবা পেস-

মেকার লাগানো বুকটা চেপে ধরবার চেষ্টা করবে।

আর আমার মনে পড়বে, বাবা বুকের ওপর দুম্ করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বলছে, তোমরা কি মনে করো, আমার এখানে হার্ট বলে কিছু নেই। মনে পড়বে, বাবা বলছে, আমরা বুড়োবুড়ি দুটো প্রাণী, ঐ উত্তরের ঘরটাতেই চলে যাই, নবেন্দু আর জয়া বরং এ ঘরটায় চলে আসুক।

বাবার হৃৎপিণ্ড, তবু, তখনো, ধুকধুক করে চলবে।

তারপর একদিন সুখেন্দু আমার ঘরে এসে ঢুকবে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবো। ও তখন থরথর করে কাঁপবে। ওর হাতের লম্বা রেজিস্ট্রি ডাকে আসা খামটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ও কি যেন বলতে যাবে। ওর গলার স্বর গাঢ় হবে, চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে যাবে।—রাঙাদা, আজ এইমাত্র এল।

ও অনেক কষ্টে বলবে, রীণা, রীণা শুধু আমার বাইরেটাই দেখলো।

আমি চাপা গলায় ওকে বলবো, শোন সুখেন্দু, বাবা মা কেউ যেন জানতে না পারে। তোর দুঃখ তুই একাই সহ্য কর।

এ কথার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। বাবাও তো তাই করেছে। আমিও করছি।

সুখেন্দুর কাছ থেকে সরে এসে আমি বারান্দার দিকে তাকাবো। বাবাকে দেখতে পাবো। চুপচাপ চোখ বুজে বাবা কি যেন ভাবছে। দু'-চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল। বাবা ঈজি-চেয়ারে অসহায়ের মত শুয়ে আছে। আর বুকের মধ্যে পেস-মেকার লাগানো হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজ। সারা বাড়িতে কেউ কোথাও নেই, যেন বাবা একা।

আমি দিনের পর দিন দেখে যাবো। কারণ, আমার কেবলই মনে পড়বে, আমি ছুটতে ছুটতে ইনুর কাছে গিয়ে বলেছিলাম, আমি তোমার হৃৎপিণ্ডটা চাইতে এসেছি। ইনু ওর দুটি শ্বেতপদ্মের মত বুক উন্মুক্ত করে দিয়ে বলেছিল, নাও। হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে তুলে দিয়েছিল। সেটাই বাবার হৃৎপিণ্ডকে চালু রেখেছে।

তাই অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে আমি একদিন বেরিয়ে পড়বো ইনুর উদ্দেশে। ক্লান্ত অবসন্ন মন নিয়ে আমি যেমনভাবে তার কাছে বারবার ফিরে গিয়েছি ঠিক তেমনিভাবেই।

বাবা এবং ইনু দুজনের মধ্যে নিজেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, আমি নিজের মনকে বলবো, আমি তো নবেন্দু নই, নবেন্দু একটা স্টুপিড, ও অকারণ মাকে পুজোআর্চা নিয়ে খোঁটা দেয়। ওর ধারণা, ঈশ্বর এবং হাসপাতাল দুটোই পরস্পরবিরোধী; ও মনে করে, তিলু আর জয়াকে নিয়ে ওর সুখ এবং বাবার বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা সকলের জন্য দুঃখ, ও দুটো পরস্পরবিরোধী।

আমি শেষে হাঁটতে হাঁটতে ইনুর কাছে পেঁছে যাবো। আমার বুকের পকেটে পাঁচ হাজার টাকার নোটগুলো আমি এক একবার ছুঁয়ে দেখবো ইনুর অগোচরে। আমি সেই কথাটা কিছুতেই বলতে পারবো না, আমার বারবার সঙ্কোচ হবে। ইনু, আমি এতদিন ধরে একটু একটু করে এই টাকাটা জমিয়েছি, তোমাকে ফেরত দেব বলে, কিন্তু এখন আমি সে কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারছি না।

আমরা দুজনে নির্বাক পাশাপাশি হাঁটবো, আর বলবো, আমাদের দিনগুলো

কত রঙিন ছিল, আমরা কাউকে দুঃখ দিতে চাইনি বলে একটু একটু করে সেই দিনগুলোকে বিবর্ণ করে দিয়েছি। তোমার মনে পড়ে এই গঙ্গার ধার ঘেঁষে আমরা কতদিন এখানে বসেছি অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে, চলন্ত লঞ্চের আলোর দিকে তাকিয়ে। কিংবা সেই প্রথম যৌবনের নৌকোয় ওঠা ভয়-ভয় আনন্দ। আমরা রেড রোড ধরে হেঁটে চলেছি, ময়দানের ঘাসে গ্রীষ্ম-বিকেলের ক্লান্তিতে বিছানা পেতেছি, কখনো ঐ নির্জন চায়ের দোকানের অবিরাম বৃষ্টিভেজা বিকেলকে সন্ধ্যা পার করে নিশীথে নিয়ে গিয়েছি। ইনু, মনে পড়ে, তোমার ছোট্ট ঘরের চার দেয়ালে আমরা দিনের পর দিন কত রাশি রাশি স্বপ্নের ছবি এঁকে গিয়েছি, অথচ সে ছবি আমরা কোনদিন পরস্পরকে দেখাইনি।

আমি ধীরে ধীরে এক সময় বলবো, ইনু, ফিরিয়ে নাও।

তুমি হয়তো লক্ষ করবে না আমি পকেটে হাত দিয়েছি। তুমি শুধু হেসে সেই আগের দিনের মত বলবে, কোনদিন তো তোমাকে আমি ফেরাইনি, ফিরিয়ে দিইনি। তা হলে আর ফিরিয়ে নেওয়ার কথা কেন।

ঠিক তখনই বাবার কথা মনে পড়ে যাবে। হঠাৎ কি একটা অজানা উদ্বেগে কেঁপে উঠবো আমি। আমি বলে উঠবো, ইনু, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, আমাদের আর সময় নষ্ট করার মত সময় নেই। আমরা অনেক দেরী করে ফেলেছি, আর নয়।

আমি বলে উঠবো, ইনু তাড়াতাড়ি চলো, তাড়াতাড়ি। দেরী হয়ে গেলেও এই সমাজ, এই পৃথিবী আমাদের গ্রহণ করবে ঠিকই, কিন্তু ভালবাসবে না। তার চেয়ে তুমি চলো, এমন একজনের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো যে তোমাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবে কিনা জানি না, কিন্তু তার মধ্যে ভালবাসা আছে।

আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে আসবো। আমাদের দু-জনের মনেই উদ্বেগ। আমরা দৌড়তে দৌড়তে সশব্দে দরজা খুলে দিয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে উঠবো, ছুটে যাবো বারান্দার দিকে।

সেখানে ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে একটি প্রাচীন স্বপ্ন, আশা, আদর্শ। একটি অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা, যে সকলকে সুখী দেখতে চায় বলেই অনন্ত দুঃখে দুঃখী। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজটা আমরা শুনতে পাবো, চতুর্দিকে এখনো সকলেই যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। শুধু জানে না, ওটার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, কারণ শব্দটা পেস-মেকার যন্ত্রের, যেটা ঐ হৃৎপিণ্ডটাকে এখনো চালু রেখেছে।

ঐ যন্ত্রটার আয়ু একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন এই পৃথিবীতে, এই সমাজে, আমরা সবাই অসীম শূন্যতার মধ্যে একেবারে একা হয়ে যাবো। তখন আর নবেন্দুদের চলে যেতে হবে না, তখন আর সুখেন্দুদের বুকফাটা হাহাকার কেউ কান পেতে শুনতে চাইবে না। কেউ আর বলবে না, খোকা, টাকাটাই সব নয়, তুই তো আমার হীরের টুকরো ছেলে রে!

—

বীজ

তিনদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। বৃষ্টি না বলে বৃষ্টির প্রদর্শনী বলাই ভাল। বৃষ্টিরও যে এত রকম-ফের আছে কে জানতো। যেন আকাশখানা ইন্দ্রপুরী নিয়ে কোন কোম্পানি বিরাট একটা স্টল খুলেছে একজিবিশনের, বৃষ্টির কত রকম মডেল আছে দেখাচ্ছে। তখনই ঝমঝম বৃষ্টি অঝোর ধারায়, আবার তখনই ইলশেগুঁড়ি, কখনো পাউডার পাউডার, কখনো ঝাঁক ঝাঁক ছুঁচের মত, কখনো তেরছা, কখনো সোজা। রাত্তিরে পিছনের টালীর বস্তিতে বৃষ্টির শব্দও কত রকমের।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দিয়ে শশাঙ্কশেখর গামছায় ভিজে মুখখানা মুছতে মুছতে মেঘলা আকাশের দিকে তাকালেন। না, রোদ ওঠেনি আজও। ইলিশ মাছের আঁশের মত আলো মেখে যথারীতি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো এক দমকা বৃষ্টি এসে লাগলো মুখেচোখে। বেসিনের কাছে এদিকে খোলা উঠোন, অনেকখানি চৌকো আকাশ দেখা যায় সামনের তেতলা বাড়ির কার্নিস অবধি। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই খুব মিহি মিহি বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। আর শশাঙ্কশেখরের হঠাৎ মনে হল এর আগে তিনি কখনো বৃষ্টি দেখেন নি।

এ বাড়িতে আর সবাই টার্কিশ তোয়ালে ব্যবহার করে, কিন্তু শশাঙ্কশেখর পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি। পারেন নি বলেই গামছাটা তাঁকে নির্ভুল-ভাবে বাথরুমের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যাতে বাইরের কোন অতিথি বা আগন্তুকের চোখে পড়ে গিয়ে এ-বাড়ির সম্ভ্রম না খোয়া যায়। কোন কোনদিন ভুল হয়ে গেলে ছোট মেয়ের শাসন কিংবা স্ত্রীর বক্রোক্তি শুনতে হয়। অবশ্য এ-সব তাঁকে স্পর্শও করে না, কারণ সে-সব দিনে তাঁর মন পড়ে থাকে কোন গভীর অন্বেষণের মধ্যে, যার হদিস স্ট্যাটাস-পাগল ছেলেমেয়ে এবং বউয়ের নাগালের বাইরে।

একদিন অবশ্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমি লোকটা কি একখানা তোয়ালের চেয়েও কম দামী?

এ-সব নিয়ে তাঁর কোন অভিমান নেই, বরং মনে হয় ওদের সব কিছুই যেন ছেলেমানুষি। আপত্তি করেন না, প্রতিবাদ করেন না, মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। যার যেখানে আনন্দ, যে যেমন খেলনা পেয়ে খুশি। কে জানে নিজেও একটা খেলনা নিয়েই আছেন কিনা।

শশাঙ্কশেখর কিন্তু সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন, এ শহরে ভাড়াটে বাড়ির মধ্যে যাদের বসার ঘর ছাড়াও নিজস্ব একখানা ঘর আছে। তাঁর সেই নিজস্ব ঘরখানার তিন দিকের দেয়ালে প্রায় সিলিং পর্যন্ত একদা ছিল অল্পমূল্যের লোহার র‍্যাক, এবং র‍্যাকগুলি মূল্যবান বইয়ে ঠাসা। যার মলাট প্রায় ক্ষেত্রেই বিবর্ণ, কোন কোনটির মলাটই নেই। এইসব ধুলোটে বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছু মোটাসোটা নতুন বইয়ের ঝকঝকে মলাট সারা ঘরখানাকে আরো কুৎসিত করে দিয়েছিল। অন্তত ছেলেমেয়েদের তাই ধারণা। আর বইগুলোকে উনি নিজে যতই মূলবান মনে করুন না কেন, বাড়ির কেউ ওগুলো ছুঁয়েও দেখে না।

মা-মেয়েতে এ-বাড়ির ভোল পাল্টাতে লেগে গেছে বহুদিন আগে থেকেই। লোহার র‍্যাক বিদায় দিয়ে ঝকঝকে নতুন কাঠের খোপ খোপ বুক-শেল্ফ দিয়ে দেয়ালগুলো মুড়ে দিয়েছে। অবশ্য না হলেও চলতো, কিন্তু মন্দ কি!

তিনদিকের দেয়ালে বইপত্র, অবশিষ্ট উলঙ্গ দেয়ালটিতে ঠেস দিয়ে আছে একটি পড়ার টেবিল। তার সামনে হাতলহীন চেয়ারটিতে বসেই তাঁর সর্বক্ষণ কেটে যায়। ছুটির দিনগুলো, কিংবা অবসরের সময়টুকু।

সেজন্যই সম্ভবত তিনি বইয়ের পাতার বাইরে তাকাবার ফুরসত পান নি। এবং একটানা তিনদিন বৃষ্টির পর তাঁর হঠাৎ ভোরবেলায় উঠে মনে হল এর আগে তিনি কখনো বৃষ্টি দেখেন নি।

দেখতে দেখতে বৃষ্টির তোড় বাড়লো, ঝাঁক ঝাঁক ছুঁচ যেন এবার রাশি রাশি পেরেক হয়ে গেল। পেরেক থেকে কিউনিফর্ম লিপির কথা মনে পড়লো। সিমেন্টের উঠোনে বেশ একটা বাজনা বাজছে। কিন্তু যতদূর চোখ যায় বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আপনা থেকেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেলেন শশাঙ্কশেখর।

পৃথিবীতে বৃষ্টির মত এমন সুন্দর একটা জিনিস আছে অথচ তার দিকে কেন যে এতকাল চোখ পড়ে নি ভেবে পেলেন না।

আটচল্লিশ বছর বয়সেই হাবেভাবে এবং চুল চোখ ও চেহারায় আটান্নর প্রবীণত্ব অর্জন করতে গিয়ে অনেক কিছুই হয়তো হারিয়েছেন। অথচ কি হারিয়েছেন, বুঝতে পারলেন না। শুধু বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। সমস্ত শরীরে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেল। যেন সত্যি সত্যি শেষ অবধি কি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে। অথচ তিনদিন ধরে এক-নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে।

আনমনাভাবেই গামছাটা যথাস্থানে রেখে তিনি বাড়ির সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সদর দরজার খিল খুললেন আস্তে আস্তে, পাছে শব্দ হলে কারো ঘুম ভেঙে যায়। ও'র মত এত ভোরবেলায় ওঠার অভ্যাস এ-বাড়িতে আর কারো নেই।

সামনের এটাকে বারান্দা না বলে রোয়াক বলাই ভাল। তাঁর হাত-পা ছড়ানোর সীমা গ্রাউন্ড ফ্লোরের মধ্যেই আবদ্ধ। ভাড়া ৩৭৫। কিন্তু কোমর অবধি উঁচু প্লিনথের এই রোয়াকটুকু যেন ফাউ পেয়ে গেছেন, ওপর তলায় বাড়িওলার ঝুল বারান্দা এটুকু এগিয়ে এসেছে বলেই সাধারণত বৃষ্টিতে রোয়াকটা ভেজে না। কোন কোনদিন এখানে এক-আধবার এসে দাঁড়িয়ে ট্রাম-বাস চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে মাথার জট ছাড়িয়ে নেন। বাড়িটা ট্রাম রাস্তার ধারেই, প্রথম প্রথম অনেক রাত অবধি ট্রাম বাসের শব্দে ঘুম আসতো না, এখন সয়ে গেছে। উপরন্তু লাভ হয়েছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলমান দৃশ্য দেখতে পান। তবু এতদিন কেন যে বৃষ্টি দেখেন নি বুঝতে পারলেন না।

কোলকাতার লোক বৃষ্টি বাদলার দিনে যা দেখে থাকে, অর্থাৎ জল, তা অবশ্য তিনি বহুবার দেখেছেন। বৃষ্টি দেখেন নি।

রাস্তার এদিকটায় তখনো হাঁটু পর্যন্ত জল জমে আছে, অর্থাৎ রাত্তিরেও থেমে থাকে নি। এত সকালেও দু একজন ধুতি গুটিয়ে বা প্যান্ট টেনে ধরে জলের মধ্যে দিয়েই রাস্তা পার হচ্ছে পা টেনে টেনে, যেন পায়ের নীচে স্কী করার ডিঙি আঁটা আছে, অল্প বয়সে বিদেশী ছবিতে দেখেছেন. প্রথমটা এই-ভাবেই স্কী আঁটা পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে হেঁটে যায় গড়ানে বরফের কাছে

পৌঁছনোর আগে অবধি। আচ্ছা 'স্কী', যার প্রকৃত উচ্চারণ 'শী', তা কত প্রাচীন। এর প্রথম প্রচলন করেছিল কারা? নর্ডিক? স্লাভদের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব।

নাঃ, আমি আবার জড়িয়ে পড়ছি। শশাঙ্কশেখর বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। আর তখনই এলোমেলো বাতাসে বৃষ্টির ছাট এসে লাগলো। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। এইভাবে দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি দেখা যায় নাকি। কোলকাতায় বৃষ্টি দেখার কোন উপায় নেই, শুধু জল দেখা যায়। তেমন উদার আকাশ কিংবা ছড়ানো সবুজের প্রান্তর চোখের সামনে থাকলে তবেই তো বৃষ্টি দেখা যায়। এতক্ষণে ওদিকের রাস্তায় পর্দা-ফেলা একটা রিক্সা গেল ঠুনঠুন করে। আর তারপরই ভিড়-ভারাক্রান্ত একখানা দোতলা বাস। দুটি ছেলে ছুটে গিয়ে বাস ধরলো। ওরা সবাই বৃষ্টিতে ভেজে, কিন্তু বৃষ্টি দেখে না। আমিও এতকাল দেখি নি, শশাঙ্ক-শেখর মনে মনে ভাবলেন।

ক্ষীণভাবে মনে পড়লো, তখন বয়স কম ছিল, ট্রামে সেকালে এত ভিড় হত না। গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ট্রামে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জোর বৃষ্টি নামলো সমস্ত সবুজ জুড়ে, উনি জানালার পাশেই বসেছিলেন, সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, জানলা বন্ধ করুন, জানলা বন্ধ করুন।

—কোথায় গেলে, তোমার চা দিয়েছি। স্ত্রীর গলা শুনতে পেলেন।

আঃ, তন্ময় হয়ে বৃষ্টি দেখছিলেন শশাঙ্কশেখর, হঠাৎ মনে হল কে যেন বললো, জানলা বন্ধ করুন, জানলা বন্ধ করুন।

দরজাটা বন্ধ করে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। পড়ার ঘরের টেবিলে চা রেখে সুধাময়ী ওঁকে দেখেই বলে উঠলেন, এ কি, ভিজলে কি করে? কাপড়টা ছেড়ে ফেল, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

গায়ের ফোঁটা ফোঁটা জল আর ঈষৎ ভিজে কাপড়ের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে সচেতন হলেন শশাঙ্কশেখর, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসলেন। যেন কিছু একটা অন্যায় করে ধরা পড়ে গেছেন।

অপরাধ চাপা দেবার জন্যে, কিংবা মনটা উৎফুল্ল ছিল বলে, হাসতে হাসতে বললেন, কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে!

চায়ের কাপটা সবে হাতে তুলেছেন। সুধাময়ী বলে উঠলেন, কি সুন্দর! তোমার আর কি, সারা ঘরে বারান্দায় কাপড় টাঙানো, দু'দিন ধরে শুকোতে পারছি না.

সুধাময়ী কথা শেষ না করেই চলে গেলেন, আর শশাঙ্কশেখরের সমস্ত মন কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল। এরা সবাই জল দেখে, এরা সবাই শুধু জল দেখে, মনে মনে ভাবলেন শশাঙ্কশেখর। অথচ উনি চেয়েছিলেন, ওঁর নিজের যখন এত ভাল লাগছে তখন ওদেরও একটু সেই ভালো লাগার ভাগ দিই।

বৃষ্টিটা কিন্তু ওঁর সর্বাঙ্গে লেগেই রইলো। বুকের ভেতরটা কেমন গুনগুন করে উঠতে চাইলো, কিন্তু ওঁর মধ্যে তো গান নেই। মন দিয়ে তেমনভাবে কখনো গান শোনেন নি। অথচ এ-বাড়িতে কত সময়েই তো রেডিওতে গান হয়, রেকর্ড বাজে। ছোট মেয়েকে গান শিখিয়েছেন। না, সে কৃতিত্ব ওঁর নয়, সুধাময়ীর।

সুধা সুধা! সুধা নামটা উনি উচ্চারণ করেন না। বিয়ের পর করতেন। এখন নেহাৎ অসুবিধে ঘটলে তবেই করেন, অর্থাৎ সুধা বলে ডাকতে বাধ্য হন। কেন নাম ধরে ডাকতে এই অস্বস্তি, বেশ মনে আছে। বড় মেয়ের তখন বছর পাঁচেক

বয়েস, কিংবা আরো ছোটো। শশাঙ্কশেখর কি জন্যে যেন ডাকলেন, 'সুধা শুনে যাও, একটা কথা বলছিলাম, কিংবা এই ধরনের কিছু, বড় মেয়ে মেঝেয় বসে পুতুল খেলতে খেলতে বলে উঠলো, 'এঃ সুধা', বলে তাকালো, চোখোচোখি হল, বাচ্চা মেয়েটা মুখ নামিয়ে বললে, বেশ অভিমানের গলাতেই যেন, 'মাকে নাম ধরে ডাকবে না।' শশাঙ্কশেখর এবং সুধাময়ী পরস্পরের সঙ্গে চোখোচোখি করে হাসি চেপেছিলেন। মেয়েটা হঠাৎ এ-কথা কেন বলেছিল উনি আজও জানেন না। কিন্তু তারপর থেকে 'সুধা' ডাকটা নিজেরই অজান্তে এড়িয়ে যেতে চাইতেন। এখনো মাঝে মাঝে সুধা বলে ডেকে বসেন, প্রয়োজন ঘটলে, কিন্তু নিজের কানেই কেমন অস্বাভাবিক লাগে।

চায়ের কাপ শেষ করে শশাঙ্কশেখর ডাকলেন, ঈশ্বর, ঈশ্বর!

দিনে দু' তিনবার তিনি ঈশ্বরের নাম নেন। যদিও সেই প্রকৃত ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি কোনদিনই কিছু চিন্তা করেন নি।

সকালে বাজারে যাওয়া শশাঙ্কশেখরের একটা বিলাস, অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন অল্প বেতনের প্রাথমিক দিনগুলিতে। এখন মোটামুটি সচ্ছল বলেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় গৃহপালিত ভৃত্যটিকে, কারণ পুত্র কন্যা ও গৃহিণীর ধারণা, তাঁর হাতে বাজারের থলি থাকলে এই সংসারের মর্যাদার হানি ঘটবে। তাঁর চেয়েও কত মান্যগণ্য ব্যক্তি থলি হাতে বাজার করে, এরা বোধহয় জানেও না। আসলে মান্যগণ্য কাকে বলে তাই তো এরা জানে না।

শশাঙ্কশেখর অবশ্য প্রতিবাদ করেন না। তাঁর আসল উদ্দেশ্য এ-সময়টা চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে একটু খোলা হাওয়া-বাতাস মেখে আসা।

'ঈশ্বর, ঈশ্বর' বলে ডাকতেই সুধাময়ী একখানা ধুতি নিয়ে এসে বললেন, তাকে আমি বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছি।

গৃহপালিত ভৃত্যটির নামই ঈশ্বর।

পড়ার ঘরের এক কোণে একটি অ্যালুমিনিয়মের মই আছে, খুব ওপরের তাকের কোন বই নামাতে হলে উনি ঈশ্ববকে ডাকেন। আজকাল আগের মত নিজে উঠে বই নামাতে গেলে সুধাময়ী রেগে যান। কিন্তু সেজন্যে নয় উনি বাজারে যাওয়ার জন্যই ঈশ্বরকে ডাকছিলেন। আসলে একটানা তিনদিন ধরে বাড়ির মধ্যে আটকে আছেন। বাইবে একবার বেরোনোর জন্যে ওঁব ভিতরটা ছটফট করছে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে উনি অকারণে বেরোতে পারেন না। অথচ ওঁর সর্বাঙ্গে বুকের মধ্যেও ভোরবেলায় দেখা ঐ বৃষ্টিটা লেগে আছে।

আজ এই জলের মধ্যে দিযে কোন অধ্যবসায়ী ছাত্র বা সহকর্মী নিশ্চয় আসবে না। তাহলে 'ঈশ্বর' শব্দটা নিয়ে, ওটাই এখন ওঁর মাথাব মধ্যে একজন ছাত্র এই নিযে একটু সরস আলোচনা করেছিল একদিন—অ্যাসিরিয়া, উচ্চারণ করেছিল এশিবব তারপর অসুর আহুর। শব্দ ক'টি অকারণেই এখন মাথাব মধ্যে ঘুরে গেল। কিন্তু ওঁর মন এ-সবের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিযে যেতে চাইছে।

কাল অনেক রাত অবধি খাতায় অনেকগুলো আঁকিবুকি কেটেছেন। বিয়ের পর সুধাময়ী ঐ রকম আঁকিবুকি করতে দেখে ঠাট্টা করে বলে উঠেছিল, ছবি আঁকা শিখছো বুঝি আহা কি আঁকার ছিরি! শশাঙ্কশেখর হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন ছবিও বলতে পারো, তবে তা থেকেই অক্ষর। এগুলো অ আ ক খ..

সুধাময়ী বিস্মিত হয়েছিলেন, তবে আর কোন আগ্রহ দেখান নি।

কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার লিপিগুলো শশাঙ্কশেখর আজও মাথা থেকে দূরে

করতে পারেন নি। কাল অনেক রাত অবধি খান পাঁচশেক সীল উল্টে উল্টে এঁকেছেন। হঠাৎ ওঁর মনে হয়েছে, এমন তো হতে পারে যারা লিখতো তারা ছাঁচ গড়তো না। হরফগুলো তাই উল্টে গেছে। একটা ব্যাপারে সন্দেহটা মাথায় ঢুকেছে। দু হাত দু পা মানুষের মত অক্ষরগুলোর হাতে যখনই কোন লাঠি তরোয়াল বা কাস্তের মত কিছু আছে, তখন সেটা তো ডান হাতেই থাকবার কথা, প্রায়ই বাঁ হাতে কেন। উল্টে দিলে কিন্তু ডান হাতেই হয়। কি আশ্চর্য, ভুল হচ্ছিল, ওগুলো তো সফ্‌ট স্টোন! না, ছাঁচের জন্যে নয়, হয়তো ওগুলো খরোষ্ঠির মতই ডান দিক থেকে পড়তে হবে।

ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না। এসব আজ আর একটুও ভাল লাগছে না।

শশাঙ্কশেখর উঠে বাড়ির মধ্যে চলে এলেন।

ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলেকে ডাকলেন, অমু, ডেকচেয়ারটা দিয়ে যা তো!

বাড়িতে তখনই হুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে। রীতিমত কলরব। কারণ এ-সময় জঞ্জাল সাফ করতে জমাদার আসে। বড় মেয়ে চাকরি করে, তার ভাত। ছোটর কলেজ। সুধাময়ী এ-সময় খুবই বিব্রত এবং বিরক্ত। তারই ফাঁকে এসে বললেন, ডেকচেয়ার কি হবে?

শশাঙ্কশেখর হেসে ফেলে বললেন, বৃষ্টি দেখবো।

বড় মেয়ে শুনতে পেয়ে হাসলো, বললে, বাবার কাণ্ড, তিনদিন ধরে বৃষ্টি দেখেও সাধ মিটলো না, আর এই জল ডিঙিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে, কি অবস্থা বলো তো।

তারপরই বললে, মা, আজ রাত্তিরে খিচুড়ি রাঁধবে?

অমু ততক্ষণে চেয়ারটা লাগিয়ে দিয়েছে, ক্যাম্বিসের আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বৃষ্টির দিকে চোখ মেলে দিলেন শশাঙ্কশেখর। মনে মনে ভাবলেন, বৃষ্টি মানে খিচুড়ি!

কিন্তু বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর বুকের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগ অনুভব করলেন। যেন কি একটা হতে যাচ্ছে। হবে। আতঙ্ক না আনন্দ বুঝতে পারলেন না। যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, কিংবা প্রচণ্ড কোন সুখবর। এমন এক একদিন হয় কেন হয় বুঝতে পারেন না। কিছুই তো শেষ অবধি হয় না। আজ কি সত্যি কিছু ঘটবে?

ডেকচেয়ার পেতে দিয়ে অমু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। যদি বাবা আবার কিছু ফরমাস করে।

শশাঙ্কশেখর স্নেহের চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়েই বৃষ্টি দেখতে লাগলেন। এই ছেলেটির জন্যে ওঁর একটু মায়া হয়, একরকম কষ্টমেশানো ভালবাসা। দুর্বলকেই তো মানুষ ভালবাসে, সফলের জন্যে থাকে শুধু গর্ববোধ।

অমু শশাঙ্কশেখরের ছেলে হয়েও পড়াশোনায় ভাল হ'ল না। তার জন্যে একসময় লজ্জায় মাথা কাটা গেছে। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনরা ওর কথা জিগ্যেস করলে অস্বস্তি বোধ করতেন। এখন ও একটা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে, দু' বন্ধু মিলে।

ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিগ্যেস করলেন, কেমন চলছে তোদের?

—চলছে। অমু কেমন যেন এড়িয়ে গেল।

আজ ও'র সকলকেই বেশ ভাল লাগছে। ইচ্ছে করছে ডেকে ডেকে গল্প করতে। ওরা সবাই এসে এখানে বসে বসে যদি বৃষ্টি দেখতো, ও'র খুব ভাল লাগতো। কিন্তু এত দিনের অভ্যাসে কেমন যেন ছাড়াছাড়া লাগছে। ওরাও আর আগেকার মত কাছে আসে না। এড়িয়ে এড়িয়ে যায়।

বড় মেয়েকে দেখতে পেয়ে বললেন, ঝুমা, খিচুড়ি করতে বলছিস রাত্তিরে, ঈশ্বরকে ইলিশ মাছ আনতে বলেছে তো!

ঝুমা হেসে ফেললে। বাবার কাছ থেকে এ-ধরনের কথা ও বহুদিন শোনে নি। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে ওর বোধহয় বাবার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও আছে। ও মনে করে, ওর যে বিয়ে হয় নি, হচ্ছে না, তার জন্যে বাবাই দায়ী।

শশাংকশেখর নিজেও মাঝে মাঝে তাই ভাবেন। তখন নিজেকে এত অক্ষম লাগে, অসহায় মনে হয়!

—রুমা, রুমা কোথায় গেল! অমুর দিকে তাকিয়ে বললেন।

—এই রুমা! যেন রুমাকে ডেকে দেবার জন্যেই অমু চলে গেল। উনি বেশ বুঝতে পারলেন, ও'র কাছ থেকে পালাতে পেয়ে যেন অমু বেঁচে গেল। বোধ-হয় ওর মনের মধ্যে অভিযোগ, ব্যবসার জন্যে টাকা দিতে পার না, অথচ জিগ্যেস করা চাই কেমন চলছে।

একটু পরেই রুমা এসে দাঁড়ালো।—কি বলছো?

রুমাকে আপাদমস্তক একবার দেখলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, না, কিছু না।

একটু থেমে বললেন, তোর কলেজ আছে নাকি? এই বৃষ্টিতে কলেজ হচ্ছে?

—কি যে বলো। রুমা হেসে ফেললো। কলেজ তো রোজই যাচ্ছি।

সুধাময়ীর কানেও বোধহয় কথাটা গেল। বাথরুমে ওদিক থেকেই চিৎকার করে বললেন, না, তুমি ছুটি নিয়ে তিনদিন ধরে বাড়িতে বসে আছো বলে আপিস কলেজ সব বন্ধ। হাসতে হাসতেই বললেন।

শশাঙ্কশেখর রুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে যা।

রুমাও পালালো।

শশাঙ্কশেখর কি যে করবেন যেন কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। ভিতরটা ছট-ফট করছে। আজ আর একটুও কাজে মন দিতে ইচ্ছে নেই। অথচ আজকের এই প্রকাণ্ড অবসর কি ভাবে খরচ করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না। নিজেকে কেমন যেন বন্দী মনে হচ্ছে, চারদিক থেকে কে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

অথচ ভিতরটা চাইছে সব কিছু ছিঁড়ে ফেলতে, কাল রাত পর্যন্ত জেগে উল্টে উল্টে লেখা ঐ বিচিত্র অক্ষরগুলোও। এতদিন তো উনি কারো দিকে তাকিয়ে দেখেন নি, সুধাকে, অমুকে, ঝুমা-রুমাকেও না। এমন কি বৃষ্টিও দেখেন নি।

আজই বোধহয় প্রথম বৃষ্টি দেখলেন। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে যে এত ভাল লাগে কে জানতো।

এই বৃষ্টির মধ্যেও একে একে সবাই বেরিয়ে গেল। বেচারী ঝুমা বোধহয় একেবারে ভিজে যাবে। ও বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই ঝমঝম করে তোড়ে বৃষ্টি নামলো। ঐটুকুন ফোল্ডিং ছাতায় কি বৃষ্টি আটকায়!

বুমাকে মুখ ফুটে বললেন, আজ নাই বা গেলি।

সেও শুনলো না।
অমুকে নিষেধ করেন নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়িটা কেমন নিঃঝুম হয়ে গেল। কি করবেন কিছু খুঁজে না পেয়ে আবার পড়ার টেবিলে এসে বসলেন। অক্ষরগুলোর ওপর চোখ বোলালেন। গয়না! সাহেবগুলো কি যে ভাবে আমাদের, মনে মনে ভাবলেন। প্রত্যেকটি পোড়ামাটির সীলে ফুটো আছে দেখে সেগুলোকে গয়না ভেবেছে। কে যেন? ম্যাকে, ম্যাকে। নিজের মনেই হাসলেন। অত উন্নত একটা সভ্যতা, তারা ঐ মাটির গয়না পড়বে? মালপত্রে কিংবা বস্তায় বাঁধতো এগুলো আজকাল-কার লেবেল আঁটার মত? সে সিদ্ধান্তও শশাঙ্কশেখরের মনঃপূত হয়নি কোন-দিন। ও'র মতে ওগুলো পর পর বাঁধা থাকতো, বইয়ের মত। কিংবা কুলজী-গ্রন্থের মত। জীবজন্তুর ছবি আসলে গোত্র বা গোষ্ঠীর পরিচয়। আর অক্ষর-গুলো নাম। পাতা ওল্টালেই পাওয়া যাবে, কার ছেলে কে, তার পরিচয়। প্রথমেই একটা গরুর মুখের মত অক্ষর অনেকগুলো সীলে। 'উল্টে দিলে ওটাই শেষ অক্ষর, বুঝলেন অমিতেশবাবু, সংস্কৃতয় অমুকস্য, এই 'স্য' বলতে যা বোঝায় ষষ্ঠীর একবচন, পালি-প্রাকৃতে শুধু 'স', ধরুন হিন্দিতে বলে রামকা, ভরতকা .শেষ অক্ষরটা হয়তো প্রাকৃতের, অর্থাৎ তখনকার প্রাকৃতের কোন অক্ষর . ধরুন 'ক' অর্থাৎ পর পর সাজানো ছিল কে কার ছেলে ..' শুনতে শুনতে অমিতেশবাবু হেসে উঠেই ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন। শশাঙ্কশেখর নিজেও। আজ তাও ভাল লাগছে না।

ছিঃ ছিঃ, সমস্ত জীবনটাই নষ্ট করেছি, আমি কোনদিন বৃষ্টি দেখি নি, শশাঙ্কশেখর ভাবলেন।

আমি সুধার দিকেও তাকিয়ে দেখি নি। আজ আর কেউ আমাব দিকে তাকিয়ে দেখে না।

পড়ার ঘর থেকে উঠে চলে এলেন শশাঙ্কশেখর। সুধা খাটের বাজুতে পিঠ দিয়ে কি একটা সেলাই করছে।

সুধাময়ী চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন, স্থির দৃষ্টিতে ও'কে দেখছেন শশাঙ্কশেখর। হেসে ফেলে বললেন, তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো।

শশাঙ্কশেখর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তুমি একটা সাদার ওপর কালো চেক-চেক শাড়ি পরতে মনে আছে?

সুধাময়ী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হল কি মানুষটার।

—ওটা একবার পরবে? তোমাকে ঐ শাড়িতে আজ একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। বলে লাজুক হাসি হাসলেন উনি।

—সে তো কবেই ছিঁড়ে গেছে। সুধাময়ী শব্দ করে হেসে উঠলেন।—বুড়ো বয়সে তোমার আজ হ'ল কি?

ছিঁড়ে গেছে! যেন নিজের মনেই বললেন শশাঙ্কশেখর।

তারপর স্বাভাবিক হবার জন্যে বললেন, জানো, আজ আর কিছু ভাল লাগছে না।

কিছু করার নেই, তাই একবার ভাবলেন, টেলিফোন তুলে কারো সঙ্গে একটু গল্প করি। রিসিভার তুললেন, তারপরই মনে পড়লো তিনদিন ধরেই

ওটা খারাপ হয়ে আছে। ডায়াল সাউন্ড নেই। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। আর কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেই জানেন না।

শশাঙ্কশেখর সাধারণত দুপুরে ঘুমোন না, ছুটির দিনেও না। সুধাময়ী ভেবেছিলেন হয়তো শরীর তেমন ভাল নেই, মানুষটা ঘুমোচ্ছে' ঘুমোক। বিকেলে সাড়ে চারটের সময় ঠিকে-ঝি আসে, হারুর-মা এসে যথারীতি জোরে কলিং বেল বাজিয়েছিল। অত জোরে অর্থাৎ অতক্ষণ ধরে বাজানোর আজকাল দরকার হয় না। সুধাময়ীর অভ্যাস হয়ে গেছে, ঠিক ঐ সময়েই ঘুম ভেঙে যায়।

কলিং বেল বাজতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

হারুর-মা যত না কাজ করে তার চেয়ে শব্দ করে বেশি। বাসন-কোসন, বালতি এ-সব ধীরেসুস্থে নামানো সরানো বলে বলেও শেখানো যায় নি। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনর্গল কথা বলে।

তাই সুধাময়ী সাবধান করে দিলেন ওকে। বললেন, শব্দ করো না, বাবু ঘুমোচ্ছে।

শশাঙ্কশেখর তাই একটানা ঘুমিয়েছেন একেবারে পাঁচটা অবধি।

ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দিয়ে দেখলেন, কখন বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ ফর্সা।

খুব আরাম করে চা খেলেন, শব্দ করে করে। তারপর মনে পড়ে গেল, সুধাময়ী এক সময়, ঝুমার তখন বয়স কম, বলেছিলেন, শব্দ করে চা খেতে নেই, প্লেটে ঢেলে চা খাস নে। আজ হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের আনন্দ কেড়ে নেওয়ার নামই বোধহয় সভ্যতা।

একবার চিৎকার করে ডাকলেন, ঈশ্বর, লেটার-বক্সটা একবার দেখে আয়।

ঈশ্বর এসে বললে, নেই বাবু।

অথচ শশাঙ্কশেখরের আজ একটা চিঠি পেতে ইচ্ছে করছিল। কিংবা ও'র মন বলছিল, একটা চিঠি আসবে।

এ-ঘর ও-ঘর পায়চারি করলেন, সদর দরজা খুলে বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখলেন। জল সরে গেছে কখন, রাস্তাঘাট ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, শুধু কোথাও কোথাও একটু-আধটু কাদা জমে আছে, কালো কালো কাদা। বাড়ির দেয়ালগুলো ভিজে ভিজে।

কিন্তু মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে তখনো ভোরবেলায় দেখা সেই বৃষ্টিটা রয়ে গেছে। কি সুন্দর বৃষ্টি। এতকাল পরে যেন এই প্রথম দেখলেন। এতদিন কেন দেখেন নি ভেবে পেলেন না।

আসলে এতকাল আমি তো কিছুই দেখি নি। সামনের পোস্টে তারের ওপর দুটো শালিক দেখে ভাবলেন, আমি বোধহয় পাখিও দেখি নি। পাখির ওড়া-বসা খুঁটিয়ে খাওয়া সবই আমার কাছে ছিল এক একটা অক্ষর। বক দেখে ভেবেছি ওটা প্রাচীন মিশরের বর্ণমালায় 'ব'। একটা সাপ, একটা প্যাঁচা, একটা হরিণ, সবই ছিল শুধু অক্ষর।

বৃষ্টি নেই, রাস্তাঘাট শুকিয়ে গেছে, ট্রাম-বাস চলছে। শশাঙ্কশেখরের

ভেতরটা কেমন যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। আর বুকের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগ আর আনন্দ মেশামিশি হয়ে আছে। কি যেন ঘটবে, কি যেন ঘটতে চলেছে। কোন নিদারুণ দুর্ঘটনা, কিংবা কোন অভাবনীয় আবিষ্কারের আনন্দ।

পড়ার ঘরে এসে বসলেন শশাঙ্কশেখর। বইয়ের পাতা ওল্টালেন, কিন্তু কোথাও মন বসছে না।

বাড়ির মধ্যে আটকে থাকতে অসহ্য লাগছে।

একবার ভিতরে এসে সুধাময়ীকে জিগ্যেস করলেন, ঝুমা এলো না এখনো। ঘড়ির দিকে তাকালেন।

আর একবার এসে বললেন, অমু কখন ফেরে?

রুমার কথা জিগ্যেস করতেই সুধাময়ী বললেন, ওর আজ ফিরতে দেরী হবে, বলে গেছে। ওর এক বন্ধুর জন্মদিন।

কিন্তু শশাঙ্কশেখরের ভীষণ অস্থির লাগছে, কেমন একটা দমবন্ধ হয়ে আসা কষ্ট। ঘড়ির দিকে তাকালেন।

ওরা কেউ এখনো ফিরছে না কেন? আলো জ্বলে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এত রাত অবধি বাইরে-বাইরে। একবার ভাবলেন, হয়তো তিনদিন বৃষ্টির জন্যে বাইরে বেরোতে পায় নি, তাই।

কি ভেবে শশাঙ্কশেখর সুধাময়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা টাকা দাও তো।

—কি হবে? অবাক হয়ে তাকালেন সুধাময়ী।

শশাঙ্কশেখর কোনদিনই নিজের কাছে কোন টাকা পয়সা রাখেন না। মাইনের টাকা সুধাময়ীর হাতেই তুলে দিচ্ছেন সেই বিয়ের পর থেকেই। ও'র কোন নেশা নেই, সিগারেটও খান না। শুধু দু' বেলা কয়েক কাপ চা। উনি একটা বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক, কলেজে যাবার সময় কিংবা প্রয়োজন ঘটলে টাকা পয়সা চেয়ে নেন সুধাময়ীর কাছ থেকে। আর এই শিলালিপি নিয়ে রিসার্চের জন্যে আগে একটা ট্যুইশানি করতেন, বইপত্র সেই টাকাতেই। লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা সময় নষ্ট, শরীরেও পোষায় না।

একটা টাকা চাইলেন শশাঙ্কশেখর।

সুধাময়ীর প্রশ্ন শুনে বললেন, ভাল লাগছে না, একটু বেড়িয়ে আসি।

সুধাময়ী বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, এই রাত আটটার সময়?

শশাঙ্কশেখর হাসলেন, তা হোক্, ট্রামে এই কাছাকাছি একটু ঘুরে আসবো।

সুধাময়ী কি আর করেন, টাকাটা বের করে দিলেন। শুধু একটি টাকা। বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।

শশাঙ্কশেখর হেসে বললেন, ন'টার মধ্যেই ফিরবো। কোথায় আর যাবার আছে। বলে হাসলেন।

তারপর পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়ে চটি ছেড়ে এসে পামশু পরলেন, আর সুধাময়ী বললেন, বোতামটা লাগিয়ে নাও। মুখে বললেন, লাগিয়ে নাও, কিন্তু নিজেই এগিয়ে এসে যে-বোতামটা লাগানো হয়নি সেটা লাগিয়ে দিলেন।

শশাঙ্কশেখর সদর দরজা খুলে পামশুর মচমচ শব্দ করে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেলেন, ঈশ্বর, দরজাটায় খিল দিয়ে দে।

২

শশাঙ্কশেখর আর ফিরে এলেন না।

সুধাময়ী ভাবতেও পারেন নি যে শশাঙ্কশেখর আর ফিরে আসবেন না।

এ-সময় অমু আসে প্রচণ্ড ক্ষিদে সঙ্গে নিয়ে। উনি বেশ বুঝতে পারেন ওর ব্যবসা খুব একটা ভাল চলে না। বাবার কাছে না বললেও অমু সে-কথা ও'র কাছে লুকোতে পারে না।

ছেলেটা ক্ষিদে নিয়ে ফেরে, তাই এ-সময় ব্যস্ততার শেষ নেই। ঝুমা থাকলে মাকে সাহায্য করে। ফিরতে দেরী হচ্ছিল বলে বরং তার কথাই দু'একবার ভেবেছেন। যার যে-সময় ফেরার অভ্যাস সেই সময় অবধি তবু নিশ্চিন্ত থাকা যায়। দেরী হলেই ভয়-ভয় করে। বিয়ের পর থেকেই এই ভয়টা ও'র সঙ্গী হয়ে গেছে। প্রথম ছিল স্বামীর জন্যে, তারপর ছেলেমেয়েদের জন্যেও। অথচ যে-মানুষটা বাড়িতে একা-একা বসে আছে তার কথা ওরা কেউ ভাবে না। একদিন দুপুরে ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন, বাস থেকে নেমেই দেখলেন রাস্তায় পীচ থেঁতলানো টায়ারের দাগ, রাস্তার পাশে সবাই ভিড় করে আছে। কে যেন বললে, 'একটা ইয়াং ছেলে।' সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো, সেই ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লেন। মুখটা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। না, চেনা কেউ নয় জেনেও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কান্না এসে গিয়েছিল, তাজা ছেলেটার জন্যে, অচেনা কোন মায়ের কথা ভেবে।

অমুর জুতোর আওয়াজ পেয়েই সুধাময়ী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কোনরকমে হাতমুখ ধুয়েই ও খাবার চাইবে। দেরী হলে এক একদিন ভীষণ রেগে যায়।

অমুব জুতোর শব্দেই সুধাময়ী বুঝতে পেরেছিলেন সদর দরজা খোলা আছে। সেই যে বেরিয়ে যাবার সময় শশাঙ্কশেখর ঈশ্বরকে হেঁকে বলে গিয়েছিলেন, দরজাটায় খিল দিয়ে দে, ঈশ্বর কান দেয় নি নিশ্চয়। তা না হলে কলিং বেল শুনতে পেতেন।

এ-বাড়ির সকলের জুতোর কিংবা চটির শব্দ ও'র চেনা হয়ে গেছে। কলিং বেল টিপলেও চিনতে পারেন। এক একজনের এক একরকম। সারাটা দুপুর একা থেকে থেকে এই শব্দগুলোর জন্যেই তো অপেক্ষা করেন।

আসলে ও'র জীবনে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিই-বা আছে।

অমু খেতে বসে জিগ্যেস করলো, ঝুমা ফেরে নি?

খুব নিশ্চিন্ত গলায় সুধাময়ী বললেন, আসবে এখন। হয়তো কোন কাজ আছে।

অমুও আর কোন কথা বললো না।

ঝুমাকে নিয়ে এ-বাড়িতে কোন সমালোচনা নেই, বরং ভয় রুমাকে নিয়ে। ওর এই বয়েসটাই ভয়ের। ঝুমার ভয়ের বয়েস পার হয়ে গেছে, চেষ্টা করেও ওর বিয়ে দিতে পারেন নি। সুধাময়ীর অবশ্য ধারণা সময়কালে তেমন চেষ্টাই হয় নি। তার জন্যে নিজেকেই অপরাধী লাগে। এখন চাকরি করছে ঝুমা, চাকরি করতে করতেও তো অনেকে নিজেই বিয়ে করে। তাই ঝুমা কোন কোনদিন দেরিতে ফিরলে সুধাময়ী কোন প্রশ্ন করেন না। বরং একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পান, একটুখানি স্বপ্ন। ও'র খুবই জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস

পান না, পাছে ওঁর ঐটুকু স্বপ্নও ঝুমার সশব্দ হাসিতে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

সদর দরজাটা খোলা ছিল বলে উনি এক ফাঁকে চুপি-চুপি ঈশ্বরকে বলে এসেছিলেন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসতে। আজ অমু বোধহয় খেয়াল করে নি, তা না হলে রাগারাগি করতো। আজকাল হঠাৎ হঠাৎ আলো নিভে যায় বলেই দরজা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা।

কলিং বেল বাজতেই সুধাময়ী বুঝতে পারলেন ঝুমা এসেছে।

ঈশ্বরই গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

একটু পরেই ঝুমা ঘরে ঢুকলো, তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধাময়ী বুঝতে পারলেন ও প্রচণ্ড রেগে আছে। ভাবলেন, হয়তো আপিসের কোন ব্যাপার। কিছু জিগ্যেস করলেন না।

ঝুমা কারো দিকে না তাকিয়ে বেশ রাগ-রাগ ভাবে ফোল্ডিং ছাতা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখলো, আলনা থেকে শাড়ি নিয়ে কাপড় বদলাতে গেল।

তারপর বেসিনে মুখ ধুতে ধুতেই বেশ কড়া গলায় হাঁক দিলে, রুমা!

সুধাময়ী বললেন, ও এখনো ফেরে নি।

ঝুমার গলার স্বরেই ঝাঁঝটা টের পেলেন। আবার কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। রুমাকে নিয়ে ওঁর চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু আজকাল মেয়েদের এত আটকে আটকে রাখাও সম্ভব নয়। তাছাড়া ঝুমাকেও প্রথম দিকে এত আটকে আটকে রেখেই তো এই অবস্থা।

কথা ঘোরাবার জন্যেই কিনা কে জানে, কিংবা সুধাময়ীর নিজেরও হয়তো একটু উৎকণ্ঠা হচ্ছিল, তাই ঝুমাকে বললেন, তোর বাবাও তো বেরিয়ে গেল।

ঝুমা অবাক হয়ে বললে, এত রাত্রে? কোথায়?

—কি জানি। বললে কাছাকাছি একটু ঘুরে আসি।

বলেই সুধাময়ী ঘড়ির দিকে আবার তাকালেন। তারপর একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। বলে তো গেছে নটার মধ্যে ফিরবে।

এ-সময় আর কোন দিকে চোখ দিতে পারেন না সুধাময়ী। আজ ঝুমা দেরী করে ফিরেছে বলে কাজ আরো বেশি। রাত্রের রান্না এখনো অনেক বাকী। সকালে বৃষ্টি দেখে রুমা খিচুড়ির কথা বলেছিল। শশাঙ্কশেখর ডেক-চেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলেছিলেন ইলিশ মাছের কথা। সব কথাই সুধাময়ীর কানে যায়, ঈশ্বরকে আবার বাজারে পাঠিয়েছিলেন ইলিশ মাছের জন্যে। কিন্তু দুপুরেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়ে চারদিক শুকনো খটখটে, এখন ওরা খিচুড়ি খেতে চাইবে কিনা জানেন না। ঝুমাব জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে খিচুড়িই চড়িয়ে দিয়েছেন।

এই সময়েই আবার কলিং বেল বাজলো।

ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখ তো কে!

শব্দেই বুঝেছেন বাইরের লোক। এই শব্দটাও এক অশান্তি। ঝুমা এক-দিন বলেছিল, ডিং ডং আওয়াজ হয়, তেমনি একটা এনে লাগাতে হবে। সুধা-ময়ীর নিজেরও তাই ইচ্ছে। হয়ে ওঠে নি, শীগগির করাতে হবে। উনি বেশ বুঝতে পারেন, ঘন-ঘন কলিং বেল বাজলে শশাঙ্কশেখরেরও অসহ্য লাগে।

ঝুমাই দেখতে গিয়েছিল, ঈশ্বর হাতের কাজ শেষ না করে যাবে না বুঝতে পেরে। কার সঙ্গে কথা বলছে অস্পষ্ট শুনতে পেলেন, তারপর দরজা বন্ধ করার, খিল দেওয়ার শব্দ। ঝুমা ফিরে এসে বললে, বাবার সেই সীরিয়াস স্টুডেন্ট।

হেসে বললে, সেই অপর্ণা কি যেন!

একটু পরেই রুমা ফিরলো, আর রুমা যখন ঘরে ফেরে তখন কলিং বেল বা চটির শব্দ শুনে তাকে চিনতে হয় না। রাস্তা থেকেই ওর কলকলানি শোনা যাবে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো বাড়িওলার মেয়ে চন্দনাকে চিৎকার করে দু-চারটে কথা বলবে, আশেপাশে চেনাজানা কাউকে দেখতে পেলেই কিছু না কিছু বলা চাই।

বেশ বোঝা গেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন কথা ছুঁড়ছে, কথার চেয়ে হাসির শব্দ বেশি। তারপরই কলিং বেল টিপলো।

ঝুমা বঁটি পেতে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল, মাকে এটুকু সময় ও যতটা পারে সাহায্য করে। সুধাময়ী দাঁড়িয়ে গ্যাস স্টোভে রান্না করছিলেন, রুমার গলা শুনতে পেয়েই ঝুমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন মুহূর্তে ঝুমার মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। তাই মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন।

তখন বেসিনের কাছ থেকে ঝুমা রুক্ষ গলায় যেভাবে রুমাকে ডেকেছিল তা থেকেই আন্দাজ করেছিলেন, কিছু একটা ঘটেছে।

অথচ এইসব ঘটনাগুলোকে ঝুমা যত গুরুত্ব দেয় সুধাময়ী ততখানি গুরুত্ব দিতে চান না। ও'র এক একসময় মনে হয় ঝুমার শাসনটা একটু মাত্রাছাড়া। এটা শাসন অথবা অন্য কিছু তাও ঠিক বুঝতে পারেন না।

হয়তো সত্যিই হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, অথবা দু'-বোনের সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে সুধাময়ী বললেন, তোর বাবা তো এখনো ফিরলো না!

ঝুমা আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই বললে, তুমি যেতে দিলে কেন!

—বৃষ্টির জন্যে এ ক'দিন কলেজেও যায় নি, বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে আছে। বললে একটু ঘুরে আসছি। সুধাময়ী নিজেকে স্তোক দেবার মত করে বললেন।

রুমা ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে, একেবারে সটান রান্নাঘরের কাছে এসে হাসতে হাসতে বললে, ফাইন গন্ধ ছেড়েছে, না মা? দুপুর থেকে ভাবছি খিচুড়ি খাবো, বৃষ্টিটা বন্ধ হয়ে দিলে মাটি করে। হাসতে হাসতেই আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, আজ যা একটা মজা হয়েছে, জানিস দিদি!

ঝুমা তখনই চোখ তুলে রুমার দিকে তাকালো, আর সেই চোখের দৃষ্টিতে কি ছিল কে জানে, রুমা কেমন দপ্ করে নিভে গেল।

সুধাময়ী বুঝতে পেরেই বললেন, ক'টা বাজলো দেখ তো! তোর বাবা এখনো ফিরলো না।

ন'টা বেজে যাওয়ার পরও সুধাময়ী ভাবলেন, ন'টার মধ্যে ফিরে আসবে বলে গেছে বলে কি আর কাঁটায় কাঁটায় ন'টা! এখনই হয়তো ফিরবে।

কিন্তু তার পর থেকেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে শুরু করে দিয়েছেন, ধাপে ধাপে উৎকণ্ঠা বেড়েছে। আসলে যার যা অভ্যাস, কত লোক তো রাত বারো-টাতেও ফেরে। কিন্তু শশাঙ্কশেখর কোনদিন এতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকেন না। অন্তত এখন তো নয়ই। একবার সুধাময়ী নিজেই এসে সদর দরজা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। তখন ট্রাম-রাস্তার দু'ধারের দোকানপাট সবই বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু রাস্তার আলোয় যেটুকু অন্ধকার দূর হয়েছে তাতে ভালো করে কিছুই দেখা যায় না। ট্রাম-বাস তখনো চলছে বলেই যেটুকু ভরসা পেলেন। ভাবলেন, এখুনি নিশ্চয় এসে পড়বে। দূর থেকে যে-ক'জন হেঁটে আসছিল

তাদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, তাই হাঁটার ভঙ্গিটা লক্ষ করলেন। হাঁটার ভঙ্গি দেখলেই অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হবে না।

সদর দরজার সামনের রোয়াকে এ-ভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও অস্বস্তি হচ্ছিল, ছেলেমেয়েরা কি ভাববে। এখনই যদি শশাঙ্কশেখর ফিরে আসেন তা হলে হয়তো রুমা হাসাহাসি করবে, ওর বাবাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলবে। তখন সুধাময়ী খুবই লজ্জা পাবেন। অথচ দশটাও বেজে গেছে।

কিন্তু দরজা বন্ধ করে ভিতরে এসেও স্বস্তি পেলেন না। অমু কি-সব হিসেবপত্র লিখছিল. তার কাছে এসে সুধাময়ী বললেন, অমু, ও তো এখনো ফিরলো না রে। বলতে গিয়ে ওঁর গলাটা কেঁপে গেল।

অমু চোখ তুলে একবার মা'র মুখের দিকে, একবার ঘড়িটার দিকে তাকালো। তারপর যেন চমকে উঠে বললে, সাড়ে দশটা?

ঝুমা আর রুমাও চিন্তিত হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে, ওরা যে-ভাবে মা'র কাছে এসে দাঁড়ালো, ওদের মুখেচোখে যে উৎকণ্ঠার ছাপ দেখতে পেলেন সুধাময়ী, তাতে নিজেও ভয় পেলেন।

ঝুমা আক্ষেপের স্বরে বলে উঠলো, তুমি বেরোতে দিলে কেন?

অমু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে. এখন এত রাত্রে কোথায় খুঁজবো বলো তো। তারপর নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, বোধহয় অমিতেশ-বাবুর বাড়িতে গল্প করছে।

অমিতেশবাবু শশাঙ্কশেখরের কলেজের সহকর্মী। মাঝে মাঝেই উনি এ-বাড়িতে আসেন, কখনো কখনো শশাঙ্কশেখরই যান। থাকেন কাছাকাছি ট্রাম-রাস্তার ওপারের একটা গলিতে। অমু দু-একবার গেছে, বাবার চিঠি নিয়ে, কিংবা অসুখ-বিসুখে কলেজে যেতে পারবেন না সে-খবর জানাতে। টেলিফোনটা তো খারাপ হয়ে আছে. একটু বৃষ্টি হলেই এ-পাড়ার টেলিফোন খারাপ হয়ে যায়। তবু রিসিভারটা তুলে দেখলো অমু. ডায়াল সাউন্ড না পাওয়া সত্ত্বেও দু-তিনবার একটা নম্বর ডায়াল করলো। তারপর রেগে গিয়ে রিসিভারটা ঠকাস করে নামিয়ে রাখলো।

সমস্ত বাড়ির চেহারাটা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। চারখানা মুখ, সুধাময়ী, অমু. ঝুমা. রুমা—সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। সবারই মুখে আতঙ্কের ছায়া. আতঙ্কের আড়ালে যেন চাপা কান্না টলটল করছে। রুমা যা-ই করে থাক. যে অন্যায়ই করে থাক না কেন. এখন আর তার উপর ঝুমার কোন রাগ নেই। যেন টাল সামলাবার জন্যেই রুমার কাঁধে হাত রেখে ঝুমা বলে উঠলো, তুই আসার সময় রাস্তায় কোথাও দেখিস নি!

রুমা বিভ্রান্তের মত তাকালো. মাথা নাড়লো ধীরে ধীরে। বললে, বাবা তো কখনো আটটার পর বাড়ির বাইরে থাকে না।

মুহূর্তে মুহূর্তে তখন উৎকণ্ঠা বাড়ছে। সকলের মুখেই ভয়।

অমু সার্টটা মাথায় গলিয়ে নিয়ে স্যাণ্ডেলজোড়া পায়ে টানতে টানতেই প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুধাময়ী আর ঝুমা-রুমা দরজার সামনে এসে রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে অমুর দিকে তাকিয়ে রইলো, যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ততক্ষণ, আর অমু গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর গলিটার অন্ধকার গহ্বরের দিকে. কখন আবার অমু ফিরে আসে সেই আশায়।

সুধাময়ী সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেবলই আশা করছিলেন সেই পরিচিত হাঁটার ভঙ্গিটা গলির মুখে দেখতে পাবেন। এক একবার ট্রাম-রাস্তার দিকেও দেখছিলেন।

বাড়ির কাছের স্টপে ট্রাম বা বাস দাঁড়ালেই যারা নামছিল তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন সুধাময়ী। একবার রুমা বলে ফেললো, ঐ তো! কিন্তু পরমুহূর্তেই বাস থেকে নামা লোকটিকে আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে দেখেই কেমন হতাশ গলায় বললে, না রে দিদি!

রাস্তার ওপারে গলির মোড়ের অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকিয়ে ওরা তিন মা-মেয়ে হতাশা-বিস্ময়-প্রশ্ন মিশিয়ে একটা কলরব তুলছিল বলেই হয়তো দোতলার বারান্দা থেকে কেউ শুনতে পেয়ে থাকবে।

হঠাৎ গলির অন্ধকার থেকে অমুকে একা বেরিয়ে আসতে দেখেই ট্রাম-রাস্তার এপার থেকেই ঝুমা চিৎকার করে জিগ্যেস করলে, কি হ'ল? নেই?

এমনিতেই তখন পাড়া বেশ চুপচাপ হয়ে গেছে। তার মধ্যে ঝুমার চিৎকার এবং গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা আশপাশের লোকদের সচকিত করে তুললো। আর দোতলার বারান্দা থেকে যতীনবাবু জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে ঝুমা?

এই রোয়াকে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার লোকদের দেখা যায় না। তাই ঝুমা ঝট করে ফুটপাতে নেমে এসে ওপরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে কান্নার গলায় বললে, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, বাবা ফেরে নি কাকাবাবু।

ওপর থেকেই যতীনবাবু বললেন, সে কি, কলেজে ফোন করেছো?

কথাটা বলেই উনি আর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলেন না, বেশ বোঝা গেল নীচেই নেমে আসছেন।

ততক্ষণে অমু ট্রাম-লাইন পার হয়ে এদিকে চলে এসেছে। এসেই বিব্রত-ভাবে বললে, ওখানে তো বাবা যায়ই নি, এখন কি করি বলো তো?

যতীনবাবুও তখন নেমে এসেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিগ্যেস করছেন। তাঁর বাড়ির অন্য সকলেও এসে গেল। সবারই মুখেচোখে উৎকণ্ঠা। শুধু যতীনবাবুই সান্ত্বনা দেবার স্বরে বললেন, বোধ হয় দূরে কোথাও গিয়েছেন, এসে পড়বেন—এসে পড়বেন। ও'র গলার স্বরে এমন একটা আত্মবিশ্বাসের গাম্ভীর্য আছে যে সকলেই একটু আশা পেল।

বাড়িওয়ালা যতীনবাবু লোকটি খুবই ভালো, বাড়িটা পৈতৃক, নিজে কোন অফিসে ভাল চাকরি করেন। শুধু অমুদের বেলাতেই নয়, পাড়ার লোকের বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়ান।

লোকেও ও'কে দেখে বেশ ভরসা পায়। খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। বেঁটে নন, কিন্তু কাঁধের দিকটায় কেমন একটা চাপা-চাপা ভাব আছে, স্বাস্থ্য ভাল, দেখলেই মনে হয় শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। প্যান্টটা কোমরের নীচে একটু বেশী টানটান, ভাবভঙ্গিও। সারা মাথায় ঘন ঢেউ-খেলানো কুচকুচে কালো চুল অনেকেই জানে না উনি চুলে কলপ দেন, যে-বার কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন, অমুরা দেখেছে প্রায় সব চুলই প্রথমে লালচে ছিল, তারপর সাদা। একটুও সঙ্কোচ নেই, অসুখের পর চুল আবার সেই কুচকুচে কালো। এবং ও'র সমর্থ চেহারার সঙ্গে সেটা মানিয়েও যায়। অনেকেই সেজন্যে ও'র বয়সটা কম ভাবে, শশাঙ্কশেখরের বেশী। তাই ঝুমারাও ও'কে কাকাবাবু বলে।

—কোথায় কোথায় যেতে পারেন ফোন করে দেখেছো?

ঝুমার কাছে শুনে শুধু বললেন, এ-সময় টেলিফোনটাও খারাপ!

অর্থাৎ অমুদের টেলিফোন। ওঁর নিজের বাড়িতে টেলিফোন নেই, অনেক-দিন ধরে চেষ্টা করেও পাচ্ছেন না।

কিন্তু টেলিফোন থাকলেই বা কি লাভ হত! সুধাময়ী খুঁজে পেলেন না। ওঁর শুধু মনে হচ্ছিল শশাঙ্কশেখরের বন্ধু অমিতেশবাবু খবর শুনেও অমুর সঙ্গে এলেন না কেন, তা হলেও উনি কিছুটা ভরসা পেতেন।

তাই খুব ম্লান হতাশ গলায় অমুকে বললেন, খবর শুনেও উনি এলেন না?

অমুকে তখনো বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কি করবে কিছুই যেন ঠিক করতে পারছে না। শুধু বললে, খেতে বসেছেন। আসতেও পারেন হয়তো, আমি অপেক্ষা করি নি।

'খেতে বসেছেন' কথাটা শুনেই সুধাময়ীর খিচুড়ির কথা মনে পড়ে গেল, ইলিশ মাছ আনানোর কথা। শশাঙ্কশেখর সকালে বলেছিলেন বলেই ঈশ্বরকে আবার বাজারে পাঠিয়ে ইলিশ মাছ আনিয়েছেন। ওঁর চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

যতীনবাবু অমুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, আসলে হাসিটা আর সবাইকে সাহস দেবার জন্যেই। বেশ ভরাট গলাতেই অমুকে বললেন, তুমি তো ইয়াংম্যান হে, এত ঘাবড়ে যাবার কি আছে।

সুধাময়ীর মুখের দিকে, ঝুমা-রুমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে যেন নিজেকেই বললেন, এটা তো কোলকাতা শহর, এত ভাববার কি আছে, ঠিক এসে পড়বেন, এসে পড়বেন।

তারপর প্রশ্ন করলেন, কারো বাড়িটাড়ি যাবার কথা ছিল?

সুধাময়ীর গলার স্বরও তখন অনিশ্চিত কোন আশঙ্কায় যেন অস্ফুট শোনালো।—শুধু একটা টাকা চাইলো, বললে, কাছাকাছি একটু ঘুরে আসছি।

যতীনবাবু তখনো সাহস দিতে চেষ্টা করলেন।—এক টাকায় কোলকাতায় অবশ্য অনেকদূর যাওয়া যায়। তাছাড়া, বুঝলে ঝুমা, আমি একবার পার্কে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হাসবার চেষ্টা করলেন যতীনবাবু, বললেন, ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি কোথাও একটা জনপ্রাণী নেই, চতুর্দিকে ভুতুড়ে অন্ধকার...

একটু থেকেই বললেন, কার কার বাড়ি যেতেন, জানো তোমরা?

বলেই ওঁর মেয়েকে বললেন, চন্দনা, যা তো গ্যারেজের চাবিটা নিয়ে আয়, গাড়ির চাবিটাও।

যতীনবাবুর একখানা পুরনো গাড়ি আছে, রঙচটা মান্ধাতা আমলের গাড়ি, নিজের হাতেই ধোয়ামোছা করেন, নিজেই চালান। দেখলে বোঝা যায় গাড়িটার ওপর ওঁর খুব মায়া, কিন্তু এখানে ওখানে ধাক্কা লেগে টোল খেয়েছে। অমু কিংবা রুমা ওঁকে গাড়ি ধোয়ামোছা করতে দেখলে, কিংবা ঐ গাড়িতে ওঁদের সপরিবারে বেড়াতে যেতে দেখলে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। সন্ধ্যেবেলায় যখন গাড়িটা ফিরে আসে তখন তার উদ্ভট আওয়াজ শুনে ঠাট্টা করে বলে, অযান্ত্রিক ফিরলো!

আজ সেই গাড়িটাই ওঁদের কাছে প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনি গাড়ির চাবি আনবার কথা বলতেই ওরা সকলেই যেন অনেকখানি ভরসা পেল।

শশাঙ্কশেখর কার কার বাড়ি যেতে পারেন তেমন সম্ভাব্য দু'একটা নাম

বললো ঝুমা। বললে, কিন্তু ঠিকানা জানি না।

সেগুলো বোধ হয় কানেও গেল না যতীনবাবুর। বললেন, তার আগে বরং চলো হাসপাতালে দেখে আসি......

—হাসপাতাল! সুধাময়ীর গলাটা কেমন হতাশ শোনালো। আসলে অ্যাকসিডেন্টের ভয়টাই ওঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় তুলছিল, কিন্তু উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছিলেন, পাছে সেটাই সত্যি হয়ে যায়।

যতীনবাবু বললেন, হাসপাতালগুলোই আগে দেখা দরকার, কারো বাড়ি গিয়ে থাকেন তো অত ভয়ের কিছু নেই, ঠিকই ফিরে আসবেন।

কথাটা সুধাময়ীর একটুও ভাল লাগলো না। কারো বাড়ি গিয়ে থাকলে ঠিকই ফিরে আসবেন, তার মানে কি এই যে দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে ফিরে আসবেন না। ওঁর সমস্ত বুক কেঁপে উঠলো।

চন্দনা চাবি নিয়ে আসার পর যতীনবাবু হাতের ঘড়িটা দেখে বলে উঠলেন, এগারোটা! তারপর গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলেন, শান্ত নিস্তব্ধ পাড়াটার মাঝে সেই উদ্ভট আওয়াজটা আর কারো কানে খারাপ শোনালো না, বরং ঐ আওয়াজটার মধ্যেই যেন এতগুলো মানুষের হৃৎপিণ্ডের দপদপানি শোনা গেল, ওটাই এখন একমাত্র ভরসা।

অমুকে সঙ্গে নিয়ে যতীনবাবু বেরিয়ে গেলেন। সুধাময়ী তাকিয়ে রইলেন ওটা যতক্ষণ দেখা গেল, ওর পিছনের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে। তারপর ওটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই সুধাময়ী উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলেন, কি হল বল্ তো!

যতীনবাবুর স্ত্রী সুধাময়ীর কাঁধে হাত রাখলেন।

আর ঝুমা বললে, মা ভেবো না। আমি বলছি অ্যাকসিডেন্ট কক্ষনো নয়।

বললে কি হবে, ওর চোখেও জল এসে গেল।

৩

রাতারাতি সমস্ত বাড়ির চেহারাটা যেন বদলে গেছে। একটা নিস্তব্ধ উৎকণ্ঠার ছায়া নেমে এসেছে সকলের মুখেচোখে। ঈশ্বর কিংবা হারুর মা, ওরাও জেনে গেছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে, একটা কথাও নেই কারো মুখে। যথারীতি সকালে কাজ করতে এসে ঈশ্বরের কাছে সব শুনে হারুর মা প্রথমটা গালে হাত দিয়ে আঁতকে ওঠার শব্দ করেছিল, 'ওমা, সে কি গো।' কিন্তু তারপরই সবারই মুখচোখের দিকে তাকিয়ে কেমন চুপ করে গেছে। মুখে তার একটা কথাও নেই, বাসন-কোসন বালতি সরিয়েছে নিঃশব্দে, কেউ টেরও পায়নি। হারুর মা, সেও বুঝতে পেরে গেছে এই স্তব্ধতার মধ্যে একটুখানি আওয়াজ করলেও সেটা এই প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যে ঠাট্টার মত শোনাবে।

রুমা ঝুমা অমু, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। বিবর্ণ রক্তহীন মুখ, চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে।

সুধাময়ী স্থিরনিশ্চল বসে আছেন ঠাকুরের সামনে। তাঁর শোবার ঘরের এক কোণে একটা কাঠের চৌকিতে খানকয়েক ছবি রাখা আছে। ফটোব দোকান

থেকে বাঁধিয়ে আনা একটা কালীমূর্তি, একটা লক্ষ্মী, আর একটা স্বর্গত গুরুদেবের ছবি।

সুধাময়ীর নয়, ও'র বাবা-মার গুরুদেব।

এ-সব নিয়ে শশাঙ্কশেখর এক সময় ঠাট্টা করতেন, পরে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান-টগবানে বিশ্বাস তাঁর একটুও ছিল না।

ঈশ্বর আসার পর তার নাম নিয়ে সুধাময়ী একটু অস্বস্তি বোধ করে-ছিলেন, বাড়ির চাকরের নাম ঈশ্বর। শুনে হেসেছিলেন শশাঙ্কশেখর। বলে-ছিলেন, ঈশ্বরকে তো সবাই বাড়ির চাকরই ভাবে, সব সময় বলে এটা করে দাও, ওটা করে দাও। একটু থেমে বলেছিলেন, একে তবু বিশ্বাস করা যায়, ফরমাস করলেই শোনে, দেবদেবীরা তোমাদের তাও শোনে না।

ঈশ্বর এসে একবার কপাটের আড়াল থেকে সুধাময়ীকে দেখে গেল। হারুর মা ফিসফিস করে তাকে বললে, তুই রান্না চাপিয়ে দে, ছেলেমেয়েগুলো মুখে তো কিছু দেবে।

সকালে ঈশ্বরই চা বানিয়ে দিয়েছিল। ঝুমা আর রুমা না-না করে মাথা নেড়েছে, আর ছোটাছুটিতে ক্লান্ত বিষণ্ণ অমুই শুধু চা খেয়েছে। সুধাময়ী হ্যাঁ-না কিছুই বলেন নি, চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওপরে সর পড়ে গেছে তাও দেখেন নি। ঈশ্বর কিচ্ছু না বলে এক সময় সেটা সরিয়ে নিয়ে গেছে।

অমুকে এখনই আবার বেরোতে হবে, কিন্তু ওর নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগছিল, নৈরাশ্যের পিছনে ছুটে ছুটে যেন আরো ক্লান্ত।

সুধাময়ী পুজো কিংবা প্রার্থনা সেরে উঠে এলেন, মুখ দেখে মনে হল কোন একটা ভাবনার মধ্যে যেন ডুবে আছেন। তবু এ-ঘরে এসে অমুর দিকে চোখ পড়তেই তাঁর বুক-ভাঙা কণ্ঠস্বরের অস্পষ্টতা শোনা গেল, খেয়েছিস কিছু?

অমু কোন জবাব দিল না, সুধাময়ীর ঐ কথাকটি হয়তো ঠিক প্রশ্নও নয়, উনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত ওরা, সুধাময়ী ঝুমা আর রুমা এই ঘরেই চুপচাপ বসে অপেক্ষা করেছে, দূরে কোথাও একটা গাড়ির আওয়াজ কিংবা হর্ন শুনতে পেলেই সচকিত হয়ে উঠেছে।

সুধাময়ী কান পেতে থেকেছেন সর্বক্ষণ। এবং মনে মনে প্রার্থনা করেছেন যেন অ্যাকসিডেন্ট বা মৃত্যুর খবর শুনতে না হয়। আশা করেছেন, একটা কোন খবর এসে যাবে, একটা কোন খবর। কিন্তু এই অপেক্ষা করে থাকা দুঃসহ লেগেছে। এক সময় ঝুমার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, এর চেয়ে সঙ্গে যাওয়াই ভাল ছিল। অর্থাৎ অমুর সঙ্গে।

ঝুমা তখন আর মাকে সান্ত্বনাও দিতে পারছে না। ওর মন বলছিল, দুর্ঘটনা, কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

তারপর এক সময় যতীনবাবুর গাড়ি সেই বিকট যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে ফিরে এসেছিল। আর সুধাময়ী সদর দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, পিছনে পিছনে ঝুমা আর রুমা। যতীনবাবুর গাড়ি তখনো এসে থামে নি, মাঝরাত্রির নিঃশব্দতাব জন্যেই শব্দটা মনে হয়েছিল কানের কাছে।

গাড়িটা থামার পরও সুধাময়ীর কিছু প্রশ্ন করতে সাহস হল না। কিন্তু দোতলার বারান্দা থেকে যতীনবাবুর মেয়ে জিগ্যেস করলো, কি জিগ্যেস করলো

তাও সুধাময়ীর কানে গেল না। শুধু দেখলেন যতীনবাবু গাড়ি থেকে নেমে তাঁর মাথাটা ডান দিক থেকে বাঁদিকে আর বাঁদিক থেকে ডানদিকে নাড়লেন।

অমুও তখন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। যতীনবাবু তাকেই যেন বললেন, কিংবা নিজেকে, গাড়িটা তুলেই ফেলি। অর্থাৎ গ্যারেজে।

অ্যাকসিডেন্ট নয়, মৃত্যু নয়। অর্থাৎ সে ধরনের কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এরা আসে নি—প্রথমেই তা জেনে সুধাময়ী একটু যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, পরমুহূর্তেই আবার ভেঙে পড়লেন।

—এত রাত্রে আর ছোটাছুটি করে লাভ নেই। যতীনবাবু গাড়ি তুলে দিয়ে ওপরে উঠে যাবার সময় বলে গেলেন। বললেন, আমার ধারণা ওপাড়ায় কারো বাড়ি গিয়ে আটকে পড়েছেন, ভোরবেলাতেই চলে আসবেন।

তাই যেন হয়, তাই যেন হয়, মনে মনে ভাবলেন সুধাময়ী।

সারারাত জেগে-জেগেই কেটে গেছে। শুধু অমুর বোধ হয় একবার তন্দ্রামত এসেছিল, ক্লান্তিতে। আর রুমা এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলে ওরা তিনজন মুখোমুখি বসে আছে। তা দেখে রুমা খুব লজ্জা পেয়েছিল ভিতরে ভিতরে।

অমু ফিরে এসে বলেছিল, কাছাকাছি দু'একটা হাসপাতালে ঘুরে আর কি লাভ, কোলকাতায় হাসপাতাল কি একটা নাকি। তারপর একটু থেমে বলেছিল, এত রাত্রে বেচারী যতীনবাবুকে নিয়ে কতই বা ঘোরা যায়।

হাসপাতাল, হাসপাতাল। এরা কেবলই হাসপাতালের কথা বলছে। সুধাময়ীর শুনতেও খারাপ লাগছিল। কেবলই অ্যাকসিডেন্ট আর মৃত্যুর কথা। ঐ ভয়টাই সবচেয়ে বেশি হচ্ছিল সুধাময়ীর, তাই শুনতে ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ কান্নার গলায় বলে উঠেছিলেন, একটা টাকা চাইলে, আর আমি সেই একটা টাকাই দিলাম। হয়তো বাস পায়নি, ট্যাকসির ভাড়াটাও পকেটে নেই বলে ..

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝুমা বলেছিল, তা হলে তো এখানে পৌঁছে ভাড়া দিতে পারতো। তুমি কি সব আজেবাজে ভাবছো, মা!

যতীনবাবুর কথাটাই শেষ ভরসা ছিল, দূরে কারো বাড়ি গিয়ে আটকে পড়েছেন, সকাল হলেই ফিরে আসবেন।

সুধাময়ীর কাছে ওটাই শেষ খড়কুটো। ভেবেছেন, টেলিফোন খারাপ, তা না হলে নিশ্চয় একটা খবর পেতেন।

ভোরবেলায় ট্রাম-বাস চলতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে থেকেছেন সুধাময়ী। একবার নিঃশব্দে সদর দরজার খিল খুলে রেখে গেছেন, আরেকবার এসে দরজার পাল্লাটাই। যেন শশাঙ্কশেখর এসে দরজা বন্ধ দেখলে অভিমানে ফিরে চলে যাবেন। ভাববেন, আমার জন্যে এদের কোন উৎকণ্ঠা হয় নি।

এক একবার যখনই বিশ্বাস হচ্ছিল শশাঙ্কশেখর এখনই ফিরে আসবেন, কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলেন, ফিরে এসে কিভাবে হাসতে হাসতে ওঁদের সারারাতের উৎকণ্ঠাকে তাচ্ছিল্য করে কিছু একটা অজুহাত দিচ্ছেন, তখনই সুধাময়ী ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছিলেন। আবার নিজেই নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছিলেন, ফিরে আসুক, শুধু ফিরে আসুক, আমি রেগে গিয়ে একটি কথাও বলবো না।

অন্যমনস্কভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুধাময়ী, আর আশায় আশায় সদর দরজার দিকে একবার তাকাতেই চমকে উঠলেন, কিংবা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কে একজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে! অমিতেশবাবু! কিন্তু সুধাময়ী প্রথমটা চিনতেই পারেন নি।

উনি এ-বাড়িতে বড় একটা কলিং বেল বাজিয়ে আসেন না। কিন্তু জোরে জোরে কড়া নাড়েন, কিংবা দরজা খোলা থাকলে বেশ উচ্চকণ্ঠে কিছু একটা বলতে বলতে ঢোকেন। ওঁর হাবেভাবে কথাবার্তায় রীতিমত একটা জমাটি হৈ-হল্লার আমেজ আছে, একটা ঘরোয়া ব্যবহার। 'কই রে, সব কোথায় গেলি', কিংবা 'হ্যালো রুমা। কি খবর তোমার, পড়াশুনো কেমন চলছে।' যে প্রথম দেখা দেবে তাকে নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ গল্প জুড়ে দেবেন। ওঁকে কেউই বাইরের লোক ভাবতে পারে না।

সুধাময়ীর সেজন্যেই একটু রাগ এবং অভিমান। এই লোকটিকেই সংসারের সবচেয়ে বন্ধু ভেবেছিলেন, বিপদে আপদে ছুটে আসার মত মানুষ। কিন্তু আশ্চর্য, কাল রাত্রে অমু ওঁর কাছে শশাঙ্কশেখর গেছেন কিনা খোঁজ নিতে যাওয়ার পরও উনি আসেন নি। এসেছেন এই এতক্ষণে, একেবারে পরিপাটি হয়ে।

ঝুমা একবার রাত্রে বলেছিল, দেখলে মা, অমিতেশবাবু একবার খোঁজ নিতেও এলেন না। তারপর নিজেই বলেছে, বোধ হয় ভেবে নিয়েছেন তেমন কিছু নয়, শুধু ফিরতে দেরী হচ্ছে।

অমিতেশবাবুর মুখচোখ দেখে বোঝা গেল, উনি খুব সঙ্কোচ বোধ করছেন। সেজন্যেই হয়তো অন্যদিনের মত হৈ-হল্লা করে ঢুকতে সাহস পান নি। সুধাময়ী রাত্রেই একবার ওঁর না আসার কারণ ভেবে নিয়েছেন। এলেই হয়তো ওঁর ওপরও দায়-দায়িত্ব পড়ে যাবে, ছোটাছুটি করতে হবে এই ভয়েই আসেন নি। কিংবা উনি আসতে চেয়েছিলেন, বাড়ির লোক আপত্তি করেছে। অথচ উনি এলে সুধাময়ী অনেকখানি ভরসা পেতেন।

সুধাময়ীর মুখ দেখে কয়েক মুহূর্ত কোন কথা খুঁজে পেলেন না অমিতেশবাবু। তারপর বলে উঠলেন, সে কি! আসেন নি?

বসার ঘরে ওরা সবাই একে একে এসে জড়ো হলো অমিতেশবাবুকে ঘিরে।

প্রশ্নের জবাবে সুধাময়ী আবার আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বলে যেতে শুরু করলেন।

সুধাময়ীর গলার স্বর দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালো।—রাত আটটার সময় একটা টাকা চাইলো, বললে কাছাকাছি একটু ঘুরে আসবো।

অমুর অসহ্য লাগছিল বসে বসে সেই কথাগুলোই আবার শুনতে।

ও উঠে পড়লো, ওপাড়ার হাসপাতালগুলো একটু ঘুরে আসি।

অমু বেরিয়ে গেল, আর তখনই টেলিফোন বেজে উঠলো।

সুধাময়ী, ঝুমা রুমা সকলেই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেল ওঘরে, টেলিফোনের কাছে। নিশ্চয় কোন একটা খবর আছে।

ঝুমাই রিসিভার তুললো। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলেন সুধাময়ী। রুমাও।

—হ্যাঁ। কে বলছেন? না, উনি তো বাড়ি নেই। আপনি কে বলছেন? কখন থাকবেন বলতে পারছি না, আপনি কে বলছেন?

সবারই মুখে একটা হতাশার ছায়া নামলো। ঝুমা রিসিভার নামিয়ে রেখে

বললে, কেটে গেল। তারপর নিজের মনেই যেন বললে, অদ্ভুত, কেবলই বলছে খুব জরুরী দরকার, নিজের পরিচয়টা তো বলবে! একটু থেমে বললে, একটা মেয়ে।

সুধাময়ী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পিছন ফিরে দেখলেন, অমিতেশবাবু কখন নিঃশব্দে এসে পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঝুমা ততক্ষণে আবার রিসিভারটা তুলে কানে দিয়েছে। দিয়েই বলে উঠলো, কখন থেকে ডায়াল সাউন্ড এসে গেছে, আমরা লক্ষই করি নি।

টেলিফোনের পাশেই একটা খাতায় চেনা-জানা সকলের নাম আর নম্বর লেখা আছে।

এখন তো টেলিফোন ঠিক হয়ে গেছে। এখন ফোন করে জানা যায় পরিচিতদের কেউ কোন খবর দিতে পারে কিনা। একবার সুধাময়ীর মনে হল আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে ফোন করে জেনে নেবেন, অন্তত স্বর্ণকে। স্বর্ণ ও'র ছোট বোন। ও'দের বোনদের মধ্যে নামের কোন মিল নেই।

কিন্তু স্বর্ণকে টেলিফোন করার কথা মনে আসতেই ও'র বড় অস্বস্তি লাগলো। আত্মীয়স্বজন কাউকে জানাতেও কেমন যেন দ্বিধা। ব্যাপারটাকে ওরা কেউই বোধহয় তেমনভাবে নিতে পারবে না, হয়তো হাসাহাসি করবে, ভাববে ও'র সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছেন। আরো ভয় হচ্ছিল, সকলকে জানানোর পর শশাঙ্কশেখর যদি এক্ষুনি চলে আসেন। তা হলে উনি আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। সবাই ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে, এমন কি শশাঙ্ক-শেখর নিজেও।

সুধাময়ী তাই অমিতেশবাবুকেই বললেন, আপনি দেখুন না, যদি কলেজের কেউ কিছু বলতে পারে।

ঝুমা নাম আর নম্বর লেখা খাতাখানা এগিয়ে দিলে। অমিতেশবাবু সেটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে গেলেন।

একটার পর একটা ফোন করে গেলেন অমিতেশবাবু। খবর জানার বদলে যেন খবর দিয়ে গেলেন উনি, চেনাজানা সকলকে। সুধাময়ীর অসহ্য লাগছিল। এ প্রান্তের একটা কি দুটো কথা শুনেই বুঝতে পারছিলেন ওরা কেউই কিছু জানে না। কিন্তু তার পরেও সমস্ত খবরটা জানাচ্ছিলেন অমিতেশবাবু· না, মানে ভাবলাম যদি আপনার ওখানে গিযে থাকেন। কাল সন্ধ্যেবেলায বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন...

অসহ্য, অসহ্য। সুধাময়ীর মনে হচ্ছিল একটা কুৎসিত অপবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শশাঙ্কশেখরকে ঘিরে, সুধাময়ীকে ঘিরে।

কিন্তু এ-ছাড়া কিই বা উপায় আছে।

শশাঙ্কশেখর যেখানে যেখানে যেতে পারেন সব জায়গাতেই ফোন করা হল। কিন্তু চেনাজানা সকলের বাড়িতে ফোন নেই। অমিতেশবাবু এসে বসার ঘরে বসলেন, সুধাময়ী ঝুমা রুমা বিভ্রান্ত মুখে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। যেন একমাত্র উনি এখন কোন আশার কথা শোনাতে পারেন।

অমিতেশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, অবশ্য কলেজে গেলে অন্যদের সঙ্গেও দেখা হবে, তারা যদি কিছু বলতে পারে। তারপর হঠাৎ বললেন, থানায় একটা খবর দিলে হত।

—থানায়? সুধাময়ী চমকে উঠলেন। তারপর নিজেই বলে উঠলেন, না না,

এখনই থানাপুলিস করতে হবে না।

অমিতেশবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তা অবশ্য ঠিক, অপেক্ষা করে দেখা যাক, তা ছাড়া অমু ফিরে আসুক। আত্মীয়স্বজন কারো বাড়ি যান নি তো!

অমিতেশবাবু চলে গেলেন। সুধাময়ীও চাইছিলেন উনি চলে যান। একটা রাগ আর অভিমান ভিতরে ভিতরে ছিলই, রাত্রেই একবার খবর নিতে আসেন নি বলে। এখন এসে বলছেন, আমি ভেবেছিলাম, কোথায় আর যাবেন, ইতিমধ্যে নিশ্চয় ফিরে এসেছেন। ভেবে নিলেই যেন দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

অমিতেশবাবু ছিলেন বলেই এতক্ষণ ছোট বোন স্বর্ণকে ফোন করতে পারেন নি। এখন তাকে একবার জিগ্যেস করা দরকার। কিন্তু সুধাময়ীর সাহস হচ্ছিল না। স্বর্ণকে ফোন করতে গেলে হয়তো কেঁদে ফেলবেন।

তাই ঝুমাকে বললেন, ছোটমাসীকে একবার জিগ্যেস কর।

সুধাময়ী কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন উদ্‌গ্রীব হয়ে।

ঝুমা দু-চারটে কথা বলার পর ওপ্রান্ত থেকে স্বর্ণর চমকে ওঠা কণ্ঠস্বর কানে আসতেই রিসিভার কেড়ে নিলেন সুধাময়ী, তারপর কথা বলতে বলতে প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছোটবোনের গলা শোনা গেল, আমরা যাচ্ছি, আমরা যাচ্ছি।

ফোন নামিয়ে রাখলেন সুধাময়ী। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েদের কাছেই উনি যেন আর মুখ তুলে তাকাতে পারবেন না। ওরাও কি ভাবছে কে জানে। অমিতেশবাবু এক ফাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, কিছু হয় নি তো? এই সন্দেহটার জন্যই সুধাময়ী নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে গেছেন। স্বর্ণও প্রথমে বলেছে, হ্যাঁ রে, ঝগড়াঝাঁটি করিস নি তো! শুনে খুব খারাপ লেগেছে। শশাঙ্কশেখরকে ওরা কেউ চেনে নি, কেউ চেনে নি। হঠাৎ সুধাময়ীর মনে হল, হয়তো আমিও চিনতে পারি নি।

তারপর ওঁর হঠাৎ কি মনে হল, আর সমস্ত বুক কেঁপে উঠলো। ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে। কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে ঝুমা বা রুমাকে বলতে পারলেন না। যদি সত্যি হয় তা হলে আর কোনদিন মুখ তুলে তাকাতে পারবেন না। ওঁর কেবলই মন চাইছিল শশাঙ্কশেখরের পড়ার ঘরটিতে ছুটে যেতে। এতক্ষণ অবধি ঐ কথাটা কেন যে ভাবেন নি খুঁজে পেলেন না। ওটাই তো প্রথম দেখা উচিত ছিল। কিন্তু কেউই দেখে নি, কেউ ভাবতেই পারছে না।

ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন সুধাময়ী। কিন্তু ঝুমা রুমার সামনে ওঘরে যেতে মন চাইছিল না। উনি গেলেই ওরাও পিছনে পিছনে আসবে। তারপর ওখানে কি অপেক্ষা করছে উনি জানেন না। ওদের সামনে কি দেখে ফেলবেন এই ভয়। তা হলে ওরাও দেখতে পাবে।

সুধাময়ী ভাবনাটা গোপন করবার চেষ্টা করলেন। ঝুমা রুমা যেন জানতেও না পারে।

অনেকক্ষণ পরে একটু সুযোগ পেলেন। ঝুমা আর রুমা মুখোমুখি বসে আছে। একটু আগেই ওরা ফিসফিস করে কি বলাবলি করছিল। সুধাময়ীকে দেখেই ওরা চুপ করে গেল।

এক সময় চুপি চুপি প্রায় পা টিপে টিপে সুধাময়ী শশাঙ্কশেখরের পড়ার ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলেন। ওঁর পা কাঁপছিল, বুক দুরদুর করছিল। ধীরে ধীরে গিয়ে উনি পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। টেবিলের একপাশে রাশি রাশি

বই, কোন কোনটার পাতা খোলা রয়েছে। যেন এইমাত্র পড়তে পড়তে উঠে গেছেন। টেবিলের ওপর কলমটা খোলা, বন্ধ করতেও ভুলে গেছেন। টেবিল-ক্লথের ওপর নিব লেগে কালি চুঁইয়ে পড়েছে। আর লেখাজোখা নানান কাগজ-পত্র। কাগজগুলো নেড়েচেড়ে একে একে দেখতে লাগলেন সুধাময়ী। ও'র হাত কাঁপছিল থরথর করে। এখুনি হয়তো কিছু একটা দেখতে পাবেন। একটা সাংঘাতিক কোন খবর। নিঃশব্দে কাগজের লেখাগুলো দেখতে লাগলেন। লেখা-গুলো ধীরে ধীরে পড়লেন, বুঝতে পারলেন না। ছবির মত আঁকিবুকি আঁকা কাগজের টুকরোগুলো নেড়েচেড়ে দেখে সরিয়ে রাখলেন। ও'র কেবলই মনে হচ্ছিল আরো কিছু আছে, আরো কিছু আছে। হয়তো দু লাইনের একটা চিঠি। ও'র হাত কাঁপছিল, পা কাঁপছিল। আর তখনই চেয়ারের নীচে চোখ গেল, শশাঙ্কশেখরের চটি জোড়া পায়ের কাছে পড়ে আছে, যেন এক্ষুনি ফিরে আসবেন। কিন্তু হাতলহীন চেয়ারটা দেখে মনে হ'ল যেন একটা শূন্যতার হাহাকার।

প্রত্যেকটি কাগজ সরিয়ে সরিয়ে দেখলেন। একখানা বইয়ের ফাঁকে এক-টুকরো কাগজে কিসব লেখা, সেটাও পড়লেন। নিঃশব্দে, একটুও যাতে শব্দ না হয়, দেরাজ খুললেন। ঝুমা রুমা যেন শুনতে না পায়।

তেমন একখানা চিঠি থাকলে উনি কি করবেন দ্রুত ভাবতে শুরু করলেন। ছিঁড়ে ফেলে দেবেন সকলের অলক্ষ্যে? নাকি চিৎকার করে ডেকে দেখাবেন ঝুমাকে?

সন্দেহটা কেন হঠাৎ উঁকি দিলো উনি নিজেও জানেন না, হয়তো হাস-পাতাল বা অ্যাকসিডেন্টের চিন্তাটা মন থেকে সরাতে চাইছিলেন বলেই। কাল রাত্রেই যতীনবাবুর ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ এই ধরনের একটা দুশ্চিন্তাই ও'কে পেয়ে বসেছিল।

এখন শশাঙ্কশেখরের পড়ার ঘরটিতে ঢুকেই উনি মনে মনে চাইলেন, যদি কারো বাড়ি গিয়ে রাত্তিরে আটকে পড়ে না থাকেন তা হলে যেন অ্যাকসিডেন্টই হয়।

কিন্তু হঠাৎ এ-রকম একটা অদ্ভুত কথা কেনই বা মনে এলো। এবং এলো বলেই উনি কেবলই ভয় পাচ্ছিলেন, হয়তো টেবিলে কিংবা দেরাজে কিংবা কোন বইয়ের ফাঁকে একখানা চিঠি পেয়ে যাবেন। একটা ছোট্ট চিঠি দু লাইনের। কিংবা বেশ বড়োসড়ো একখানা চিঠি।

আসলে এরকম একটা ঘটনা সুধাময়ী কোথায় যেন এই কিছুদিন আগেই শুনেছিলেন। ঠিক মনে পড়লো না।

কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই। একটা লাইনও কিছু লেখা নেই।

বেশ স্বস্তি পেলেন এবং হাসিও পেল। কিন্তু তা হলে কি অ্যাকসিডেন্ট? উদ্বেগে এবং আতঙ্কে উনি হাসতে পারলেন না। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো।

আর তখনই বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একখানা মোটা বইয়ের মধ্যে পেজ-মার্কের মত রাখা এক টুকরো কাগজ দেখে কৌতূহল হল, টেনে বের করলেন। সরু লেখার প্যাডের একখানা কাগজ, চোখ বুলিয়েই আবাব রেখে দিলেন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে। না, চিঠিফিটি কিছু নয়। শুধু পাতার ওপর বার কয়েক একটা নাম শশাঙ্কশেখরেরই হাতে লেখা। বোধহয় কলমের নিব

ঠিক করেছেন, ঠিক মত কালি না এলে সুধাময়ীও ওরকম করেন। তারপর কি মনে হতে আবার দেখলেন কাগজটা। হ্যাঁ, অপর্ণার নাম, সেই পড়াশুনোয় ভালো শশাংকশেখরের প্রিয় ছাত্রী। কিন্তু একটা কাগজের ওপর তার নাম বার বার লেখা কেন। কেন, কেন!

৪

শশাংকশেখর চিরদিনই ওদের কাছে একটা রহস্য ছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি তিনি যে এমন একটা রহস্য রেখে দিয়ে যাবেন ওরা কেউ ভাবতেই পারে নি।

এই ক'দিনে অমুর ওপর দিয়ে যেন একটা প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে।

চারপাশের মানুষদের সংগে তো ওরা কোনদিনই শশাংকশেখরকে মেলাতে পারে নি। আজ টুকরো টুকরো ভাবে মানুষটার কথা মনে পড়ছে, কিন্তু অমু কিছুতেই মেলাতে পারছে না।

শশাংকশেখর এক একদিন বড় অস্থির হয়ে পায়চারি করতেন। ঐটুকুন তো বাড়ি, চারখানা ঘর, একটা বারান্দা আর ঐ সদর দরজার সামনে রোয়াক। কিন্তু তারই মধ্যে এক একদিন বড ছটফট করে বেড়াতেন। মুখের দিকে তাকালে মনে হত কি এক অসহ্য যন্ত্রণা কিংবা বিস্ফোরণ চেপে রেখেছেন।

বারবার এ-ঘর ও-ঘর করছেন, কখনো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এ-সব দিনে উনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন, কিংবা একাগ্রমনে কি যেন চিন্তা করতেন। খেতে বসে এমনিতে কত অনর্গল কথা বলতেন সকলের সংগে, অথচ হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন একেবারে চুপচাপ হয়ে যেতেন। তখন কারো কোন কথার উত্তর দিলেও মনে হত মানুষটা দু'খানা হয়ে গেছে। একটা মানুষ সংসারের মধ্যে, আরেকটা বহু দূরের কোন রহস্যের সন্ধানে ডুবে আছে।

ওঁকে ছটফট করে বেড়াতে দেখে রুমা একদিন হেসে বলে উঠেছিল, স্থির হয়ে বসবে তো এক জায়গায়। বাবা, কি হল কি তোমার?

অনেকক্ষণ পরে যেন প্রশ্নটা গিয়ে পেঁছিলো শশাংকশেখরের কানে। আর কেমন একটা কণ্ট চাপার ভংগিতে দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে বলে উঠলেন, এ যে কি কণ্ট বুঝবি না, বুঝবি না। একটা অংকের উত্তর না মেলার মত। কয়েকটা ব্যঞ্জনবর্ণ আমি পেয়ে গেছি, শুধু যুক্তাক্ষর মেলাতে পারছি না।

মেলাতে পারছি না, মেলাতে পারছি না।

অমুর মনে হচ্ছে, বাবার মতই ওরাও যেন একটা অংক মেলাতে পারছে না। বাবাকে এখন সেই সিন্ধু-সভ্যতার লিপির মতই টুকরো টুকরো ভাবে দেখতে পাচ্ছে কিন্ত সব মিলিয়ে বাবা যেন রহস্যই রয়ে গেছে।

কত জায়গায় তো ও ছুটে বেড়ালো। কিন্তু নেই, নেই, কোথাও নেই।

বুকের মধ্যে উদ্বেগ নিয়ে তো ও ছুটে বেড়িয়েছে। সারা সকাল হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে ও যখন একমুখ হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছিল, তখন মা'র মুখের দিকে ও চোখ তুলে তাকাতে পারে নি।

লক্ষও করে নি ঘরের মধ্যে আর কে কে আছে।

—এত ঘোরাঘুরির দরকার ছিল না, পুলিসে একটা ইন্টিমেশন দিলেই...

অমু চমকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

সুধাময়ীর ফোন পেয়েই স্বর্ণ আর রেবতী চলে এসেছিল। রেবতী, অর্থাৎ অফিসের সকলেই যাকে আর-এম বলে, এমন কি বাইরের অনেকেই ঐ নাম-করণের মধ্যে বেশ একটা সমীহ করার ভাব আছে।

রেবতী বললে, আন্‌নেসেসারি ছোটাছুটি করে কি লাভ। ওরাই খবর নিতো।

তারপর একটু থেমে বললে, ডি সি সাউথ আমার বন্ধু। তাছাড়া বাইরে যদি খোঁজ করতে হয়, আই জি-র সঙ্গেও ফোনে আলাপ আছে।

রেবতী টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করলো।—আমি আর-এম বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা ওদের কাছে ভীষণ দামী হয়ে উঠলো।

অবশ্য ছোটোমেসোকে ওরা খুবই সমীহ করে। একটা বড় কোম্পানির ওপর তলার অফিসার। বিশাল লাক্সারি ফ্ল্যাট, সাজানো গোছানো! কখনো কখনো বন্ধুদের কাছেও অমু গর্ব করে বলেছে।

বাবার সম্পর্কে ওর সে-রকম কোন গর্ব ছিল কিনা অমু জানে না। ও যখন আরো ছোট ছিল, এই পৃথিবী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কোথায় যেন অহঙ্কারীর মত বাবার পরিচয় দিয়েছিল। আর কাউন্টারের ওপাশের লোকটা কেমন বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেছিল, প্রোফেসার! কথাটার মধ্যে তাচ্ছিল্য ছিল, অর্থাৎ প্রোফেসার তো আজকাল হাজার হাজার। কিন্তু তাদের থেকে বাবা যে পৃথক তা অমু বোঝাবে কি করে। আমার বাবা একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, গবেষণার মধ্যে ডুবে থাকেন, হারানো ইতিহাস খুঁজে বের করেন—এ-সব বলে কি খাতির আদায় করা যায়! এর চেয়ে অমিতেশবাবুর মত ইতিহাসের একটা চালু নোটবই লেখককে লোকে বেশি চেনে। মর্যাদা দেয়।

কিংবা, এই আর-এমকে।

সুধাময়ীকে স্বর্ণ একবার ওদের অফিস ক্লাবের থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, রেবতীকে সবাই কি খাতির করছিল, ওর চাকরিটায় খুব সম্মান, বুঝলে!

ছোটবোনের সুখে যেন সুখী হতে চেয়েছিলেন সুধাময়ী।

আর অমুর মনে আছে, শশাঙ্কশেখর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমাদেরও সম্মান আছে, আছে। তোমাদের আর-এমের মত অফিসের এয়ারকণ্ডিশন ঘরের ঘোরানো চেয়ারে নয়, অন্যত্র।

—কোথায়? ছাত্রদের কাছে? সুধাময়ী রসিকতা করে প্রশ্ন করেছিলেন।

একটু থেমে শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, আমার চেয়েও অনেক দামী মানুষ আছেন, বড় বড় ঐতিহাসিক, তাঁদের এই মোটা মোটা বইয়ের ফুটনোটে।

কিন্তু ছোটমেসো ফোন করে বললে, আমি আর-এম বলছি। আর সঙ্গে সঙ্গে অমুর মনে হল, কাউন্টারের ওদিকের লোকটা এখন আর বাবাকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। অমুরাও এখন টেবিলের ওপারে চলে গেছে।

তবু, ছোটমেসো কি করে বললে, আন্‌নেসেসারি ছোটাছুটি করে লাভ নেই।

মা'র মুখের দিকে ও এখন তাকাতে পারছে না। ও তো জানতো, ওখানে বুকের ভিতরে কি দুর্যোগ চলছে। আর ছোটমেসো দিব্যি বললে কিনা, ওরাই খবর নিতো।

যেন বাড়িটা একটা সরকারী অফিস, কিংবা বে-সরকারী কোম্পানি। রিপোর্ট পাঠাতে বলেই নিশ্চিন্ত। এত যে ছোটাছুটি, উদ্বেগ, ভয়, কান্না, এসবের যেন কোন দাম নেই। শুধুই বোকামি।

আর তখনই ছোটমেসো বলে উঠেছিল, একটা ফোটো বের করে নাও, পুলিসকে দিতে হবে।

মানে শশাঙ্কশেখরের ছবি।

ছুটে গিয়ে অ্যালবাম এনে দিয়েছিল রুমা। আর পাতা উল্টে উল্টে ছোট-মেসো বলে উঠেছিল, ব্যস, আর নেই?

ছবির কথা তো ওদের কোনদিন মনে হয় নি। সবই তো অমু ঝুমা রুমার ছবি, ওদের পিকনিকের ছবি। একটা সেই কতকাল আগে সুধাময়ীর সঙ্গে তোলা, তখন শশাঙ্কশেখর যুবক, আর খানকয়েক বিভিন্ন কনফারেন্সের গ্রুপ ফোটো। ছোট্ট একখানাই শুধু শশাঙ্কশেখরের একার। তাও বছর পাঁচেক আগের।

'আমাদের সম্মান কোথায় জানো, এই মোটা মোটা বইয়ের ফুটনোটে।' কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল অমুর। ছোটমেসোর কাছে ওর ভীষণ লজ্জা করছিল এবং অনুশোচনা। আমাদের পরিবারের মধ্যেও তো আমরা তোমাকে শুধু একটা ফুটনোট করে রেখে দিয়েছিলাম। এই সমাজের কাছেও তুমি তাই ছিলে।

মনে পড়লো, বাড়িওয়ালা যতীনবাবু একদিন বলেছিলেন, বেশ তোষামোদের ভঙ্গিতেই, আপনারা হলেন সমাজের মাথা।

কথাগুলো নেহাতই বানানো। এবং তাও বাবার আসল পরিচয়ের জন্যে নয়। কোন একটা ছেলেকে কলেজে ভর্তি করার দরকার হয়েছিল বলে। আশ্চর্য, কলেজে ভর্তি করে দিতে পারলে তাকেও লোকে খাতির করে। অর্থাৎ পদ-মর্যাদাকে। চাকরির জগতের একটা উঁচু চেয়ার পেলে তবেই তোমার পাণ্ডিত্যের দাম। কিন্তু শশাঙ্কশেখরের পরিচয় যে তার চেয়েও অনেক বড়ো সে-খবর কেউ রাখতে চায় না। তার কোন সম্মানও নেই। কারণ, মানুষটা চুপচাপ ঘরের কোণে বসে সারা জীবন ধরে এমন কিছু খুঁজে বের করতে চেয়েছিল যা নিয়ে ভবিষ্যতের মানুষ গর্ব করবে।

ভুল, ভুল, এ-সবের কোন দামই নেই এ সমাজে।

এখন বাবার কথা মনে পড়লেই অমুর বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট হয়। সমস্ত বাড়িটাকে এক অসীম শূন্যতায় ভরে দিয়ে যেন বাবা নিজের মূল্যটা বুঝিয়ে দিতে চাইছে।

শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, সিন্ধুসভ্যতা লিখতে জানতো, জানিস অমু, আর আর্য একটা ট্রাইব, তারা যখন এলো, তখন লিখতে জানে না। তাই শ্রুতি আর স্মৃতির ওপর নির্ভর করলো। এমন কি লিখিত শাস্ত্র পড়াও বললে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ একে অন্যের দামী জিনিসগুলো চিনে নিতে পারে নি। বুঝলি অমু, এটাই হল সভ্যতার ট্র্যাজেডি।

বাবা প্রায়ই বলতো, কোনটা দামী আর কোনটা দামী নয় আজ আর কেউ চিনতে পারছে না। ভাবছে, এটাই বুঝি সভ্যতা।

একদিন বলেছিল, মানুষ তো এই প্রথম সভ্য হয়ে ওঠে নি। অ্যাসিরিয়া, ঈজীপ্ট, ব্যাবিলন, এক একটা দেশ এক এক সময় সভ্যতার শিখরে উঠেছে এবং

ধ্বংস হয়ে গেছে। কেন? কেন? কারণ, সভ্যতার বাইরের চেহারাটাই শেষে সমাজের চোখে বড় হয়ে উঠেছিল। তার মূল শক্তিটা কোথায় তা জানতেও চায় নি। একটা শহর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েও কোন সভ্যতাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, তার ধ্বংসের বীজ তার নিজের মধ্যেই থাকে।

বাবার কথা শুনে রুমা শুধু হাসতো। অমু ঝুমাও তখন স্পষ্ট বুঝতে পারতো না।

আসলে শশাঙ্কশেখর সংসারের মধ্যে থেকেও একেবারেই বাইরের মানুষ ছিলেন। ওঁর কথা তাই কেউই বুঝতে পারতো না।

অমু তো বাবাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতো। তবু একদিন জিগ্যেস করেই ফেলেছিল, ধরো ওগুলো পড়েই ফেললে, তাতে কি আর জানা যাবে?

শশাঙ্কশেখর হেসেছিলেন।—সম্রাট অশোকের কথা তো পড়েছিস, সেদিন অবধি তাঁর নামও আমরা জানতাম না, ওটা ছিল অন্ধকার যুগ। প্রিন্সেপ যেদিন ব্রাহ্মী লিপি পড়ে ফেললেন, কয়েকটা শব্দ, বিজয়মিতস, অত্রিদাম, বীরদাম, সে-দিন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কি ঘটে গিয়েছিল ভাবতে পারবি না। প্রিয়দর্শী অশোকের কথা তো জানতে পারলাম আমরা, সমস্ত ইতিহাস, ঐ প্রিন্সেপের জন্যেই।

রুমা দু'হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল, প্লীজ বাবা, চণ্ডাশোক আর ধর্মাশোক মুখস্থ করতে করতে সম্রাট অশোককেই গালাগাল দিয়েছি। তুমি ঐসব পড়ে ফেলে আর কিছু আবিষ্কার করে বসো না। অত মুখস্থ করতে পারবো না।

সবাই শব্দ করে হেসে উঠেছিল সেদিন।

আর অমু বলেছিল, আমাদের এখনকার সভ্যতা কি আরো বড় নয়?

শশাঙ্কশেখর হেসেছিলেন। বলেছিলেন, সভ্যতা মানে আধুনিক উপকরণ নয়। জেট প্লেন কিংবা তেলের খনি নয়।

ছেলেবেলায় টুকরো টুকরো ছবি অমুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক একসময়। আর তখন এই দুটো মানুষকে ও একসঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে না। মনে হয় দুর্বোধ্য একটা রহস্য।

ছেলেবেলার একটা ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

ছোট্ট অমু ছোট্ট একখানা ক্রিকেট ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্ধুরা রাগ করে চলে গেছে, ওর সঙ্গে কেউ খেলবে না, খেলবে না।

ওর কান্না দেখে শশাঙ্কশেখর বলছেন, কাঁদছিস কেন, চল আমি খেলবো তোর সঙ্গে।

সেই আগের পাড়ার নির্জন রাস্তার ধারের ঘাসে ঢাকা ফুটপাথে ছোট্ট ক্রিকেট ব্যাটখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অমু।

আর শশাঙ্কশেখর হাসতে হাসতে বল্ করছেন।

লাল টুকটুকে একটা রবারের বল। ব্যাটখানা শক্ত করে ধরে ও বলটাকে এখানে ওখানে পাঠাচ্ছে আর শশাঙ্কশেখর ছুটতে ছুটতে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনছেন। আবার বল্ করছেন।

অমু দেখতে পাচ্ছে বাবা ক্লান্ত, বাবা হাঁপাচ্ছে। দৌড়তে পারছে না আর। ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে বল কুড়িয়ে আনছে।

শশাঙ্কশেখর বলছেন, আর পারছি না অমু। আমি কি এত ছুটতে পারি।

অমু তখনো বলছে, না বাবা, আরো দুবার, আরো দু'বার।

বাবা হাসিমুখে ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে আবার বল কুড়িয়ে আনতে যাচ্ছে।

অমুর সেসব দিনের কথা মনে পড়ছে। অমু ভাবলো, বাবার মধ্যে এত যে স্নেহ ভালবাসা, সেই মানুষটা কি সত্যি ওদের ছেড়ে চলে যেতে পারে। না কি দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা আরো সাংঘাতিক কিছু!

অমু বুঝতে পারে না।

কি হতে পারে, কোথায় যেতে পারেন শশাঙ্কশেখর!

একটা মানুষ সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে গেল, একটু ঘুরে আসছি!

অমু যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, বাবা বলছে, ডেক-চেয়ারটা দিয়ে যা অমু।

তারপর কেমন ছেলেমানুষি হাসি হেসে বলছে, বৃষ্টি দেখবো।

অমুর একবার মনে হল, আমরা তো কেউ কিছু জানি না, কেউই বাড়িতে ছিলাম না। মার কথাগুলোই বিশ্বাস করছি। কিন্তু এমন কিছু হয় নি তো, যা মা বলতে পারছে না!

অমুর খুব একটা মনে পড়ে না, তবু কখনো কখনো তো মার সঙ্গে বাবার মনোমালিন্য হয়েছে। মা স্পষ্ট করে না বললেও ওরা টের পেয়েছে। এক এক-সময় মা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছে বাবার ওপর। একটাই অভিযোগ, লোকটা সংসারের দিকে তাকায় না।

অমু তো জানে না, ঝুমা রুমাও কেউ জানে না। সেই বৃষ্টির দিনে দুপুরে মার সঙ্গে কোন তর্কবিতর্ক কিংবা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কিনা। মা এক এক-সময় রেগে গিয়ে এমন এক একটা কথা বলে বসতো, বাবার মুখ দেখে ওরা বুঝতে পারতো বাবা খুব আঘাত পেয়েছে।

সে-সব দিনে মাকে ওদের একটুও ভাল লাগতো না।

অমু ভাবতে চেষ্টা করলো, সেরকমই কোন অভিমান নিয়ে বাবা চলে গেছে কিনা। পরক্ষণেই মনে হল অসম্ভব, অসম্ভব। তেমন কিছু হলে কি মা সেকথা গোপন রাখতো। রাখতে পারতো!

অমুর নিজেরই যেন হঠাৎ খুব খাবাপ লাগলো। ছি ছি, অমুও কি একটা বাইরের লোক হয়ে গেছে নাকি!

ছোটমেসোর সঙ্গে সেদিনই ওরা পুলিসে খবর দিতে গিয়েছিল। অমু আর ঝুমা।

আর সেই ডি সি ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলেছিলেন, দাম্পত্যকলহ নয় তো?

শুনে ভীষণ খারাপ লেগেছিল অমুর। ও তো ভেবেছিল, পুলিসে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহর তোলপাড় করে শশাঙ্কশেখরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে ওরা।

তার বদলে অমুর নাম আর টেলিফোন নম্বরটা লিখে নিয়ে সেই ডি সি ভদ্রলোক বলেছিলেন, জরুরী কোন খবর থাকলে টেলিফোনেই জানিয়ে দেবো।

আর তারপর একদিন সত্যি সত্যি একটা টেলিফোন এলো।

অমু কোথায় যেন গিয়েছিল, ফিরে আসতেই ঝুমা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে বললে, কোথায় গিয়েছিলি! সেই ডি সি ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, তোকে একবার যেতে বলেছেন, খুব জরুরী দরকার।

৫

একখানা বিশাল আলো-ঝলমল ঘরের সব আশা-ভরসার আলোগুলো কে যেন একটার পর একটা নিভিয়ে দিল। বাড়িটার ওপর ধীরে ধীরে নেমে এলো প্রচন্ড অন্ধকার।

শশাঙ্কশেখর আর ফিরে এলেন না। শুধু ও'র পড়ার ঘরখানা তেমনি পড়ে রইলো একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে।

পর পর ক'টা দিন ও'রা সকলেই ছুটে বেড়িয়েছেন। একটা রহস্যের আলো বার বার আশা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। সুধাময়ী এখন একটা বিধ্বস্ত মানুষ, কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারেন না। যেন সমস্ত অপরাধ সুধাময়ীর।

কথাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে, আর বুকের মধ্যে তোলপাড়।—একটা টাকা দাও তো।

শুধু একটা টাকা নিয়ে কত দূর যেতে পারে মানুষ, কোথায় যেতে পারে!

প্রায় এইরকমই একটা কথা যেন শশাঙ্কশেখর একদিন বলেছিলেন। কাকে বলেছিলেন ঠিক মনে পড়লো না। বলেছিলেন, টাকাপয়সার সভ্যতা আর কত দূর যেতে পারে, কোথায় যেতে পারে?

ও'র সব কথা উনি সব সময় বুঝতে পারতেন না। বইয়ের পাতার মধ্যে তিনি কি খ‍ুঁজতেন কে জানে। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, মানুষ তো জন্মে থেকে শুধু খুঁজে বেড়িয়েছে, খুঁজে বেড়ানোই তার কাজ।

অথচ যারা ঈশ্বর খুঁজে বেড়ায় তাদের তিনি বিদ্রূপ করতেন। ভগবান-টগবানে তাঁর একটুও বিশ্বাস ছিল না। মনে কোন আস্থা ছিল না।

ও'র খুব প্রিয় ছাত্র ছিল অতনু ছেলেটি। খবর পেয়ে পরের দিনই এসে-ছিল, কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠেছিল। কান্নার গলায় বলে উঠে-ছিল, মাসীমা, আমার আর কেউ রইলো না, কে আমাকে রাস্তা দেখাবে।

অমিতেশবাবু ছিলেন, উনি হঠাৎ বলে উঠেছেন, কখনো কি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার কথা বলতেন!

—অসম্ভব, অসম্ভব! অতনু প্রতিবাদ করেছে।

সুধাময়ীও মনে মনে সায় দিয়েছেন তার কথায়। অথচ সকলেই ঘুরে ফিরে ঐ একটা কথাই ভেবে বসে। যেন সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া মানুষের আর কোথাও যাবার নেই। যেন ঈশ্বর ছাড়া মানুষের আর কিছু খোঁজার নেই। স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়েই তো আমার সব কিছু, তাদের সুখের জন্যেই তো আমার পুজোআর্চা। সুধাময়ী মনে মনে বলেন, আমার ভগবানে বিশ্বাস সংসারকে আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরার জন্যে। 'যে সব ছাড়তে পারে ভগবানকেই বা তার কি দরকার', শশাঙ্কশেখর একদিন বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন ঠিক মনে পড়লো না।

অতনু হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠেছিল, ও'কে নিয়ে আমাদের কত গর্ব ছিল।

গর্ব, গর্ব। কথাটা সুধাময়ীর কানের চারপাশে ঘুরছিল। ও'র নিজেরও এক সময় গর্ব ছিল, বিয়ের পর পর।

কিন্তু সেই পুরোনো বাড়িতে, সরু গলির মধ্যে ছোট্ট ঘরখানায় গিয়ে নতুন সংসার পাতার সঙ্গে সঙ্গে ও'র সব গর্ব মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল

এ-সব মিথ্যা অহঙ্কার। এই সমাজে যারা গর্বে মাথা উঁচু করে আছে তাদের কাছে নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল। শশাঙ্কশেখরের কাছে ও'র সে জন্যেই একটা গোপন অভিমান ছিল। নিজের কাছে একটু ছোট হতে পারলেই তো অনেকের কাছে বড় হওয়া যায়। কেউ তখন আর খোঁজও রাখে না সিঁড়ির ধাপ-গুলো কি দিয়ে তৈরি। তার ধাপগুলো যে নিজেরই আত্মসম্মান বেচে দিয়ে বানাতে হয়েছে সে-খবর কেউ জানতেও পারে না। তা হলে আর দোষ কি।

না, এসব কথা সুধাময়ী কোনদিন ভাবেন নি। এগুলো ও'র অভিমান, সমাজের বিরুদ্ধে, এই কালের বিরুদ্ধে।

অতনু এসে বলে গেছে, ও'র জন্যে আমাদের কত গর্ব ছিল।

শশাঙ্কশেখর একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, অমুও মানুষ হল না...

সুধাময়ীর চোখের সামনে যেন হঠাৎ বারো বছরের অমু এসে দাঁড়ালো।

পরনে নীল হাফপ্যান্ট, সার্টের বোতাম খোলা, কিশোর মুখখানা মাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সুধাময়ী বললেন, দেখি দেখি। বলে অমুর হাত থেকে ওর স্কুলের প্রগ্রেস রিপোর্টখানা নিয়ে দেখলেন।

ও'র মুখ বেদনায় কঠিন হয়ে উঠলো।

অমু তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর কষ্ট দেখে শশাঙ্কশেখরের ওপরই উনি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন।

প্রগ্রেস রিপোর্টখানা দেখে শশাঙ্কশেখর বলে উঠলেন, সে কি রে, তোর জন্যে আমি যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।

সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়েছিলেন সুধাময়ী।—স্বার্থপর, স্বার্থপর, তুমি শুধু নিজের মুখ দেখানোর কথাই ভাবছো। ওর কষ্টটা ভাবছো না। ওর ভবিষ্যৎ ভাবছো না।

সেদিন কি হয়েছিল সুধাময়ী নিজেও জানেন না, নিজেকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলেন না।

রুক্ষ গলায় বলে উঠেছিলেন, ছেলেমেয়েদের ওপর, সংসারের ওপর তোমার একটুও ভালবাসা নেই। যত মাটি আর পাথরের জঞ্জাল এনে জড়ো করেছো, ওগুলো পড়ে ফেলতে পারলেই যেন সারা দেশ তোমার পায়ে এসে লুটোবে।

কিছুতেই যেন থামতে পারছিলেন না সুধাময়ী।

আর শশাঙ্কশেখর কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেবলই বলছেন, ভালবাসা নেই! ভালবাসা নেই! ও'র তখন চোখে জল এসে গেছে।

—না, নেই নেই। ভালবাসা থাকলে কর্তব্য থাকে, দায়িত্ব থাকে। তুমি তো নিজের নেশায় ডুবে আছো। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখার সময় নেই তোমার। অথচ একটা প্রাইভেট টিউটর রাখারও যোগ্যতা নেই।

সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে এখন বড় দুঃখ হয়, অনুশোচনা হয়। শশাঙ্কশেখরের সেই অল্প বেতনের দিনগুলোর অসহায় মুখখানা মনে পড়লে বড় কষ্ট হয় সুধাময়ীর।

সেদিন রাত্রে বিছানায় ছটফট করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো, মানুষের শুধু একটাই জীবন।

সুধাময়ী সেদিন একটাও কথা বলতে পারেন নি। শুধু নিঃশব্দে শশাঙ্ক-

শেখরের বুকের ওপর হাতখানা রেখেছিলেন।

শুধু একটাই জীবন! কি বলতে চেয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর? একটা জীবন দিয়ে জীবনের সব দায়িত্ব পালন করা যায় না, সে-কথাই!

আজকাল সুযোগ পেলেই উনি স্বামীর পড়ার ঘরটিতে এসে ঢোকেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখেন, তন্ন তন্ন করে খোঁজেন। কি খোঁজেন, কি খুঁজে পেতে চান তাও তাঁর কাছে অস্পষ্ট। শুধু মনে হয় এখান থেকেই হয়তো সেই রহস্যের চাবিটা পাওয়া যাবে।

এক সময় এই ঘরখানার সঙ্গে বাকী ঘরগুলোর কোন মিল ছিল না। দেয়ালের গায়ে ছিল জং ধরা লোহার র‍্যাক, সুধাময়ী জোর করে সেগুলোকে বিদায় দিয়েছিলেন। তারপর দেয়াল জুড়ে ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের মডার্ণ ডিজাইনের খোপ খোপ বুক-শেল্ফ বানিয়ে নিয়ে ঘরের চেহারাখানা বদলে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে এক একটা খোপে অসংখ্য পুরোনো বই, শশাঙ্কশেখর যেগুলোকে মনে করতেন দুর্মূল্য। এখান ওখান থেকে জোগাড় করা অসংখ্য ভাঙা মূর্তি, কয়েকটা নাকি উনি নিজেই মাটি ছেঁচে তুলে এনেছিলেন। সামান্য কিছু প্রাচীন মুদ্রা। আর সেই পোড়া-মাটির সীল। একটিই। সুধাময়ীর মনে পড়ে যায়, কি উল্লাস শশাঙ্কশেখরের এই পোড়ামাটির সীলটা পেয়ে। রাজস্থানের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে গেছেন কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে। ফিরে এলেন এক রাশ আনন্দকে সঙ্গী করে।

—জানো সুধা, একজন চাষীর দাওয়ায় বসে গল্প করছি, মাটির দেয়ালে ঝিনুক কড়ি আরো কি সব দিয়ে একটা নক্সা বানানো আছে, আর তার মধ্যে দেখি এই ছোট্ট টেরাকোটা। লক্ষ করে দেখি কি, কীসব প্রাচীন অক্ষর...

সুধাময়ীর চোখের সামনে সেই আনন্দের দিনটা যেন নতুন করে ফুটে উঠলো। স্বামীর কথাগুলো সেদিন শুনতে ভাল লেগেছিল। বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই চাষীকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে সামান্য একটা টাকার বিনিময়ে দেয়াল থেকে খুলে নিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর। আর সেটাই নিয়ে এসে সুধাময়ীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, দ্যাখো, দ্যাখো, দারুণ দামী জিনিস, বাইলিংগুয়াল, দেখছো তো, দু পাশে দু রকম অক্ষর, মানে দু রকম লিপি। কে জানে এর থেকেই হাজার হাজার বছরের আগের ইতিহাস জানা যাবে কিনা, কিংবা জানা ইতিহাস হয়তো উল্টে যাবে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে শশাঙ্কশেখর কেমন বিষণ্নভাবে বলেছিলেন, শুধু দামী জিনিস থাকলেই তো হয় না, দামী জিনিস চিনে নেবার লোকও দরকার। এবং এক সময় হেসে উঠে বলেছিলেন, ঐ গ্রাম্য চাষীদের কাছে ঝিনুক আর কড়ি আর এই পোড়া-মাটির সীল সবই এক দাম। তারপর হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে যেন নিজেকেই বলেছিলেন, আমাদের সমাজেও তো তাই।

সেদিন খেতে বসে উত্তেজিতভাবে সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, জানিস ঝুমা, নেপোলিয়ান হেরে পালাচ্ছে ঈজিপ্ট থেকে, তবু একটা বিশাল পাথরের লিপি নিয়ে গিয়েছিল, এমনি বাইলিংগুয়াল। রোসেটা স্টোন। টমাস ইয়াং যেদিন 'টলেমি' নামটা পড়ে ফেললো, মিশরের একটা অন্ধকার যুগ বেরিয়ে এলো। এর মধ্যেও আছে হয়তো তেমনি সিন্ধু লিপির চাবিকাঠি।

সেদিন ভাবতে পারেন নি কি তার মূল্য, কিন্তু আজ এতদিন বাদে সেই পোড়া-মাটির টুকরোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। মনে করতে চাইলেন

সেদিন উচ্ছ্বাসের বশে আরো কি কি বলেছিলেন শশাংকশেখর।

তারপর একবার ভাবলেন, আচ্ছা এমন কি হতে পারে, কাউকে কিছু না জানিয়ে শশাংকশেখর সে-রকম কোন জায়গায় চলে গেছেন, হঠাৎ একদিন এসে হাজির হবেন কোন একটা প্রাচীন মুদ্রা কিংবা প্রাচীনতর শিলালিপি নিয়ে।

কিন্তু সুধাময়ী জানেন, তাঁর স্বামী এভাবে চলে যাবার মানুষ ছিলেন না। না জানিয়ে কেনই বা যাবেন, সুধাময়ী তো কখনো বাধা দেন নি।

শশাংকশেখরের মধ্যে বোধহয় একটা বাউল ভবঘুরে মানুষ ছিল। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তেন। কোথাও কিছু একটা খবর পেলেই। একবার একজন মারাঠী ছাত্র বললে, তাদের গ্রামে একটা মাটির ঢিবি আছে, ভাঙাচোরা কি সব পাথর উঁকি দিচ্ছে। অমনি ছুটলেন তার সংগে। ঝুমা বলেছিল, বাবা যেও না। ও তখন ছোট। স্কুলে পড়ে। বললে, স্কুলে সবারই বার্থ-ডে পার্টি হয়। আমার কেন হবে না।

সুধাময়ী বলেছিলেন, বেশ তো, তোরও এবার জন্মদিন হবে।

আর ঝুমা আবদারের গলায় বলেছিল, বাবা, তুমি যেও না, আমার জন্মদিনে তোমাকে থাকতেই হবে।

শশাংকশেখর হেসে বলেছিলেন, ফিরবো রে ফিরবো, ঠিক দিনেই ফিরবো।

কিন্তু, ফিরতে পারেন নি।

ঝুমার কি রাগ! আর সুধাময়ী বলেছিলেন, তোর বিয়ের দিনটাই হয়তো ওর মনে থাকবে না, এ তো শুধু জন্মদিন।

শশাংকশেখর ঝুমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, কি যে বলো। আমি যেখানেই যাই, যতদূরেই যাই ওর বিয়েতে আমি কি না এসে পারি। আমি না এলে সম্প্রদান করবে কে!

সেইসব দিনের কথা এখন মনে পড়ে যায়। দেয়ালের বিশাল বুক-শেলফের খোপে খোপে রাখা ভাঙা মূর্তিগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে গেলেন সুধাময়ী। যেন শশাংকশেখরের মুখের ওপর হাত বোলাচ্ছেন, তাঁর চুলে বিলি কাটছেন।

তারপর কি মনে হতেই সেই কাগজের টুকরোটা বইয়ের ফাঁকে লুকিয়ে রাখার জায়গা থেকে বের করে দেখলেন। রাফ-প্যাড থেকে ছিঁড়ে নেওয়া এক টুকরো কাগজ, শশাংকশেখর তার ওপব তাঁর প্রিয় ছাত্রীর নামটি তিন-চার বার লিখেছেন, তারপর কখন অন্যমনস্ক ভাবে ওটাকেই পেজ-মার্ক বানিয়েছেন। কিন্তু কেন, কেন? যেদিন প্রথম ওটা খুঁজে পেলেন, সুধাময়ীর কিছুই মনে হয় নি! তখন তো মনের মধ্যে শুধু উদ্বেগ আর আশংকা। দুর্ঘটনা কিংবা মৃত্যুর।

তাছাড়া, এ ধরনের কোন কথা তো ওঁর মাথায় আসেই নি। বিশেষ করে শশাংকশেখরের মত মানুষ সম্পর্কে কোন সন্দেহই ছিল না সুধাময়ীর। এতকাল একসংগে একই ছাদের নীচে কাটিয়ে এসেছেন, এমন একটা অসম্ভব কথা উনি ভাববেন কি করে। এর আগেও তো দু-একজন ছাত্রীকে আসতে দেখেছেন। তাদের সকলের চোখে শুধু শ্রদ্ধা দেখেছেন উনি। বরং খুশিই হয়েছেন। শশাংকশেখরকে কেউ কোন শ্রদ্ধা দেখালে, সম্মান করলে ওঁর খুব ভাল লাগতো। মনে মনে যেন সেই শ্রদ্ধার ভাগ পেতেন সুধাময়ী নিজেও।

সুধাময়ীর মনে পড়লো, সেদিন রেবতীর সংগে অমু আর ঝুমা বেরিয়ে যাওয়ার পর ওঁর কান্না পাচ্ছিল, নিজেকে বড় অসহায় লাগছিল, আর মাঝে

মাঝেই উনি সেই বৃষ্টির দিনের কথাগুলো স্বর্ণকে বলছিলেন। ও'র ছোট বোন স্বর্ণ, ওকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবেন।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটু ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গেল, তারপর কি যে হতে পারে...

আর তখনই স্বর্ণ দুম্‌ করে বলে বসলো, দিদি, কখনো কিছু বেচাল দেখিস নি তো! তারপর নিজেই বোধহয় বুঝেছে, কথাটা তোলা উচিত হয় নি, তাই বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছে, অসম্ভব, ঐ মানুষের পক্ষে ভাবা যায় নাকি।

আসলে স্বর্ণর তো কোন দোষ নেই। ও রেবতীকেই জানে, পার্টিতে যায়, একবার সুধাময়ীর সামনেই ওর স্টেনো মেয়েটিকে নিয়ে স্বর্ণ রসিকতা করেছিল। বলেছিল, পুরুষ মানুষদের আমার সব জানা আছে। কথাটা অবশ্য ঠাট্টাই। না কি স্বর্ণর মনে সত্যি কোন ভয় আছে, সুধাময়ী জানেন না।

কিন্তু ওর কথাটা ও'র মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

'দিদি, কখনো কিছু বেচাল দেখিস নি তো।'

সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাগজের টুকরোটা মনে পড়ে গিয়েছিল। স্বর্ণকে অবশ্য সে-কথা বলতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, কি যে বলিস তুই। কিন্তু কথাটার মধ্যে বোধহয় জোর ছিল না।

কারণ স্বামীর ওপর বিশ্বাস থাকলেও, অপর্ণার ওপর বিশ্বাস ছিল না। সেজন্যেই, কিংবা ঐ বয়সের ঐ রূপ-যৌবনকেই উনি পছন্দ করতে পারতেন না।

ও'র কান্না এসে গিয়েছিল দু' চোখ ভরে। এভাবে একটা পাতার ওপর তার নাম তুমি বার বার লিখেছো কেন? তুমি এভাবে আমাকে অপমান করতে পারো?

সুধাময়ী সেদিন ভয় পেয়েছিলেন, ছেলেমেয়ের কারো চোখে পড়ে যেতে পারে। অমু কিংবা ঝুমা, ওদের বয়স অল্প। ওরা এখন সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখে। বলা যায় না, ওরা সাংঘাতিক কিছু ভেবে বসতে পারে। তা হলে আর ছেলেমেয়ের কাছেই উনি মুখ দেখাতে পারবেন না। শুধু শশাঙ্কশেখর এভাবে চলে গিয়েই তো ও'কে ছোট করে দিয়ে গেছেন।

সুধাময়ী একবার ভেবেছিলেন, কাগজটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দেবেন। এখন মনে পড়ছে না, সম্ভবত সেটা রাগে, কিংবা ঈর্ষার জ্বালায়।

ঐ ছাত্রীটি প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এলো, অপর্ণা, সেদিন ওকে সুধাময়ীর খুব ভাল লেগেছিল। হাসতে হাসতে আলাপ করিয়ে দিয়ে শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, এমন সীরিয়াস স্টুডেন্ট খুব কম দেখেছি। ডক্টরেট করছে।

সুধাময়ীর খুব ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। বেশবাস, ব্যবহার, কথাবার্তা—কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিল।

পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি সুঠাম চেহারার মেয়ে। দিব্যি সুশ্রী। সুধাময়ীর তো সুন্দরীই মনে হয়েছিল। তারপর এক সময় ভেবেছিলেন, তাঁর স্বামীর কাছে বাইরের এই সৌন্দর্যের কোন দাম নেই, তার কাছে মেয়েটির একটিই পরিচয়—সীরিয়াস স্টুডেন্ট, ডক্টরেট করছে।

মাঝে মাঝেই মেয়েটি আসা-যাওয়া করতো, কখনো কখনো সুধাময়ীর ঈষৎ রাগ যে হয় নি তা নয়। উনি ঠিক পছন্দ করতেন না, মুখ ফুটে বলতেও

পারতেন না।

সেই বিশ্বাস আমার একটুও নড়ে নি, তুমি ফিরে এসে দেখে যাও, সুধাময়ী যেন মনে মনে বলেছিলেন। তারপর কি ভেবে, কাগজটা সযত্নে বইয়ের সারির পিছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আলমারিতে রাখতে সাহস পান নি, অমু কিংবা ঝুমা কখনো দেখে ফেলবে।

সেই কাগজখানাই বের করে দেখলেন, আবার লুকিয়ে রাখলেন। নিজের মনকে বোঝালেন, একখানা কাগজের ওপর একটি ছাত্রীর নাম বার বার লিখলেই কি সেটা ভালবাসা হয়ে যায়। হয়তো বইয়ের ঐ জায়গাটা অপর্ণাকে দেখাতে চেয়েছিলো, অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে, তাই অন্যমনস্কভাবে নামটা লিখে গেছে। আরেকখানা বইয়ের ফাঁকে তো অতনুর নামও দেখেছেন সুধাময়ী।

কিন্তু খবর জানতে পেরে এত লোক এলো, সমবেদনা জানালো, কৌতূহল দেখালো, কেউ কেউ ও'কে উপদেশ দিয়ে গেল টাকাকড়ির ব্যাপারে, কিন্তু অপর্ণা এলো না কেন একদিনও।

সুধাময়ীর মনে পড়লো পরের দিন সকালে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠেছিল, ঝুমা বিরক্তির সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে বলেছিল, মেয়েটা নিজের পরিচয়টা বলবে তো। ওটাকে তখন উনি অতটা গুরুত্ব দেন নি। এখন ভাবলেন, মেয়েটি কে হতে পারে। আর তো ফোনও করে নি, আসেও নি। অপর্ণা, অপর্ণাই কি ফোন করেছিল? তা হলে নাম বলে নি কেন। এত গোপন করার কি ছিল।

এই অপর্ণা মেয়েটি ও'র মনে একটা প্রশ্নের কাঁটা হয়ে আছে। ঐ কাঁটায় তাই ব্যথা নেই, কিন্তু খিচখিচ করে লাগে, মনে পড়িয়ে দেয়।

এক একবার ইচ্ছে হয়েছে অপর্ণাকে জিগ্যেস করে দেখেন, সে কিছু জানে কিনা। কিন্তু তার ঠিকানাও জানেন না। আর এত লোক আসা-যাওয়া করলো, কারো কাছে মুখ ফুটে ওর নামটা তুলতেও পারলেন না, ঠিকানা জিগ্যেস করা তো দূরের কথা। ও'র কেবলই মনে হয়েছে ঐ নামটা উচ্চারণ করলেই শশাঙ্কশেখরও ছোট হয়ে যাবেন।

একমাত্র স্বর্ণর সঙ্গেই শশাঙ্কশেখরের তবু কিছুটা সরস রসিকতার সম্পর্ক ছিল। তাও রসিকতা যা-কিছু, তা স্বর্ণই করতো।

স্বর্ণদের সংসারটা বেশ গুছনো ছিমছাম। দেখলেই বোঝা যায় টাকার অভাব নেই। ভালো পরিচ্ছন্ন পাড়ার লাক্সারি ফ্ল্যাট, একেবারে হাল-ফ্যাশনের আসবাব, দামী দামী পর্দা, বিছানার চাদর, ঢাউস টি ভি, আলমারি-সাইজের ফ্রীজ, ফ্রীজের মধ্যে ঠান্ডা পানি, স্কচের বোতল।

গলির মধ্যের সেই কম-ভাড়ার বাড়ি থেকে প্রথম যখন বড় রাস্তার ধারের এই বাড়তি পরিসরের বাড়িটায় উঠে এলেন, শশাঙ্কশেখরের তখন এক ধাপ উন্নতি হয়েছে, সুধাময়ী বাড়িটাকে একটু ছিমছাম করে তুলতে চেয়েছিলেন, পুরনো মান্ধাতা আমলের আসবাব বিদায় দিয়ে ঝকঝকে নতুন আসবাবপত্র আনছিলেন একে একে।

তাই শশাঙ্কশেখর একদিন সুধাময়ীকে হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, তুমি এই বুড়ো ঘোড়াকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে নামিয়ে দিতে চাইছো? রেবতীর মত তেজী জোয়ান ঘোড়ার সঙ্গে আমি কখনো দৌড়তে পারি!

সুধাময়ী খুব রেগে গিয়েছিলেন। কারণ উনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন

কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে। আসলে সুধাময়ী যেন স্বর্ণর সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছে, তার বাড়িঘর দেখে নিজেদেরও তার সমকক্ষ করে তুলতে চাইছে। অথচ সুধাময়ী স্বর্ণর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না। উনি শুধু আশপাশের পাঁচজনের মতই হতে চেয়েছিলেন, একটু সাজানোগোছানো সংসার, একটু রুচিসম্মত।

অতনু বলেছিল, ও'র জন্যে আমাদের কত গর্ব ছিল!

কিন্তু আজকের দিনে চারপাশের মানুষ তো জানে না, কোনটা গর্বের, কোনটা সত্যি সত্যি দামী। সুধাময়ী সে-জন্যেই তাদের চোখেও শশাঙ্কশেখরকে দামী করে তুলতে চেয়েছিলেন। সুধাময়ীর তো তাই মনে হয়, নাকি নিজেও বুঝতে পারেন নি কোনটার দাম বেশী।

স্বর্ণর কাছে অনুযোগ করে বলেছিলেন, ও তো হাজার বছর আগের খবর জানতেই ব্যস্ত, তাই কিছুই বদলাতে দেবে না। বাড়িটাকে আস্তাকুঁড় করে রাখতে পারলেই ওর শান্তি।

স্বর্ণ হেসে উঠে বলেছিল, সত্যি জামাইবাবু, সীল খুঁজে খুঁজে আপনি একেবারে ফসিল হয়ে গেছেন।

রেবতী পাশেই বসেছিল, সাহেবী পোশাকে। স্বর্ণর কথা শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল, ওয়েল সেড্।

শশাঙ্কশেখর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বলেছিলেন, তোমার দিদি তো তোমার মত একটা গোল্ড-মাইনকে বিয়ে করে নি।

স্বর্ণ বলে উঠেছে, সে কী, এত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সোনার খনির সন্ধান পেলেন না!

ঠিক তখনই ঝুমা বলেছে, ছোটমাসী, গুপ্তধন আজকাল মাটির তলায় থাকে না, থাকে লকারে। ঝুমা অবশ্য কিছু ভেবে বলে নি।

সেদিন সবাই একসঙ্গে সশব্দে হেসে উঠেছিল। স্বর্ণও। কিন্তু ওর মুখে-চোখে কেমন একটা অস্বস্তি মাখানো লজ্জা দেখতে পেয়েছিলেন সুধাময়ী।

রেবতীও হেসেছিল। তারপর প্রায় স্বীকৃতিব স্বরেই বলেছিল, সব ব্ল্যাক মানি কিন্তু সমান ব্ল্যাক নয়। উকিল ডাক্তার ব্যবসাদারদের কথা ভাবো, আফটার অল ইটস দেয়ার আর্নড ইনকাম। পরিশ্রম করে রোজগার করে। আমাদের লুকোনো পার্কসও তাই। কিন্তু গাভমেন্টে যারা ঘুষ নেয়? ঘুষ নেয়াই তো ক্রিমিন্যাল অফেন্স, অ্যান্ড দে ট্রীট ইট অ্যাজ ট্যাক্স-ফ্রী। তাদের টাকাও শুধুই ব্ল্যাক মানি?

রুমা ফোড়ন কেটেছিল, ব্ল্যাক নয়, জেট ব্ল্যাক।

শশাঙ্কশেখর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমরা যৎসামান্য রোজগার করি, ট্যাক্স নিয়ে এত দুশ্চিন্তা নেই।

যৎসামান্য রোজগার করি' এই কথাটা সুধাময়ীর কানে লেগেছিল খট্ করে। শশাঙ্কশেখর কথাটা রেবতীব সামনে বলেছিলেন বলেই হয়তো। কিংবা তাঁর কথায় কিছুটা সত্য ছিল বলেই।

৬

শশাঙ্কশেখর খুঁজতেন, খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন ইতিহাসের একটা অন্ধকার অধ্যায়। আজকের পৃথিবীতে তার কোন দাম আছে কিনা, ওরা কেউ জানতো না। কিংবা ভিতরে ভিতরে ঠিকই বুঝতে পারতো তার দাম আছে, আজকের এই সভ্যতার বিরুদ্ধেই তাই হয়তো ওদের একটা অভিমান ছিল।

ঝুমারা এখন শশাঙ্কশেখরকেই খুঁজছে। একটা মানুষের অভাবে বাড়িটা এখন হয়ে উঠেছে শুধু প্রকাণ্ড শূন্যতা।

এই ক'টা দিন ধরে সমস্ত সংসারের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। শরীর মন ভেঙে পড়েছে ঝুমার। মার দিকে এখন আর ও তাকাতে পারে না, বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হয়।

ঝুমা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, খাবার টেবিল ঘিরে ওরা সবাই বসে আছে, আর রুমা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলছে, একটা একটা করে আমাদের সব এসে যাবে, না মা?

মা হেসে বললে, আসবেই তো! একটু একটু করে।

সেদিনই ওদের একটা টি ভি এসেছে। ফ্রীজ তো আগেই এসেছিল। সকলেই তাই বেশ খুশি খুশি।

রুমা আনন্দের চোটে হাত-পা নেড়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে বলছে, এরপরই গাড়ি, তারপর একটা ফ্ল্যাট, ব্যস্ তা হলেই আমরা সকলের সমান হয়ে যাবো।

ওরা সবাই হাসছিল ওর ভাবভঙ্গি দেখে। আর ঝুমা হাসতে হাসতে বলেছিল, অত টাকা কোত্থেকে আসবে শুনি?

সঙ্গে সঙ্গে রুমা বলে বসলো, দেখিস, আমি অনেক টাকা রোজগার করে নিয়ে আসবো। একটু থেমে বলেছিল, সিনেমায় নামলে অনেক টাকা পাওয়া যায়, না রে দিদি?

সবাই হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সেদিন। কথাটা কারো ভালো লাগে নি।

শুধু বাবা, ঝুমার স্পষ্ট মনে আছে, বলেছিল, তোরা কত কি চাস, আমার কিন্তু একটাই চাওয়া, আমি শুধু একটা লেখা পড়ে ফেলতে চাই, আর কিছু চাই না।

রুমা বলেছিল, বারে, আমরা কি বেশি কিছু চাই নাকি! যেটুকু না হ'লে নয়।

শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, ভোগ আর ত্যাগ কি একসঙ্গে চলে? একটা জৈন কথানক আছে, রাজা শালীভদ্র সন্ন্যাস নেবেন বলে সব ভোগ একটু একটু করে ত্যাগ করছিলেন। অর্থাৎ রাজার পক্ষে যেটুকু না হলে নয়। তাঁর শ্যালকও খুব ধনী, তার নাম ধন্য। সে ঠাট্টা করলো তার স্ত্রীকে, অর্থাৎ রাজার বোন সুভদ্রাকে। বললে, ওভাবে ত্যাগ হয় না। সুভদ্রা বললে, তুমি পারো সংসার ত্যাগ করতে? দাদা তো কিছু অন্তত পেরেছে। ধন্য হেসে বলল, কেন পারবো না, এই চললাম। বলে সত্যিই চলে গেল।

এখন সেই গল্পটা মনে পড়লে ঝুমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে শশাঙ্কশেখর বলতেন, এটা তো একটামাত্র জীবনের কাজ নয়, যদি তেমন একটা ছাত্র পেতাম।

একদিন বলেছিলেন, যার ওপরই ভরসা রাখি, কত ভাল ভাল ছাত্রই তো এলো, শেষ অবধি তারাও টাকার লোভে কেরিয়ার তৈরি করে। ভয় হয়, অতনুও হয়তো চলে যাবে।

ঝুমা মনে মনে ভাবলো, বাবা সেই দুর্বোধ্য আর রহস্যজনক লিপির পাঠোদ্ধার করতে চেয়েছিল, এখন বাবা নিজেই আমাদের কাছে একটা দুর্বোধ্য লিপি। অক্ষরগুলো এখন আর আমরা কেউই চিনতে পারছি না। পারছি না বলেই আমাদের এই অসহ্য যন্ত্রণা।

ঝুমার মনে হল, বাবার মধ্যেও হয়তো ঠিক এমনি একটা যন্ত্রণা ছিল। যা জানা যাচ্ছে না, যা রহস্যে ঢাকা তাকে খুঁজে বের করতে না পারার যন্ত্রণা।

অনেককাল আগের, শশাঙ্কশেখরের লেখা একখানা ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঝুমা হঠাৎ একটা সুন্দর লাইন পেয়ে গেল। আমাদের বর্তমান সভ্যতা একটা চলন্ত ঘড়ির মত, টিকটিক করে চলছে, তার বড় কাঁটাটা দ্রুত এক একটা ঘর পার হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই ঘড়িটার ছোট কাঁটাটাই নেই। ফলে ঘড়িটাই অর্থহীন হয়ে গেছে।

ঝুমার মনে হল ওদের এই সংসার এখন ঠিক ঐ রকমের একটা ঘড়ি, চলছে, কিন্তু আসল কাঁটাটাই নেই।

এখন নিত্যদিন ও নিজেও অপিসে যাওয়া-আসা করছে। ভেবেছিল, বাড়ির মধ্যে একা একা এই অসহ্য কষ্ট চেপে রাখার চেয়ে সে তবু ভাল।

ভয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে ঝুমার অফিসে ঢুকতেই ইচ্ছে করছিল না সেদিন। কোন রকমে পা টেনে টেনে এগিয়ে গেল, মাথা নীচু করে নিজের চেয়ারটিতে গিয়ে বসে পড়লেই যেন স্বস্তি। দুর্ঘটনা নয়, মৃত্যু নয়, শশাঙ্কশেখর ওদের ছেড়ে চলে গেছেন এ-কথা কি বলা যায়! শোকের চেয়ে তার জ্বালা আরো বেশি।

কিন্তু ঝুমা নিজের চেয়ারটিতে গিয়ে বসে পড়ার আগেই ওপ্রান্ত থেকে আলোকবাবু উঠে এসেছেন, কি ব্যাপার, সীরিয়াস অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছিল নাকি! তারপরই বলে উঠেছেন, আরে আপনার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেল কি করে!

ঝুমা একটু হাসবার চেষ্টা করেছে, পারে নি।

আর আলোকবাবু নাছোড়বান্দার মত প্রশ্ন করেছেন, কি হয়েছিল বলবেন তো?

ঝুমা মুখ তুলে আলোকবাবুর দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। কিচ্ছু বলতে পারে নি।

আলোকবাবু শুধু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন।

সেই পুলিসের লোকদের কাছেও প্রথম যখন ছোটমেসো নিয়ে গিয়েছিল, ঝুমার তখন এতটা সংকোচ বা লজ্জা ছিল না। তখন ওরা ভাবতেই পারে নি বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

ছোটমেসোর সঙ্গে সেই ডি সি ভদ্রলোকের কাছে যাওয়ার সময় অবশ্য ওর ভয়-ভয় করছিল।

ছোটমেসোর হাঁটা চলা, তাকানো এবং কথা বলার মধ্যে এমন একটা ভারিক্কি ভাব আছে যা দেখে সবাই সমীহ করে। দরজার কনস্টেবলটাও পথ আটকায় নি।

ডি সি ভদ্রলোক একমুখ হাসি নিয়ে ওঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। আর ছোটমেসো দিব্যি চেয়ারটা আরো পিছনে ঠেলে পা দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে বেশ আয়েস করে বসেছিল। অমু আর ঝুমা ভয়ে-ভয়ে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল পাশের চেয়ারে, তাও সেই ডি সি ভদ্রলোক চোখের ইশারায় বসতে বলার পর।

ছোটমেসোর কাছে একটুখানি শুনেই ডি সি চিন্তিত হবার ভান করলেন।

কাকে কাকে ডেকে পাঠালেন তখনই। ফোন করলেন কাকে যেন। অনবরত ওঁর কাছেও ফোন আসছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে কথা বলেছিলেন তিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছিলেন। কখনো ঝুমা কখনো অমু উত্তর দিচ্ছিল।

যাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে ছোটমেসোর পরিচয় দিলেন ডি সি. ইনিই আর-এম। তাদের চোখে বেশ সম্ভ্রম ফুটে উঠলো। কিন্তু ঝুমা লক্ষ করেছে বাবার নামটা যখন বললে ছোটমেসো, এমনকি কলেজের নামটাও, তখনো বিশেষ কোন সমীহ করার ভাব ফুটলো না তাদের মুখে চোখে। কিংবা উৎকণ্ঠা।

ডি সি ভদ্রলোক বললেন, একটা ফোটোগ্রাফ চাই কিন্তু...

—এনেছি। বলেই ছোটমেসো ঝুমার দিকে তাকালো।

আর ঝুমা ভয়ে-ভয়ে সেটা ডি সির দিকে এগিয়ে দিল।

তিনি হাতে নিয়ে দেখলেন, একটু যেন বিরক্তই হলেন। বললেন, এর চেয়ে ভালো ছবি নেই? এর থেকে কি একটা মানুষকে চিনে বের করা যাবে! বলে ছোটমেসোর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

তারপর, আশ্চর্য, ওদের সামনেই ছোটমেসোর সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলেন, পলিটিক্স, বাজার, দিনকাল নিয়ে। এবং ছোটমেসোও ওঁর কোন কোন কথায় হাসছিল। এবং নানারকম সরস মন্তব্য করছিল। তা দেখে ঝুমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। মনে হচ্ছিল বাবার জন্যে ওঁর যেন কোন দুর্ভাবনাই নেই।

সেদিন ফেরার পথে ওরা ছোটমেসোর গাড়ি থেকে মাঝপথেই নেমে পড়েছিল, কারণ তাঁকে আবার একবাব অফিসে যেতে হবে। ছোটমেসোর ব্যস্ততা এবং ছোটাছুটি করার ক্ষমতা দেখে ঝুমা সত্যি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

আর গাড়ি থেকে নেমেই অমু বেশ রাগ-রাগ ভাবে বলেছিল, দেখলি তো, ওরা কেউ বাবার নামই শোনে নি।

কথাটার মধ্যে ক্ষোভ ছিল, কিন্তু ঝুমা ভেবে দেখেছে, কেনই বা শুনবে! হোমরা-চোমরা লোক, রাজনৈতিক নেতা, কিংবা বড় ব্যবসাদার এদেরই তো সবাই চেনে। একটা লোক ঘরের কোণে বসে ইতিহাসের ক'টা নতুন তথ্য খুঁজে বের করেছে, কিংবা কোন অসাধ্য লিপির পাঠোদ্ধার করতে চেয়েছে, তার খবর কেন রাখবে তারা। এ সমাজে সাফল্যের তবু দাম আছে, সাধনার কোন দাম নেই।

কিন্তু ঝুমা ভেবে পেল না, সকলেই যখন টাকা রোজগার করতেই ব্যস্ত, কেউ বা প্রতিপত্তি চায়, তখন কিসের নেশা বাবাকে এভাবে টানতো। এবং কেন?

ওর ছোটবোন রুমা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, হ্যাঁ বাবা, যা সব খুঁজে বেড়াও, পেলে কি কেউ তোমাকে অনেক টাকা দেবে? তা হলে এত কষ্ট করো কেন!

শশাঙ্কশেখর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছেন, আমি আর কতটুকু কষ্ট করি রুমা। লোকে যখন গড়গড় করে ইতিহাস পড়ে যায়, ইতিহাস কেন, জ্ঞানের রাজ্যের সব কিছুই, তখন জানতেও পারে না তার পিছনে কত লোকের সমস্ত জীবনের সাধনা আছে।

তারপর অনেকগুলো নাম বলে গিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর। একজন কার কথা বলেছিলেন, এখন আর মনে নেই ঝুমার। গল্পটা মনে আছে। দুশো বছর আগে সারা পৃথিবী চষে বেরিয়েছে, ডেরিয়াসের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ খুঁজে বের করে দু'মাস ধরে শুধু একটা কিউনিফর্ম শিলালিপি নকল করে এনেছে।

গল্পটা বলতে বলতে শশাঙ্কশেখর বলে উঠেছেন, কেন করেছে সে, কেন? কেউ কি তাকে অনেক টাকা দেবে বলেছিল?

সুধাময়ী হেসে উঠে বলেছেন, সেও বোধহয় এখন ফুটনোট হয়ে গেছে।

ঝুমা অনেক চেষ্টা করেও তার নামটা মনে আনতে পারলো না। কিন্তু তার গল্প বলতে বলতে বাবা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, ইউরোপ থেকে গিয়ে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খুঁজতে খুঁজতে সেই প্রথম দেখেছিল বাকু অয়েল-ফীল্ড, এখন যেখানে তেলের খনি, পেট্রোলের। গিয়ে কি দেখেছিল জানিস? একটা মন্দিরের মত জায়গা, পাথুরে মাটির ফাটল থেকে নানা জায়গায় আগুনের শিখা বেরুচ্ছে, আর দুটো সাধু স্তোত্র পাঠ করছে।

একটু থেমে শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, আমাদের জ্বালামুখীও তাই। আর আমার মনে হয়, অগ্নিপূজা শুরু হয়েছিল ঐ বিস্ময় থেকেই, তখন তো পেট্রোলিয়ম বুঝতো না, ভাবতো দৈব। বংশপরম্পরায় যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে রাখা শুরু হয়েছিল ওখান থেকেই, ওটাকেই ভাবতো পবিত্র অগ্নি। দেশবিদেশে আগুন নিয়ে আসার এত যে গল্প, অথচ ইতিহাসে পাচ্ছি মানুষ তার অনেক আগেই আগুন জ্বালাতে শিখে গেছে।

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিলেন, অগ্নিকে আমরা বলি আগুন, প্রাচীন শ্লাব ভাষায় অগ্নিদেবতা হল ওগোনু।

এইসব কথা যখন শশাঙ্কশেখর বলতেন তখন ঝুমা স্তব্ধ হয়ে শুনতো।

এখন আর খাবার টেবিলে কেউ ওদের ঐসব গল্প বলে না। চুপচাপ মাথা নীচু করে খায়। উঠে যায়। নিতান্ত প্রয়োজনেই দু-চারটে কথা। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

কিন্তু, কি হতে পারে, কোথায় যেতে পারে মানুষটা, খুঁজে পায় না ঝুমা। বাবাকে ও চিরে চিরে দেখতে চায়, কোথাও কোন অসঙ্গতি ছিল কি না। বাবা সত্যিই নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে কিনা।

একদিন মা আর বাবার সম্পর্কটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কোথাও কোন চিড় ধরেছিল কিনা, কিংবা কোন ফাটল, যেখান থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসতে পারে।

বাবার ওপর ঝুমার তাই মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগ হয়। রাগ না অভিমান। তুমি কাউকে কিচ্ছু না বলে এভাবে চলে গেলে কেন! আমাদের জন্যে তোমার মধ্যে কি একটুও ভালবাসা ছিল না। আমাদের মধ্যে তোমার জন্যে যে প্রচণ্ড ভালবাসা লুকিয়ে রাখতাম তা কি তুমি কোন দিন টের পাও নি!

এক একদিন খুব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় ঝুমার। চোখের সামনে

যেন দেখতে পায় বাবা ওর হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে।

স্কুল-বাস আসতো খুব সকালে, তাই বাবা বলেছিল, ও তো অত সকালে পেট-ভরে খেতেই পারে না, শরীর নষ্ট হয়ে যাবে।

তখন বাবার মাইনে অল্প, রান্নার লোক ছিল না। মা তাই ব্যস্ত থাকতো।

ঝুমা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, বাবা বলছে, সুটকেশটা আমাকে দে, ওটা তো তোর চেয়েও বেশি ভারি। ওয়াটার বটলও কেড়ে নিত বাবা।

বাবার হাতে সুটকেশ, কাঁধে ওয়াটার বটল ঝুলছে। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাবাকে। আর ঝুমা হাসতে হাসতে বলছে, বাবা, সবাই তোমাকে দেখে ভাবছে তুমি ইস্কুলে পড়ো।

বাবা হাসতে হাসতে বলছে, তোদের ইস্কুলে ভর্তি করে নিবি, বেশ এক-সঙ্গে যাবো, আসবো।

ঝুমা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে, আর বাবা হাত শক্ত করে ধরেছে, এই, গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে, চাপা পড়বি যে!

ঝুমা বাবার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করতো, ও কি একা একা রাস্তা পার হতে পারে না! কিন্তু বাবার কি ভয়। ওর জন্যে বাবার কি উৎকণ্ঠা।

তখন ভাল লাগতো না, মনে হত, বাবা যেন ওকে বড় হতে দিচ্ছে না। এখন সব বুঝতে পারে, ভাল লাগে ভাবতে সেইসব দিনের কথা।

এত যে ভালবাসা, তা কি কখনো ধুয়ে মুছে যেতে পারে। তা হলে বাবা কি করে ওদের ছেড়ে চলে গেল। নাকি, অন্য কিছু?

তুমি ভিতরের বারান্দায় ক্যাম্বিশের ডেক-চেয়ারে বসে বসে বৃষ্টি দেখছিলে। আমাকে বললে, ঝুমা, খিচুড়ি করতে বলছিস রাত্তিরে, ঈশ্বরকে ইলিশ মাছ আনতে বলেছে তো! মা ভেবেছে, তুমি নিজের কথা বলছো। কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার কথা ভেবেই বলেছিলে। একটু একটু করে তুমি আলাদা হয়ে যাচ্ছিলে, তোমার নেশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলে, কিন্তু জানতাম আমাদের জন্যে তোমার ভালবাসা বাদামের দানার মতই তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

—জানেন আলোকবাবু, সন্ধ্যেবেলায় বাবা বার বার জিগ্যেস করেছে, ঝুমা ফেরে নি?

শেষ অবধি সব কথা আলোকবাবুকে না বলে পারে নি ঝুমা।

বলেছে, সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরে গেলে বাবা হয়তো বেরোতোই না।

আর সঙ্গে সঙ্গে রুমার ওপর ওর ভীষণ রাগ হয়েছে। রুমার জন্যে ওর ভয়, ওর উৎকণ্ঠা। সে জন্যেই তো দেরী হয়ে গিয়েছিল। যে লোকটাকে ও সবচেয়ে ঘৃণা করে, তার সঙ্গেই রুমাকে দেখতে পেয়েছিল দোতলা বাস থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছিল। কিন্তু তারপর আর ওদের ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পায় নি।

ঝুমার মনে হয়, মা যেন ঝুমাকেই দায়ী করছে। মা বলেছিল, তোরা তো কেউ ছিলি না, ভাবলুম, মানুষটা একা একা ঘরের মধ্যে ..

মার গলা কান্নায় আটকে আসছিল। আমি তো ভাবতেও পারি নি, ও আর ফিরে আসবে না!

কিন্তু সত্যি, বাবা এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের কথা জিগ্যেস করেছে কেন? সকাল বেলায় বাবা ছেলেমানুষের মত হেসে বললে, বৃষ্টি দেখবো। ওরকম তো কখনো করে নি।

বাবা তো নিজের কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতো। যা-কিছু কথাবার্তা খাবার টেবিলে, তাও শুধু রাত্তিরে। কোন কোন দিন একটাও কথা বলতো না, খেতে খেতে কি যেন ভাবতো। একদিন খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠেছিল, বোধ-হয় পেয়ে গেছি, পেয়ে যাবো। জানিস ঝুমা, ওটা বোধহয় ডান দিক থেকে বাঁদিকে পড়তে হবে। মানুষ আর তার হাতে ঢাল, ওগুলো আলাদা করতে হবে, ওগুলো যুক্তাক্ষর।

বাবার উচ্ছ্বাস দেখে সবাই হেসে উঠেছিল।

রুমা বলেছিল, এসব পুরোনো জিনিস ঘেঁটে ঘেঁটে কি পাও, ওসব জেনেই বা কি লাভ।

আর বাবা বলে উঠেছিল, সে কি রে! পিতৃপরিচয় জানবি না? তা হলে যে নিজেকেই জানা হবে না।

'সে কি রে, পিতৃপরিচয় জানবি না?' কথাটা মনে পড়তেই ঝুমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কষ্ট হল। ঐ অতীত, হারানো অতীত, ওটাই নাকি পিতৃ-পরিচয়। তা হলে কি বাবারও আমাদেরই মত কষ্ট হত। বাবা নিজে হারিয়ে গিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিল?

ঝুমার মনে পড়ছে রুমা ছেলেমানুষের মত বলছে, মা, বাবা ঝট্ করে কিছু একটা হয়ে যেতে পারে না, খুব বড় কিছু?

সুধাময়ী কেমন গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, ও তো বড়ই।

রুমা বোঝে নি কথাটা মাকে আঘাত দিয়েছে। ও তখনো অনর্গল বলে চলেছে, কলেজে কত মেয়ের বাবা কত কি, মিতার বাবা রাইটার্সে সেক্রেটারি, অঞ্জলির বাবা একটা সাহেব কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার, রিনাদের নিজে-দেরই একটা ফ্যাক্টরি আছে।

একটু থেমে বলেছিল, ওরা খুব কালচার্ড।

কালচার্ড! কথাটা খট্ করে লেগেছিল ঝুমার কানে।

বাবার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। বাবা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, কালচার মানে কি মেয়েদের হাতে রিস্টওয়াচ, ছেলেদের প্যান্টের বেড়, বারান্দায় মানিপ্ল্যান্ট।

বাবা ধীরে ধীরে বলেছিল, একটা বাচ্চা ছেলেরও একটা ফুল দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু ঐ ফুলের বীজটার জন্যে উর্বর জমি তৈরি করার নাম কালচার। যা কিছু ভালো যা কিছু মহৎ তার বীজটাকে বাঁচিয়ে রাখাই সংস্কৃতি।

ঝুমার এখন অনুশোচনা হয় বাবা প্রাচীন জিনিসের দিকে ছুটতো আর ওদের সবারই নেশা ছিল নতুন জিনিসের জন্যে। সেই পুরোনো গলির বাড়ি থেকে উঠে এসে এই বাড়িটাকে নতুন করে সাজাতে চেয়েছিল ওরা সবাই। বাবার এ-সবের ওপর কোন মায়া ছিল না।

এই খাবার টেবিলটা জোর করে কিনিয়েছিল মা, অনেক দিন ধরে টাকা জমিয়ে জমিয়ে। বাবা তো আসনে বসে খাওয়াতেই অভ্যস্ত ছিল, প্রথম দিন টেবিলে বসে খেতে গিয়ে বললে, কনুইটা কোথায় রাখি রে?

তার পর হঠাৎ হাসতে হাসতে বলেছিল, টাকাও নষ্ট, খেতেও অসুবিধে।

মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। আসলে বাবাকে দামী করে তোলবার জন্যে, বাড়িতে কেউ এলে বাবাকে যাতে খাতির করে, সে জনোই তো এ-সব করা। লোকে তো এ-সবই বোঝে।

মা'র কষ্টটা বাবা বুঝতে পারে নি। হাসতে হাসতে বলেছিল, টাকাটা আমায় দিলে পারতে। ইস্টার আইল্যান্ডের ওপর একটা বই বেরিয়েছে, অনেকগুলো হরফ একেবারে ইন্ডাস স্ক্রীপ্টের মত।

বাবা একদিন অমিতেশবাবুকে বলেছিল, অনেক টাকা পেয়ে গেলে মন্দ হয় না।

অমিতেশবাবু বলেছিলেন, কত গ্র্যান্ট আছে, ফাউন্ডেশন আছে, একটু ধরাধরি করলেই তো পারেন।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। কারণ এই ধরাধরির সভ্যতার বিরুদ্ধেই তো বাবার সব কিছু!

মা একদিন অভিমান করে বলছিল, শুধু কতগুলো ভুয়ো আদর্শ নিয়ে মানুষ বাচতে পারে না। অমিতেশবাবু তো দিব্যি গুছিয়ে নিচ্ছেন, ও'র মত নোটবই লিখলেও তো পারো।

বাবাকে সেদিন খুব অসহায় লেগেছিল। যেন ভিতরে ভিতরে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। একটা দ্বন্দ্ব। না কি প্রচণ্ড দুঃখ!

আজকাল মা যখনই কাছে থাকে না, অমু আর ঝুমা ফিসফিস করে বাবার কথা বলে। কখনো কখনো মা'র কষ্টের কথা।

ঝুমা বলেছিল, আচ্ছা অমু, বাবা কি কোন ফাস্ট্রেশনে ভুগছিল! আমরা তো কেউ তাকিয়ে দেখি নি।

অমু যেন একটা ব্যথা চাপবার চেষ্টা করলো, দীর্ঘশ্বাসের মত বললে, জানি না, জানি না, আমাকে জিগ্যেস করিস না।

ঝুমা বললে, না না, টাকাপয়সা, চাকরিতে উন্নতি, ওসব ইচ্ছে বাবার ছিল না। আমি ভাবছি, ধর, বাবা যা খুঁজে বের করতে চেয়েছিল হয়তো পারলো না বলেই...

অমু কোন উত্তর দেয় নি, উঠে চলে গিয়েছিল।

ঝুমার সন্দেহ হয়েছিল, ও কি কিছু জানে। কখনো কখনো সন্দেহ হয়েছে, মা হয়তো জানে, আমাদের বলছে না।

অফিসের আলোকবাবু একদিন বললেন, শুনুন, একটা কথা বলবো?

এতকাল লোকটির মধ্যে কিছুই দেখতে পায় নি ঝুমা। কিন্তু সমবেদনায় ভরা ঐ মানুষটাকে দেখলে, কাছে থাকলে বেশ শান্তি। ও'র মুখেচোখে যেন একটা সহানুভূতি উপছে পড়ে।

—শুনুন, একটা কথা বলবো? কেমন নার্ভাস হাসি হেসে আলোকবাবু বললেন, কিছু মনে করবেন না তো?

ঝুমার ভিতরটা কেমন করে উঠলো। ভয় না আগ্রহ, ও ঠিক বুঝতে পারলো না।

ঝুমার হৃৎপিন্ডের গতি দ্রুত হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে বললে, বলুন।

আলোকবাবু বললেন, আপনি হয়তো বিশ্বাস করেন না। মানে, আমাদের ওদিকে বুড়োবাবা বলে একজন খুব বিখ্যাত তান্ত্রিক আছে। প্রশ্ন করতে হয় না, সব বলে দেয়। আমি অবশ্য শুনেছি।

নিমেষের মধ্যে ঝুমার মুখটা ম্লান হয়ে গেছে, কিংবা ও স্বস্তি পেয়েছে।

ঝুমা ভাবলো, কথাটা মাকে একদিন বলতে হবে। অমু যেন না জানতে পারে, বাবার মতই অমুরও এ-সবে একটুও বিশ্বাস নেই।

বেচারি অমু, ছুটে ছুটে হয়রান।

সেই ডি সি ভদ্রলোক মিসিং স্কোয়াডকে বলে দেওয়ার পর, ওরা তো ডায়েরি করে নিয়েছিল, বার বার অমুকে ডেকে পাঠিয়েছে। মর্গে, হাসপাতালে। পরিচয় জানা না গেলেই, যান একবার দেখে আসুন, আইডেন্টিফাই করতে পারেন কিনা।

এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

শশাঙ্কশেখরের কলেজেরই একজন সহকর্মী, ব্রজেনবাবু, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। দরদর করে ঘামছেন, মুখেচোখে একটা ব্যগ্রতা।

—আমি দেখলাম, স্পষ্ট দেখলাম শশাঙ্কবাবুকে। বাসে যাচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি নেমে এসে খুঁজলাম। একটু তো দেরী হয়েই ছিল, ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

সে কি আনন্দ, সে কি উদ্দাম আশা। সেই তল্লাটে অমু দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছে, ছুটে বেড়িয়েছে। যদি ভিড়ের মধ্যে আবার দেখতে পেয়ে যায়।

তারপর অমু নিজেই বলেছে, আমার বিশ্বাস হয় না, ওরকম ভুল হয়। এক লহমায় একটা মানুষকে কি ঠিক ঠিক চেনা যায়।

যায় না, যায় না। এতকাল ধরে বাবাকে দেখে এসেও তো ওরা ঠিক ঠিক চিনতে পারে নি। ভিতরের মানুষটাকে কোনদিনই চেনবার চেষ্টা করে নি। সেখানে কি দুঃখ ছিল ওরা কেউ জানে না। কিংবা কি অভিমান।

বাবার পড়ার ঘরে ঢুকলে ওর এখন কান্না পেয়ে যায়।

মা বলে ওঠে, ওঘরে যাস নে ঝুমা, যাস নে। যেখানে যা আছে ঠিক তেমনি থাক।

ঠিক আগের দিনের মতই মা এমনভাবে বলে ওঠে, যেন বাবা এক্ষুনি ফিরে আসবে। কোন কিছু নাড়াচাড়া করলে যেমন রেগে যেত তেমনি রেগে যাবে।

কখনো বা মা'র গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে।—ও ঘরে গেলে মনে হয় এইমাত্র উঠে গেছে, বইপত্র তেমনি ছড়ানো, কলমটাও খোলা, নিব থেকে কালি চুঁইয়ে পড়েছে টেবল-ক্লথে। চেয়ারের সামনে চটিজোড়া খোলা আছে।

সত্যি তাই, ঘরটার দিকে তাকালে ঝুমার বুকটা হু হু করে ওঠে।

এই ঘরখানাও ছিমছাম করে তুলতে গিয়ে মাকে কত যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই লোহার র‍্যাক দেয়াল জুড়ে। মা বলেছে, ওটাকে বিদেয় করো, বিদেয় করো। এই বাড়িতে কোথায় আর বই রাখেন, তাই অনেক উঁচু অবধি বুক-শেলফ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পালিশ করা কাঠের সুন্দর বুক-শেলফ। বাবা হাসতে হাসতে বলেছিল, বইগুলোর দাম কিন্তু সেই একই রইলো।

আর সেই কাঠের সিঁড়ি ফেলে দিয়ে অ্যালুমিনিয়মের মই।

—বাবা ঈশ্বর, একবার এসে বইটা পেড়ে দিয়ে যা।

সে শুধু মা'র ভয়ে। মা ভাবতো পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে। বাবা একদিন হাতের বাইসেপ দেখিয়ে বলেছিল, আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি!

যত ষড়যন্ত্রের পিছনে ছিল মা আর ঝুমা। ওরা তখন কত কি স্বপ্ন দেখতো। সুন্দর বারান্দার দোতলা ফ্ল্যাট, সাজানো ঘর, গাড়ি, টি ভি, ফ্রীজ, সব কিছু পেতে ইচ্ছে করতো ঝুমার। কিংবা বাবাকে খুব দামী করে তুলতে। এইসব জিনিসগুলোই তো একটা মানুষের গায়ে ছাপ দিয়ে দেয় কে কেমন

দামী।

কিন্তু বাবার কাছে যেগুলো দামী মনে হত, সেই বইপত্তর, শিলালিপি, মূর্তি, সেই পোড়ামাটির বাইলিংগুয়াল সীল, এসবের মায়া ছেড়ে বাবা চলে গেল কি করে।

ঝুমার কেবলই মনে হয়, এ-সবের মায়া ছেড়ে, মা ঝুমা-রুমা-অমু এদের মায়া ছেড়ে বাবা কোথাও থাকতে পারবে না। বাবা নিশ্চয় ফিরে আসবে, ফিরে আসবে।

—এই রুমা, একবারটি শুনে যা।

রুমা সামনে এসে দাঁড়ালো!—কি বলছিস?

এখন আর ও রুমাকে শাসন করতেও সাহস পায় না। নাকি আঘাত দিতে ভয় পায়। ওর মধ্যেও তো অসীম দুঃখ বাবার জন্যে। কিন্তু এখন তো বাবা নেই, বাবা ছিল একটা অদৃশ্য শাসন। কখনো কিছু বলে নি, একটা ধমকও না। কিন্তু ওরা জানতো, কেউ বলে উঠবে, অমন একটা লোক তোর বাবা, শেষে কিনা .ওটাই ছিল অদৃশ্য নোঙর, সে জন্যেই তো কেউ ভেসে যায় নি।

বাবা আক্ষেপ করে বলতো, এই সভ্যতার নোঙরটাই ছিঁড়ে যাচ্ছে। নোঙরটা থাকলে আর কিছু ভয় থাকে না।

ঝুমা ধীরে ধীরে রুমার কাঁধে হাত রাখলো। বললে, আমরা তোর ভালই চাই। একটু থেমে বললে, হ্যাঁ রে, তুই কি ভাবিস আমি তোকে ভালবাসি না!

রুমা অবাক হয়ে তাকাল ঝুমার মুখের দিকে। ওকে তো ঝুমা কখনো এভাবে আদর করে নি। ওর চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

—আমার তো একটাই ভয়, পাছে তুই ভুল করে ফেলিস, পাছে তোর ক্ষতি হয়। তার চেয়ে বড় ভয় বাবার গায়ে আঁচড় লাগবে।

রুমা জলে ভাসা চোখ তুলে তাকালো।

ঝুমা যেন শক্ত হতে পারছে না। তবু বললে, জীবনদা লোকটার তোর ডবল বয়েস। আমি তোকে কতবার সাবধান করেছি, তবু তুই শুনিস নি।

রুমা জোর দিয়ে বলে উঠলো, আমি মিশি না, মিশি না।

ঝুমা হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো, তুই চুপ কর। আমি নিজে দেখেছি। তোর জনেই সেদিন আমার দেরি হয়েছিল।

রুমা ধরা পড়ে গিয়ে আরো রেগে গেল।—জীবনদার ওপর তোর এত রাগ কেন, ও তো ভাল লোক।

ঝুমার ইচ্ছে হল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় রুমার গালে। পারে নি। নিজেকে শুধু সংযত করলো।

তারপর বলে উঠলো, লোকটা খাবাপ, খারাপ। ও তোর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলছিল। তুই কি কিছু বুঝিস না?

একটু থেমে ঝুমা আবার বললে, তুই বিশ্বাস কর, ও খারাপ, আমি জানি।

—জানিস তুই? রুমা অবাক হয়ে ঝুমাব মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

৭

একটু একটু করে সুধাময়ী নিস্তরঙ্গ নদীর মত শান্ত হয়ে গেলেন। আর কোন আশা নেই, আনন্দ নেই। কোন কিছুই আর তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। শুধু বুকের মধ্যে একটাই প্রশ্ন, কোথায় গেলেন শশাঙ্কশেখর, কেন গেলেন।

এক একসময় মনে হয়, বুকের মধ্যে ব্যথাটা আর যেন অনুভব করতেও পারেন না। স্বামীর মুখের আদলটাও যেন স্মৃতি থেকে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ রহস্যটা হাজারো প্রশ্ন হয়ে বুকের মধ্যে গুমরে মরে। দম বন্ধ করে এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে চেষ্টা করেন। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এক একবার শূন্যতায় ভরে ওঠে সারা বুক, আর কখনো বা গোপন লজ্জা আর অপমান ওঁকে কুরে কুরে খায়।

যতীনবাবুর স্ত্রী, হয়তো সমবেদনা জানাতে, কোন কোন দিন দোতলা থেকে নেমে আসেন।

—কিছু খবর পেলে ঝুমা?

প্রশ্নটা আসলে সুধাময়ীকেই। ঝুমা দেখলো মা শুধু তাঁর দিকে তাকিয়েই রইলো, যেন প্রশ্নটাও বুঝতে পারছে না।

যতীনবাবুর স্ত্রী হয়তো সহানুভূতি জানাতে চাইলেন। ক্ষোভের স্বরে বললেন, শিক্ষার এই তো দাম! এমন একটা জ্ঞানী-গুণী মানুষ বউকে ছেড়ে চলে গেল, ছেলেমেয়ের কথা ভাবলো না।

ঝুমার নিজেরও কথাটা ভাল লাগে নি, মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মুখখানা কেমন যেন অপমানে কালো হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝুমা রূঢ় চিৎকারে বলে উঠলো, চলে গেছে, চলে গেছে। চলে যাওয়া ছাড়া কি আর কিছু ভাবতে পারেন না? বাবা কক্ষনো আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না।

বলতে বলতে ও ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, পাছে যতীনবাবুর স্ত্রী ওর চোখের জল দেখে ফেলেন।

যতীনবাবুর স্ত্রী সুধাময়ীর হাতখানা ধরে তখন বলছেন, আমি ওভাবে বলি নি, ওভাবে বলি নি।

কিন্তু যে যেভাবেই বলুক, সুধাময়ীর কেবলই মনে হয়, সবাই যেন ওঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, স্বামী ওকে ভালবাসতো না। ওর ওপর স্বামীর কোন টান ছিল না। কিংবা কে জানে, শশাঙ্কশেখর সম্পর্কেই ওরা কেউ কিছু অপবাদ দেয় কিনা। সেটা ওঁর কাছে আরো অসহ্য, আরো অসহ্য। এই সাজানো-গোছানো বাড়িখানার মতই।

কে জানতো, একটা মানুষের অভাবে আর সবই অর্থহীন হয়ে যায়, মূল্যহীন হয়ে যায়। এই বাড়িটা এখন যেন উৎকট সাজপোশাকে সাজানো একজন বিধবার মত।

বসার ঘরের শোফাকৌচের দিকে তাকিয়ে ওঁর সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, কত কষ্টে একটু একটু করে বাড়িটা সাজিয়ে তুলছিলেন। সে তো শুধু শশাঙ্কশেখরকে দামী করে তুলবেন বলেই।

অমিতেশবাবুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ঝুমা বলেছিল,

বসার ঘরখানা দেখলে মা, কি সুন্দর! বাবা ও'র মত নোটবই লিখলেও তো পারতো।

সুধাময়ী কোন কথা বলেন নি। বছরের পর বছর উনি স্বপ্ন দেখে গেছেন আর একে একে সেই স্বপ্নগুলোকে সার্থক করে তুলেছেন ঝুমা চাকরি পাওয়ার পর থেকে।

গোপনে গোপনে যত ষড়যন্ত্র সুধাময়ী আর ঝুমার। শশাঙ্কশেখর টেরও পেতেন না।

সুধাময়ীর মনে আছে, যেদিন সত্যি সত্যি সোফাটোফা বানানো হয়ে গেল, ওরা দুজনে গিয়েই তো পাড়ার দোকানে অর্ডার দিয়ে এসেছিল, মা-মেয়ে ঘরটা সাজাতে সাজাতে কি হাসাহাসি। ঝুমা বলেছিল, বাবা খুব অবাক হয়ে যাবে, না মা?

সুধাময়ী সেদিন কেবলই ঘর আর বারান্দা করেছেন, অস্থির আনন্দ, কখন শশাঙ্কশেখর ফিরে আসেন।

—বাবা, শোনো শোনো, একটা জিনিস দেখবে এসো।

সুধাময়ী তখন মৃদু মৃদু হাসছেন।

শশাঙ্কশেখর ভেবেছিলেন কেউ হয়তো এসেছে, স্বর্ণ বা রেবতী।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকেই একেবারে অবাক।—বাঃ বাঃ, চমৎকার। এ যে একেবারে সাহেববাড়ি হয়ে গেছে রে!

সুধাময়ীর মনে আছে, শশাঙ্কশেখর সেদিন ছেলেমানুষের মত গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়েছিলেন সোফার ওপর, আর স্প্রিঙের গদিটা ও'কে বার দুই নাচিয়ে দিয়েছিল।

শশাঙ্কশেখর গদিটা হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখেছিলেন; তারপর বলে উঠেছিলেন, রবারের গদি? বাঃ, বেশ আরাম রে ঝুমা।

সেদিন সুধাময়ীর কি আনন্দ, কি আনন্দ! বারবার বসার ঘরখানা গিয়ে দেখে আসছেন। তাকিয়ে থাকতেও ভাল লাগছিল।

আর আজ সব বিস্বাদ হয়ে গেছে। এখন শুধু একটা শূন্য হৃদয় নিয়ে রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। কি হ'তে পারে শশাঙ্কশেখরের! কোথায় যেতে পারেন। 'একটা টাকা দাও তো।' কানের কাছে ঐ একটা কথাই বারবার শুনতে পান। একটা টাকা নিয়ে একজন মানুষ কোথায় যেতে পারে, কতদূরে যেতে পারে।

—মা, একটা জায়গায় যাবে? নিয়ে যাবো।

—কোথায়? উদাসীন চোখে তাকান সুধাময়ী। সে-চোখে কোন কৌতূহল নেই।

ঝুমা ধীরে ধীরে বলে, সেই যে 'আলোকবাবু', তোমাকে বলেছি না...

'আলোকবাবু' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ঝুমা কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। একটু লজ্জা পায়। কেন ও নিজেই বুঝতে পারে না। সহানুভূতি পেয়ে ও কি আলোকবাবুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। ওর জন্যেই বা আলোকবাবুর এত মায়া কেন। না, না, ঝুমা ওর এই গভীর দুঃখের মধ্যে ওসব কথা এখন ভাবতেও চায় না।

—আলোকবাবু বলছিলেন, ও'দের ওদিকেই, তান্ত্রিক না কি যেন, গুনে বলতে পারে...

—যাবি, নিয়ে যাবি আমাকে?

সুধাময়ীর দু'চোখে কৌতূহল ফুটে ওঠে। যেন অন্ধকারের মধ্যে একটু-খানি আলো দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু যাবার সময় কি উদ্বেগ কি ভয়। অথচ মনের মধ্যে কৌতূহল, হয়তো জানা যাবে। কিন্তু কি জানা যাবে সেটাই একটা আতঙ্ক। যদি বলে বসে, সে আসবে না, ফিরে আসবে না।

ঐ একটা আশা নিয়েই এখনো সুধাময়ী বেঁচে আছেন। একদিন না একদিন ফিরে আসবে। যেখানেই যাক, যতদূরেই যাক, এতদিনের এই মায়ার বন্ধন কি কাটাতে পারবে!

কিন্তু ঝুমা যার কথা বলছে, সে যদি ঝুমার সামনেই তেমন কিছু বলে বসে, যা সুধাময়ী শুনতে চান না। অপর্ণার কথা! তখন তো ঝুমার সামনেও উনি মুখ তুলে তাকাতে পারবেন না। না, ওটা ওঁর মনের ভুল। স্বর্ণ ওঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে চিন্তাটা।—কোনদিন কিছু বেচাল দেখিস নি তো, দিদি। স্বর্ণর বয়সে ওসব কথা ভাবা যায়। ও তো রেবতীকেই দেখেছে, রেবতীকেই জানে। শশাংকশেখর অন্য মানুষ।

কিন্তু কোন সাংঘাতিক কথাই যদি বলে দেয়।—নেই। শুধু একটা ছোট্ট কথা। একটা ফুঁ দিয়ে যদি সব আলো নিভিয়ে দেয়। তখন আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো! তখন যে আমার এই আশাটুকুও থাকবে না।

শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা মেঝে, বড় হলঘরখানার মধ্যে রাশি রাশি লোক, ফুল-বেলপাতা ধুনো আর ধূপের কেমন ঠাকুর-ঠাকুর গন্ধ। রোগা হাড় বের করা কালো শরীরে লাল রঙের কাপড়, সামনে বিচিত্র কালীমূর্তি।

আলোকবাবু বললেন, সামনে এগিয়ে যান মা, সামনে এগিয়ে যান।

ঝুমা ফিরে তাকালো আলোকবাবুর মুখের দিকে। চোখ নামালো। ওর সারা মুখে কেমন যেন আভা ছড়ালো।

কিন্তু তখন ওর মনের মধ্যে উদ্বেগ, কি বলবে কে জানে। বুকের ভেতরটা দুরদুর করে কাঁপছে।

সুধাময়ীকে পাশ থেকে কে যেন বললে, শুধু চুপ করে গিয়ে পিছনে বসুন, প্রশ্ন করতে হবে না, বুড়োবাবা প্রশ্ন না শুনেই উত্তর দেন।

সুধাময়ী গিয়ে বসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই তান্ত্রিক ক্ষ্যাপার মত বলে উঠলো, শুনতে চাস নে রে বেটি, শুনতে চাস নে, বাড়ি যা, বাড়ি যা।

বলে একটা জবা ফুল দিলো সুধাময়ীকে, আঁচলে বেঁধে রাখ। যত্ন করে রাখবি।

তারপর সুধাময়ী দু'চোখে জল নিয়ে উঠে চলে এসেছেন। জবা ফুলটা মাথায় ঠেকিয়ে, ঝুমার, আলোকবাবুর, উঠে এসেছেন আরো রহস্যের মধ্যে, আরো প্রশ্নের মধ্যে।

—হ্যাঁ মা, ওরকম বললো কেন! ঝুমা হতাশার গলায় বললে, এর চেয়ে না আসাই ভাল ছিল।

সব শুনে অমু সেদিন খুব রেগে গিয়েছিল।—কেন যাও ওসব জায়গায়, যত সব বুজরুকি।

অমুও ঠিক বাবার মত। ঠাকুরদেবতায় একেবারে বিশ্বাস নেই। সেজন্যেই ঝুমা জানে, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে কোথাও যেতে পারে না। কেউ ওসব কথা বললে ঝুমা ভিতরে ভিতরে রেগে যায়।

ঝুমা মনে মনে বললে, তুই একেবারে বাবার মত। মা'র দুঃখটা তো বুঝবি। বাবার তো তবু প্রাচীন মূর্তি, শিলালিপি, বাইলিংগুয়াল সীল, কত কি ছিল! মার কি আছে!

ঝুমার মনে পড়ে গেল, বাবা একদিন মাকে বোঝাতে চেয়েছিল দেবতারা এলো কোত্থেকে।—শোনো শোনো, তুমি তো কিছুই শুনবে না।

বাবা ঝুমাকেই বোঝাতে চাইলো।—আহুর এবং দেইবো, দুটো দল। আহুর থেকে অসুর, তারাই জ্ঞানেবিজ্ঞানে উন্নত। আর দেইবো, ইন্দো-ইরানীয়তে দইব, তা থেকে দেব; পশু চরাতো। দুটো দলই একই জায়গার। দু'দলই আর্য-ভাষী। হয়তো, দেইবোদের আহুররা তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা এখানে এসে পাঞ্জাবে গেড়ে বসলো। বললে, আমরা দেব। রাজার জাত, অতএব সকলে বললে, তোমরাই দেবতা। আর অসুরদের থেকেই হয়তো আসিরীয় সভ্যতা—ওদের রাজার নাম অসুর-বাণীপাল, অসুর-নাসিরপাল, শলমেনেশ্বর। রাজাই তখন দেবতা, রাজাই ঈশ্বর।

হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বৈদিক সাহিত্যে অনেকসময় বলা হয়েছে ইন্দ্রও ছিল অসুর। অসুরও ঈশ্বর।

রুমা ফোড়ন কেটেছিল, আর ঈশ্বর আমাদের বাড়ির কাজ করে।

সবাই হেসে উঠেছিল সেদিন।

শুধু সুধাময়ীই হাসতে পারেন নি। ঠাকুরদেবতা নিয়ে ওইসব ঠাট্টা ওঁর ভাল লাগতো না।

এখন তো ওঁর সবকিছুতেই বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে। তান্ত্রিকে, তাবিজে, জ্যোতিষে। তাই সুধাময়ীর মনে হ'ল, লোকটা বোধহয় ঠিকই বলেছে। কিন্তু জানতে চাস নে, জানতে চাস নে বললো কেন! সুধাময়ী যা ভয় পাচ্ছিলেন, হয়তো তাই-ই। কিন্তু কি ভয় পেয়েছিলেন? উনি আর বেঁচে নেই? হত্যা, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, কি না ভেবেছেন প্রথম প্রথম। রেবতী তো একদিন বললে, 'পুলিসের কাছেও তো এটা মিস্ট্রি।' প্রত্যেকটি হাসপাতাল তন্ন তন্ন করে দেখেছে পুলিস। একদিন হঠাৎ টেলিফোনে ডেকেছে অমুকে। 'কোথায় মর্গে দুটো অসনাক্ত মৃতদেহ আছে, 'এ ছবি থেকে কিছুই বোঝা যায় না, যান একবার নিজেই দেখে আসুন, আইডেন্টিফাই করতে পাবেন কিনা।'

অমুর মুখখানাও সেদিন ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল।

সুধাময়ী, ঝুমা, রুমা, তিনজনেই চুপচাপ বসে থেকেছে মুখোমুখি, প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে। সেকি অসহ্য যন্ত্রণার অপেক্ষা। সে কি ভয়। যেন যে-কোন মুহূর্তে একটুখানি টোকা লাগলেই ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়বে সুধাময়ীর দু'চোখ বেয়ে।

সারাটা দুপুর অপেক্ষা করে থেকেছেন, বারবার দরজার কাছে ছুটে গিয়ে দেখেছেন অমু ফিরলো কি না।

আর অমু ফিরে আসতেই, ওর পায়ের শব্দ তো সুধাময়ীর চেনা, ছুটে গিয়ে তাকিয়ে থেকেছেন উন্মুখ হয়ে।

অমু চোখে চোখ রাখছে না কেন? অমু কথা বলছে না কেন?

উনি উদগ্রীব হয়ে তাকিয়েছেন, ঝুমা-রুমা তাকিয়েছে।

অমু একটি কথাও না বলে এসে বসে পড়েছে চেয়ারে, যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। তারপর নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানিয়েছে, না।

আর সংগে সংগে সব উদ্বেগ মুছে গেছে সুধাময়ীর, সব ভয়।

সুধাময়ীর তো একটাই আশা, শশাঙ্কশেখর একদিন ফিরে আসবেন।

একটুখানি বৃষ্টি হলেই ও'র মন উদাস হয়ে যায়, সেই বৃষ্টির দিনটা বেশি করে মনে পড়ে।

অমুকে ডাকছেন শশাঙ্কশেখর।—অমু, ডেক-চেয়ারটা বারান্দায় দিয়ে যা তো।

—বৃষ্টি দেখবো। বলছেন শশাঙ্কশেখর। ছেলেমানুষের মত হাসি তাঁর মুখে, সুধাময়ীর চোখে যেন এখনো লেগে আছে।

তোমার মুখে এই সরল বালকের হাসি, সব ব্যাপারে তুমি নিজেকে একটা আদর্শের গন্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইতে, অথচ তুমিই আবার ঘোর নাস্তিক। তোমার জ্ঞান-বিদ্যা দিয়ে দেখেছো ঈশ্বর বলে কেউ নেই। তোমাকে যে আমি একটুও বুঝতে পারি না। সব মানুষই কি এমনি দুর্বোধ্য? তোমার ঐ-সব প্রাচীন লিপির মতই। নাকি আমরাই পড়তে পারি না।

কিন্তু তান্ত্রিক না কি, ও বললো কেন, জানতে চাস নে, জানতে চাস নে।

তুমি তো আমাকে ভালবাসতে। আমি জানি। অমু-ঝুমা-রুমা সবাইকে। তা হলে তুমি ঐ কাগজের টুকরোয় বারবার অপর্ণার নাম লিখেছিলে কেন?

সবাই তো দেখা করতে এলো। অমিতেশবাবুর সঙ্গে সেদিনই অনেকে এসেছিল। অতনু এখনো মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু অপর্ণা একদিনও এলো না কেন।

তার কথা সুধাময়ী কাউকে মুখ ফুটে জিগ্যেস করতেও পারেন নি।

—দ্যাখো মা, সেই অপর্ণা কিন্তু এলো না একদিনও। ঝুমা হঠাৎ একদিন বলেছিল।

ও হয়তো কিছু ভেবে বলে নি, তবু সুধাময়ী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, ঝুমার প্রশ্নটা শুধুই প্রশ্ন কিনা।

কিন্তু না, সুধাময়ী ও-সব ভাবতেই পারেন না। ওটা মিথ্যে সন্দেহ।

ভাবলেন, মানুষটা মাঝে মাঝেই কি ছেলেমানুষি না করতো! সেই বিয়ের পরের দিনগুলো, কি ছেলেমানুষি ভালবাসা। মনে পড়লেও হাসি পায়। আবার গর্বে বুক ভরে যায়। টুকরো টুকরো সেইসব স্মৃতি।

তখন তো শশাঙ্কশেখর একেবারেই যুবক। পা টিপে টিপে এসে পিছন থেকে আচমকা ভয় দেখানোর মত করে জাপটে ধরেছিল একদিন, ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছিলেন সুধাময়ী। পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল ছিল মানুষটা।

একদিন খাটের ওপর পা গুটিয়ে বসে আছেন, পাগলের মত হঠাৎ এসেই কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো। সুধাময়ী ভাবতেই পারেন নি, হঠাৎ এমন একটা কান্ড করে বসবে কিছু না দেখেই। স্বর্ণ তখন ছোট, ও ঘরের কোণে কি যেন করছিল, স্বামী লক্ষই করে নি। কি লজ্জা, কি লজ্জা। দু'জনেরই। স্বর্ণ হাসতে হাসতে পালিয়েছিল। সে ঘটনা নিয়ে স্বর্ণ তারপর কতবার হাসি-ঠাট্টা করেছে।

সেই মানুষটা কোথায় গেল, কেন গেল, কিছুতেই বুঝতে পারেন না সুধাময়ী।

যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পান, স্থিরদৃষ্টিতে সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে আছেন শশাঙ্কশেখর। বলছেন, তুমি একটা সাদার ওপর কালো চেক-চেক শাড়ি পরতে মনে আছে?

সুধাময়ী অবাক হয়ে ভেবেছেন, হ'ল কি মানুষটার!

—ওটা একবার পরবে? তোমাকে ঐ শাড়িতে আজ একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। বলে লাজুক হাসি হেসেছিলেন।

হাসিটা ও'র চোখে কাজল হয়ে লেগে আছে।

সুধাময়ী মনে মনে বললেন, তুমি আমাকে স্পষ্ট করে বলো নি কেন? ছেঁড়া শাড়িটা আলমারির মধ্যে পাট হয়ে পড়ে আছে, আমি বের করে পরতাম। তুমি দু'চোখ ভরে দেখতে। সেদিন পারি নি, লজ্জা করছিল। তুমি একবার ফিরে এসো, আমি আবার ছেলেমানুষ হয়ে যাবো। তোমার মতই।

কিন্তু ভাবতে গেলেই, বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করে লাগে।

—ও খুব সীরিয়াস স্টুডেন্ট, ডক্টরেট করছে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর।

আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সুধাময়ী। ওর ঐ পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের সুঠাম সৌন্দর্য উনি বোধ হয় সহ্য করতে পারেন নি।

আমিও তো মেয়ে, বয়েস দিয়ে কিছু বিচার করা যায় নাকি। শ্রদ্ধা থেকেও তো ভালবাসা জন্মায়। আর যে যতই বড় হোক, যত উঁচুতেই উঠুক, সামান্য একটা মেয়ের রূপের কাছে, যৌবনের কাছে মাথা নোয়াতে কারো আটকায় না। এমন তো কতই শুনেছেন। পুরুষের যত অহংকার, যত আত্মসম্মান, শুধু পুরুষের কাছেই।

কিন্তু, না, শশাঙ্কশেখর অন্য মানুষ.

অতনু একদিন এলো। ও মাঝে মাঝেই আসে, খবর নেয়।

- মাসীমা, কোন দরকার পড়লেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন। ও'র কাছে আমার ঋণ শোধ হবার নয়। অতনু বলেছিল।

সুধাময়ী যেন আক্ষেপের স্বরেই বললেন, তুমি তো তবু আসো, খবর নাও। সেই অপর্ণা মেয়েটি তো একদিনও এলো না।

এমন ভাবে বললেন, যেন শুধুই একটা অভিযোগ, ও'র কোন কৌতূহল নেই।

অতনু বললে, আমি তো তার ঠিকানাও জানি না। দেখাও হয় নি।

বললে, ঠিকানা পেলে আপনাকে জানাবো।

সুধাময়ী সঙ্গে সঙ্গে কথা পাল্টেছেন।

তারপরই ভেবেছেন, ছি ছি, এসব কি ভাবছি আমি। অসম্ভব অসম্ভব।

—অতনু, তুমি আর যাই করো, চাকরিতে প্রমোশন, টাকা, এইসব ঠুনকো জিনিসের পিছনে ছুটো না। তোমার ওপর আমার অনেক আশা।

সুধাময়ীর সামনেই শশাঙ্কশেখর একদিন বলেছিলেন। সেই মানুষ কি আবো ঠুনকো জিনিসের নেশায় কোথাও চলে যেতে পারে। অসম্ভব।

কোনটা দামী, আব কোনটা দামী নয়, চিনতে পারেন নি বলে সুধাময়ীর এখন অনুশোচনা হয়। অমিতেশবাবুকেই তখন উনি দামী ভাবতেন। ঝুমা একদিন বলেছিল ও'র মত বাবাও তো নোটবই লিখলে পারে।

একটা দিনের কথা মনে আছে।

শশাঙ্কশেখর ডাকলেন সুধা শুনে যাও সুধা শুনে যাও।

গিয়ে দেখলেন শশাঙ্কশেখরের মুখে কি উল্লাস।—খুব সুখবর আছে।

অমিতেশবাবুও তখন হাসছেন। আর অতনু মাথা নীচু করে চুপচাপ গম্ভীর।

শশাঙ্কশেখর হাসতে হাসতে বললেন অমিতেশবাবু ফ্ল্যাট কিনছেন, দু'খানা নোটবই থেকে অনেক টাকা পেয়েছেন উনি।

সুধাময়ীকেও খুব খুশি-খুশি ভাব দেখাতে হয়েছিল।—কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।

তারপর অমিতেশবাবু একসময় চলে গেছেন।

আর সুধাময়ীর সামনেই শশাংকশেখর অতনুকে বলেছেন, সারা জীবন ধরে মানুষ কি চায়, বলতে পারো অতনু? উন্নতি, পদমর্যাদা, ঐশ্বর্য, বিলাস এ-সব কিসের জন্যে?

অতনু কোন উত্তর দেয় নি।

শশাঙ্কশেখর বলেছেন, মানুষ শুধুই একটা পরিচয় খোঁজে। একটা আত্ম-পরিচয়। আর সেটা খুঁজতে গিয়ে আসল জিনিসটাকেই বিসর্জন দিয়ে বসে। অমিতেশবাবু একজন ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র ছিলেন, উনি তো অনেক কিছু করতে পারতেন, দুঃখ সেজন্যেই। ও'রই বা দোষ কি, এই সমাজে সবাই নোটবই লিখতে চায়, কারণ যার ওপর সেই নোটবই, এই সমাজে তার কোন পরিচয় নেই।

কথাটার মধ্যে কোন ক্ষোভ ছিল কিনা সুধাময়ী বুঝতে পারেন নি।

আর শশাঙ্কশেখর বলেছেন, শিকড় থাকলে তবেই তো গাছ পাতা ফুল ফল। অথচ শিকড়টার কেউ খোঁজ রাখে না। একটু একটু করে একদিন হয়তো সভ্যতার শিকড়টাই শুকিয়ে যাবে, আর তখন যা-কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছো, তা একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে। এখন আমরা যেমন ইতিহাসের পাতায়, পাথরের গায়ে, মাটির তলায় সেই সভ্যতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শিকড়টা খুঁজে পাচ্ছি না। পাচ্ছি শুধু বাড়িঘর, মূর্তি কিংবা মমি, কঙ্কাল, দুর্বোধ্য লিপি।

সেদিন কথাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি সুধাময়ী। এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্যি। মানুষ কি খোঁজে? শুধু একটা আত্মপরিচয়। সুধাময়ী বুঝতে পারেন, সেই আসল পবিচযটা ভুলে গিয়ে উনি পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে একটা মিথ্যে পরিচয় বানিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ আসল পরিচয়টাকে এ-যুগে কেউ কোন দাম দিতে চায় না।

শশাংকশেখর কোন্ জিনিসটাকে শিকড় বলতে চেয়েছিলেন সুধাময়ী স্পষ্ট বোঝেন নি। সেটা কি এই পরিবাবে শশাঙ্কশেখর নিজেই যা ছিলেন। না কি অন্য কিছু।

—শিকড়টা হারিয়ে গেলে, কিংবা তাব খোঁজ না পাওয়া গেলে কি হয় জানো? যে সভ্যতা একদিন উপনিষদ লেখে সেই সভ্যতাব পতন হতে হতে শেষে বিধবাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে।

এই পরিবারটার জন্যেও তো তাই এত ভয়।

সেজন্যেই ও'র মনের মধ্যে একটাই আশা, ফিরে আসবে, ফিরে আসবে।

কোন কোনদিন কানের কাছে যেন শুনতে পান।—একটা টাকা দাও তো' এই কাছাকাছি একটু ঘুরে আসবো।

তারপরই সেই বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর।—কোথায আর যাবার আছে। ন'টার মধ্যেই ফিরে আসবো।

ন'টার মধ্যেই।

সুধাময়ী কান পেতে থাকেন। অনেক দূব থেকে কোন ট্রামের আওয়াজ কিংবা বাসের শব্দ শুনলেই সচকিত হয়ে ওঠেন। ও বোধহয় ট্রাম থেকে নামছে, আব ক'টা মিনিট, এখুনি এসে পড়বে, পায়ের শব্দ কিংবা কলিং বেল্-এর আওয়াজ।

দূরের ট্রাম ডিপোয় ন'টার ঘন্টা পড়তেই সুধাময়ী চমকে উঠে ঘড়িটার দিকে

তাকালেন।

আর অমুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অমুর চোখে অস্বস্তি, সুধাময়ীর চোখে অস্বস্তি, দুজনেই চোখ নামিয়ে নিলো।

সুধাময়ী শুনতে পেলেন, ঝুমা আর রুমা কি যেন ফিসফিস করে বলছে। ওঁকে দেখতে পেলেই আজকাল ওরা চুপ করে যায়। জানেন, ওদের মনেও ঐ একই কষ্ট।

—অমু ফিরেছে নাকি, ও ঝুমা!

ওপাশের সিঁড়িতে যতীনবাবুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন সুধাময়ী।

ইদানীং উনি আর কোন খবর নিতে আসেন না, সান্ত্বনা দিতে আসেন না।

ডাক শুনে অমু উঠে গেল। উনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছেন।

সুধাময়ী উৎকণ্ঠ হয়ে এ-ঘরের কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। এত রাত্রে যতীনবাবু অমুর খোঁজ করছেন কেন। কোন খবর আছে নাকি!

যতীনবাবু বেশ জোরে জোরেই বললেন, বোধহয় সুধাময়ীকে শোনাবার জন্যেই বললেন, কিছু ঠিক করলে অমু?

অমু বুঝতে না পেরে বোধহয় অবাক হয়ে তাকিয়েছে ওঁর মুখের দিকে।

যতীনবাবুর গলা শোনা গেল। যেন কথাটা বলতে অস্বস্তি বোধ করছেন।

বললেন, মানে, তোমাদের পক্ষে তো ভাড়াটা বেশি।..তাছাড়া এর চেয়ে ছোট ফ্ল্যাট হলেই তোমাদের চলে যায়।

এই যতীনবাবুই সেদিন ওদের মতই উৎকণ্ঠা দেখিয়েছিলেন। নিজের থেকেই বলেছিলেন, চাবিটা নিয়ে আয় চন্দনা। অথচ এর মধ্যেই সেই মানুষটা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। ভয়, পাছে ঠিকমত ভাড়া না পান। কিংবা এই তো সুযোগ। উঠে গেলেই বেশি ভাড়া পাওয়া যাবে।

শশাঙ্কশেখর একদিন বলেছিলেন, প্রকৃত দামী জিনিসটা থাকলে তবেই তো অন্য জিনিসগুলো দামী মনে হয়।

তুমি এসে দেখে যাও। এই সমাজ প্রকৃত দামী জিনিসটার কোন দামই দেয় না।

অমিতেশবাবু একদিন এসেছিলেন।

সুধাময়ী ভেবেছিলেন খোঁজখবর নিতে এসেছেন। উনি তো শশাঙ্কশেখরের বন্ধু, এই পরিবারের।

হঠাৎ বললেন, ওঁর তো অনেক মূর্তিটুর্তি রয়েছে, দামী দামী বই। একটা খদ্দের আছে। কিউরিও ডীলার, ভালো দাম দেবে, ওগুলো বেচে দিন। সংসারটাকে তো দাঁড়াতে হবে।

সেদিন চোখে জল এসে গিয়েছিল সুধাময়ীর। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল।

সুধাময়ী মনে মনে বলেছিলেন, আপনি শুধু কেনাবেচাই জানেন অমিতেশ-বাবু। কোনটার কি দাম আপনি কোনদিন জানতে চাননি। যদি কোনদিন বেচে দিতে হয় তার চেয়ে অতনুকে কিংবা কোনদিন অর্পণা যদি আসে, তাদেরই দিয়ে দেবো, কারণ তারাই এর মূল্য দিতে পারবে, আপনার টাকাওয়ালা কিউরিও-ডিলার নয়।

কিন্তু আমি যে জানি, সে একদিন ফিরে আসবে।

—ফিরে এলাম। ব'লে ছেলেমানুষের মত লাজুক হাসি হাসবে।

৮

যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু পুরোনো, তাই দামী নয়। যা নতুন আর ঝকঝকে তার সবই মূল্যহীন নয়। শুধু চিনে নিতে হয়, জানতে হয়, কোন্‌টার কত দাম। শশাঙ্কশেখর একদিন আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন, ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এই তো সকলের ধারণা। কিন্তু মানুষ তো তার চেয়েও বড় স্রষ্টা, সে ঈশ্বরকেই সৃষ্টি করেছে। তার কল্পনা দিয়ে।

কথাটা সুধাময়ীকেই বলেছিলেন, কিন্তু অমুর খুব ভাল লেগেছিল কথাটা।

অমুর মনে আছে, বাবা বলেছিল, আমরা ঈশ্বরের দিকেই তাকিয়ে থেকেছি, মানুষের দিকে তাকাতে ভুলে গিয়েছিলাম। অথচ মানুষের দিকেই যাতে সমাজ তাকায়, তাকিয়ে দেখে, সেজন্যেই তো সে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছিল।

ছোটমাসী এসব বোঝেই না, ভেবেছিল খুব মজার কথা. হেসে উঠেছিল খিলখিল করে।

কথাটা বোধহয় তুলেছিল ছোটমেসো। বসার ঘরের কৌচের ডানলোপিলো গদিতে আরাম করে বসে ছোটমেসো তার দামী ট্রাউজারের পা-দুখানা সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সাকসেশফুল লোকরা ঐরকম ভাবেই বসে। বাবা বসতো চেয়ারের ধার ঘেঁষে, পা গুটিয়ে।

ছোটমেসো বলেছিল, আমাদের ট্র্যাডিশনই কিন্তু আমাদের উন্নতি হতে দিচ্ছে না।

আর ছোটমাসী হাসতে হাসতে বলেছিল, আপনাদের আর-এম কিন্তু, জানেন জামাইবাবু, পুরোনো দিনের কিছুই পছন্দ করে না।

বাবা হেসেছিল।—রেবতী, যা-কিছু পুরোনো তাই ট্র্যাডিশন নয়, যেমন তেরতলার ওপর সতেরোতলা বাড়ি হলেই সেটা উন্নতি নয়। তা হ'লে তো বলতে হবে সিন্ধু সভ্যতার দোতলা কি তিনতলা বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার বছরে আমরা শুধু তেরতলা বানিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা হাসতে হাসতে বলেছিল, সামান্য একটা চাষীও জানে কোন জিনিসটা তার কাছে সবচেয়ে দামী, 'বীজধান'। তাই বীজতলাকে সে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে, আমাদের এই সভ্যতা সেই বীজ চেনেই না, কোথায় আছে জানতেও চায় না।

সেইসব কথা অমুর এখন মনে পড়ে যায়।

ওর মনে হয় এই বাড়িটার মধ্যে বাবাও যেন তেমনি ছিল। ওরা তখন বুঝতে পারে নি। কিন্তু বাবার বিরুদ্ধেও তো ওর ক্ষোভ ছিল। তুমি বলেছিলে, ঈশ্বরের দিকে তাকাতে গিযে মানুষ মানুষের দিকে তাকাতে ভুলে গিয়েছিল। তুমিও তো তোমার ঐ প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, অতীত সভ্যতার দিকে তাকাতে গিয়ে আমাদের দিকে তাকাও নি।

—হ্যাঁ বাবা অমু, তুমি অমন একটা লোকের ছেলে হয়ে পড়াশুনোয় ভাল হলে না কেন!

জ্যাঠাইমা একবার বেড়াতে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল।

আর অমুর প্রচণ্ড রাগ হয়ে গিয়েছিল। কার বিরুদ্ধে ও জানে না।

বাবা তো একটা কাচের দেয়ালের মধ্যে বাস করতো। মনে হ'ত খুব কাছে। কিন্তু হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায় না। অমুর দিকে বাবা কখনো তেমন দৃষ্টি দিতে

পারে নি। মা আক্ষেপ করে বলেছিল, কি করবো বল্, তখন একজন প্রাইভেট টিউটর রাখারও সঙ্গতি ছিল না।

এখন ও বুঝতে পারে দোষ বাবার নয়, কার দোষ ও খুঁজে পায় না।

অতনু বলেছিল, ওঁর জন্যে আমাদের কত গর্ব ছিল।

শুনে খুব ভাল লেগেছিল অমুর।

কিন্তু বাইরের পৃথিবী তো এ-সবকে দাম দেয় না। পাড়ায় যে-লোকটা সবচেয়ে বেশী চাঁদা দেয় তারই সম্মান বেশী। কিংবা ছোটমেসোর মত মালিকের মুনাফা বাড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব দেখাতে পারে যারা। কিংবা ঘুষটাকে যারা অন্যায় ভাবে না, ভাবে সম্মান। কোন এক মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আছে বলে পাড়ার বখাটে ছেলেটাও খাতির পায়।

অমুও রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। ওর ব্যবসাও ফুলেফেঁপে উঠতে পারে। পারে নি বাবার জন্যেই। এখনো যেন পিছন থেকে বাবাই টেনে ধরছে।

কিন্তু অমুরও তো উপায় নেই।

—কিছু ঠিক করলে অমু? যতীনবাবু এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন; মানে তোমাদের পক্ষে তো ভাড়াটা বেশি, তাছাড়া এর চেয়ে ছোট ফ্ল্যাট হলেই তো তোমাদের চলে যায়।

অর্থাৎ, তোমরা এবার উঠে যাও।

সেদিন অপমানে মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল অমুর। এখন ও রাস্তা চিনে গেছে, এখন ও উঠে দাঁড়াচ্ছে।

নোটগুলো যতীনবাবুর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু রাগ তো যতীনবাবুর ওপর নয়। রাগ সেই অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আর অমুর মনে হয়, যতীনবাবুরও তারই ওপর রাগ। এমন কি আর-এম, মানে ছোটমেসোর। এদের সকলের কথার আড়ালেই তো একটা ক্ষোভ দেখতে পেয়েছে অমু। ওর নিজের মতই।

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল অমুর।

গড়ের মাঠে তখন কি একটা এক্জিবিশন চলছে, যেতে-আসতে অমুরও চোখে পড়েছে। চতুর্দিক আলোয় আলো।

ছোটমাসী এসে বাবাকে ধরলো, জামাইবাবু, চলুন সবাই মিলে দেখে আসি।

বাবা হাসতে হাসতে বললে, তোমার আর-এম কি হ'ল?

—ও তো গাড়ি ছেড়ে দিয়েই খালাস। আর-এম ব্যস্ত মানুষ, তাছাড়া ঐসব ভিড়ের মধ্যে গেলে ওর মাথা কাটা যাবে না!

বাবাকে শেষ অবধি রাজী হতে হ'ল। মা বললে, চলো না বাপু, স্বর্ণ এত করে বলছে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওরা স্টলগুলো দেখছিল। একটা স্টলে মুখোশ বিক্রি হচ্ছিল, নানা রকমের মুখোশ। একদিকে আদিবাসী পুরুষ আর রমণী-মুখের ঘন বাদামী রঙের মুখোশ সাজানো ছিল, তা দেখে রুমা বুঝি হঠাৎ বলে উঠলো, বাবা, এরাই তো অনার্য!

হাসতে হাসতে শশাঙ্কশেখর বললেন, আমরা বাঙালীরা কিন্তু ওদেরই আত্মীয়। ওরা তো আর্যদেরও আগে এসেছে। অনার্য হবে কি করে।

রুমা হাসতে হাসতে বললে, সে আবার কি। কিন্তু শশাঙ্কশেখর তাঁর নিজের প্রসঙ্গ পেলে আর চুপ করেন না। ভারতবর্ষে কত দিক থেকে কত রক্ত এসে মিশেছে, কত রকমের সংস্কৃতি, সে-সব অনর্গল বলে গেলেন।

ওরা কেউ শুনছিল না, হাসাহাসি করছিল।

উনি তখনও বলে চলেছেন, উত্তর ভারত থেকে ইস্টার আইল্যান্ড পর্যন্ত একসময় অস্ট্রিক ভাষারই দাপট ছিল, আমাদের ভাষাতেও অস্ট্রিক শব্দের সংখ্যা অনেক, বাঙালীর রক্তেও। আর্যও একটা উপজাতি, কাশিতে এক্কা দেখেছিস, তেমনি রথ টানাতো ঘোড়া দিয়ে। ঘোড়ায় চড়তেও জানতো না।

অমু বলেছিল, কিন্তু চাকা?

শশাংকশেখর হেসেছিলেন, সে অনেক আগেই আবিষ্কার হয়েছে, সুমের সভ্যতায়। মিশরে। সিন্ধুসভ্যতাতেও মৃচ্ছকটিকা পাওয়া গেছে, তারও চাকা আছে।

কিন্তু কে এ-সব শুনতে চায়।

ওরা সবাই তখন অন্য স্টলের দিকে পা বাড়িয়েছে। তাই অমুর মনে হ'ল দলের মধ্যে থেকেও বাবা কেমন একা একা, এত ভিড়ের মধ্যেও।

আর তখন হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কি একটা গুঞ্জন উঠলো।

অমু দেখলো, সবাই ছুটছে, রাশি রাশি ছেলে মেয়ে সামনের দিকে ছুটছে। কে একজন যেন এক অভিনেতার নাম করলো। সিনেমার হীরো। তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন। তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে সবাই ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাগলের মত।

আর সে কথা শুনে ছোটমাসীও নেচে উঠলো ফুর্তিতে। চল চল ঝুমা, দেখে আসি আমি কখনো দেখি নি।

ঝুমাকে টানতে টানতে ছোটমাসীও দৌড়তে লাগলো।

আর তখনই একদল ছেলেমেয়ে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, 'সরুন না মশাই' বলে বাবার দিকে তাকিয়ে কেমন উপহাসের হাসি হাসলো। তারপর ছুটতে লাগলো সেই হীরোকে দেখবার জন্যে।

অমু লক্ষ করলে, ধাক্কা খেয়ে বাবা কেমন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকিয়ে বিব্রত হাসি হাসলো।

বাবার সেই হাসিটা অমুর বুকের মধ্যে এসে লেগেছিল।

এখন সেই ঘটনার কথা মনে পড়লে বড় কষ্ট হয় অমুর।

কলেজে পড়ার সময় ওর বন্ধুরা দিন-রাত তর্ক করতো। ও নিজেও। সকলেই বলতো, ভ্যালুজ বদলে যাচ্ছে, ভ্যালুজ বদলে যাচ্ছে। ভ্যালুজ বলতে কি বোঝায় তখন বুঝতো না। আসলে বোধহয় এই রকমই কিছু। কোন বন্ধন বা পায়ের বেড়ি যা নোঙরের মত বেঁধে রাখে। উন্মাদের মত শশাংকশেখরকে ধাক্কা দিয়ে সিনেমার হীরোর দিকে ছুটে যেতে দেয় না।

অমিতেশবাবু ঠিকই বলেছিলেন। একদিন উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বলে-ছিলেন, অমু, নিজের কথা ভাবো। শুধু নিজের কথা। তোমার বাবা তো জীবনটাই উৎসর্গ করে গেছেন, কিন্তু বৃথাই। এই সমাজ যদি উচ্ছন্নে যায়, যাক্ না।

অমু বুঝেছিল, ও'র মধ্যে একটা প্রচন্ড রাগ আছে। বলেছিলেন, আমারও অনেক স্বপ্ন ছিল অমু, কিন্তু দিন পালটে গেছে, আমিও তাই নিজেকে পালটে নিলাম। এখন আর ওসব পাণ্ডিত্য, ইতিহাস খুঁজে বের করা, এ-সবের কোন দাম নেই অমু। দাম শুধু রাজনীতি আর সিনেমার। আমারও অনেক আদর্শ ছিল স্বপ্ন ছিল, এখন শুধু নোটবই লিখি।

অমুর সেদিন সত্যি দুঃখ হয়েছিল অমিতেশবাবুর জন্যে। ইনিও তো এক-

সময় ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন। ঐ অতনুর মতই, বাবার কাছে শুনেছে। বাবা কতদিন দুঃখ করে বলেছে, অমিতেশবাবু কিছুই করলেন না।

অমিতেশবাবুর ভিতরেও একটা প্রচণ্ড দুঃখ আছে, অমু বুঝতে পেরেছিল।

আর উনি বলেছিলেন, সে-সব দিন চলে গেছে অমু, এখন পৃথিবীর সর্বত্র শুধু খাটো মাপের মানুষ, তারা সদাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এক ঘন্টা সময় সিনেমা কিংবা টি ভি দেখে তারাই সব বিচার করে ফেলে। কিংবা পাঁচ মিনিটে খবরের কাগজের হেড লাইন দেখে ঠিক করে ফেলে কার কত দাম, কে কত দামী। ভুলে যায়, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের কে ডিরেক্টর ছিল আর কে নায়ক কেউ মনে রাখে নি।

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বলেছিলেন, তোমার বাবা ইণ্ডাস স্ক্রীপট্ পড়তে চেয়েছিলেন, দশ বছর ধরে একটা সত্যিকারের ইতিহাস লিখছিলেন, কিন্তু অমু, কে পড়বে সে বই? বই জিনিসটাই আউট-ডেটেড হয়ে যাবে, শুধু নোট-বই থাকবে, শুধু নোটবই।

একটু থেমে বলেছিলেন, কেন জানো? ওটা পড়ে যে পরীক্ষায় পাশ করা যায়, পাশ করলে চাকরি মেলে, অর্থাৎ টাকা।

সেজন্যেই হয়তো উনি একজন কিউরিও-ডীলারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এসেছিলেন বলেই ওঁর ওপর রেগে গিয়েছিল অমু। মা'র চোখে জল এসে গিয়েছিল।

শশাঙ্কশেখরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। একদিন বলেছিলেন, অনেক টাকা পেলেই তোরা খুশি, তাই না? একটু থেমে সুধাময়ীকে বলেছিলেন, সত্যি, তোমাদের জন্যে তো কিছুই করতে পারলাম না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর ঐ সব মূর্তিটুর্তি শিলালিপি সব বেচে দিস তোরা, অনেক, অনেক টাকা পাবি।

—কক্ষনো না, কক্ষনো না! মা বলে উঠলো, ও ঘরের একটি জিনিসও কাউকে ছুঁতে দেবো না। আর অমিতেশবাবু মুখ কাঁচুমাচু করে বসে রইলেন।

সেই মাড়োয়ারী কিউরিও-ডীলার অবাক হয়ে বলে উঠলো, তাজ্জব! বেচবেন না তো কি হোবে ই-সব' কোতো রুপেয়া চাই সির্‌ফ বলে দিন না।

—আমি তো বলেই দিয়েছি একটা জিনিসও বেচবো না'

লোকটা হয়তো ভাবলো, আরো বেশি টাকা চায়।

সে ঘুরে ঘুরে মূর্তিগুলো দেখছিল, তারপর জ্ঞানসরস্বতীর সেই বড় মূর্তিটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—লেকিন কলকাত্তায় তো খরিদ্দার মিলবে না। হামার চেয়ে যাস্তি কেউ দিবে না।

অমিতেশবাবু হাসতে হাসতে ঠাট্টার সুরে সায় দিয়ে বললেন, তা ঠিক। ও তো স্মাগল করে বিদেশে পাঠাবে। তাই না শেঠজী?

সে হাসলো।—উ-সোব দেশে বহুৎ ধনী আদমি আছে, কে লিবে আপনার ইখানে। আমি ভাল দাম দিবে।

আর সুধাময়ী রেগে গিয়ে বললেন, ভাল টাকা দিলেই কি ভাল দাম দেওয়া যায়! অমিতেশবাবু, ওকে যেতে বলুন, ওকে যেতে বলুন।

শুনে অমুর মনে হয়েছিল, মা নয়, যেন শশাঙ্কশেখরই কথা বলছেন।

কিন্তু, মা, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। একথাটা যে আমরা কেউই এতদিন বুঝতে পারি নি।

অমু জানে, মার বিশ্বাস বাবা একদিন ফিরে আসবেই। ঘরখানাকে ঠিক তেমনি ভাবেই রেখে দিয়েছে মা। সাবধানে বইপত্র ঝেড়েমুছে রাখে নিজেই, সব তেমনি তকতকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বইগুলো তেমনি আছে, কাগজপত্র ছড়ানো, কলমটা খোলা, নিব্ থেকে কালি চুঁইয়ে পড়ছে টেবিল ক্লথের ওপর। মনে হয় যেন মানুষটা এক্ষুনি উঠে গেছে। এখনই ফিরে আসবে।

ছেলেমানুষি হাসি হেসে বলবে, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি, এই একটু ঘুরে এলাম।

যদি সত্যি তেমন হয়, অমু বলবে, বাবা আমার ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে। তোমার কোন চিন্তা নেই, তুমি তোমার কাজ করে যাও। আমি আছি। তুমি রাগ করো না, এভাবে ব্যবসা দাঁড় করানো ছাড়া আমার যে কোন উপায় ছিল না।

অমুর ব্যবসা ভাল চলছে, একটা বড় কন্‌ট্রাক্ট পেয়ে গেছে। যে ভাবে সবাই পায়।

যতীনবাবু বোধহয় ভয় পেয়েছিলেন, এখন নিশ্চিন্ত।

দোতলায় ওঠার মুখে দেখা হয়ে গেল।—এই যে অমু!

গাড়ির চাবির রিংটা তর্জনীতে ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। একটু আগেই ও'র টোল খাওয়া পুরোনো গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজ শুনেই রোয়াকে এসে দাঁড়িয়েছিল অমু।

যতীনবাবুর চুলে বাসি হয়ে যাওয়া কলপের লালচে আভা।

হাসতে হাসতে বললেন, শুনলাম, ব্যবসা ভাল চলছে তোমার। ভালো, ভালো, তবে কি জানো অমু, ব্যবসায় কোন প্রেস্টিজ নেই। অত বড় জ্ঞানীগুণী একটা মানুষের ছেলে হয়ে শেষে ব্যবসা!

অমুর ভিতরটা রাগে ফেটে পড়তে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছিল ও। আর মনে মনে বলেছিল, আপনি বোধহয় ভয় পাচ্ছেন আমি আপনার সমান হয়ে যাবো, কিংবা আপনার চেয়েও ওপরে উঠে যাবো। জ্ঞানী-গুণীরা মাথা হেঁট করে থাকে বলেই আপনাদের এই বানানো শ্রদ্ধা, আমি জানি, আমি জানি। আমি যদি ইস্কুলে মাস্টারি করতাম আর যত্ন করে আপনার ছেলেকে পড়াতাম, আপনি খুশি হতেন। কারণ নিশ্চিন্তে আপনারা আরো উন্নতি করতে পারতেন।

বাবার কথা মনে পড়লেই সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওর একটা আক্রোশ এসে যায়।

বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছে, অমু, একবার ডেক-চেয়ারটা দিয়ে যা তো!

বাবার মুখে ঐ 'অমু' ডাকটা ওর বড় ভাল লাগতো। ইচ্ছে হ'ত বাবার সংগে কথা বলে, গল্প করে। কিন্তু বাবা যেন কথা খুঁজে পেত না।

এখন অমুর বাবার জন্যে কষ্ট, মার জন্যে কষ্ট।

—ঝুমা, জুতোর শব্দ শুনলেই মা কেমন কান পেতে শোনে দেখেছিস?

—কলিং বেল্ বাজলেও।

—মা'র বড় কষ্ট রে। অমু বলেছিল।

ঝুমার চোখ ছলছল করেছিল। বলেছিল, আমার মন বলছে, বাবা ফিরে আসবে। রোজ বাড়ি ফেরার সময় মনে হয়, যদি হঠাৎ এসে দেখি বাবা ফিরে এসেছে।

ঝুমা একটুখানি থেমে গাঢ় গলায় বললে, বাবা বলেছিল, ন'টার মধ্যেই

ফিরবে! আমার সত্যি মনে হয়, বাবা কোনদিন হঠাৎ রাত ন'টার সময় ফিরে আসবে।

বাবা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। সকলেই আছে। সবই আছে, কেমন ছাড়া-ছাড়া, যেন কেউই নেই। এক এক সময় অমুর অসহ্য লাগে। বাবার পড়ার ঘরখানা যেন আরো অসহ্য।

মা ভাবছে, বাবা একদিন ফিরে আসবে।

বাবার পড়ার ঘরে নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকলো অমু। মা টের পেলে এখনই চিৎকার করে উঠবে। মা'র ভয়, ওরা কিছু নষ্ট করে ফেলবে, কিংবা বইপত্র নাড়াচাড়া করবে।

ঘরের কোণায় টুলের ওপর রাখা সেই জ্ঞানসরস্বতী মূর্তি, মধ্যপ্রদেশের কোন জংলা গ্রাম থেকে পেয়েছিলেন। আরো নানান মূর্তিটুর্তি।

শশাঙ্কশেখর প্রথম প্রথম বলতেন, কাজ শেষ হয়ে গেলে মিউজিয়মকে দিয়ে দেবো। কিংবা এমন কোন ছাত্রকে যে এর দাম বুঝবে।

টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর ওপর হাত বোলালো অমু। বুক-শেলফের খোপে বই, পুরোনো জরাজীর্ণ বই। কিন্তু বাবার কাছে দামী। কয়েকটা ভাঙা মূর্তি, পোড়া-মাটির বাইলিংগুয়াল সীল।

সব আছে, তবু বাড়িটা এক অসীম শূন্যতা। কোনো কিছুরই যেন দাম নেই।

অমু ভাবলো, আমি তো একদিন এই সংসারের চেহারা বদলে দেবো। ছোটমেসোর মত, কিংবা অমিতেশবাবুর মতই আমি মাথা তুলে দাঁড়াবো। সবাই বলবে, অপদার্থ ছেলেটা সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। দিব্যি টাকা রোজগার করছে। হয়তো বলবে, বাপটা সংসারের দিকে কখনো তাকিয়েও দেখে নি। আর আমরা জানবো, মা আমি ঝুমা রুমা, মনে মনে জানবো, সবকিছু থেকেও আমাদের কি যেন নেই। গর্ব। তখন আমাদের হয়তো অহঙ্কার থাকবে, গর্ব করার মত কিছু থাকবে না।

ঠিক এই আজকের সভ্যতার মতই। এই কোলকাতা শহরটার মতই। অমু যেন শুনতে পাচ্ছে, শশাঙ্কশেখর বলছেন।—'সবাই কেবল উন্নতি উন্নতি বলছে। তেরতলা বাড়ি, গঙ্গার ওপর আরেকটা ব্রীজ, পাতাল রেল, আরো কত কি হবে। কিন্তু, এসব হলেই কি সব হয়ে যাবে। যদি না আসল জিনিসটাকেই আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি, ভবিষ্যতের জন্যে ভয়ঙ্কর সুন্দর একটা প্রকাণ্ড ধ্বংস-স্তূপই আমরা বানিয়ে তুলতে পারবো, তার বেশি কিছু না।' আর কোনদিন সেই ধ্বংসস্তূপ খুঁজে বের করে তখনকার মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে, হয়তো বাবার এই পড়ার ঘরখানাও, আর তারা গর্ববোধ করবে। কোনদিন জানতেও পারবে না এই সভ্যতার যা-কিছু গর্ব করার মত তা ক্ষোভে অপমানে, কিংবা অভিমান করে চলে গিয়েছিল। কারণ দামী জিনিসগুলোকে কেউ দাম দিতে চায় নি। কোনটা দামী আর কোনটা দামী নয় বুঝতে পারে নি।

মা বিশ্বাস করে, বাবা একদিন ফিরে আসবে।

ঝুমাও মার মত ন'টার ঘন্টা শুনতে পেলেই চমকে চোখ তুলে ঘড়ির দিকে তাকায়। কারণ, বাবা বলে গিয়েছিল ন'টার মধ্যেই ফিরবো।

ওরা সবাই ভাবে, বাবা ফিরে আসবে।

এই আশা, এই বিশ্বাসটুকু বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ওটাই তো মানুষের

পরম বন্ধন। পায়ের বেড়ি। ঐ আশাটুকুই তবু নোঙর হয়ে থাক। ওটুকুও না থাকলে কে কোথায় ছিটকে চলে যাবে তার ঠিক নেই।

অমু ভাবলো, আমি নিজেই ছিটকে চলে যাচ্ছি। আজকের এই অর্থহীন সভ্যতার মতই। ছুটে বেড়াচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। সে জানে না, তার আসল গর্ব কোথায়। যেদিন সেটা নিঃশব্দে চলে যাবে, নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেদিন তার জন্যে থাকবে শুধু হাহাকার। বীজধান নষ্ট হয়ে গেলে চাষীর যেমন হয়, বাবা বলেছিল।

অমু ভাবলো, বাবা হয়তো সত্যি তেমন বড় কিছু ছিল না। আমরা তাকে অনেক বেশি দামী মনে করছি। কিন্তু বাবা বলতো, কে কি করতে পেরেছে সেটা বড় কথা নয়, কে কি করতে চায়, তার ওপরই তার দাম। বলেছিল, আমার কাছে অমিতেশবাবুর চেয়ে অতনু অনেক বেশি দামী।

অমু ভাবলো, এই সভ্যতার মধ্যেও হয়তো তেমন গর্ব করার মত কিছু নেই। তবু বিশ্বাসটা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, বাঁচিয়ে রাখা দরকার, কোথাও আছে, যেখানেই যাক, যতদূরেই যাক, একদিন আবার হয়তো ফিরে আসবে।

অমু ভাবলো, আমার সেই বিশ্বাস নেই। আমার মধ্যে একটা ক্ষীণ সংশয় ঢুকে গেছে। তবু সংশয় বলেই, আমি ছিটকে গিয়েও বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। বাবা অবিরত আমাকে টেনে ধরছে।

রুমা ছিটকে যেতে গিয়েও নিজেকে বেঁধে রেখেছে।

রুমার জন্যে বড় কষ্ট হয় অমুর। বোকা মেয়ে।

অমুর মনে পড়ে, ঝুমাই ওকে বলেছিল, তুই ওকে একটু শাসন কর।

—শোন্ রুমা, তুই আমাদের ভুল বুঝিস না। আমরা তোকে ভালবাসি, ঝুমা তোকে ভালবাসে বলেই ওর এত ভয়।

অমু এখন আর ধমক দিতেও পারে না। বড় মায়া হয়।

ঝুমা বলেছে, ও বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদে রে। ঐ জীবনদা লোকটাকে বোধহয় ভালবেসে ফেলেছিল। বোকা মেয়ে।

—ওর বয়েসকে তো আমি চিনি। কাঁদতেই দে। তা না হলে তো ওকে সারা জীবন কাঁদতে হবে।

অমু ভাবলো, ওর কি দোষ! আমাদের সকলকেই তো একটা অদৃশ্য লোভ ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মতই ও লোভটাকে ভালবাসা ভেবে বসেছে। ছোটমেসো, যতীনবাবু, অমিতেশবাবু এবং আমি। আমরা সকলেই তাই ভেবে বসেছি।

রুমাও বিশ্বাস করেছে, বাবা ফিরে আসবে।

এইটুকু আশা, এই বিশ্বাসটুকু অন্তত বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

অমুর চোখের সামনে যেন সেদিনের ছবিটা ভেসে উঠলো।

ছোটমেসো ওদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ডি সি ভদ্রলোকের কাছে।

তিনি ঝুমার হাত থেকে বাবার ছোট্ট ফটোখানা নিয়ে বলেছিলেন, এ কি ছবি! এর চেয়ে ভাল ছবি নেই? এ থেকে কি একটা মানুষকে চিনে বের করা যায়!

তার পরের দিনই ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই ডি সি ভদ্রলোক।

একটা চিঠি লিখে দিয়ে বলেছিলেন, যান, গিয়ে নিজেই দেখে আসুন, ঐ ছবি থেকে কিছু বোঝা যায় না। আজ তিন তিনটে ডেডবডি, অ্যাকসিডেন্ট

বলেই মনে হয়। ড্রাইভার তো বলছে, একটা নাকি সুইসাইড। ড্রাইভাররা অবশ্য তাই বলে।

একটু থেমে বলেছিলেন, দেখে আসুন, যদি আইডেন্টিফাই করতে পারেন।

অমু চোখের সামনে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ওর বুকের মধ্যে উদ্বেগ, প্রচণ্ড ভয়। ওর হাত-পা তখন থরথর করে কাঁপছে।

মার মতই, ঝুমার মতই ওরও ভিতরে ভিতরে তখন একটা আশা, একটাই আশা, বাবা একদিন ফিরে আসবে। বাবা আছে। কোথাও না কোথাও আছে।

মা বলেছিল, আমি তো কিছু বুঝতে পারি নি রে। বললে, একটা টাকা দাও তো!

একটা টাকা নিয়ে মানুষ কোথায় যেতে পারে, কতদূর যেতে পারে!

অমুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল অমিতেশবাবুর কথাগুলো।

—আমার কি ভয় জানো, অমু। যদি আঘাত পেয়ে কিছু একটা করে বসে থাকেন।

হাত বাড়িয়ে একটা ইংরেজী পত্রিকা দিলেন। বললেন, পড়ে দ্যাখো।

অমু দেখলো, একটা প্রবন্ধের মাঝে মাঝে লাল কালির দাগ। পাশে পাশে বাবার হাতের লেখা।

অমিতেশবাবু বললেন, কি রকম অভদ্রভাবে ওঁকে অ্যাটাক করেছিল দ্যাখো। উনি যুক্তি দিয়ে পাশে পাশে উত্তর দিয়েছেন। দিয়ে পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে। একটু থেমে বলেছিলেন, কিন্তু আজকাল কেউ যুক্তির ধার ধারে না, উপহাসই আজকাল যুক্তি। আর সংগে সংগে সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছে অমুর।

অমুর একটুও যেতে ইচ্ছে করছিল না। ও ভাবতেও পারছিল না, বাবা একটা ডেড বডি হয়ে যেতে পারে।

মর্গের হিন্দুস্থানী ডোমটা বললে, আইয়ে।

বলে আরেকটা দেহাতী বন্ধুর সংগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো। অমু যে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ভ্রূক্ষেপই নেই।

অমুর তখন পা কাঁপছে। হাত কাঁপছে।

বুকের ভিতরটা দম বন্ধ হওয়া চাপ-চাপ আশংকা। এখনই কি দেখতে পাবে কে জানে! যেন বাবা না হয়, বাবা না হয়।

ও যদি না দেখে ফিরে যায় কেমন হয়। তবু তো একটা আশা থাকবে।

কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই। হয়তো ডি সি ভদ্রলোক জানতে পারবেন।

—চলিয়ে মুর্দাঘর।

এতক্ষণে ডোমটা বললো। হাঁটতেও শুরু করলো।

পিছনে পিছনে হেঁটে চলেছে অমু। ও এখনই যেন ভেঙে পড়বে।

ডোমটা মুর্দাঘরের দরজার তালা খুললো। ডাকলে, আইয়ে বাবু, ভিতর আইয়ে।

অমুর তখন মাথা ঘুরছে, দাঁড়াতে পারছে না। কোথায় এসেছে অমু বাবাকে খুঁজতে!

অতনু ছেলেটি বলেছিল, ওঁর জন্যে আমাদের কত গর্ব!

অমু পারছে না, পারছে না। ওর দু'চোখ জলে ভরে গেছে। ও কিছুই

দেখতে পাচ্ছে না। কেবল ভয়।

ঝাপসাভাবে দেখলে, তিনটে লাশ পড়ে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

ও ভাল করে দেখতে পেল না। ভাল করে দেখতে চাইলো না।

—নেহি হ্যায়। নেহি হ্যায়। বলে মুর্দাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে এলো।

কিংবা ওর দু'চোখ তো জলে ভরা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, কিছুই দেখতে পেল না।

ওখান থেকে ও সোজা চলে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে।

ওর মাথা ঝিম ঝিম করছিল। একটু ঠান্ডা হাওয়ায় ও শান্ত হতে চাইলো। একটু শান্তি চাইলো।

তারপর ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটে নেমে গেল, হাত বাড়িয়ে এক আঁজলা জল তুললো।

যেন তর্পণ করছে অমু।

সেই জল নিয়ে মুখে চোখে দিলো।

আঃ, শান্তি।

অমুর স্পষ্ট মনে আছে, ও আচ্ছন্নের মত ফিরে এসেছিল সেদিন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত।

সবাই মুখে চোখে আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মা, ঝুমা রুমা। কেউ কোন কথা বলে নি। কেউ কোন প্রশ্ন করে নি। যেন প্রশ্ন করতেও ভয়।

অমু গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল মাথা নীচু করে। ওর কান্না পাচ্ছিল।

চোখ তুলে দেখলো মার চোখে জল। উৎসুক নিষ্প্রভ মুখে অনুচ্চারিত কোন প্রশ্ন।

অমু মাথাটা একবার ডান দিক থেকে বাঁদিকে, আর বাঁদিক থেকে ডান দিকে নাড়ালো। না।

৯

সুধাময়ী এখন একটা যন্ত্রের মত হয়ে গেছেন। প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, কলের পুতুলের মত নিত্যদিনের কাজগুলো করে যান। অথচ মাঝে মাঝে সব কেমন ভুল হয়ে যায়। সব সময়েই একটা আনমনা ভাব। হাত দুটো কাজ করে, মুখ কথা বলে, কিন্তু চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কোথায় বুঝি ডুবে আছেন।

ঈশ্বর, আয় বাবা, বাজারটা করে এনে দে।

বলে হঠাৎ হয়তো ডেকে বসেন, আর হারুর মা মনে পড়িয়ে দেয়, সে কি গো, এই তো টাকা দিলেন তাকে, বাজারে পাঠালেন গো মা।

অন্য সময় হলে হারুর মা হেসে উঠতো। সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে সে হাসতেও ভুলে গেছে। আজকাল আর বাসনকোসন নিয়ে তেমন আওয়াজও করে না।

তার কথা শুনে অন্যমনস্কভাবে সুধাময়ী বলেন, ও হ্যাঁ, তাই তো। বাজারে চলে গেছে ঈশ্বর। আমার আজকাল কিচ্ছু মনে থাকে না হারুর মা।

হারুর মা কোন জবাব দেয় না, চুপচাপ বাসন মাজে। ওর সেই চিরকালের অভ্যাস অনর্গল কথা বলা, তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

বাড়িওয়ালা যতীনবাবুর স্ত্রী হঠাৎ কোন কোনদিন এসে হাজির হন।

প্রশ্ন করেন, কিছু খবর পেলেন দিদি?

সুধাময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কি আর খবর পাবো ভাই। আমি এখন আর ও-কথা ভাবতেও পারি না।

কিন্তু ভাবনাটা ওঁকে বোধ হয় এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকে না। কেবলই মনে পড়ে যায়, শক্ত সমর্থ মানুষটা দিব্যি বললে, একটা টাকা দাও তো। কাছা-কাছি একটু ঘুরে আসবো।

সুধাময়ী ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পান না। চিরে চিরে দেখেন মানুষটাকে, বুঝতে চেষ্টা করেন। কি হতে পারে, ভেবে পান না।

রেবতী একদিন কি যেন বলছিল, কার কথা, সুধাময়ী ভাল করে শোনেন নি। কার যেন কোথায় যেন, প্রচণ্ড একটা আঘাত লেগে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল।

সুধাময়ীর কখনো কখনো মনে হয় ওঁর নিজেরও সেরকম কিছু হয়ে যাবে কিনা।

শশাংকশেখরকে উনি কি কখনো অজান্তে কোন আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। মনের মধ্যে ডুব দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ান সুধাময়ী। মনে পড়ে না, মনে পড়ে না।

রেবতী বলেছিল, স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গেলে তখন আর আগের কথা কিছু মনে থাকে না।

ভাবতে ভাবতে সুধাময়ী যেন কল্পনায় দেখতে পান সেই মানুষটাকে। একটা স্মৃতি-হারানো মানুষ সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, সুধাময়ীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, আর সুধাময়ী বলছেন, তুমি চিনতে পারছো না আমাকে! আমি, আমি, এই দ্যাখো না সেই চেক-চেক শাড়িটা পরেছি, সেদিন আমি বুঝতে পারি নি, লজ্জা করছিল, এই দ্যাখো . চিনতে পারছো না?

সুধাময়ী ভাবেন, আজকাল আমার আর কিচ্ছু মনে থাকে না! কিন্তু স্মৃতি-টাই আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে। রুমার মধ্যেও হয়তো তাই। কে জানে!

—মা, তুমি রুমাকে একটু বলো। এভাবে দিনরাত কাঁদলে মেয়েটা যে মরে যাবে। ঝুমা বলেছিল।

সুধাময়ী এসে দেখলেন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রুমা কাঁদছে।

—ওঠ রুমা। স্নেহের হাতখানা তার পিঠে রাখলেন।—কাঁদিস না।

—মা, আমি যে পারছি না, ভুলতে পারছি না। রুমা আবার ফুঁপিয়ে উঠলো।

সুধাময়ী সব শুনেছেন। ঝুমা ওঁকে বলেছে।

বোকা মেয়ে! নাকি সুধাময়ীর নিজেরই দোষ। উনি তো কোনদিন শাসন করেন নি। সাবধান করেন নি।

—জানো মা, ঐ জীবনদা লোকটা ভীষণ খারাপ। সিনেমায় নামানোর লোভ

দেখায়। রুমার কি দোষ, ও তো দেখেছে, আমাদের টাকার দরকার। ও ভেবেছে অনেক টাকা পাবো, নাম হবে। সবাই তো তাই ভাবে।

রুমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।—আমি যে ওকে ভালবেসেছিলাম। ভুলতে পারছি না। তুই কেন বলিস নি দিদি, ও খারাপ, তুই জানতিস।

কিন্তু কি করে বলবে ঝুমা, সে যে ওর নিজেরও লজ্জা। ও কি করে জানবে তুই একটা বোকা মেয়ে।

শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, সবাই একটা পরিচয় খোঁজে, একটা আত্মপরিচয়। রুমা যে সেই পরিচয় খুঁজতে গিয়ে নিজেকেই হারিয়ে বসবে, কি করে জানবে ঝুমা।

সুধাময়ীও বুঝতে পারেন নি ওর শাসনটা আসলে ভালবাসা।

সুধাময়ী সব শুনেছেন ঝুমার কাছে। সেজন্যেই তো ও'র আরো দুঃখ।

—ওঠ রুমা, অনেক ভাল ছেলের সঙ্গে আমি তোর বিয়ে দেবো। তুই কিছু ভাবিস না।

রুমা এমনভাবে অসহায়ের মত তাকালো, সুধাময়ীর মনে হল যেন বলছে, ভাল ছেলে তো তুমি এনে দেবে মা! কিন্তু ভালবাসা আমার মধ্যে কে এনে দেবে!

সে-কথা সুধাময়ীর চেয়ে কে বেশি জানে।

সুধাময়ী আজকাল বড় একটা বাড়ির বাইরে কোথাও যান না। যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু মনটা চতুর্দিকে ছুটে বেড়ায়, তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ কোনদিন বাসে-ট্রামে কোথাও যেতে হলে যেভাবে ভিড়ের মধ্যে ওঁর চোখ দুটো তন্ন তন্ন করে খোঁজে। একটাই মুখ, একটা চেনা মুখ।

কলেজের একজন একদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছিল। বলেছিল, দেখেছি, ভিড়ের মধ্যে দেখেছি, বাস থেকে নেমে এসে আর খুঁজে পেলাম না।

অমু বিশ্বাস করে নি। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। বলেছে, এক পলকের দেখায় কি একটা মানুষকে চেনা যায়। ওরকম ভুল হয়, আমারও কতবার হয়েছে। মনে হয়েছে চেনা লোক, তারপর দেখেছি একেবারে অন্য মানুষ।

সুধাময়ী ভাবেন, আমারও তো মনে হয়েছিল চেনা, সব চেয়ে বেশি চিনি, কিন্তু এখন এক একদিন মনে হয়, আমি তাকে একটুও চিনতে পারি নি।

—সেই তান্ত্রিক, সেই বুড়োবাবার আশ্রমে আরেক দিন যাবে মা? আলোক-বাবু বলছিলেন, সেদিন হয়তো তার মেজাজ ভাল ছিল না।

সুধাময়ী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিলেন, যাবো।

অমু এ-সব একটুও বিশ্বাস করে না। একদিন একজন জ্যোতিষীকে ডেকে এনেছিল ঝুমা। জানতে পেরে অমু ভীষণ রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, বুজ-রুকি, বুজরুকি। সেদিন ওর রাগ দেখে সুধাময়ীর মনে হয়েছিল, বাবার জন্যে অমুর একটুও মায়া নেই, দুঃখ নেই। এটা কি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার! তোর যদি সত্যি কষ্ট থাকতো, তুই তো আমার মতই যে-কোন খড়কুটো ধরতে চাইতিস। কিন্তু সে-কথা তো অমুকে বলা যায় না। আহা, ওর ভিতরে সত্যি কষ্ট থাকতে পারে, নিশ্চয়ই আছে, মা'র কাছ থেকে এ-কথা শুনলে ও বেচারি আরো দুঃখ পাবে।

অমুকে না জানিয়ে সুধাময়ী আবার একদিন চলে গিয়েছিলেন।

সেই শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা মেঝে। দুঃখী মানুষের ভিড়।

একটা জবা ফুল দিয়ে তান্ত্রিক লোকটা বলে উঠলো, পাবি পাবি, হারানো জিনিস তুই ফিরে পাবি।

আর সেদিন সুধাময়ীর কি আনন্দ! সমস্ত মুখ খুশিতে ভরে উঠেছিল।

ফেরার পথে ঝুমার সংগে অনর্গল কথা বলেছেন। যেন আর কোন দুশ্চিন্তা নেই, ভয় নেই।

কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেছে প্রথম দিনের কথা। জানতে চাসনে রে বেটি, জানতে চাস নে।

কেন বলেছিল?

মুহূর্তের জন্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেছে ওঁর মনে। তবে কি অপর্ণা? সবাই এলো, কলেজের সকলে, অমিতেশবাবু, অতনু তো কতবার, কিন্তু অপর্ণা একবারও এলো না কেন? সংগে সংগে সন্দেহটা উনি দু' হাতে সরিয়ে দিয়েছেন। অসম্ভব, অসম্ভব। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় নি।

শশাংকশেখরের কণ্ঠস্বর উনি শুনতে পাচ্ছেন। ঐ তো পড়ার ঘরে বসে, মোটা মোটা বই খুলে কি দেখছেন, আর একটানা ডিকটেশন দিয়ে যাচ্ছেন। 'একটা ইতিহাস লিখছি, সব ধারণা পালটে যাবে, দেখো।' শশাংকশেখর ডিকটেশন দিচ্ছেন, আর অপর্ণা মাথা নীচু করে একটানা লিখে চলেছে, দ্রুত।

সুধাময়ী যেন চোখের সামনে দেখতে পান। অপর্ণার চোখে শ্রদ্ধা আর ভক্তি।

কিন্তু শ্রদ্ধা থেকে কি ভালবাসা হয় না?

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু একটা সন্দেহ অকারণেই বারবার উঁকি দিয়ে যায়। একবার, একবার উনি শুধু অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হতে চান। কিংবা জিগ্যেস করবেন, তুমি কি কিছু জানো? কোনদিন কি কিছু বলেছিলেন তোমাকে! আমার ওপর কি তার কোন অভিমান ছিল!

হয়তো ছোট হয়ে যেতে হবে। কিন্তু উনি তো সকলের চোখেই ছোট হয়ে গেছেন। স্বামী ওকে ছেড়ে গেছে, স্বামী ওকে ছেড়ে গেছে, হয়তো আঙুল দেখিয়ে সকলে বলে।

—মাসীমা, আপনি ঠিকানাটা চেয়েছিলেন। অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি, এই নিন। অতনু বলেছিল।

ঠিকানাটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন সুধাময়ী। সুযোগ পেলেই একদিন সরাসরি চলে যাবেন অপর্ণার কাছে। কাউকে না জানিয়ে। অনুকে না, ঝুমাকে না। স্বর্ণর কাছেও উনি কোনদিন বলতে পারেননি। স্বর্ণই তো ওঁর মাথার মধ্যে কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। একদিন বলেছিল, কখনো কিছু বেচাল দেখিস নি তো দিদি!

শশাংকশেখর একদিন বলেছিলেন, ভগবানে বিশ্বাস এমন কিছু বড় জিনিস নয়, খারাপ লোকরাও ভগবানে বিশ্বাস করে।

একদিন অমিতেশবাবুকে বলেছিলেন, সুধাময়ীর সামনেই; বলেছিলেন, ভগবান একটা না দুটো, নাকি অনেক, একসময় তো সেই তর্কেই দিন গেছে। কিন্তু মানুষের জীবন একটাই, সেটা ভালভাবে খরচ করতে হয়।

তখন সুধাময়ী ভেবেছিলেন, ভাল ভাবে খরচ করা মানে ঐসব ধারণা পাল্টে দেওয়ার ইতিহাস লেখা, মূর্তিটুর্তি, শিলালিপি, বাইলিংগুয়াল সীল। কিন্তু

শশাঙ্কশেখর কি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন? বিশ্বাস হয় না।

অমিতেশবাবু ফ্ল্যাট কিনছেন এ-খবর শুনে ঝুমা বলেছিল, বাবা, তুমি একটা কেনো।

সুধাময়ী তো তখন ভাবতেন, এ-সবই একটা মানুষকে দামী করে তোলে। দামী জিনিসটা না থাকলে এ-সব যে অর্থহীন হয়ে যায়, তখন জানতেন না।

এপাড়াতেই তখন ঐ তেরোতলা চোদ্দতলা আকাশ-ছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়িগুলো মাথা তুলছে বড় রাস্তার ধারে ধারে।

কোথায় যেন যাচ্ছিলেন ওঁরা। বাসের জানালা দিয়ে তেমনি একটা অহঙ্কারী মাথা-উঁচু-করা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রুমা বলে উঠেছিল, এ-রকম অনেক বাড়ি হয়ে গেলে গ্র্যান্ড হবে, না বাবা? কোলকাতাটা বিলেত হয়ে যাবে।

আর শশাঙ্কশেখর সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, বাড়িগুলো যত উঁচু হচ্ছে মানুষগুলো ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে।

সুধাময়ী প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেন নি।

স্বর্ণ আর রেবতীর সংসার এমনি একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ির এগারো তলার বিশাল ফ্ল্যাট, সুধাময়ী বেড়াতে গিয়ে তাদের বারান্দা থেকে নীচে তাকিয়ে দেখেছেন, মানুষগুলো পুতুলের মত ছোট ছোট লাগে।

বাড়িগুলো যত উঁচু হচ্ছে মানুষগুলো ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে। শশাঙ্ক-শেখর বলেছিলেন।

স্বর্ণ এ-সব কথা শুনে খুব হাসতো। একদিন ঠাট্টা করে শশাঙ্কশেখরকে বলেছিল, জামাইবাবু, আপনি যাত্রাদলের বিবেক হয়ে গেছেন।

সুধাময়ীও সেদিন শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, ঠিক বলেছিস।

আর শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, বিবেক আজকাল যাত্রাগানেও নেই স্বর্ণ, কোথাও নেই। সেজন্যেই তো ওটাকে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

তারপর ঝুমা-রুমার দিকে তাকিয়ে, সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমরা ভাবো আমার বুঝি কিছুই ইচ্ছে করে না। শোনো, আমারও সবই পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোনকিছু বিসর্জন দিয়ে নয়, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তো নয়ই। তা হলেই পাওয়াটা বড় হয়ে যায়, মানুষটা ছোট।

সেই মানুষটাকে ছোট ভাবছেন কি করে সুধাময়ী!

'আমারও সব কিছু পেতে ইচ্ছে করে', শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন। সুধা-ময়ীর মনে পড়ে গেল, বসার ঘরের নতুন শোফাটায় বসে ডানলোপিলোর গদিটা টিপে টিপে হাসতে হাসতে ঝুমাকে বলছেন, বেশ আরাম রে! ঐ পাওয়ার কথাই কি বলেছিলেন, নাকি অন্য কিছু। সুধাময়ী জানেন না। কে কি চায়, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় নাকি। কে কোনটাকে পাওয়া বলে কেউ জানতেও পারে না। সেজন্যেই তো মানুষের এত রকম দুঃখ। রুমা ওর ভুল বুঝতে পেরেছে, নিজেকে বাঁচাতে চাইছে। ও জানে ওর পাওয়াটাও পাওয়া নয়।

সুধাময়ী দেখতে পাচ্ছেন ওঁর চোখের সামনে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

—মা, সত্যি করে বলো, আলোকবাবুকে তোমার কেমন লাগে!

সুধাময়ী লক্ষ করেছেন, ঝুমা ওঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না।

—বেশ ভাল, খুব সাদাসিধে।

ঝুমা মাথা নীচু করে বলেছে, ও কি-সব বলছিল। বলতে গিয়ে চুপ করে

গেল ঝুমা। বললে, বাবা ফিরে না আসা অবধি আমি ওসব ভাবতেই পারি না।

সুধাময়ী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। শশাঙ্কশেখরের কথা কেউ মনে পড়িয়ে দিলেই উনি অন্যমনস্ক হয়ে যান।

—হ্যাঁ ঝুমা, অমু এখনো ফেরে নি? সুধাময়ী বললেন।

আর ঝুমা হাসলো। বললে, মা, তোমার কিছু মনে থাকে না, এই তো অমুকে দেখে জিগ্যেস করলে বৃষ্টিতে ভিজেছে কিনা। ও তো বসার ঘরে।

—ও হ্যাঁ, কিছু মনে থাকে না রে, আজকাল কিছু মনে থাকে না।

কিন্তু তুমি একটা কাগজের টুকরোয় সেই মেয়েটির নাম বারবার লিখেছিলে কেন। কি যেন নাম! হ্যাঁ, অপর্ণা। কিন্তু তুমি আমাকে এ-ভাবে অপমান করতে চাইলে কেন।

সুধাময়ী ভাবলেন, আমি হয়তো ভুল করছি, তোমার কোন দোষ নেই। ঐ মেয়েটিই অতখানি রূপ আর অনেকখানি শ্রদ্ধা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিল, তারপর মেয়েটি নিজেও হয়তো বুঝতে পারে নি শ্রদ্ধা কখন ভালবাসা হয়ে গেছে। এইখানেই তো পুরুষদের হার। তারা যত ওপরেই উঠুক, যত বড়ই হোক, ন্যায়নীতি, আত্মসম্মান, পাণ্ডিত্য, বিবেক কত কি আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু বয়সের গণ্ডী পার হয়ে গিয়েও একটা সামান্য মেয়ের কাছে তারা নিজেদের কত সহজে বিকিয়ে দেয়। কতই তো দেখেছি, শুনেছি।

সুধাময়ী মনে মনে ভাবলেন, না, শশাঙ্কশেখর তেমন মানুষ ছিলেন না। ওসব ঠুনকো জিনিসের দিকে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। থাকতে পারে না।

একদিন মনে আছে, তুমি অমিতেশবাবুকে বোঝাতে চাইছিলে, পৃথিবী এই আজই সভ্য হয়ে উঠছে না, বারবার মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, ধ্বংস হয়েছে। আমরা মাটি খুঁড়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু উন্নতির শিখরে উঠেও সভ্যতা ধ্বংস হয় কেন?

অমিতেশবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, কি যেন, বোধহয় যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ।

আর তুমি বলেছিলে, একটা সভ্যতার সর্বনাশের বীজ তার মধ্যেই থাকে। কোনটা দামী আর কোনটা দামী নয়, সেটা ভুলতে শুরু করে। তারপর এক সময় তার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়, মূল্যহীন জিনিসগুলোই হয়ে ওঠে মূল্যবান। আমাদের আজকের সভ্যতাও তাই।

তখন সুধাময়ী বোঝেন নি। এখন বুঝতে পারছেন, ভিতরে ভিতরে গর্ব করার মত কিছু থাকলে তবেই অন্য সব কিছু দামী হয়ে ওঠে।

—অমু, রাগ করিস না, একটা কথা বলবো?

—কি বলো।

—তোকে না জানিয়ে আবার সেই বুড়োবাবার আশ্রমে গিয়েছিলাম। এবার বললে, ফিরে পাবি ফিরে পাবি, যা হারিয়েছিস তা পাবি।

অমু বলে উঠলো, মা, আমি পারছি না, পারছি না, আমাকে ওসব কথা বলো না।

সুধাময়ী ব্যথা পেলেন। ভাবলেন, অমু ওরকম করে উঠলো কেন। ওর বাবার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছি বলে! না কি ওর অন্য কষ্ট। ওর মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন লাগে। ও কি কিছু গোপন করতে চাইছে, কিছু

জানে!

অমু এখন বসার ঘরে। শুনতে পাচ্ছেন অমু তর্ক করছে। আলোকবাবুর সঙ্গে। ঝুমা বোধহয় চা বানাতে গেছে।

আলোকবাবু লোকটি দিব্যি সাদাসিধে মানুষ। হাতে বড় একটা প্রবালের আংটি। কিন্তু লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান মানুষটার মধ্যে কিসের যেন অভাব আছে। সম্ভবত আত্মবিশ্বাসের। দেখলে মনে হয় ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত দুর্বল, কিংবা বিপর্যস্ত।

সুধাময়ী শুনতে পাচ্ছেন ওদের কথা।

—জ্যোতিষ, বুড়োবাবা, মাদুলি তাবিজ রত্নধারণ—ওসব বুজরুকি। আমি বিশ্বাস করি না। অমু বলছে।

আরেকটা শান্ত গলা উত্তর দিলো, মিথ্যে আশাও তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। একটা ক্যান্সারের রুগীকে, যার মৃত্যু অবধারিত, তাকে আপনি কি দিতে পারেন? মিথ্যে আশা ছাড়া।

অমু বলছে, ঠিকই বলেছেন। ক্যান্সারের রুগী, আমরা সবাই, সারা দেশটা।

এইসব বাঁধা বুলির কথাগুলো সুধাময়ীর ভাল লাগে না। এই ধরনের কথা বহুবার শুনেছেন অমুর মুখেই। ওর বন্ধুদের মুখে।

সুধাময়ী হঠাৎ ভাবলেন, কিন্তু ওরা মিথ্যে আশা বলছে কেন? ওরা কি কিছু জানে?

কিন্তু না, সুধাময়ীর মন বলছে, শশাঙ্কশেখর ফিরে আসবেন, ফিরে আসবেন। বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড কষ্ট, শশাঙ্কশেখর চলে গেছেন সুধাময়ীর বুকের ভিতর একটা শূন্যতা রেখে দিয়ে। ওঁর আরো কষ্ট, সব কথা উনি কাউকে বলতে পারেন না। অপর্ণার কথা নয়, চেক-চেক শাড়ির কথা নয়। স্বর্ণকেও বলতে পারেন নি।

অতনু ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিল।

শেষ অবধি একদিন একা একা বেরিয়ে পড়েছিলেন সুধাময়ী। কাউকে কিছু না জানিয়ে। এ-কথা কি কাউকে বলা যায় নাকি!

যাবার আগে একবার নিজের মুখখানা আয়নায় দেখলেন। আমার মুখখানা কি খুব কালো হয়ে গেছে অপমানে?

ঠিকানা লেখা কাগজখানা সঙ্গে নিয়ে বাসের জানালা থেকে দু'পাশের মানুষগুলোর মুখ তন্ন তন্ন করে দেখতে দেখতে এসে নামলেন।

রাস্তার নাম বললেন। দোকানদারটা কেমন অবাক হয়ে তাকালো। বললে, ঐ দিকে।

লোকটা অবাক হয়ে তাকালো কেন? সুধাময়ীর দু' চোখের আড়ালে কি জল থৈ থৈ করছে? না কি আশংকায় সারা মুখ রক্তহীন?

রাস্তা খুঁজে বের করলেন।

বাড়ির নম্বর বললেন।

ভদ্রলোক আঙুল দেখালেন। বললেন, বোধহয় ঐ দিকে। বলে সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

সুধাময়ী নম্বর খুঁজে খুঁজে এসে দাঁড়ালেন।

পা থরথর করে কাঁপছে, সারা শরীর শক্তিহীন। লক্ষ্যই করেন নি দরজায়

একটা বড় তালা ঝুলছে।

—কাকে চান?

দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন সুধাময়ী।

—ওরা তো এই কিছুদিন হল এখান থেকে চলে গেছে। কবে যেন ফিরবে বলে গেছে।

আরো কি কি যেন বলেছিলেন ভদ্রমহিলা, বোধহয় ও'র পরিচয়ও জিগ্যেস করেছিলেন।

একটা দুশ্চিন্তার ভার নেমে গিয়েছিল বুক থেকে। সুধাময়ী ফিরে এসেছিলেন।

মনে মনে ভেবেছেন, ছি ছি, ওর সম্পর্কে আমি এত সব কথা ভাবতে গেলাম কেন?

শুধু বুকের মধ্যে কাঁটাটা খিচখিচ করে লাগে।

একটা কাগজের টুকরোয় অপর্ণার নাম তুমি বারবার লিখেছিলে কেন? তুমি কি অপর্ণার রূপ আর যৌবনের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলে? সেই ভয়েই, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারো নি বলেই কি তুমি পালিয়ে গেলে। তা হলেও, অন্তত সেজন্যেও তুমি একবার ফিরে এসো। তোমার তো কারো ওপর মায়া নেই, ভালবাসা নেই, আমি জেনে গেছি আমার কথাও তোমার মনে পড়ে না, আমি জানি। অমু, ঝুমো, রুমা ওদের ওপর তোমার কোন টান নেই। সেজনোই তো তুমি এভাবে চলে যেতে পেরেছো। এমন কি তোমার ঐ জীবনের সাধনা, ইতিহাসের সব ধারণা পাল্টে দেবে! তোমার ঐ পড়ার ঘর, বই, মূর্তিটুর্তি, শিলালিপি, তোমার সেই অনেক কষ্টে রাজস্থানের কোন গ্রাম্য চাষীর দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে আসা বাইলিংগুয়াল সীল—কোন কিছুই তোমাকে তো আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে নি।

তুমি অন্তত অপর্ণার জন্যেও একবার ফিরে এসো। আমি দুঃখ পাবো, তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে আমি সবকিছু উপেক্ষা করবো। আমি আর কিছু চাই না, তুমি আমার আত্মসম্মান বাঁচাও। সমস্ত পৃথিবীর কাছে, নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে আমি এ-ভাবে মাথা নীচু করে থাকতে পারছি না।

এখন সত্যি সত্যি বুঝতে পারছি, পাওয়ার চেয়ে আত্মসম্মান অনেক বড়ো।

১০

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। কখনো অঝোরে, কখনো ঝির ঝির ঝির ঝির। বোধহয় সারা রাত ধরেই এমনি একটানা বৃষ্টি পড়েছে। পিছনের বস্তির টালির ছাদে ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন সুধাময়ী। আধো তন্দ্রা আধো ঘুমের মধ্যে ঐ একটানা বৃষ্টির শব্দ কখনো ঝড়ো হাওয়ার দাপটে নেচে নেচে উঠেছে, তারপর বৃষ্টির তেজ কমে যেতে যেতে একেবারে মোলায়েম আওয়াজের রেশ হয়ে ময়ূর পেখম বুলিয়ে গেছে তাঁর ঘুমের ওপর।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সুধাময়ী ভিতরের উঠোনে এসে দেখলেন—বৃষ্টি

পড়ছে, বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক সেদিনের মতই। আঃ, কতদিন আগের কথা, কিন্তু মনে হয় যেন এই সেদিন।

বৃষ্টি দেখলেই সব কথা সুধাময়ীর মনে পড়ে যায়। বুকের মধ্যে কি এক শূন্যতা গুমরে ওঠে। এমনি এক বৃষ্টির দিনেই তো তুমি চলে গিয়েছিলে। সেদিনও এমনি একটানা বৃষ্টি পড়ছিল।

উঠোনের চৌকো আকাশের দিকে, বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদাস বিষণ্ণতায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন সুধাময়ী। কি সুন্দর বৃষ্টি, কি গভীর দুঃখ মেশানো। ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। কি এক পুঞ্জীভূত ব্যথা যেন ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ছে। ঝির ঝির বৃষ্টি সুধাময়ীর চোখের সামনেই একটু একটু করে এসে এলোমেলো হাওয়ায় রেণু রেণু হয়ে উড়ছে। চামরের বাতাস হয়ে দুলছে। আবার তখনই বাড়তে বাড়তে সিমেন্টের উঠোনে বৃষ্টির বাজনা। কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে' তুমি বলেছিলে।

আহা, কি সুন্দর বৃষ্টি, কি গভীর দুঃখ মেশানো।

সুধাময়ীর সমস্ত মন উন্মনা হয়ে গেল।

কানের কাছে যেন শশাঙ্কশেখরেব কণ্ঠস্বর।—ডেক চেয়ারটা দিয়ে যা অমু।

ছেলেমানুষের মত সরল হাসি হেসে শশাঙ্কশেখর যেন বলছেন বৃষ্টি দেখবো।

এই গভীর দুঃখ মেশানো বৃষ্টির মধ্যে কি যেন আছে। কেবলি হাতছানি দিয়ে ডাকছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কোথায় কতদূরে। বোঝা যায় না, জানা যায় না। 'একটা টাকা দাও তো।' একটা টাকা নিয়ে মানুষ কোথায় যেতে পাবে, কতদূর যেতে পারে। টাকা নিয়ে কোথাও পেঁছিনো যায় না।

কিন্তু এই বৃষ্টিব মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যায়। এই অনন্ত দুঃখের বৃষ্টি। পড়ছে, পডছে। একটা অদৃশ্য রহস্যের জালের মত নড়ছে। অব্যক্ত ব্যথার মত।

হঠাৎ কলিং বেল-এর আওয়াজে চমকে উঠলেন সুধাময়ী।

—মা, আমার কেমন মনে হচ্ছে আজ হয়তো বাবা ফিরে আসবে। ঝুমা বলেছিল। কথাগুলো যেন ওর বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাসের মত বেবিয়ে এসেছিল।

সুধাময়ীর বুকের মধ্যেও তো সেই একই স্বপ্ন। তুমি যেখানেই যাও, আমাব মনে হয় কখনো কখনো যেন এই বাড়িটাকে দেখে যাও। আমাদেবও। যখন আমরা জানালায় দাঁড়াই, কিংবা ঐ রোয়াকে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে তোমাকে খুঁজি। আমাদের ওপর তোমার একটুও মায়া নেই—আমি যে ভাবতেও পারি না।

ঝুমা বলেছিল, মা, যখন প্যাণ্ডেল বাঁধা হবে, টুনি বালব্ জ্বলবে, বাবা যদি এদিক দিয়ে যায় নিশ্চয় বুঝতে পারবে আজ ঝুমার বিয়ে...

সেই কথাগুলোই কি ভাবছিলেন সুধাময়ী' ভিতরে ভিতরে স্বপ্ন দেখছিলেন শশাঙ্কশেখর ফিরে এসেছেন?

হঠাৎ কলিং বেল-এব আওয়াজে চমকে উঠলেন সুধাময়ী।

—এসেছো? যাচ্ছি যাচ্ছি।

সুধাময়ী যেন চিৎকার করে ডাকলেন, অমু, ঝুমা...

সুধাময়ী ছুটে গেলেন, সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো।

ঝট করে সদর দরজা খুলে দিলেন।

এই তো শশাঙ্কশেখর এসেছেন, ফিরে এসেছেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন সংকুচিত, লজ্জিত। নাকি অভিমান।

সুধাময়ী তাকিয়ে রইলেন, দাঁড়িয়ে রইলেন।

—আমি জানতাম তুমি ফিরে আসবে। কোথায় গিয়েছিলে, কতদূর। একটা টাকা নিয়ে মানুষ কতদূর যেতে পারে।

—এসো, ভিতরে এসো। সুধাময়ী ডাকলেন।

হাত ধরে বললেন, এসো, দ্যাখো তোমার ঘরের একটা জিনিসও আমরা সরাই নি, যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। সেই পোড়ামাটির সীল, দু'পাশে দু' রকম হরফ, স্মৃতিভ্রংশ মানুষ আজ আর কোনটাই পড়তে পারে না। দ্যাখো তোমার টেবিলে তেমনি খোলা আছে বইয়ের পাতা, সেই কলম, লিখতে লিখতে খুলে রেখে গেছো, নিব থেকে কালি চুঁইয়ে পড়েছে টেবল-ক্লথের ওপর। আমি জানতাম, তুমি ফিরে আসবে।

কলিং বেল-এর আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছেন সুধাময়ী, সশব্দে সদর দরজা খুলে দিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন অন্য কি ভেবেছিলেন, অন্য কি স্বপ্ন দেখছিলেন। বৃষ্টির মধ্যে, গভীর দুঃখের এই বৃষ্টির মধ্যে।

—মাসীমা, চিনতে পারছেন না? আমি সেই অপর্ণা?

সুধাময়ী তাকিয়ে রইলেন। কপালে বড় একটা সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। প্রথমটা চিনতেই পাবেন নি। কিংবা স্বপ্ন দেখছিলেন। ভেবেছিলেন অন্য কেউ।

—আপনি আমার খোঁজ করেছিলেন?

সুধাময়ী তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, শান্ত সংযত স্বরে বললেন, এসো।

অপর্ণার চোখ ছলছল করে উঠেছে।

মাসীমা, আমি আসতে পারি নি। আমি যে তাকে কথা দিয়েছিলাম।

—কি কথা! নির্বিকার গলায় প্রশ্ন করলেন সুধাময়ী, কিন্তু সে কথায় কোন কৌতূহল নেই। এখন আর তাঁর কিছু এসে যায় না।

—উনি বলেছিলেন, আমার তো দিন শেষ হয়ে এলো, আমার অসমাপ্ত কাজ তোমরা তুলে নাও। বলেছিলাম, নেবো, তুলে নেবো।

অপর্ণা একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, ওর গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। বললে, পারি নি মাসীমা, কথা রাখতে পারি নি। অত বড় দায়িত্ব নেবার মত যোগ্যতাই আমার নেই। আমি তো সামান্য একটা মেয়ে। সেদিন এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে।

সুধাময়ী ধীরে ধীরে বললেন, পরের দিন তুমি বোধ হয় ফোন করেছিলে।

—আমি জানতাম না, বুঝতে পারি নি। আমার তখন আর সময় ছিল না।

সুধাময়ী চপ করে রইলেন।

অপর্ণার চোখে জল।—আমি শুনেছি, সব শুনেছি। কিন্তু কোন্ মুখে আমি আপনার কাছেই বা আসবো, বলুন মাসীমা।

—অপর্ণা, তুমি বসো।

অপর্ণা বসলো না। ওর দু' চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাসের মত করে বললে, ওঁর কাছে আমার অনেক কিছু পাবার ছিল, কিছুই নিতে পারলাম না। আমার সে যোগ্যতাই ছিল না, নেই। আমি তো

সামান্য একটা মেয়ে, সকলের মতই আমি শুধু সুখী হতে চেয়েছি।

সুধাময়ী কি যেন ভাবলেন। বুকের মধ্যে কি একটা কষ্ট চাপলেন। তারপর বিষণ্ণ ব্যথার গলায় বললেন, যাবার আগে শুধু তোমার কথাই ভেবেছে।

ধীরে ধীরে বুক-শেলফের কাছে এগিয়ে গেলেন সুধাময়ী, বইয়ের পিছনে লুকিয়ে রাখা সেই কাগজের টুকরোটা বের করলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে অপর্ণার দিকে এগিয়ে দিলেন কাগজের টুকরোটা।

কোন কথা বলতে পারলেন না।

এই কাগজের টুকরোটা এতদিন কাউকে দেখাতে পারেন নি। অমু কিংবা ঝুমাকে নয়, স্বর্ণকেও নয়। এতকাল এই দুঃখটা গোপন লজ্জার মত বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কাঁপা কাঁপা হাতে অপর্ণার কাছে সেটা এগিয়ে দিলেন। এখন তো এই কাগজের টুকরোটা অপর্ণার কাছেই সবচেয়ে বেশি দামী।

অবাক হয়ে ও কাগজটা নিলো, চোখ বুলিয়েই বলে উঠলো, আমার নাম, আমার নাম! ওর দু'চোখ ভাসিয়ে দু'গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

তারপর কাগজের টুকরোটা হাতের মুঠোয় নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একটাও কথা না বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ছুটে পালালে। যেন চোখের জল আড়াল করার জন্যেই।

সুধাময়ী চুপচাপ নিথর দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মধ্যে।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চোখ-মুখে জল দিয়ে অমু ভিজে মুখখানা মুছতে মুছতে আকাশের দিকে তাকালো। ইলিশ মাছের আঁশের মত আলো মেখে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তেতলা বাড়িটার কার্নিসের ওপর দিয়ে আলো-মাখা চৌকো আকাশে বৃষ্টির স্বচ্ছ পর্দা ঝুলছে। অমু মুখের জল মুছে তোয়ালেটা টাঙিয়ে রেখে তাকিয়ে রইলো।

বাবা পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। গামছাটা বাথরুমের মধ্যে না রাখলে মা আর ঝুমা রাগারাগি করতো। বাইরের কেউ এসে দেখে ফেলবে। এ বাড়ির সম্ভ্রম খোয়া যাবে।

বাবা ঠাট্টা করে বলেছে, আমি লোকটা কি একটা তোয়ালের চেয়েও কম দামী?

সিমেণ্টের উঠোনে বেশ একটা বাজনা বাজছে, বৃষ্টির বাজনা। জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আপনা থেকেই কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল অমু। ঝুমা বোধহয় কষ্ট পাবে, আজ বৃষ্টি দেখে ওর হয়তো বাবার কথা মনে পড়ে যাবে।

তখন যতীনবাবুদের ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছিল। অমু ভেবেছে, আমি কোন ত্রুটি রাখবো না। বাবার অভাব কেউ যেন বুঝতে না পারে।

—অমু শোন্, আমার মনে হচ্ছে কি, এই প্যাণ্ডেল বাঁধা হবে, আলো জ্বলবে। টুনি বালব্ দিয়ে সাজাবি বলছিস, আর তা দেখে বাবা হয়তো ফিরে আসবে। না এসে কি পারে। ঝুমা বলেছিল।

আর অমুর তখন ভীষণ কষ্ট হয়েছে। এদের সকলের মধ্যেই একটা আশা আছে, একটা বিশ্বাস, বাবা ফিরে আসবে।

আমার মধ্যে সেটুকুও নেই, অমু ভাবলো।

আমি তো সত্যি ভাল করে দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে নি। মর্গের মধ্যে তিনটে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। বাবা এদেরই মধ্যে, এই মর্গে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে ভাবতেও কষ্ট। আমি তাই ভালো করে দেখি নি, স্পষ্ট দেখতে পাই নি।

মুর্দাঘরের ডোম ভাল করে দেখতে বলেছিল। একটা মুখ পাশ ফেরানো ছিল। চাদরটা সরিয়ে লোকটা বলেছিল, ভিতর আইয়ে।

অমু ভয় পেয়েছিল। যদি সত্যি বাবাকে দেখে ফেলে। একটু সন্দেহ তো হয়েছিলই, অমু ভাবলো, সেজন্যেই আমি ভালো করে দেখি নি, দেখতে চাই নি।

আমি শুধু আশা এবং বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি। তা না হলে তোরা সকলেই কে কোথায় ছিটকে পড়তিস। তলিয়ে যেতিস। আমি নিজেই যেমন তলিয়ে যাচ্ছি।

—এত টাকা আমাদের কিসের দরকার রে অমু, সে তো আমাদের একেবারে অসহায় রেখে যায় নি। মা বলেছিল।

অথচ মা, অমু নিজেও, ঝুমা, রুমা একদিন ভেবেছিল, এই টাকাই এই সংসারটাকে একেবারে সমাজের চূড়ায় পেঁাছে দিতে পারে। যেমন সবাই ভাবে টাকাই একটা সভ্যতাকে তার শিখরে পেঁাছে দেয়। বিলাস, ঐশ্বর্য, স্ট্যাটাস, জীবনধারণের মান। আমি নিজেও এখন তারই পিছনে দৌড়চ্ছি।

—শিক্ষা বলে এখন আর কিছু নেই রে, থাকবে না। ইস্কুল কলেজ ওগুলো শুধু ছাপ মেরে বলে দেয় কে কত টাকা রোজগার করবে। কে কত সুখে থাকবে। একে একে আমার সব ছাত্র, যাদের সম্পর্কে আমার আশা ছিল, ঐ টাকাই তাদের ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে। কেউ আর আমার পথে আসে নি। অতনু, অপর্ণা, ওদেরও আমি ধরে রাখতে পারবো না, জানি। বাবা কেমন হতাশার সংগে একদিন বলেছিল।

আজ কথাটা অমুর নতুন করে মনে পড়লো। আর মনে মনে বললে, বাবা, তুমি দেখে যাও, অতনু আছে, তোমার সেই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এখনো তোমার দেখানো রাস্তাতেই হেঁটে চলেছে।

বৃষ্টি পড়ছে, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে।

অমু ভাবলো, বাবা তো একদিন বলেছিল, সবাই একটা পরিচয় খোঁজে, আত্ম-পরিচয়। কিন্তু অমুর তো কোন নিজস্ব পরিচয় নেই। ও ভাবলো, আমি একটা সামগ্রী হয়ে গেছি। ক্রমশই আমি একটা দরজায় আঁটা নেমপ্লেট কিংবা একটা বড় মাপের সাইনবোর্ড হয়ে যাবো। সবাই তো তাই হয়, হতে চায়। একটা সাজানো ফ্ল্যাট, কিংবা সুন্দর একটা বাড়ি, টি ভি, ফ্রীজ, গাড়ি—যত রকমের উপকরণ, যা যা ছোটমেসোর আছে, অমিতেশবাবুর, যা যা নিজেকে বিক্রী করে কেনা যায়।

ডি সি ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, একটা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক চাই। কিছু একটা চিহ্ন আছে? যা দিয়ে চেনা যাবে!

অমু বলতে পারে নি। সেদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিচ্ছু মনে পড়ে নি।

এখন মনে হচ্ছে, ওসব চিহ্ন তো সবারই থাকে, ঐটেই সকলে পরিচয় বলে দেখায়। চেয়ার কিংবা উপার্জন। পাণ্ডিত্যের জন্যে কিংবা সৃষ্টির জন্যে একটা মানুষকে কেউ চিনতে চায় না, সে ইউনিভার্সিটির কোন উঁচু চেয়ারে আছে

কিনা জানতে পারলে তবেই তার সম্মান। কিংবা সে কত টাকা রোজগার করে। ওটা পরিচয় নয়, শরীরের তিলচিহ্ন কিংবা কাটা দাগের মত ওটা শুধু আইডেন্টিফিকেশন মার্ক!

বাবার ছিল একটা আইডেন্টিটি, একটা পরিচয়। ঐ পোড়া মাটির বাই-লিংগুয়েল সীলের মতই, বাবার বুক-শেলফের খোপে যেটা ঠিক তেমনিভাবেই মা সযত্নে রেখে দিয়েছে, স্মৃতিভ্রংশ মানুষ যেটা পড়তে পারে নি। এই স্মৃতি-ভ্রংশ সভ্যতাও বাবার মত মানুষদের পড়তে পারছে না। সেও ছুটছে, শুধুই অমুর মত ছুটছে। তবু এই বিশ্বাসটা বাঁচিয়ে রাখা দরকার, যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেও আছে, সেই মূল্যবান জিনিসগুলোও আছে, যে-কোনদিন হঠাৎ এসে হাজির হবে।

রুমা, তোকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল। দ্যাখ, এই বিশ্বাসটাই তোকে আগলে আগলে রেখেছে। তুই ছিটকে বেরোতে গিয়েও পারিস নি।

আঃ, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি-মাখা বাতাস লাগছে অমুর মুখে পুরনো স্মৃতির মত।

কি ভাল লাগছে রে, কি সুন্দর বৃষ্টি!

আমি একবার খুব ছেলেবয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। তোদের হয়তো মনে নেই। মা জানে। কোথায় যাবো জানতাম না। কতদূর যাওয়া যায় ভাবি নি। শুধু কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম বলে কি লজ্জা, কি লজ্জা। আত্মসম্মান জিনিসটা কত বড়, তখন ঐটুকুন বয়সে বুঝতে পারতাম, তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম। আজ বুঝি না, বুঝতে চাই না। একটা ঘুষখোর কেরানীকে আজ আমি স্যার বলি।

পালিয়ে তো গিয়েছিলাম, তারপর দিব্যি আমি ফিরে এলাম। কেন জানিস? কারণ আমি জানতাম এ বাড়িতে সবাই আমাকে চায়, সবাই উৎকণ্ঠ হয়ে আছে। আমার জন্যে তোদের চিন্তার শেষ নেই। এরই নাম ভালবাসা। আমি জানতাম, তোরা সবাই আমাকে ভালবাসিস।

বাবার কি মনে হয়েছিল, এই সভ্যতা তাকে চায় না? এই সমাজ?

—একটু তো চেষ্টা করবেন, কত রকম গ্র্যান্ট আছে। ফাউন্ডেশন আছে। একটু ধরাধরি করলেই আপনি পেয়ে যাবেন। অমিতেশবাবু একদিন বাবাকে বলেছিলেন, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ আপনাকে খুঁজে বেড়াবে না।

বাবা হেসেছিল। ঠিক সেদিন এক্জিবিশন দেখতে গিয়ে ছেলেগুলো বাবাকে ধাক্কা দিয়ে যখন উপহাস করে উঠেছিল, তখন যেমন ছেলেমানুষি হাসি হেসে-ছিলেন। বাবা ছেলেমানুষি হাসি দিয়ে সব জয় করতে চাইতো, অমুর মনে আছে।

আজ সে জন্যেই তো অমুর এত কষ্ট। ওরাও তো কোনদিন বাবাকে দাম দিতে পারে নি। সবাই যেভাবে দামী হয়ে ওঠে, মা আর ঝুমা সেভাবেই বাবাকে দামী করে তুলতে চেয়েছিল।

অমু মনে মনে ভাবলো, আজ মা'র খুব কষ্ট, ঝুমার খুব কষ্ট।

অযত্নে অবহেলায় কিংবা দামী জিনিসটাকে চিনতে পারছে না বলে যদি কোনদিন শিকড়টা শুকিয়ে যায়, কিংবা হারিয়ে যায়, তাহলে কি এই উজ্জ্বল সভ্যতার বুকের ভিতরটাও এমনি হাহাকার করে উঠবে? অমু জানে না, অমু জানে না।

সকাল থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি বৃষ্টি। সকাল থেকেই ঝুমার মন আজ তাই উন্মনা হয়ে উঠেছে। এই দিনটা ওর মনে হয়েছিল কত আনন্দের। সেই ছেলেবেলা থেকে এই দিনটিকে ঘিরে কত স্বপ্ন বুনে এসেছে।

বাবার ওপর এক সময় ওর মনে একটা লুকোনো অভিযোগ ছিল। আপন-ভোলা মানুষ নিজেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। কি যেন খুঁজে বের করবে। কিন্তু সংসারের দিকে তো তাকাবে মানুষটা। আর পাঁচজনের মত তো হতে হবে। তা না হলে কেউ তোমাকে দাম দেবে না। জ্ঞান কিংবা গুণের কোন দাম নেই যদি না সেটা টাকার অঙ্কে তোমার বিলাসে বৈভবে প্রমাণ করতে পারো।

প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে সামনে ফুটপাথ জুড়ে। যতীনবাবুদের ছাদে। অমু বলেছে টুনি বালব্ লাগানো হবে। সানাই!

আজ তো ঝুমার খুশি হয়ে ওঠার দিন। কিন্তু পারছে না, কেবলই বাবার কথা মনে পড়ছে।

বৃষ্টি, অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে আজ। ঠিক সেদিনের মতই।

ঝুমা ভাবছে, রাস্তায় জল জমে যাবে, বাবার আসতে কষ্ট হবে, যদি আসে। ঝুমার মন বলছে, আজ বোধ হয় বাবা ফিরে আসবে। সাজানো প্যাণ্ডেল, সানাই, টুনি বালবের আলো এসব দেখে কি বাবা না এসে পারবে!

সেই স্কুলে পড়ার সময় তুমি আমার জন্মদিনে আসতে পারো নি। কিন্তু বলেছিলে, যেখানেই যাই, যতদূরেই যাই, ঝুমার বিয়েতে আসবো না, তা কি কখনো হয়?

বাবা, আজ তোমার ঝুমার বিয়ে।

—কোথায় আর যাবো, কোথায় আর যাবার আছে। বাবা বলেছিল। মা'র কাছে কতবার শুনেছে ঝুমা।—ন'টার মধ্যেই ফিরে আসবো। বাবা বলেছিল।

ন-টার মধ্যেই! কথাটা যেন কানে লেগে আছে।

ওর সঙ্গে মা'র কতদিন চোখাচোখি হয়ে গেছে। দূরের ট্রাম ডিপোর ন-টার ঘন্টা পড়তেই মা চমকে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মা চোখ নামিয়ে নিয়েছে, ঝুমা চোখ নামিয়ে নিয়েছে।

বাবা, তোমাকে হারিয়ে আমাদের বড় কষ্ট।

সেজন্যেই তো আমাকে মুখে হাসি আনতে হয়, সাজ-পোশাকে নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে হয়, যাতে ভিতরের শূন্যতা কেউ বুঝতে না পারে।

ঠিক আজকের সভ্যতার মতই।

এমনি বৃষ্টির দিনেই বাবা চলে গিয়েছিল। কিসের অভিমানে, ওরা কেউ জানে না, কারণ কোনদিনই ওরা জানতে চায় নি।

কিন্তু ঝুমার মন বলছে, বাবা ফিরে আসবে।

মা বলেছিল, আলোককে আমার ভালই লাগে, বেশ সাদাসিধে। ও যখন চাইছে ।

ঝুমা বলেছিল, ওসব আমি এখন ভাবতেই পারছি না, মা। বাবা যদ্দিন না ফিরে আসে...

মা আর অমু ওকে রাজী করিয়েছে।—বাবা যেখানেই থাক, সেখান থেকেই বাবা আশীর্বাদ করছে, তুই বিশ্বাস কর ঝুমা।

কিন্তু ঝুমার ভিতরে ভিতরে তো সে জন্যেই আরো কষ্ট। রুমার কথা

মনে পড়ে। ওর মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। রুমার ভালবাসা তো আমি ভেঙে দিয়েছি—কোন্ মুখে ওর সুখ কেড়ে নিয়ে নিজে সুখী হওয়ার স্বপ্ন দেখবো। কিন্তু জীবনদা তো একটা স্কাউন্ড্রেল।

এক একবার তাই অতনুর কথাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আহা, রুমার ভালবাসাকে আবার যদি নতুন করে গড়ে দেয়া যেত। ঐ তো অতনু হাসতে হাসতে রুমার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু রুমার মুখ এখনো থমথমে। অতনু বোধ হয় ওকে হাসাবার চেষ্টা করছে।

—রুমা, আমার শাসনটা কিছু নয় রে, ওটা ভালবাসা। তুই আমার মতই বিশ্বাস রাখ, বাবা ফিরে আসবে। তা হলেই আর ভয় নেই।

—কোথায় আর যাবো, ন'টার মধ্যেই ফিরে আসবো। বাবা বলে গিয়েছিল।

ঝুমার নিজেরও কেমন মনে হচ্ছে, বাবা হয়তো আজ ফিরে আসবে।

বাবা বলতো, সভ্যতাও নাকি এই রকমই। পিতার মত কেউ আছে। কিছু আছে। যা মূল্যবান, সেটাকে চিনে নেওয়া চাই, দাম দেওয়া চাই। তবেই আর সব কিছু। যেদিন সেটা থাকবে না, সেদিনও বিশ্বাস রাখতে হয়, আছে। কোথাও আছে, তা না হলে এই তেরতলা বাড়ি, উজ্জ্বল আলো, এই উপকরণের সভ্যতা ভবিষ্যতে একটা ভীষণ সুন্দর প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।

এখন সন্ধ্যা নেমেছে। একটু একটু করে অন্ধকার বাড়ছে।

আজ সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে। এখন ঝির ঝির ঝির ঝির আলো-অন্ধকার মাখা বৃষ্টি পড়ছে। আলোর নীচে রুপোর তারের মত বৃষ্টি ঝিলিক দিচ্ছে। ওদিকে অন্ধকারে ঝাঁক ঝাঁক কালো কালো রেখা বৃষ্টি হয়ে ঝরছে।

ছাদের পাণ্ডেল আলোয় আলো।

সুধাময়ী কিছু কি দেখছেন, নাকি শুধুই তাকিয়ে আছেন ঝুমার দিকে। মন অন্য কোথাও, অন্যখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

যতীনবাবু, বাড়িওয়ালা যতীনবাবুদের ছাদে ত্রিপল টাঙানো হয়েছে। ত্রিপলের ওপর কুরুর কুরুব বৃষ্টির আওয়াজ। কিন্তু সুধাময়ীর কানে যাচ্ছে না।

স্বর্ণ আর রেবতী খুব সেজে এসেছে। কোঁচানো ধুতি আর চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবিতে রেবতীকে বেশ ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে বয়েস যেন অনেক কমে গেছে। স্বর্ণ অনর্গল কথা বলছে, হাসছে।

ঝুমার মনের মধ্যে কোন সাজ নেই, সুধাময়ী জানেন।

এত আলো, সাজ-পোশাক, সানাইয়ের শব্দ, সেন্টের ফিকে সুগন্ধ, সবাই ভিড় করে এসেছে, কথা বলছে হাসছে। আর সুধাময়ীর মনে হচ্ছে, আমাদের শোফা-কৌচে সাজানো বসার ঘবখানার মত সবকিছুই যেন অর্থহীন।

সুধাময়ী কান্না চেপে রেখেছেন।

আলোক, তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

পিঁড়ির ওপর বসে আছে ঝুমা। সুধাময়ী বুকে কষ্ট চেপে রেখে পরম স্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঝুমার পাশেই অমু হাঁটু মুড়ে বসে আছে।

সুধাময়ী তাকিয়ে আছেন, অনিমেষ তাকিয়ে আছেন।

পুরোহিত ঝুমাকে কি একটা মন্ত্র বলতে বলছে।

ঝুমা কিছু বলছে না, নাকি বলতে পারছে না। ও শুধু মুখ নীচু করে আছে।

—বল ঝুমা, কি বলতে বলছেন। অমু বলে উঠলো।

আর তখনই হঠাৎ যেন তন্ময়তা ভেঙে ঝুমা অমুর হাতখানা টেনে নিল, অমুর কবজি উল্টে, কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখলো।

সুধাময়ী তাকিয়ে দেখছিলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

অমু, কি হল তোর? তুই ওখান থেকে উঠে কোথায় যাচ্ছিস! তোর চোখে জল কেন? ও কি, তুই ছেলেমানুষের মত কাঁদছিস কেন। দ্যাখ, আমি কত শক্ত হয়ে আছি। আমি তো কাঁদি নি। যা গেছে সে তো আমারই, আমার চেয়ে বেশি কারো নয়। সুধাময়ী ভাবলেন।

কোথায় যাচ্ছিস অমু? এই ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে তুই কোথায় যাবি!

জানি জানি, তোর বড় কষ্ট, আমি জানি। আমার তো মাঝে মাঝেই সন্দেহ হয়েছে, তোর মুখের দিকে তাকালেই আমার কেমন ভয়-ভয় করতো। মনে হত তুই কি যেন গোপন করতে চাস। আমি তো মা, তোর মুখের দিকে তাকালেই আমি টের পাই।

অমু, তোর বুকের মধ্যে তোর কষ্ট চেপে রাখ। অপর্ণাকে নিয়ে একদিন আমি যেমন আমার কষ্ট চেপে রেখেছিলাম। কাউকে বলতে পাবি নি। ওঁর গায়ে কোন দাগ লাগতে দিই নি। ঝুমা-বুমার আর কিছু না থাক, অন্তত বিশ্বাসটুকু থাক. ওরা মনে মনে ভাবুক, বাবা ফিরে আসবে।

যা অমু, এই বৃষ্টির মধ্যে, এই গভীর দুঃখের ঝির ঝির বৃষ্টির মধ্যে তুই গিয়ে দাঁড়া। তোর সমস্ত দুঃখ ধুয়ে-মুছে যাক।

আছে, কোথাও আছে, একদিন ফিরে আসবে, এই বিশ্বাসটা অন্তত থাকতে দে। উনি বলতেন, এই বিশ্বাসটা না রাখলে এই উজ্জ্বল সভ্যতাও কোনদিন হয়তো ভিতরের শূন্যতার জন্যে এমনি হাহাকার করে উঠবে।

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

গেস্ট হাউসের পিছন দিকে এক টুকরো চৌকো বারান্দা আছে। রোদ আসে। তার পরেই একটা নীচু উঠোন। অনুপম গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে বেতের চেয়ারটায় পা গুটিয়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল ঐ বারান্দায়। ও এমনিতেই বড্ড শীতকাতুরে। তার ওপর বয়স হচ্ছে।

অনীতার বোধহয় শীতটীত লাগে না তেমন। মেয়েদের সত্যি শীত কম লাগে, না ওটা ওদের বাহাদুরি অনুপম ঠিক বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেই বলেছিল, এবার শীত একটু বেশী পড়েছে, না অনু?

সঙ্গে সঙ্গে অনীতা বলে উঠলো, না মশাই না, আসলে বুড়ো হচ্ছো।

শুনে হাসেনি অনুপম। যেন অনীতার বয়স বাড়ছে না। আসলে অনীতাও এখন ছেলের সঙ্গে দল পাকাচ্ছে। এই জায়গাটা ওরও আর ভাল লাগছে না।

কিন্তু কলেজ থেকে ছুটি পেলেই অনুপম এখানেই পালিয়ে আসতে চায়। বেশ নির্জন নিরুপদ্রব। মুসাবনি হলুদপুকুরের খবর এখনো বেশি লোক পায় নি। পেলেও বাড়িঘর কম, এসে ভিড় জমানোর উপায় নেই। রাখা মাইন্সের ঐ দিকটায় গেলে কেমন একটা রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ লাগে। চতুর্দিকে বনজঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, আর ফাঁকে ফাঁকে দূরে দূরে এক একটা দোতলা-সমান উঁচু শ্যাওলাধরা নিঃসঙ্গ দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন কোনো ধ্বংসস্তূপের মত। আসলে এককালে এখানে বড় বড় বাড়ি গজিয়ে উঠেছিল তামার খনি ঘিরে। কোম্পানী ফেল মেরে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার পর বাড়িগুলো একে একে ধসে পড়েছে, দাঁড়িয়ে আছে জেলখানার উঁচু পাঁচিলের মত কয়েকটা ছন্নছাড়া দেয়াল।

জায়গাটা যে-কোনো শহুরে মানুষকে মুগ্ধ করবে। রোপ-ওয়ের বাকেটের সারি চলছে ঝিরঝির আওয়াজ তুলে, বাতাসে ধাতব গন্ধ। কপার ওর, রক ফসফেট, অ্যাসবেসটস, কোয়ার্টজাইট। কায়ানাইট পাথরের সাদা আর সবুজের আভা। দূরে শুঁড়গি পাহাড়, নদীর নাম শাঁখ। আর সারা অঞ্চল জুড়ে অরণ্যের ছায়া।

এখানে এই গেস্ট হাউসে এসে পেঁাছলেই অনুপমের মনে হয় সারা পৃথিবী থেকে ও ছুটি পেয়েছে। এক নাগাড়ে সেই মুখস্থ বুলি আউড়ে, বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের সামনে একই লেকচার দিতে দিতে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এখানে এলে মনে তবু কিছুটা রঙ লাগে।

অনুপমের কলেজের এক প্রাক্তন ছাত্রের দিশী মদের ডিস্টিলারি আছে এখানে, ব্যবসার প্রয়োজনে তাই একটা গেস্ট-হাউস বানিয়ে রেখেছে। সেই সুবাদে দু'তিন বছর অন্তর অনুপম সপরিবারে বেড়াতে আসে। ভাড়া লাগে না, মুসলমান ছাত্রটির খুব শ্রদ্ধাভক্তি ওর ওপর।

অসুবিধে যে কিছু নেই তা নয়। এক অসুবিধে, খবরের কাগজ এসে পেঁাছয় বেলা এগারোটায়। সকাল থেকে তাই কোনো কাজই থাকে না, সময় কাটানো এক দুরূহ ব্যাপার। অনুপম অবশ্য যথারীতি এক বাণ্ডিল পরীক্ষার খাতা নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে-সব খুলতে ইচ্ছেই করে না।

সকালের দিকে দ্বিতীয় কাপ চায়ের পর একবার বেড়াতে বের হয়, কিন্তু আগের দিন একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে ভিতর-বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে

রোদ পোয়াচ্ছিল। দ্বিতীয় কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে গায়ে চাদর জড়িয়ে সকালের রোদে বসে থাকার মত আরাম ছেড়ে কে আর উঠতে চায়। বেড়ানো মানে তো এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে শুধু খানিকটা হেঁটে আসা।

অন্যদিন হলে, অর্থাৎ হাটের দিনে ততক্ষণে অনীতা তিন-তিনবার তাড়া দিয়ে ফেলতো, রাগারাগি করতো, বলতো—দুটোর আগে আজ ভাত পাবে না, বলে রাখলাম। আজ আর সে ঝামেলাও নেই। অথচ থাকলে অনুপম খুশীই হতো। ওর মন আজ হাটের মধ্যেই পড়ে আছে।

সেই দৃশ্যটাই ও বার বার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল।

এদিকে একটা মোরগ অনেকক্ষণ থেকে মাথার ঝুঁটি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যাত্রা-দলের রাজার মত পা ফেলে ফেলে কেবলই ঘরে ঢুকতে চাইছে। মুখে 'হাট্ হাট্' শব্দ করলেও, মোরগটা ভয় পাচ্ছিল না, বরং উঠোনের মুরগীটা আর তার সবে রোঁয়াগজানো পাঁচ-ছ'টা ছানা শব্দ শুনে তড়বড় করে ছুটে পালাচ্ছিল।

চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অনুপম ডাকলো, বাপ্পা! হাসু!

কেউ সাড়া দিল না।

আসলে চেয়ারের ওপর পা গুটিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিল অনুপম, উঠতে হলে ওকে অনেক কসরত করতে হবে। তাই এবার একটু জোরেই বাপ্পাকে ডাকলে।

অনীতা এসে বললে, কেন ডাকছো ওকে, ওর এমনিতেই মেজাজ ভাল নেই।

—কেন? অবাক হয়ে অনুপম জিগ্যেস করলে।

অনীতা বললে, কেন আবার, ওর এখানে ভাল লাগছে না।

ওঃ, তাই ক'দিন থেকেই বাপ্পার মুখ গম্ভীর। কলকাতায় কি যে নেশা আছে ওই জানে। কিংবা সদ্য কলেজে ঢুকেছে, হয়তো কলেজের বন্ধুদের নেশা।

তবু বললে, এমন চমৎকার জায়গা, এত সব জঙ্গল-টঙ্গল...

অনীতা হেসে বললে, তুমি বুড়ো হচ্ছো, বাণপ্রস্থে যাওয়া প্রাকটিশ করে নিচ্ছো, ও বেচারী তো সবে আঠারো।

'বুড়ো হচ্ছো', কথাটায় এতদিন বেশ মজা পেয়েছে ও। কিন্তু গতকাল হাটের মধ্যে যা ঘটে গেছে তার পর থেকে ওর আবার যুবক হতে ইচ্ছে করছে। তাই অনীতার কথাটা শুনে অনুপম হাসতে পারলো না। কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

অনীতা হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ অনুপমের মুখটা এবারও গম্ভীর হতে দেখে ও থেমে পড়লো। তারপর নিজের মাথাটা অনুপমের সামনে নুইয়ে বললে, দেখুন স্যার দেখুন, আমারও একটা চুল পেকেছে। এবার থেকে আমিও রাশভারী হবো।

অনীতার কথা শুনে, আর সত্যি সত্যি তার মাথায় সেই লম্বা সাদা চুলটা খুঁজে পেয়ে অনুপম বললে, আরে সত্যি তো। খুব লুকিয়ে লুকিয়ে রাখছিলে বাবা। না কি আগেও তুলে ফেলেছো?

অনীতা রেগে গিয়ে বললো, কক্ষনো না। তা হলে এটাও দেখাতাম না।

অনুপম ওর রাগ দেখে জোরে হেসে উঠলো, ছেলেমেয়েদের দেখাবার জন্যে চিৎকার করে ডাকলে, আরে বাপ্পা! এই হাসু!

বাপ্পা ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে এলো।—বাবা!

আঠারো বছর বয়সের ছেলের সামনে এইসব ইয়ার্কি অনীতার একদম পছন্দ হয় না। ও তাই কটাক্ষে ধমক দিয়ে সরে পড়ছিল। তার আগেই বাপ্পা হাঁপাতে

হাঁপাতে বললে, বাবা, তোমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন, সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা।

ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অনুপম। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার সঙ্গে? কোথায়?

বাপ্পা এমনিতেই একটু চঞ্চল প্রকৃতির। তার ওপর ইতিমধ্যেই অনুপমের কাঁধ ছাড়িয়ে প্রায় কান ছুঁই ছুঁই। যখন হাঁটে লম্বা লম্বা পা ফেলে, মনে হয় দৌড়চ্ছে। একসঙ্গে বেড়াতে বের হলে অনুপম আজকাল আর সমানে তাল রাখতে পারে না। খিড়কির উঠোনের দিক থেকে এসে ওর সদরের বারান্দায় পেঁছতে পেঁছতেই বাপ্পা একেবারে বাগান ছাড়িয়ে লোহার ফটকের সামনে। বোধহয় এতক্ষণে ওঁদের ডেকে আনার কথা মনে হয়েছে। ছেলেটা আচ্ছা বোকা, তখনই ডেকে এনে বসতে বলবি তো!

প্রথমে ভদ্রমহিলার দিকেই চোখ গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের সমস্ত মন দারুণ খুশী হয়ে উঠলো। এতখানি আশা করা ওর কল্পনারও বাইরে ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু অস্বস্তি বোধ করলো। চোখ সরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালো ও। দ্রুত এগিয়ে গেল নিজেও।

ভদ্রমহিলাকে চিনতে ওর একটুও অসুবিধে হয়নি। হয়নি বলেই ওর লজ্জা আর অস্বস্তি। কারণ এই একটি জায়গাতেই ওর মনের মধ্যে একটা গোপন অভিমান লুকিয়ে আছে।

—সেদিন হাটে আপনি বোধহয় আমাকে চিনতেই পারেন নি। ভদ্রমহিলার কথাগুলো উত্তেজনায় আব চাপা লজ্জায় কেমন কেঁপে কেঁপে গেল। মুখচোখে অপ্রতিভ ভাব ফুটে উঠলো।

অনুপমের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তবু অস্বস্তি ঢাকবার চেষ্টা করে স্বাভাবিক হতে চাইলো।

স্ত্রীর কথায় ভদ্রলোক ততক্ষণে হেসে উঠেছেন। তিনি হাসতে হাসতেই বললেন, এখন চিনতে পারছেন কিনা জিগ্যেস করবে তো!

এবার অনুপমের সঙ্কোচ খানিকটা কেটে গেল। ও সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললে, না না, একবার মনে হয়েছিল। আসলে সেদিন চশমা ফেলে গিয়েছিলাম। আজকাল দূরের জিনিস একটু ঝাপসা দেখি।

বলে অনুপম বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। বললে, আসুন আসুন।

—উঁহু। আগে বলুন আমি কে?

যেন সত্যিই অনুপম সেদিন ওকে চিনতে পারেনি। যেন কোনোদিন ওকে অচেনা লাগতে পারে!

অনুপম হেসে উঠলো। বললে, কি আশ্চর্য, তুমি অঞ্জলি।

—যাক্, মনে আছে তা হলে। অঞ্জলি সপ্রতিভ হাসি হাসল। —সেদিন হাটে আমাকে দেখেও মনে হলো চিনতে পারেন নি, মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন।—তুমি নিজেও তো ডেকে কথা বলতে পারতে। শুধু ওঁকে দোষ দিচ্ছো কেন!

অনুপমও হাসলো। কথা বলতে বলতে বসার ঘরে এসে পড়লো ওরা। ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন।—জিওলজিস্টের চাকরি, ইন্সপেকশনে এসেছি কয়েক মাসের জন্যে।

অনুপম দেখলো হাসু কপাটের ধারে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে দেখছে

অঞ্জলিকে। বললে, এটি আমার মেয়ে। তারপর তাকেই বলল, হাসু, যাও তো, মাকে ডেকে আনো। বাপ্পার দিকে দেখিয়ে বললে, এই বড় ছেলে। বাপ্পা। ছোট ছেলেটি এলো না, মামার-বাড়িতে আছে।

অঞ্জলি চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। বললে, বাড়িটা চমৎকার।

অনুপম মৃদু হেসে একবার তাকালো অঞ্জলির চোখে চোখ রেখে। বললে, বসো তোমরা, আসছি।

দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে এসে হাজির হলো। গিয়ে দেখলো বাপ্পা হাসু আর অনীতা জটলা শুরু করেছে চাপা গলায়। কানে এলো হাসু চোখ পাকিয়ে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলছে, কি মিষ্টি দেখতে মা বউটাকে! ও কে মা?

অনীতা আটপৌরে একটা শাড়ি পরে রান্না করছিল. হাতে হলুদের ছোপ। ও তাই একটু বিরক্ত হয়েছিল। অনুপম যেতেই জিগ্যেস করলে, কে এসেছে? তোমার ছাত্রীটাত্রী কেউ?

অনুপম হাসলো।—আরে না না। ছেলেবেলায় আমরা সিমলা স্ট্রীটে থাকতাম, শুনেছো বোধহয়। তখন মেয়েটিও ও পাড়ায় থাকতো, বিলুর বন্ধু ছিল।

বিলু অনুপমের ছোট ভাই।

অনীতা মুখ বিকৃত করে বললে, সকালবেলায় কেন যে আসে কাজের সময়। বলে বোধহয় শাড়ি বদলাতে যাচ্ছিল। তার আগেই অঞ্জলি এসে হাজির।

হাসতে হাসতে বললে, তোমার সঙ্গেই তো আলাপ করতে এলাম, আর তোমারই দেখা নেই। হাসুকে জড়িয়ে ধরে বললে, তোমার মেয়ে কি ঠাণ্ডা, আমারটা একেবারে ডানপিটে।

বলে রান্নাঘর দেখলো, উঠোন বারান্দা, একেবারে বেডরুম অবধি। জানালার পর্দার প্রশংসা করলো। বিছানার চাদরে হাতের উল্টোপিঠ ঘষতে ঘষতে বললে, খুব সুন্দর তো ডিজাইনটা।

মুহূর্তের মধ্যে অনীতার সব অস্বস্তি কেটে গেল। যেন কতদিনের বন্ধু। অথচ অনুপমের তখনো মনে হচ্ছে অঞ্জলি আর ওর মধ্যে যেন একটা বিরাট পাঁচিল। কিছুতেই একেবারে স্বাভাবিক হতে পারছে না।

বসার ঘরে বসে অঞ্জলির জিওলজিস্ট স্বামীর সঙ্গে গল্প করছিল অনুপম। আর ওধার থেকে তার হাসি আর কথার টুকরো ভেসে আসছিল। ওর মনের মধ্যে একটা খুশীর হাওয়া বইছিল। অঞ্জলি এসেছে, অঞ্জলি এসেছে।

ফাইফরমাস খাটার জন্যে যে দেহাতী বাচ্চা মেয়েটা আছে, বুধলি, তাকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন হাটে গিয়েছিল অনুপম। এই সব সাঁওতালী হাটে গিয়ে মাছ ডিম শাকসবজি কেনার চেয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে বেশ ভাল লাগে ওর। তকলিতে কাটা রঙে ছোপানো লাল লাল সুতোর গোছা মেলে রেখে দোকান সাজায় কেউ মাটির ওপর, কারো কাছে রাশি রাশি রঙ-বেরঙের পুঁতির মালা, তামার তাবিজ, কিংবা রুপোর জল দেওয়া দস্তার গয়নাগাটি। হাত-কাটা মহাজন মেওয়ালালের দোকানে সাঁওতাল মেয়েদের ভিড়। সেখানে মিলের কাপড়। জুট ফ্লানেলের জামা। কুটকুটে কম্বল। কোথাও বা বাঁশতাঁতে বোনা মোটা মোটা শাড়ি চাদর, বেটেগ শার্ট ব্লাউজ। খাদের রোজ পেয়ে কুলিরাই ভিড় জমায় বেশী। একজনের কাছে কাঁচপোকার রাশি, কাঁকড়াবিছের তেল, আরো কত কি। সাঁওতাল মেয়েরা এ ওর কোমর জড়িয়ে

রসিকতা করে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে।

আরেকদিকে শাকসবজির হাট, ঝিঙে বেগুন টমাটো। আর সবারই হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা দু' চারটে মুরগী।

এটা-ওটা কিনতে কিনতে হঠাৎ দূরে চোখ গেল অনুপমের। এ হাটে মাঝে মাঝে দু-একজন শহুরে মেয়ের দেখা মেলে না এমন নয়। কিন্তু অঞ্জলির দোহারা দীর্ঘ চেহারার দিকে চোখ না গিয়ে উপায় ছিল না। একটা নক্শাকাটা সুন্দর থলি হাতে নিয়ে জিনিস কিনছিল ও। ঝিঙের হিসেব মিটিয়ে হঠাৎ অঞ্জলি ফিরে তাকালো আর অনুপমের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের সমস্ত শরীরে একটা পুলকের শিহরণ খেলে গেল। একটা অবর্ণনীয় বেদনা মিশে রইলো সেই চমকের সঙ্গে।

বুকের মধ্যে আজও কেমন টনটন করে উঠলো অঞ্জলির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই। এই এত বছর বাদেও।

অনুপম যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবু ও তাকিয়ে থাকতে পারলো না, চোখ সরিয়ে নিল অপ্রতিভভাবে।

তারপর তাড়াতাড়ি হাট সেরে চলে এলো। কিন্তু ওর মন পড়ে রইলো ঐ হাটের মধ্যেই। কি আশ্চর্য, অঞ্জলি তো কলকাতাতেই থাকে, কিন্তু দেখা হলো কিনা এই নির্জন দ্বীপে! তবু প্রচন্ড অভিমনের ভারী পাথরটা ও সরিয়ে দিতে পারলো না।

ভাবতেই পারেনি সেই অঞ্জলি নিজেই এসে হাজির হবে এই গেস্ট হাউসে।

ওরা যখন বিদায় নিয়ে উঠলো, স্থিরচোখে অঞ্জলিকে দেখলো অনুপম। চোখ নামিয়ে নিল অঞ্জলি। সে চোখ যেন কত কি বলার কথা লুকিয়ে রেখেছে।

অনুপম দেখলো ও তেমনি দীর্ঘাঙ্গী। তখন হয়তো একটু রোগা ছিল। এখন নিশ্চিন্ত সুখের স্পর্শে দোহারা সুন্দর শরীর। চোখ দুটি এখন শান্ত।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে দিতে এলো অনুপম আর বাপ্পা।

হাঁটতে হাঁটতে অনুপম এক সময় লক্ষ করলো, বাপ্পাকে খাদ চেনাতে চেনাতে এগিয়ে চলেছেন অঞ্জলির জিওলজিস্ট স্বামী। একটা পাথুরে চাঙড় তুলে নিয়ে বলছেন, এই সোনালী সোনালী ফাইবার, বুঝেছো বাপ্পা, এই হলো কপার পাই-রাইট। তামা—তামা।

অঞ্জলি স্বামীর কথা শুনতে পেয়ে অনুপমের দিকে তাকালো, হাসলো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ধীরে ধীরে বললে, আপনি তো এখন দূরের জিনিস ঝাপসা দেখেন।

অনুপমের মনে পড়লো এই কথাটা ও নিজেই বলেছিল হাটে কথা না বলার অজুহাত হিসেবে।

অদ্ভুত এক আনন্দের ফোয়ারায় স্নান করলো অনুপম। বললে, বিশ্বাস করো অঞ্জলি, আমার সাহস হয়নি।

অঞ্জলির গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো। চাপা আবেগে ও বলে উঠলো, ভয় করে করে সমস্ত জীবনটাই তো কেটে গেল, তাই না, বলুন?

চুপচাপ ওরা পাশাপাশি হেঁটে চললো। হেঁটে যেতে যেতে অঞ্জলি হঠাৎ বললে, কত দিন বাদে, কত দিন...কুড়ি বছর।

অনুপম প্রতিধ্বনি তুললো, কুড়ি বছর। দীর্ঘশ্বাস ফেললে ও। তারপর হাসবার চেষ্টা করে বললে, কে বিশ্বাস করবে এই প্রথম আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছি।

অঞ্জলির গলার স্বর কান্নার মত মনে হলো। বললে, কুড়ি বছর ধরে আমি আপনার সঙ্গে মনে মনে কথা বলেছি।

২

অনুপমের বুকের মধ্যে কোথায় কি ভূমিকম্প ঘটে গেছে তার খবর কেউ রাখে না। কিন্তু অঞ্জলির দেখা করতে আসার এই তুচ্ছ ঘটনাটা যেন স্থির জলের দীঘিতে এক টুকরো নুড়ি ছুঁড়ে দেওয়ার মত সারা বাড়িটায় আলোড়ন আনলো।

রণেনবাবুকে অনুপমের বেশ ভালই লাগলো, অঞ্জলির খুব বংশবদ। ভদ্র, বিনয়ী এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ভদ্রলোক জিওলজিস্ট, কলকাতাতেই তাঁর হেড-অফিস, কোম্পানীর কয়েকটা ফিল্ড আছে এদিকে, তাই মাসকয়েকের জন্যে ইন্সপেকশনে এসেছেন। যে বাড়িটায় এসে উঠেছেন ওঁরা, হাটে যাওয়ার পথে বহুবার দেখেছে অনুপম।

খানিকটা এগিয়ে দিতেই রণেনবাবু থেমে দাঁড়িয়ে বলেছেন, এবার ফিরে যান অনুপমবাবু, বলে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করেছেন।—আর এগোলে আবার আপনাদের পেঁৗছে দিতে আসবো। বলে হেসেছেন নিজের রসিকতায়।

অনুপম আর বাপ্পা দাঁড়িয়ে পড়েছে। রণেনবাবু আর অঞ্জলিকে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে এগিয়ে যেতে দেখেও অনুপম নির্লজ্জের মত অপেক্ষা করেছে কিছুক্ষণ। আর তখনই হেঁটে যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়েছে অঞ্জলি। অনুপমের চোখে চোখ মেলে যেন একটা করুণ হাতছানির ভাষায় কথা বলেছে অঞ্জলির দৃষ্টি। এই বয়সেও অনুপমের বুক ব্যথায় কনকন করে উঠেছে।

অঞ্জলিকে ও বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। দেখা না হলে, এভাবে কথা না বললে অনুপম জানতেই পারতো না যে অঞ্জলিকে ও এত যত্ন করে বুকের কোণে তুলে রেখেছে।

অঞ্জলির সঙ্গে চোখাচোখি হবার পরই কি মনে হতে বাপ্পার মুখের দিকে তাকালো ও। বাপ্পার মধ্যে ও যেন সেই ফেলে-আসা বয়েসটা দেখতে পেল, সেই পবিত্রতা। মনে মনে বলতে ইচ্ছে হলো, অঞ্জলি, তুমি এখনো সেই পবিত্র দেবনাগরীর মত। তোমার চোখের ভাষায় আমি এখনো মন্ত্র হয়ে উঠি।

ফিরে আসার পথে অনুপম একটিও কথা বললো না। বাপ্পার সঙ্গে কথা বলে নিস্তব্ধতা ভাঙতে ইচ্ছে হলো না। ওর শুধু অনুশোচনা হলো সেদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়েও ও কেন কথা বলেনি। ওর এখন অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে, অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

অনুপম মনে মনে বললে, আমি এখনো সেই আঠারো-উনিশেই রয়ে গেছি। মনে মনে বললে, ইচ্ছের কোনো বয়েস নেই। 'কতদিন বাদে, কতদিন...কুড়ি বছর', অঞ্জলির গাঢ় স্বর ওর কানে বাজলো।

বাড়ি ফিরে অনুপম একটু নির্জনতা চাইছিল, স্মৃতির মধ্যে ডুব দিতে চাইছিল।

কিন্তু তখন অঞ্জলি আর রণেনবাবুকে ঘিরে কলরব উঠেছে।

হাসু অনুযোগ করলে, দাদা তুই একটা কি, আমাকে নিয়ে গেলি না কেন।

মাসীমা কি ভাল। কি চমৎকার কথা বলেন!

অনীতা আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বললে, রণেনবাবু লোকটাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। একেবারে গোবেচারী ভালমানুষ।

বাপ্পা বাধা দিল।—না মা, উনি খুব সিরিয়াস টাইপের, বক্সাইট নিয়ে দারুণ ইণ্টারেস্টিং সব কথা বলছিলেন।

হাসু ধমক দিল।—থাম্ তো দাদা, তোর সব সময় পড়ার কথা।

অঞ্জলি যে ওদের সংসারে আলোড়ন এনেছে, এতখানি মুগ্ধতা সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে, দেখে খুব মজা লাগছিল অনুপমের। অদ্ভুত লাগছিল। অঞ্জলি—ওর আঠারো বছর বয়সের চোখে দেখা সেই কিশোরী মেয়েটি যেন সারাক্ষণ ওর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। কতই বা বয়েস হবে এখন অঞ্জলির, মনে মনে হিসেব করলো, সাঁইত্রিশ...হয়তো ছত্রিশ...ছত্রিশ বছর বয়সের অঞ্জলি এইমাত্র চলে গেছে, পিছনে ফেলে রেখে গেছে সেই সতেরো বছরের কিশোরী মেয়েটিকে।

দুপুরে খাওয়ার পর প্রতিদিন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটায় ও। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে বিছানায় রোদ্দুর এসে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে এই রোদ্দুরে পিঠ দেওয়ার মত আরাম নেই। তবু ঘুমোতে ইচ্ছে হলো না অনুপমের, ঘুমোতে পারলো না।

সকালে ভেবে রেখেছিল দুপুরে পরীক্ষার খাতার বাণ্ডিল বের করে বসবে। তাও ইচ্ছে হলো না। প্রতিবারের মতই ছুটিতে খাতা দেখে রাখবে বলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখনো খোলাই হয়নি বাণ্ডিলটা। পরীক্ষার খাতার কথা মনে পড়লেই অনুপমের সমস্ত আনন্দ মাটি হয়ে যায়। ওটা একটা কাঁটার মত, সর্বক্ষণ খচখচ করে লাগে। মনে পড়িয়ে দেয় খাতা দেখতে হবে। সমস্ত ছুটির দিনগুলো তাই বিস্বাদ হয়ে যায়।

এখন আর সময় নেই, এখন অঞ্জলি ওর সমস্ত সময় কেড়ে নিয়েছে।

অনুপম অবাক হয়ে গেল সেদিনের তুচ্ছ দৃশ্যগুলো একটার পর একটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতেই।

ওর ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে অঞ্জলিকে বলে আসে, সব মনে আছে, সব মনে আছে। একটি দিনও আমার হারিয়ে যায়নি।

আনন্দে উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ও বিছানা থেকে নেমে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো অনীতা, বাপ্পা, হাসু সকলেই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু আজ আর ওর চোখে ঘুম নামবে না।

খিড়কির দিকের দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো অনুপম। দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঐ তো শুঁড়ীগ পাহাড় আর বন, আঁকাবাঁকা ঘন সবুজের অরণ্যরেখা, স্বচ্ছ আকাশ, ওপারেই শাঁখ নদী। আগে একবার বেড়াতে গিয়েছিল। সাঁওতাল পল্লীর পরিপাটি মাটির বাড়িগুলো দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ছিমছাম মাটির দেয়ালে চওড়া পাড়ের মত শ্লেট রঙ, হলুদ রঙ, গেরুয়া। দু' একটা ছবি আঁকা আছে দেয়ালে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়িয়ে যায়। মাটির কলসী মাথায় নিয়ে একসারি সাঁওতাল মেয়ে চলেছে।

ওর চোখে যেন মুসাবনির রঙ বদলে গেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল অনুপম। আর ঠিক তখনই একটা ডাক শুনতে পেল। কিশোরী একটি কণ্ঠস্বর যেন ইচ্ছে

করে টেনে টেনে সুর করে ডাকছে কাকে।

কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো অনুপম। আর স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন ডাকছে বাপ্পাকে।

আবার সেই ডাক—বাপ্-পা। বাপ্-পা।

স্পষ্ট শুনতে পেয়েই বাপ্পাকে চিৎকার করে ডেকে দিল ও। তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এলো।

আবার সেই সুরেলা ডাকটা শোনা গেল।—বাপ্-পা।

অনুপম জানালা থেকে উঁকি দেবার চেষ্টা করলো। দেখা গেল না।

বাপ্পা ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। চটপট চোখমুখ ধুয়ে এগিয়ে গেল বাগানের দিকে। তখন রোদ পড়ে এসেছে। বিকেল হয়ে গেছে। শ্যামল পাহাড়ের ছায়ামাখা শান্ত বিকেল।

সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই অনুপম দেখতে পেল লোহার ফটকে এক পা রেখে লেডিজ সাইকেলে বছর সতেরোর একটি মেয়ে বসে আছে। উজ্জ্বল জরির কারুকাজ করা কমলা রঙের ঢিলে কুর্তা আর কালো রঙের স্ল্যাকস পরে আছে মেয়েটি। মুখে চাপা হাসি কৌতুকের ছটা। ঠিক একটা আঁকা ছবির মত লাগলো। বিকেলের রোদ কিংবা কমলা রঙের কুর্তার আভা লেগে সুন্দর ফরসা মুখখানা গোলাপী লাগছিল।

মেয়েটি বাপ্পাকে দেখতে পেয়েও টেনে টেনে সুর করে অদ্ভুতভাবে ডাকছিল বাপ্-পা বাপ্-পা বলে।

বাপ্পা চিনতে না পেরে অবাক হয়ে একবার অনুপমের দিকে ফিরে তাকালো, তারপর মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, আমাকে ডাকছেন?

মেয়েটি হাসতে হাসতে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সাইকেলটা ফেন্সিং-এর গায়ে ঠেসিয়ে রাখতে রাখতে বললে, তুমি বাপ্পা?

মেয়েটির উদ্ভট ডাক শুনে বাপ্পা সংকোচ বোধ করছিল, তাই গলার স্বর মোটা করে গম্ভীরভাবে বললে, হ্যাঁ।

মেয়েটি ততক্ষণে অনুপমকে দেখতে পেয়েছে, তাই বাপ্পাকে গ্রাহ্যই করলো না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে অনুপমকে চট্ করে একটা প্রণাম করলে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, মেসোমশাই, আমি ঝুমঝুম। সকালে এসে মা যার সম্পর্কে একরাশ অপবাদ দিয়ে গেছে। ডানপিটে, অবাধ্য, আদুরে, আরো কত কি। আর কি কি বলেছে বলুন না মেসোমশাই?

—ঝুমঝুম তুমি? অনুপম ওর কথা শুনে হাসছিল। চিনতে অসুবিধে হলো না। এই তা হলে অঞ্জলির মেয়ে। দারুণ স্মার্ট তো, বেশ মজা করে কথা বলে।

অনুপম আবার প্রশ্ন করলে, কি পড়ো তুমি?

ঝুমঝুম একমুখ হেসে ফেলে বললে, আমি? আমি তো এবার হায়ার সেকেন্ডারী ফেল করেছি। তারপর ঝট করে বাপ্পার দিকে ফিরে বললে, বাপ্পা তুমি নাকি দুটো লেটার পেয়ে পাস করেছো, মা বলছিল। কি প্রশংসা বাবা তোমার! কিন্তু কি করে দু-দুটো লেটার পেলে বলো না। খুব টুকেছো নিশ্চয়।

বাপ্পা হেসে ফেলেছিল। গম্ভীর হয়ে বললে, আমি টুকি না পরীক্ষায়। পড়ি। পড়াশুনো করি।

—ঈস্! ছেলেরা ভীষণ টোকে। আমি দেখেছি। না টুকলে পাস করা যায় নাকি?

বাপ্পা বাবার সামনে এভাবে কথা বলে না। বাবাকে সমীহ করে। তাই রেগে গিয়ে বললে, তুমি তো টুকেও ফেল করেছো।

বাপ্পাকে রাগতে দেখে শব্দ করে হেসে উঠলো ঝুমঝুম। বললে, বেশ বাবা বেশ, তুমি ভীষণ গুড্‌বয়। পড়াশুনো করে পাশ করেছো।

বলেই অনুপমের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা মেসোমশাই, পড়াশুনো করে তো সবাই পাস করতে পারে, তাতে কোনো ক্রেডিট আছে?

অনুপম হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, ঠিকই তো।

ঝুমঝুমের ভাবভঙ্গী, কথা বলার ধরন সবই ভাল লেগে গেল অনুপমের। গুমোট গরমের বন্ধঘর হলে বলতো, ও যেন এক ঝলক বাতাস। কুয়াশা জড়ানো শীতের সকালে এক ফালি সোনালী রোদ্দুর। খুঁজে খুঁজে এই অচেনা বাড়িতে এসেও ওর কোনো অস্বস্তি নেই।

ওদের কথাবার্তা শুনেই হয়তো অনীতার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাসুও তার পিছনে পিছনে ঘুম জড়ানো চোখে কৌতূহল নিয়ে দাঁড়ালো।

অনুপম বললে, অঞ্জলির মেয়ে। ঝুমঝুম।

—ও মা, তাই নাকি? অনীতা আদর করে ওকে কাছে টানলো। পিঠে হাত জড়িয়ে বললে, এই মেয়েকে ডার্নাপিটে বলে গেল তোমার মা?

ঝুমঝুম বলে উঠলো, দেখেছেন তো মাসীমা, আমি দিব্যি ভালো মেয়ে। অথচ মা আমার একটা গুণও দেখতে পায় না।

ওর কথা বলার ধরনটাই অন্য রকম। হাত পা নেড়ে এমনভাবে বলে না-হেসে পারা যায় না। অথচ মুগ্ধ হতে হয়।

ও যত কথা বলে, অনীতা হেসেই অস্থির। সতেরো বছরের মেয়েদের অনীতা যেমনটি দেখতে অভ্যস্ত, যেমনটি দেখলে ভাল লাগে ওর, এ মেয়ে তেমন একেবারেই নয়। হাসুকে গত পুজোয় এই ঢিলে কুর্তা আর স্ল্যাকস কিনে দিয়েছিল নেহাত বায়না ধরেছিল বলেই। কিন্তু এ পোশাকটা ও পছন্দ করতো না। অথচ ঝুমঝুমের বেলায় সে-সব প্রশ্নই উঠলো না।

আসলে ঝুমঝুমের মুখেচোখে একটা অপূর্ব শ্রী আছে। এতখানি স্মার্ট হলেও সর্বাঙ্গে একটা কোমল স্নিগ্ধতা জড়িয়ে আছে।

ঝুমঝুম হঠাৎ বললে, কেন এসেছি সেটাই তো বলিনি। আজ রাত্তিরে আপনারা সক্কলে আমাদের বাড়িতে খাবেন। মানে নেমন্তন্ন আর কি, যাকে বলে ডিনার। বলে নিজেই হেসে উঠলো ঝুমঝুম।

অনুপম এবার একটু অস্বস্তি বোধ করলো। অনীতা বললে, আমরা কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি। আজ না, আরেকদিন।

নানা অজুহাত দেখালো অনীতা। তোমার মেসোমশাইয়ের শরীর ভাল নেই আজ। তারপর বললে, তোমাকে একা পাঠিয়ে দিলেন তোমার মা? তুমি তো আমাদের চিনতেও না।

ঝুমঝুম হেসে উঠলো—বাঃ রে, মা পাঠাবে কেন। বাবা আসছিল, আমি নিজেই তো বললাম, ঠিক খুঁজে বের করে নেবো। গেস্ট-হাউস তো আমি চিনি। এখানকার সব স—ব চিনি আমি।

ঝুমঝুমকে বসিয়ে রেখে প্লেটে করে মিষ্টি এনে দাঁড়ালো অনীতা। ঝুমঝুম উঠে পড়লো ঝট করে, নেমন্তন্ন ক্যানসেল হলে আমি বাবা থাকছি না। ও-সব খাবোও না।

অনীতা জিদ ধরতে একটা কি তুলে নিয়ে ঠিক ওষুধের পিল খাওয়ার মত করে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর এক ঢোঁক জল খেয়েই বললে, আমি কিন্তু গিয়ে ওসব বলতে-টলতে পারবো না।

বাপ্পার দিকে ঘুরে বললে, এই বাপ্পা, তুমি চলো, যা বলার বলে আসবে।

অনুপম হাসতে হাসতে বললে, যা তো বাপ্পা, তুই বুঝিয়ে বলে আয়।

বাপ্পা আর ঝুমঝুম চলে গেল। অনুপম দেখতে পেল ঝুমঝুম খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছে। আর পাশে পাশে চলেছে বাপ্পা।

মৃদু মৃদু হাসছিল অনীতা। ওরা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হতেই হাসুর দিকে চোখ গেল, দেখলে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। অনীতা বললে, তুইও তো গেলে পারতিস দাদার সঙ্গে।

৩

আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা, ধার ঘেঁষে একটা সরু ফালি মানুষের পায়ে পায়ে দিব্যি সমতল হয়ে গেছে। সাইকেলে চড়ে যারা যায় তারা ঐ সরু ফালি রাস্তাটার ওপর দিয়েই যায়। তবে মাঝে মাঝে খানাখন্দ আছে বলেই ঝুমঝুমকে এক একবার নেমে পড়তে হচ্ছিল। বাপ্পা পায়ে হেঁটে চলেছে, আর সেই পায়ে হাঁটা গতিতেই খুব আস্তে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছিল ঝুমঝুম। বাপ্পা তাই মনে মনে বাহবা দিচ্ছিল এত আস্তে চালিয়েও ঝুমঝুম অনায়াসে ব্যালান্স রাখতে পারছিল বলে।

খানিকটা গিয়েই রাস্তাটা একটু খারাপ। ঝুমঝুম তাই সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলো বাপ্পার জন্যে। সে কাছে আসতেই দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, কি, রাগ পড়লো ভাল ছেলের?

বাপ্পার কিছু মনে ছিল না। ও অবাক হয়ে বললে, রাগ কেন?

—ঐ যে, টুকে লেটার পেয়েছো বলেছিলাম বলে!

বাপ্পা আর ঝুমঝুম দু'জনেই হেসে উঠলো। দূরত্বের মেঘ কেটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ও সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে বললে, দাও তো, আমি একটু চালিয়ে দেখি।

ঝুমঝুম অবাক হবার ভান করে বললে, তুমি সাইকেল চালাতেও জানো?

বাপ্পা উত্তরই দিল না। গর্তটা পার করিয়ে নিয়ে সাইকেলে উঠলো। আর ঝুমঝুম বললে, লেডিজ সাইকেল চালাতে দেখলে লোকে হাসবে কিন্তু।

—ভাট্, হাসবে! তোমাকে দেখেই বরং হাসছিল সবাই। বাপ্পা বললে। তারপর একটুখানি চালিয়েই নেমে পড়লো। বললে, এখানে সাইকেল ভাড়া পাওয়া গেলে বেশ হতো।

ঝুমঝুম বলে উঠলো, ওফ্, গ্র্যান্ড হতো তা হলে। দু'জনে অনেক দূর বেড়াতে চলে যেতাম, সব্বাই খুব ভাবতো, মা কান্নাকাটি করতো, তারপর আমরা মজা করতাম ফিরে এসে। বাপ্পা, সত্যি যাবে একদিন?

বাপ্পার মাথাতেও দুষ্টুমি বুদ্ধি এলো। হাসতে হাসতে বললে, সাইকেল নাই বা পেলাম, হলুদপুকুর থেকে বাসে চড়ে...

ঝুমঝুমের হয়তো শুধু নিজের কথা শুনতেই ভাল লাগে, নিজের গলার

স্বরকেই ভালবাসে। ও তাই বাপ্পার কথাটা শুনলোই না। বলে বসলো, এই বাপ্পা, দ্যাখো দ্যাখো, লাভ্লি লাগছে!

বাপ্পা তাকিয়ে দেখলো, সত্যি সুন্দর। ও তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। সমস্ত অঞ্চলটায় ছোট বড় টিলা ছড়ানো। দূরে বেশ বড় একটা পাহাড়। তারপর স্বচ্ছ আকাশ। বিকেলের পড়ন্ত রোদে পশ্চিমের আকাশ এতক্ষণ ঝকঝকে সোনার মত দেখাচ্ছিল। সূর্য ডুবছে, সোনা রঙ এখন লাল, টকটকে লাল। কিন্তু তার পাশেই টুকরো টুকরো সাদা মেঘে নানা রকম রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। কি করে এমনটা হয় ওরা কেউ জানে না। কেউ যেন টুকরো টুকরো রঙিন মেঘের ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। খয়েরী, সোনালী, নীল আর বেগুনী—নানা রঙের মেঘ।

ঝুমঝুম আর বাপ্পা দু'জনেই অবাক খুশীতে থেমে পড়েছিল। ঝুমঝুম বললে, দ্যাখো দ্যাখো বাপ্পা, ঐ নীলটা একটা মানুষের মুখ হয়ে গেছে।

বাপ্পা বললে, সোনালীটা দেখেছো, ঠিক ভারতবর্ষের ম্যাপ। বাঃ রে, কেমন বদলে যাচ্ছে দ্যাখো।

সত্যিই টুকরো টুকরো রঙিন মেঘের সারি নড়েচড়ে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল, মানুষের মুখটা হাতির মত হয়ে গেল, ভারতবর্ষের মানচিত্র বদলে গিয়ে একটা নাচের ভঙ্গি।

ওরা দেখলো রোদ নিভে যাচ্ছে, দূরের জঙ্গলের ওপর অন্ধকার ছায়া নামছে। অন্ধকার যেন একটা আরণ্যক সমুদ্রের ঢেউ। একটা অন্ধকারের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে যেন আরেকটা অন্ধকারের ঢেউ গড়িয়ে আসছে।

অনেকক্ষণ ওরা ওদিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েক পা এগিয়েই আবার থেমে পড়ে, আবার তাকায়। বাপ্পা নিজেই এবার বললে, লাভ্লি। ঝুমঝুমের একটু আগে বলা কথাই ও লুফে নিল।

ঝুমঝুম তখনো তন্ময়। রাস্তার ধারে একটা ঢিবির মত। তার পাশে একটা বড় গাছ, মোটা মোটা শিকড় মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে ঝুমঝুম বললে, একটু বসবে বাপ্পা! এমন সুন্দর বিকেল আমার ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাপ্পা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো, কথা বললো না।

দু'জনে গাছটার কাছে গিয়ে মাটি ফুঁড়ে বের হওয়া দুটো মোটা মোটা শিকড়ের ওপর বসলো আকাশ দেখার জন্যে।

কেউ কোনো কথা বলছিল না। একটু আগে কথা বলেই যেন মুগ্ধতা ভেঙে [illegible]।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। একটা গরুর গাড়ি ধিকিয়ে ধিকিয়ে পার হয়ে গেল। খাদ থেকে ফিরছে সাঁওতাল কুলিকামিনের দল।

বাপ্পা ডাকলো, ঝুমঝুম!

ঝুমঝুম সাড়া দিল না। ওর সাড়া দিতে ইচ্ছে করছিল না। তারপর হঠাৎ যেন তন্ময়তা ভেঙেছে এমনভাবে আচমকা উঠে দাঁড়ালো।

সাইকেলটা টানতে টানতে হাঁটতে শুরু করলো ঝুমঝুম। পাশে পাশে বাপ্পা।

ঝুমঝুম একবার বললে, আমার নামটা বিচ্ছিরি, তাই না বাপ্পা?

বাপ্পা হাসলো। হাঁটতে হাঁটতে আস্তে করে ডাকলো, এই ঝুমঝুমি।

—ঈস্, এ আরো বিচ্ছিরি।

বাপ্পা হাসলো। হাঁটতে হাঁটতে ডাকলো, ঝুমুরঝুম!

শব্দ করে হেসে উঠলো ঝুমঝুম।

বাপ্পা কি যেন ভাবলো হাঁটতে হাঁটতে। ওরা হাঁটছিল সাইকেলটা মাঝখানে রেখে। ঝুমঝুম সাইকেলের বাঁদিকে, আর বাপ্পা তার ডানদিকে। ও বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দু'বার বেল বাজালো, যেন ঝুমঝুমের ঘোর কাটানোর জন্যে।

তারপরও ঝুমঝুম কথা বলছে না দেখে বললে, এই খুকু!

সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়লো ঝুমঝুম। বাপ্পার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের সুরে বলে উঠলো, ঈস্, কি মিষ্টি লাগে না খুকু বলে ডাকলে! আমাকে সত্যি কেউ কখনো খুকু বলে ডাকেনি।

ওর ভঙ্গি দেখে, ওর গলার স্বরে বাপ্পা হেসে ফেললো। বললে, আমিও ডাকবো না খুকু বলে। আমি তোমাকে এমন একটা নাম দেবো...

বলে থেমে গেল বাপ্পা, ভাবতে শুরু করলো কি নাম দেবে।

ঝুমঝুম বললে, কি নাম? বলো শীগগির।

বাপ্পা ধীরে ধীরে বলে, জানি না কি নাম। কিন্তু কি যেন একটা নাম দিতে ইচ্ছে করছে। আমি অনেকদিন ধরে ভাববো, ভাবতে ভাবতে যদি সেই নামটা পেয়ে যাই তখন সেই নামে ডাকবো।

কৌতুকের মুখভঙ্গি করে বাপ্পার কথাগুলো শুনছিল ঝুমঝুম। শুনতে শুনতে বলে উঠলো, সর্বনাশ! তুমি আমাকে নিয়ে অনেকদিন ধরে ভাববে? একটু থেমে বললে, আমি কিন্তু তোমার কথা একটুও ভাবতে পারবো না। আমার কিছু ভাবতে ভাল লাগে না, কাউকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে না।

—কি ইচ্ছে করে তোমার?

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে যেটুকু দিগন্তের আকাশ দেখা যাচ্ছিল, যেখানে পড়ন্ত রোদ সোনা-হলুদ থেকে এতক্ষণে শ্লেট রঙ হয়ে গেছে, সেইদিকে তাকিয়ে ঝুমঝুম বললে, ইচ্ছে করে আমার জন্যে দূরে কোথাও কেউ অপেক্ষা করবে, আর আমি বাড়িতে বসে বসে তার করুণ মুখটার কথা ভেবে খুব হাসবো। মা বলবে, হাসছিস কেন, নিজে নিজে হাসছিস কেন, আর আমি কিচ্ছু বলবো না।

বাপ্পা গম্ভীর হয়ে গেল। থমথমে গলায় বললে, চটপট এখন বাড়ি চলো তো। অপেক্ষা করে আছেন তোমার বাবা আর মা। দেরী করলে এরপর ঠ্যাঙানি খাবে।

ঝুমঝুম হেসে উঠলো।—আরে দূর, আমার জন্যে কেউ ভাবেই না। শাসন করলেও তো বুঝতাম আমার ভাল চায়। কয়েক পলকের জন্যে ও অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তারপর হঠাৎ বললে, এই, তুমি আমাদের বাড়ি রোজ আসবে? দু'জনে খুব পিং পং খেলবো, গল্প করবো। তুমি পিং পং খেলতে জানো?

বাপ্পা চুপ করে রইলো। কলেজে ঢোকার পর থেকে ওর পিং পং খেলতে ভীষণ ইচ্ছে করে। কমনরুমে গিয়ে অফ পিরিয়ডে খেলা দেখে। কিন্তু খেলতে জানে না বলে এগিয়ে গিয়ে র‍্যাকেট হাতে নিতে লজ্জা করে ওর। তাছাড়া সিনিয়র ছেলেরাই তো সব সময় টেবলটা দখল করে থাকে।

ঝুমঝুম বুঝতে পেরে বললে, ও কিছু নয়, তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো। আমি তো বাপীকেও শিখিয়েছি; বিপিন, আমাদের যে রান্না করে সেও...

বাপ্পার ক্রমশই যেন সঙ্কোচ বাড়ছিল মনের মধ্যে। ও অবাক হয়ে মাঝে মাঝে ঝুমঝুমের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, আর ওর মনে হচ্ছিল, ঝুমঝুম ওর সরল ব্যবহারে যতই কাছে আসতে চাইছে ততই যেন দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। ওকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। প্রতিমা দেখার মত শুধু দূর থেকে তাকিয়ে

দেখতে হয়।

বাড়িটার বর্ণনা শুনেছিল সকালেই, ঝুমঝুমের মা'র কাছে, চিনতেও পেরেছিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই হকচকিয়ে গেল। ঢোকার পথেই এক টুকরো বাগান, গাছের নয়, পাথরের। ফুলের গাছ নানান টবে, টবগুলো গোলাপী নীল সাদা রঙ করা, আর চারপাশে সুন্দর করে সাজানো নানা রঙের পাথর। প্রথমে মনে হয়েছিল রঙ করা। একটু লক্ষ করে বুঝতে পারলো, ওগুলো আসলে খাদ থেকে আনা নানা রকম মিনারেল ওর। ধাতুর পাথর। পাথুরে মাটির গায়ে কোথাও সাদার ছিটে, কোনোটায় সোনালী লেয়ার, কোনোটা বা সবুজ।

—বাপীর কাণ্ড। এখানেও জিওলজি। বলে হাসলো ঝুমঝুম।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো বাপ্পা। মেঝেতে পুরু লাল কার্পেট। নরম নরম। জুতো খুলে ঢুকবে, না জুতো পরেই কার্পেট মাড়িয়ে যাবে ভেবে ইতস্তত করলো। ওদের কলেজের এক সাহেব প্রফেসরের বাড়িতে গিয়েছিল ওরা কয়েকজন ছাত্র। জুতো খুলতে দেখে প্রফেসর হেসেছিলেন, বলেছিলেন, মাই ইয়াং ফ্রেণ্ড, জুতোটা অনেক ঠোক্কর খেতে খেতে এসেছে, তাকে এবার একটু আরাম দেবার জন্যেই কার্পেট পেতে রেখেছি। বাপ্পা সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল। সিনেমা হলেও তো কার্পেট মাড়িয়েই হাঁটে। তাই প্রথমে জুতো পরেই কার্পেটের ওপর উঠে গিয়েছিল, দু'পা ফিরে এসে জুতোটা খুলে রাখলো। এত সুন্দর কার্পেট জুতো-পায়ে মাড়াতে ইচ্ছে হলো না।

—মা-মণি, কে এসেছে দেখে যাও, কাকে ধরে এনেছি। চিৎকার করলো ঝুমঝুম।

. দরজার ভারী পর্দাটা সরিয়ে পাশের ঘর থেকে মাসীমাকে ঢুকতে দেখলো বাপ্পা। ঘরটা বিরাট বড় বলেই বাপ্পার তখন আরো সংকোচ লাগছে, একা মনে হচ্ছে নিজেকে।

মাসীমা স্নিগ্ধস্বরে বলে উঠলেন, আরে আরে, কি ভাগ্য আমাদের। এসো বাপ্পা এসো।

শোফা কৌচে, জাপানী ফ্লাওয়ার ভাসে বেশ সাজানো সুন্দর ঘরখানা।

একটা শোফার এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসলো বাপ্পা। ফিরে তাকিয়ে দেখলো ঝুমঝুম সরে পড়েছে।

—ঝুমঝুম গিয়েছিল তোমাদের বাড়ি? খুঁজে পেয়েছিল?

বাপ্পা একটু লাজুক ভাবে মাথা নুইয়ে বললে, হ্যাঁ। ঐ তো জোর করে নিয়ে এলো। মানে, মা বললে, আজ বাবার শরীর ভাল নেই...

—কি হয়েছে? শরীর ভাল নেই! সকালে তো দেখলাম...

সত্যি সত্যি উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো মাসীমার কণ্ঠস্বরে, বাপ্পার খুব ভাল লাগলো। আপন মনে হলো। সকালে ঝুমঝুমের মাকে ওর ভীষণ ভাল লেগেছিল, এখন আরো। নতুন আলাপ নয়, যেন নিজেদের পরিবারের কেউ।

ঝুমঝুম ইতিমধ্যে পোশাক বদলে একখানা সাদাসিধে শাড়ি পরে গায়ে খাটো শাল জড়িয়ে এসে দাঁড়ালো। বাপ্পার দিকে আঙুল দেখিয়ে মাকে বললে, সব শুনে নাও বাপ্পার কাছে, আমি কিচ্ছু জানি না বাবা। বলে ধপাস্ করে শোফার ওপর বসে পড়লো। গদিটার সঙ্গে সঙ্গে ঝুমঝুমের শরীরটাও লাফালো দু'বার।

বাপ্পা আড়চোখে ঝুমঝুমের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, আচ্ছা মাসীমা, আমাকে কেবল বাপ্পা বাপ্পা বলছে কেন বলুন তো?

ঝুমঝুমের মা বললেন, ঠিকই তো। দাদা বলবি তো ওকে।

—আহা রে। ঠোঁট ওল্টালে ঝুমঝুম। এইটুকুন একটা পুচকে ছেলে, তাকে দাদা বলবে!

ঝুমঝুমের মা ওর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, তুই আর কোনোদিন সভ্য-ভব্য হতে পারবি না!

৪

টকা-টক টকা-টক টকা-টক শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। বাপ্পা আর ঝুমঝুম পিং পং খেলছে। বাপ্পা খেলতে জানে না বলে ঝুমঝুম হেসে উঠছে, শেখাবার চেষ্টা করছে, ধমক দিচ্ছে। এ ঘরে বসে বসে সব শুনতে পাচ্ছে অঞ্জলি।

ওর ইচ্ছে ছিল বাপ্পার সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। খুঁটিনাটি কত কথাই তো ওর জানতে ইচ্ছে করছে। মাঝখানের কুড়িটা বছর একটা বিরাট ফাঁক রেখে গেছে, সেটা ভরাট করে নিতে চায় অঞ্জলি। এতদিন মাঝে মাঝে শুধু টুকরো খবর পেয়েছে অনুপম সম্পর্কে। এই কুড়ি বছরে কলকাতা শহরের ভিড়ে একবার বিয়ে বাড়িতে, একবার পুজোর সময়, মাত্র দু'বার চকিতে দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে, তবু এমন অধীর হয়ে ওঠেনি তখন।

হঠাৎ এখানে এসে কি যে ঘটে গেল, অঞ্জলি নিজেই বুঝতে পারে না। ওই বিরাট বাড়িটায় এসে ও যেন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো, ও একা, সম্পূর্ণ একা।

কোম্পানীর লীজ নেওয়া বাড়ি, খাট আলমারি আসবাবপত্র কিছুই আনতে হয়নি ওকে। সবই সাজানো ছিল। কোম্পানী যখন যাকে পাঠায় তার যাতে অসুবিধে না হয়। বড় ডাইনিং টেবলটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ও-ঘরে টেবল টেনিসের ব্যবস্থা করে নিয়েছে ঝুমঝুম। বাপকে বলে জামশেদপুর থেকে সব -সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছে। ওর সময় কাটানোর কোনো অসুবিধেই নেই।

কাঁধে ঝাড়ন ফেলে বিপিন নিঃশব্দে কাজ করছে। একটু আগে আলো জেলে দিয়ে গেল। বিরাট ঘরখানার শোফার এক কোণে চুপ করে বসে ভীষণ নিঃসঙ্গ লাগছিল অঞ্জলির। কলকাতাতেও ও এমনি একা বসে থাকে। ঝুমঝুমকে ডেকে যে একটু বসে গল্প করবে তার উপায় নেই। ওর ইস্কুলের বন্ধুরা আছে, পাড়ার বন্ধুরা আছে, ওর খেলা, ফাংশন, পরীক্ষার পড়া, গানের স্কুল, কত কি আছে। অঞ্জলির শুধু স্মৃতি। হয়তো কোনো কোনোদিন সিনেমা যায়, কখনো দু'একজন আত্মীয়ের বাড়ি। সেও একঘেয়ে, একঘেয়ে।

স্বামী বসে বসে কি সব লেখালেখি করছে, হেড-অফিসে পাঠাতে হবে কালই। তারপর এসে বসবে, এক সঙ্গে চা খাবে। কথা বলবে, গল্প করবে, তার মধ্যেও হয়তো অফিসের কথা ঢুকে পড়বে, কোনো বৈচিত্র্য নেই। অথচ অঞ্জলির চেয়ে সুখী কে আছে। ওর মত একটি মেয়ে যা কিছু চাইতে পারে সবই তো পেয়েছে অঞ্জলি। সচ্ছলতা, শান্তির সংসার, স্বামীর ভালবাসা। অঞ্জলি একবার ভাববার চেষ্টা করলো, ও কি অসুখী? অসুখী হবার মত কিছুই খুঁজে পেল না। মনে হলো, স্বামীর সঙ্গে মাঝে মাঝে যদি একটু ঝগড়াঝাঁটি হতো তাহলে বরং ভালই লাগতো।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

স্বামী একটু আগেই বলেছে, তোমাকে ক'দিন থেকে ফিলজফার ফিলজফার লাগছে। দেখো বাপু, জিওলজির সঙ্গে কিন্তু ফিলজফি একদম চলে না।

শুনে হেসে উঠেছিল অঞ্জলি, কিন্তু আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

আসলে ওর মনটা বার বার সিমলা স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে যেতে চাইছে, সেই সতেরো বছর বয়সে। ও যখনই একা থাকে, তখনই অতীত ওর সঙ্গী হয়ে যায়। যাক না, কুড়টা বছর তো এমনিভাবে কেটে গেছে। নিরুপদ্রবে। কিন্তু অনুপমকে এমন আকস্মিকভাবে ঐ সাঁওতালী হাটের মধ্যে দেখতে পাওয়ার পর কি যেন ঘটে গেল। বুকের মধ্যে তোলপাড়।

চোখাচোখি হওয়ার পর অনুপম ওভাবে চোখ নামিয়ে না নিলে হয়তো এমন একটা কাণ্ড করে বসতো না ও। অনুপমের মুখেচোখে ও মুহূর্তের জন্যে কি যেন দেখতে পেয়েছিল। লজ্জা, অভিমান, বোধহয় কিছুটা অপমানের ছায়া। অবাক লাগে অঞ্জলির, একটি দিনের ছোট্ট একটা ভুলের জন্য, এত বড় মানুষটা আজও ভেবে বসে আছে, সে হেরে গেছে। জানে না, কুড়িটা বছর ধরে অঞ্জলি তার বুকের মধ্যে কি লুকিয়ে রেখেছে। অনুপম কোনোদিন তা জানতে পারবে না এ-কথা ভাবতেই ওর চোখের পাতা ভিজে এসেছে।

তাই স্বামী কাজ থেকে ফিরে আসতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছে, জানো, আজ না, একজন চেনা লোকের দেখা পেলাম হাটে।

বলেছে, উনি আমাকে ঠিক চিনতে পারেন নি।

সব শুনে রণেনবাবু হেসে উঠেছেন।—এ যে সেই কাকাতুয়ার কবিতা, ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। বিদেশে গিয়ে একজনের বাড়িতে পোষ মেনে গেছে, হঠাৎ একদিন দেশের লোক দেখতে পেয়ে আনন্দে পাখা ঝটপট করে মরেই গেল।

অঞ্জলি হাসতে পারেনি।

বলেছে, কোথায় আছেন আমি খুঁজে বের করবই। এইটুকু তো জায়গা, নাম করলে কেউ না কেউ বলতে পারবেই।

রণেনবাবু বলেছেন, রাণীর যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন সেটাই আইন। ইংরেজীতেই বলেছিল কথাটা, অঞ্জলি জানে ওটা একটা প্রবাদ। তাই হেসে ফেলেছিল।

কিন্তু অঞ্জলির মনে হচ্ছে, দেখা না হলেই ভাল ছিল। সামান্য ক'টা কথা, তার ফলে যে ওর বুকের মধ্যে এমন একটা তোলপাড় চলবে তা ও ভাবতেই পারেনি। ও যে আরো বেশী নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি। অথচ ওর বুকের ভেতর একটার পর একটা আনন্দের ঢেউ উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা অনুপমদা, খুব তো মনে আছে মনে আছে বলছেন, বলুন তো কবে প্রথম আমি আপনাকে আবিষ্কার করলাম?

চোখ বুজে শোফায় হেলান দিয়ে ছবির পর ছবি দেখছিল অঞ্জলি।

কল্পনায় ও তো কতবার অনুপমের একেবারে কাছটিতে বসেছে। কথা বলেছে। 'আমি আপনার সঙ্গে কুড়ি বছর ধরে কথা বলেছি, মনে মনে।' অঞ্জলি সেদিন বলেছিল। ঠিক তেমনি মনে মনে কথা বলতে চাইছিল ও। কিন্তু ও ঘরের টকা-টক টকা-টক পিং পং খেলার আওয়াজ, ঝুমঝুমের শব্দ করে হেসে ওঠা, ওদের দুজনের তর্কাতর্কি—কেবলই ওর স্বপ্নটাকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

হাতে একটা ইংরেজী ছবির কাগজ নিয়ে বসে ছিল, কিন্তু পাতা ওল্টাতে ইচ্ছে হলো না। চোখ বুজে সতেরো বছর বয়েসটাকে দেখলো। সেই গলি-রাস্তাটা।

দু'পা এগিয়ে গেলেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ট্রামের ঘন্টি, পাঞ্জাবী বাস-ড্রাইভারের টিন চাপড়ানোর আওয়াজ, মোটরের হর্ন, একটা হট্টগোল, ভিড় দোকানে দোকানে, স্যাকরার দোকানে অবিরাম ঠুকঠুক আওয়াজ। কিন্তু সিমলা স্ট্রীটে ঢুকলেই সব শান্ত। শুধু একটু গেলে একটা খাটালের গলির মুখে হিন্দুস্থানী গয়লাদের রামধুন। পাশের বাড়ির নীচের তলায় একটা মিঠাইয়ের দোকান, সামনেই একটা বিরাট উনোন, সারাদিন গনগনে আগুন থাকতো রাত অবধি, সকালে ছাইয়ের রাশ জমে থাকতো, শীতের দিনে রাস্তার ভিখিরি ছেলেগুলো ছাইয়ের ওপর শুয়ে থাকতো অনেক রাত্তিরে এসে।

ছবির মত সবই দেখতে পাচ্ছে অঞ্জলি। ওদের বাড়িটা—তিনতলা বাড়িটা। বাবা-কাকাদের পৈতৃক বাড়ি, এককেতলা এক একজনের ভাগে। শুধু রান্না একসঙ্গে, আর সব আলাদা আলাদা। খুড়তুতো ভাইবোনেরা আছে, তাদের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে গল্প, ঘুড়ি-ওড়ানো, ফিসফাস। আঃ, কি মিষ্টি ছিল দিনগুলো। তিনতলায় থাকতো অঞ্জলিরা। আর সামনের বাড়িটায় অনুপমরা। অঞ্জলির ঘরের সামনাসামনি ঘরখানা ছিল অনুপম আর তার ছোটভাই বিলুর। বিলুর তখন দশ-বারো বছর বয়স। অঞ্জলি তখনো অনুপমকে আবিষ্কার করেনি।

—খুব তো মনে আছে বলছেন, বলুন তো কবে প্রথম আমি আবিষ্কার করলাম?

—বাঃ রে, তোমার কথা আমি কি করে জানবো। আমি আবিষ্কার করলাম কবে জানো! তোমার খুড়তুতো বোন রুণু, তোমার খুব বন্ধু ছিল, ওরা নীচের তলায় থাকতো—।

—ও মা, রুণুর নামটাও ভোলেন নি দেখছি। আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে।... কেন আবার, রুণু দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তাই ভোলেন নি।

—অঞ্জলি, তুমি একটা কি, ওকে নাকি সুন্দর বলে? ভুলিনি কেন আবার, তুমি যে ওর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছ। মনে নেই তোমার, নীচের তলার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তোমরা ফিসফিস করছিলে, কেউ কোথাও ছিল না। আমাদের তিনতলায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি একটা লম্বা বারান্দা ছিল, আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার দিকে দু'একবার তাকিয়েছি, তোমার কানে কানে রুণু কি বললো, তুমি চোখ তুলে তাকালে, লজ্জা পেলে...

—ঠিক ঠিক, সব মনে রেখেছেন? এতদিন পরেও? কিন্তু আমি তো তার আগে থেকেই আপনাকে লক্ষ করি, রাত্তিরে আপনি ঘাড় গুঁজে পড়তেন, অনেক রাত্তির অবধি, আমি ঘুমোতাম না...

ঘরের আলোটা কে সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল, অঞ্জলি চমকে উঠে বললে, এই, কে?

আলোটা আবার জ্বলে উঠলো। রণেনবাবু হেসে উঠলেন। বাঁ হাতে পাইপটা ধরে একটা দেশলাইয়ের কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছিলে ভেবে নিভিয়ে দিলাম।

অঞ্জলি অস্বস্তি বোধ করলো। কি হবে ওর? ও কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? অনুপমের কথা ভাবতে ভাবতে কখন চোখ বন্ধ করেছে নিজেই জানে না। কি করবে ও, চোখ বন্ধ না করলে যে স্বপ্ন দেখা যায় না।

বিপিন এসে টি-পয়োর ওপর চা রেখে গেল। দু'জনের।

—তা হলে ওঁরা আজ এলেন না? অনুপমবাবুর নাকি শরীর খারাপ।

অঞ্জলি বললে, হুঁ। কে বললো তোমাকে?

—ঝুমঝুম। ভাবলাম খেলতে ডাকছে। বললে, চাই না তোমাকে, তোমাদের ভালো ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছি।

অঞ্জলি হাসলো। আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

রণেনবাবু ডাকলেন, বিপিন!

বিপিন কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে এসে হাজির হলো। দাঁড়িয়ে রইলো।

রণেনবাবু বললেন, কি রাঁধছিস আজ? মুরগী না ডিম? আজ খুব খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে রে।

অঞ্জলি তাকালো স্বামীর দিকে। বললে, সেটা আমাকে বলতে কি হয়েছিল! না কি আমার রান্না ভাল লাগে না আজকাল। বলে হাসলো।

উঠে দাঁড়ালো, বিপিনকে বললে, চলো যাচ্ছি আমি।

রণেনবাবু হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন, আরে বসো বসো, পরে গেলেও চলবে। বিপিন চলে গেল।

আর সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রণেনবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে বসে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে ইচ্ছে করছে!

অঞ্জলি গম্ভীর হয়ে বললে, কি হচ্ছে কি?

রণেনবাবু হেসে উঠে বললেন, তা হলে চলো বরং খেলা দেখি। উঠে দাঁড়ালেন।

অঞ্জলি কোনো কথা বললো না। সেও উঠে দাঁড়ালো, ওঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, আজ থাক্ না তোমার খিচুড়ি, কাল হাটবার, কড়াইশুঁটি নিয়ে আসবো।

কাল হাটবার। কথাটা আজ অনেকবার ভেবেছে অঞ্জলি। বিপিনই তরি-তরকারি শাকসবজি কিনে আনে। হঠাৎ সেদিন ও শুধু শখ করে গিয়েছিল। কিন্তু এখন যে ওকে হাটের নেশায় পেয়ে বসেছে। তাই স্বামীকে বলে রাখতে চাইছিল, কালও ও হাটে যাবে। বলার কোনো দরকার ছিল না। ও জানে স্বামী কোনো প্রশ্ন করবে না। ও জানে স্বামীর মনে কোনো দ্বিধা নেই। ও কিছুই মনে করেনি, মনে করবে না। তবু কোথায় যেন একটা বিবেকের কাঁটা বিঁধছে। লুকিয়ে দেখা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাই এটুকু বলে রেখে যেন একটু হাল্কা হলো।

ঘরে ঢুকে দেখলে বাপ্পা দিব্যি খেলছে, ভালই খেলছে।

ঝুমঝুম চিৎকার করে উঠলো, দ্যাখো দ্যাখো, এইটুকুন সময়ে কত ভাল খেলছে বাপ্পা, আমার ট্রেনিং।

অঞ্জলি হেসে বললে, তুই তো সারাক্ষণ আটকে রাখলি, ভাবলাম বাপ্পার সঙ্গে গল্প করবো।

বাপ্পা খেলা থামিয়ে একটু লাজুক লাজুক মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর র‍্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর দিয়ে। বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে।

৫

অনুপম অনেক আগেই এসে পেঁাছেছিল। কেনাকাটা শেষ করে বুধলিকে বললে, তুই চলে যা বুধলি, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

হাটের একপাশে মোরগ-লড়াইয়ের ভিড় জমেছে। প্রতি হাটের দিনেই এখানকার বড় আকর্ষণ এই মোরগ-লড়াই। চারপাশের গাঁ থেকে লোক এসে জমে। কারো কারো হাতে থাকে জোয়ান মোরগ। জুড়ি খুঁজে খুঁজে বাজি ধরে, কেউ টাকায়, কেউ মোরগটাই। আর তাদের ঘিরে সাঁওতাল মেয়েপুরুষের দল কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে থাকে। কখনো উল্লাসে নেচে ওঠে, কোনোটা হারলে বিমর্ষ ধ্বনি দেয়।

অনুপমের চোখ সারা হাট ঘুরে এলো। না, অঞ্জলি আসেনি। আজ ঘড়ি ধরে ঠিক একই সময়ে এসেছে ও। আশা ছিল আজও আসবে। তাই ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো না। ভাবলো, একটু অপেক্ষা করেই দেখি না।

মোরগ-লড়াইয়ের কাছে আসতেই তার দিকে তাকিয়ে দুটো সাঁওতাল মেয়ে ফিক করে হেসে সরে দাঁড়িয়ে ওকে জায়গা ছেড়ে দিল। পুরুষ একটা বললে, বাবুকে দিখতে দে!

সামনাসামনি দু'জন কোলের কাছে দুটো তাগড়াই মোরগ নিয়ে বসেছে। বাজির কথা হচ্ছে। যে যার মোরগের পায়ে ধারালো এক টুকরো ছুরি বাঁধছে শক্ত করে, অনুপম দেখতে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভিড় দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। মোরগওয়ালাদের এরা কেউ চেনে না, মোরগ দুটোর সঙ্গেও এদের কোনো সম্পর্ক নেই। অনুপম বহুবার দেখেছে, তবু মোরগ-লড়াই হলেই ভিড়ের মানুষগুলো দু'ভাগ হয়ে যায়। একটা জয়ী হলে অকারণেই অনেকে আনন্দ পায়। হই হই করে ওঠে, বাকী মানুষগুলো অকারণেই বিষণ্ণ হয়, দুঃখ পায়। মানুষের স্বভাবই বোধহয় এমনি। যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন যে-কোনো একটা পক্ষ তাতে নিতেই হবে।

অনুপম দেখলো, পায়ে ছুরি বেঁধে দু'জনই দু'দিক থেকে দুটো মোরগকে ছেড়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুটো খুনী আসামীর মত. একে অন্যের রক্ত না দেখে ছাড়বে না। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে একটার সাদা পালকগুলো লাল হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের চিৎকার। যে হেরে গেল সে মুখ চুন করে পা থেকে ছুরিটা খুলে নিল। জিতলো যে, সে মোরগটা টেনে নিল হাসতে হাসতে।

রক্তটক্ত অনুপমের সহ্য হয় না। ও বেরিয়ে এলো ওখান থেকে।

দুটো সাঁওতাল ছেলে চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে দেখছিল অনুপমের দিকে। একজন বললে, ঝুলা বটে।

অন্য ছেলেটা বিজ্ঞের মত বললে, বাবুলোকরা ঝুলা জামা পরে।

অনুপম হেসে ফেললো। আসলে ওর পাঞ্জাবির ঝুলটা দেখেই বলাবলি করছে ওরা।

অনুপম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চোখ পড়লো রাস্তার দিকে। উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে হাতে একটা সুন্দর মণিপুরী কাজ করা থলি নিয়ে অঞ্জলি আসছে। বুকের ভিতর থরথর করে উঠলো।

অঞ্জলির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। বুকের ভেতরটা

কেঁপে কেঁপে উঠলো।

অঞ্জলি দূর থেকেই ওকে দেখতে পেয়ে একমুখ হাসি হয়ে গিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। হেলে দুলে ওর সমস্ত শরীর একটি ঝড়ে দোলা শাখার মত এগিয়ে আসছিল। অনুপমকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি ঋজু এবং শান্ত পায়ে চলতে শুরু করলো।

—আপনাকে আজ দেখতে না পেলে কি খারাপ যে লাগতো! অঞ্জলি কাছে পেঁৗছেই মৃদু হেসে বললে।

অনুপমের সমস্ত মন আনন্দের পাপড়ি হয়ে গেল। ও মৃদু হাসলো, কোনো কথা বললো না।

—আপনি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছেন। আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম বলে?

অনুপম শান্ত গলায় বললে, তোমার ওপর রাগ করার মত মনের জোর তো কোনোদিনই ছিল না অঞ্জলি। কাল তুমি আমাকে কি দিয়ে গেছ তুমি নিজেই জানো না।

অঞ্জলি স্নিগ্ধ হাসির কৌতূহলী চোখ তুলে তাকালো অনুপমের দিকে।

অনুপম বললে, আমার সেই উনিশ-কুড়ি বয়েসের মন।

অঞ্জলি লাজুক হলো। আস্তে আস্তে বললে, কি সুন্দর সাজিয়ে সাজিয়ে কথা বলতে পারেন। আমার কিন্তু খুব ভয় ছিল।

অনুপম কোনো কথা বললো না। ও শুধু অঞ্জলির পাশে পাশে হাঁটলো, অঞ্জলির পাশে পাশে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল ওর। এত কাছে, ইচ্ছে হলেও ও অঞ্জলিকে ছুঁতে পারে, হাতে হাত ধরতে পারে। তবু একটা দূরত্ব রাখতে ভাল লাগছিল।

অঞ্জলি হঠাৎ একবার থেমে পড়ে বললে, দাঁড়ান, আজ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করবো। তাই বিপিনকে বলেছি ও পরে এসে নিয়ে যাবে যা-কিছু কেনার। আমি শুধু ওর জন্যে...অনুপমের চোখের দিকে তাকিয়ে কৌতুকে হেসে উঠলো অঞ্জলি। বললে, সাহেবের খিচুড়ি খাবার ইচ্ছে হয়েছে। তাই দু' চারটে জিনিস শুধু...ও আপনার গেস্ট-হাউস খুঁজে বের করে দিয়েছিল...তার একটা প্রাইজ তো দেওয়া উচিত, কি বলেন?

অনুপম হেসে বললে, অঞ্জলি, তুমি কিন্তু সত্যি সুখী। আমার এত ভাল লাগছে দেখে...

অঞ্জলি চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। তারপর বললে, সত্যিই সুখী, কিসের দুঃখ আমার, কিছুই তো খুঁজে পাই না। তবু এক একদিন এত কষ্ট হতো...হঠাৎ গলার স্বর প্রায় কান্না হয়ে গেল...আপনি কিছু বোঝেন না, কিছু বোঝেননি কোনোদিন।

বলেই অঞ্জলি হেসে ওঠার চেষ্টা করলো। —দাঁড়ান, দাঁড়ান, সাহেবের জন্যে কড়াইশুঁটি কিনতে হবে।

একটা সাঁওতাল বুড়ি এক ঝুড়ি কড়াইশুঁটি নিয়ে বসেছিল। তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কড়াইশুঁটি বাছতে লাগলো ও।

অনুপম বুঝতে পারলো নিজেকে এভাবে প্রকাশ করে লজ্জা পেয়েছে অঞ্জলি।

ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো হাটের চারপাশ। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর তার স্থূলদেহী গৃহিণী টমাটো কিনছে একটু দূরে। দু' চারজন হিন্দুস্থানী,

বাঙালী দু'একজন অচেনা।

থলিতে কড়াইশুঁটি নিয়ে পয়সা মিটিয়ে উঠে দাঁড়ালো অঞ্জলি।

অনুপম বললে, থলিটা আমাকে দাও।

—সব্বনাশ। আঁতকে উঠলো অঞ্জলি। —প্রফেসর মানুষ আপনি, আপনাকে বইতে দেবো বাজারের থলি? হেসে ফেললো ও।

অনুপমের ইচ্ছে হচ্ছিল অঞ্জলি ওকে 'আপনি' বলার দূরত্ব থেকে কাছে টেনে আনবে। তাই ধীরে ধীরে বললে, তোমার মুখে 'আপনি' শুনতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না অঞ্জলি।

অঞ্জলি হঠাৎ থেমে পড়লো ওর কথা শুনে। চোখ তুলে তাকালো অনুপমের চোখের দিকে। গাঢ় গলায় বললে, কুড়ি বছর ধরে মনে মনে আপনার সঙ্গে কতবার 'আপনি' বলে কথা বলেছি জানেন? আপনিটাই আমার এখন সবচেয়ে আপন হয়ে গেছে।

কিছু একটা বলতে গেল অনুপম। তার আগেই অঞ্জলি ফুলকপির দর করতে শুরু করে দিয়েছে, কমবয়েসী সাঁওতাল মেয়েটা হাসতে হাসতে মাথা নাড়ছে।—আর দশটা পয়সা দে রাণীমা।

অঞ্জলি মাথা নাড়লো।—না, না, আর দেবো না।

মেয়েটা অনুপমের দিকে তাকিয়ে বললে, দশটা তো পয়সা; বলে দে না রাজাবাবু।

অঞ্জলি চমকে অনুপমের দিকে তাকালো, লাজুক হাসলো, মেয়েটার হাতে আরো দশটা পয়সা দিয়ে দিল।

তারপর টমাটোর সারির দিকে যেতে যেতে চাপা গলায় বললে, সেদিন বউ কিছু ভাবেনি তো? আমার বড় ভয় করছিল।

অনুপম শব্দ করে হেসে উঠলো।—কি ভাববে?

—আমাদের সম্পর্কটা?

—সম্পর্ক তো ছিল না কিছু।

—ছিল না? চমকে চোখ তুললো অঞ্জলি। সত্যি ছিল না কিছু?

এমনভাবে তাকালো অঞ্জলি, অনুপমের মনে হলো অঞ্জলির চোখের আড়ালে জল টলটল করছে।

অনুপমের সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল। ওর গলার স্বরও গাঢ় হয়ে এলো।—এতদিন কেন জানতে দাওনি অঞ্জলি, তখনই কেন জানতে দাওনি?

একটু থেমে বললে, শুধু এইটুকু জানলে, তখন যদি জানতে পারতাম...আমি কত কি হবো ভেবেছিলাম অঞ্জলি...

অঞ্জলি চুপ করে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। কোনো জবাব দিল না। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আপনি এত বড়, এত সব জানেন, এটুকু তো জানতে চাননি। সতেরো বছর বয়সের ভয়, লজ্জা, অস্বস্তি আপনি কেন বুঝতে পারেন নি।

একটু থেমে অঞ্জলি বললে, ব্যস, আর কিছু নেবার নেই, চলুন ফিরে যাই।

ব্যস, আর কিছু নেবার নেই; চলুন ফিরে যাই। অনুপমের মাথার মধ্যে —ঘুরলো—ফিরে যাই, চলুন, ফিরে যাই—কথাটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে ও। সত্যিই বুঝি ফিরে যাওয়া ছাড়া এখন আর কিছু নেবার নেই।

আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে বাড়ির পথে যেতে যেতে অঞ্জলি হঠাৎ বললে, আপনি যেবার ডক্টরেট পেলেন, একটা গোলাপের তোড়া পাঠিয়েছিলাম। নাম জানাই নি।

অনুপম চমকে উঠে হঠৎ ঘুরে দাঁড়ালো অঞ্জলির মুখোমুখি।—তুমি? তুমি পাঠিয়েছিলে?

অঞ্জলি আশ্চর্য হয়ে তাকালো অনুপমের মুখের দিকে। ওর সমস্ত মুখ সাদা হয়ে গেল। ভেঙে পড়া গলায় ও বললে, সে কি? আপনি বুঝতে পারেন নি? আপনি কি কিছুই বোঝেন না?

অঞ্জলির হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপম কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু আজ আবার যেন সেই গোলাপের তোড়াটা ও বুকের কাছে টেনে নিয়েছে, গোলাপের পাপড়িগুলো সমস্ত মুখে বুলিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু ও কি করে ভাববে, যার সঙ্গে একটি কথাও কোনোদিন বলতে পায়নি, যার কাছ থেকে একদিন শুধু অপমান কুড়িয়ে এনেছিল, গোলাপের তোড়াটা তারই উপহার। এই পরম আনন্দের কাছে ডক্টরেট পাওয়ার আনন্দটা তা হলে সেদিন একেবারে তুচ্ছ হয়ে যেত।

অনুপম ধীরে ধীরে বললে, আশ্চর্য! তুমি কার্ডে নাম লিখে দাওনি। আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন চব্বিশ বছর বয়েস। আমি বাড়ি ছিলাম না, বিলুর হাতে দিয়ে চলে গিয়েছিল ফুলের দোকানের লোক। নাম বলেনি।

অঞ্জলি অন্যদিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে, কিন্তু কার্ডে কিছু লেখা ছিল।

অনুপম বললে, মনে আছে। 'আজ যে সবচেয়ে সুখী তার কাছ থেকে।' দিদি ঠাট্টা করেছিল। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পাইনি। বিয়ের পর অনীতার কাছে গল্প করে বলেছিল আমার মেজো বোন। ও খুব হেসেছিল।

ওমা, তাই বুঝি! অঞ্জলি হেসে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, দেখুন, দেখুন, মেয়েটা একেবারে পাগল।

অনুপম তাকালো দূরের মাঠের দিকে। যতদূর চোখ যায় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মাটি একবার উঁচু হয়ে উঠেছে আবার নেমে গেছে। একবার উঠেছে আবার নেমে গেছে। যেন তরল মৃত্তিকার তরঙ্গ কোন্ এক প্রাগৈতিহাসিক কালে হঠাৎ এখানে স্থির আর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অনুপম দেখতে পেল, ঢল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে ঝুমঝুম আর বাপ্পা। ঝুমঝুমকে চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে একটা ছবির মত দেখালো। একটা ভায়োলেট রঙের শাড়ি পরেছে ঝুমঝুম। বাতাসে ওর চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে।

আবার পথ চলতে চলতে অঞ্জলি হঠাৎ বললে, বাপ্পা কিন্তু এর মধ্যেই ঝুম-ঝুমের খুব বন্ধু হয়ে গেছে।

অনুপম বললে, ঐ বয়েসটা আমরা কোনোদিন পাইনি।

কিন্তু অনুপমের ক্রমশই কেমন একটা নেশা হয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে করছে সারাক্ষণ অঞ্জলি ওর কাছে কাছে থাকুক। অনর্গল কথা বলুক। অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হবার আশায় সকাল থেকে উৎকণ্ঠ হয়ে ছিল। বার বার ঘড়ি দেখেছে, মনে মনে ভেবেছে, দেরী হয়ে গেলে হয়তো হাট থেকে ফিরে যাবে ও।

অথচ এক একদিন হাটে যেতে ক্লান্তি লাগতো। অনীতা বার বার তাড়া দিত।

অঞ্জলির কথা ভাবতে ভাবতে রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছিল। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন নিশ্চুপ, রেডিও বন্ধ থাকলে নিঃসঙ্গ লাগে। গেস্ট-হাউসের ওপর দিয়ে রোপ-ওয়ে গেছে, কপার ওর বয়ে নিয়ে যায় বাকেটগুলো, তারই ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দ আসে। ঠিক মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে। সেটাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে ওকে একা করে দিয়েছে। আর অঞ্জলি গতকাল এসে দুটি মাত্র কথা বলে ওকে একেবারে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে গেছে।

ভিতর দিকের বারান্দায় চৌকো টুলের ওপর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম এনে রেখে ও যখন হাটে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছিল, তখনই অনীতা একবার এসে উঠোনে ভিজে কাপড় মেলতে মেলতে বলেছিল, শোনো, আজ একবার ওঁদের বাড়ি যাওয়া উচিত, এতবার করে বলে গেলেন!

অনুপম খুব খুশী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উৎসাহ দেখাতে পারেনি। বলেছিল, হ্যাঁ, যাওয়া যায় বিকেলের দিকে।

বিকেলের দিকে সে-কথাটা মনে পড়লো। কিন্তু নিজে থেকে বলতে সংকোচ হলো ওর। অনীতা কি কিছু মনে করবে? অনীতা কি কিছু বুঝতে পেরেছে?

জানো অনীতা, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম কিন্তু তুমি যা ভাবছো, তেমন কিছু নয়। শুধু আমরা পরস্পরকে তাকিয়ে দেখতাম। সিমলা স্ট্রীটের বাড়িতে তখন থাকতাম আমরা, তখন আমার কতই বা বয়েস। বাপ্পার মত। তখন ভীষণ ভীতু ছিলাম, বোকা ছিলাম আমি। কোনো কিছুতেই তখন সাহস পেতাম না। বাবাকে তো তুমি দেখ নি, প্রচণ্ড রাগী আর রাশভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আর মা? মাকে নিয়ে যখন বাসে-ট্রামে কোথাও যেতাম, কোনো সুন্দর মুখের দিকে তাকালে মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। আমি তাই কোনোদিন 'আমি' হয়ে উঠতে পারিনি। বাবা-মা'র শান্তশিষ্ট বাধ্য সন্তান হয়েই ছিলাম। কিন্তু বুকের মধ্যে কি একটা জিনিস আছে জানো, সে সকলের অবাধ্য। কাউকে ভয় পায় না। আমাদের বাড়ির সামনের দিকে ছিল একটা লম্বা বারান্দা। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। সেখান থেকে একটি মেয়েকে দেখতে পেতাম। জানালায়, তাদের উত্তরের বারান্দায়, ছাদের কার্নিস ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো মেয়েটি। যেন আমার উপস্থিতি সে লক্ষই করেনি এমনিভাবে বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি করতো, গল্প করতো। কোনোদিন গল্প করতে করতে চুলে চিরুণী টানতো। ওর চুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হতো। ওর পড়ার টেবিলটাও দেখা যেতো। বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে পড়ার ভান করে ও হঠাৎ হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখতো। দেখার চেয়ে দেখা দেওয়ার আনন্দে সে তখন মশগুল। এমনিভাবেই আমাদের মধ্যে ভালবাসা হয়ে গিয়েছিল। মুখে আমরা কত কথাই বা বলতে পারি, চোখ অনেক বেশী কথা বলে। বিশ্বাস করো অনীতা, আমরা কোনোদিন কেউ কাউকে একটা কথাও বলিনি। অথচ আমি ওর পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর, হাসি—সব চিনতাম। একদিন, একদিন শুধু আমি ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। তারপর আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সিমলা স্ট্রীট ছেড়ে আমরা চলে এলাম। জানো অনীতা ভেবেছিলাম কম বয়সের বোকামি-ভরা দিনগুলো জীবন থেকে মুছে গেছে। যায়নি কুড়ি বছর পরে হঠাৎ জানতে পারলাম, কোনো কিছুই মুছে যায় না।...হ্যাঁ অনীতা, সেই মেয়েটিই অঞ্জলি।

আচ্ছা, অনুপম ভাবলো, সত্যি যদি এভাবে অনীতাকে বলে, ও কি বুঝবে না? না, মিথ্যে কষ্ট দেবে না অনীতাকে। তুচ্ছ এইটুকু গোপন আনন্দ ও অনীতার

কাছে গোপন করে রাখবে। সকলের কাছেই কিছু-না-কিছু গোপনীয় থাকে। স্ত্রীকে, বন্ধুকে, প্রেমিকাকে হয়তো অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু এক-একটা কথা থাকে যা বলা যায় না। সকলেরই বুকের মধ্যে একটা কোনো গোপনতার কৌটো থাকে। সেই কৌটোটা খুলে দেখলেই একটা মৌমাছি বের হয়ে বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে দেয়। অঞ্জলি তো ওর অহংকার। অহংকারকে বুকের মধ্যে চেপে রাখতে হয়, প্রকাশ করা যায় না।

—যাবে নাকি? তা হলে তৈরী হয়ে নিই। অনীতা এসে বললে।

অনুপম অনুৎসাহীর মত সায় দিল।

বিকেলের রোদটা তখন মিষ্টি লাগছে। ট্রেঞ্চের মত করে কাটা সরু সরু খাদে কায়ানাইটের লেয়ার চলে গেছে কিছু দূর অবধি। কপার পাইরাইটের সোনালী সোনালী ফাইবার রোদ লেগে চিকচিক করছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে থেকে থেকে।

গেস্ট-হাউসের ওপাশে খানিকটা গেলেই বাগানওয়ালা একটা বাড়ি—লোকে বলে নবাববাড়ি। শুধু একটা মালী আছে, খালি পড়ে থাকে বারোমাস। একবার ভেবেছিল ওখান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসবে, বসার ঘরের ফুলদানীর জন্যে। কিন্তু এখন আর ইচ্ছে হলো না।

অনীতা আর হাসুকে নিয়ে অনুপম বেরিয়ে পড়লো।

অনুপমের হাতে গরম কোট। অনীতা বললে, পরে নাও, তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

—নাঃ। ফেরার সময় পরা যাবে। অনুপম বললে। আসলে ও হঠাৎ যেন বয়স সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হবার পর।

সকালে হাটের দৃশ্যগুলো বার বার ওর মনে পড়ছে, অঞ্জলির কথাগুলো।

অনীতা একসময় আড়চোখে তাকালো অনুপমের দিকে।—বাপ্পা আজ আর কলকাতা যাওয়ার কথা কিছু বলেনি।

অনুপম বিরক্ত হলো। হাসুর দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ওরা অন্যরকম। যা ভাবছো তা নয়।

—আমি কি তাই বলেছি। অনীতা চুপ করলো।—বাপ্পা অন্যরকম।

একটু পরে বললে, আমি মুখ দেখলে সব বুঝতে পারি। বুঝতে পারতাম তা হলে।

অনুপম অস্বস্তি বোধ করলো। অনুপমের মুখ দেখে কি কিছু বুঝতে পারছে অনীতা! কে জানে! ওর একটু ভয়-ভয় করলো। অঞ্জলির মুখ দেখে কি কিছু বুঝতে পারবে?

অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দেওয়াব জন্যে অনুপম বললে, বাপ্পা বোধহয় ওখানেই আছে, পিং-পং খেলার গল্প করছিল সকালে।

একটু দূরেই একটা দিশি মদের দোকান। সামনে খাদের কুলিদের ভিড় জমছে। উবু হয়ে বসেছে সকলে। এক ঝলক মদের গন্ধ ভেসে এলো বাতাসে। অনীতা নাকে আঁচল চাপা দিল। দ্রুতপায়ে পার হয়ে এলো।

ঝুমঝুমদের বাড়ির সামনে এসে পোঁছতেই রণেনবাবু হইহই করে উঠলেন। মনে হলো ওদের আসাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত বলেই বেশী খুশি হয়েছেন। অঞ্জলিও বেরিয়ে এলো হাসি-হাসি মুখে। এসেই দু'হাত বাড়িয়ে অনীতার দুটি হাত ধরলো। হাসতে হাসতে বললে, তোমার বিরুদ্ধে দারুণ একটা অভিযোগ আছে।

অঞ্জলি একটা কথাতেই যেন আপন করে নিল অনীতাকে। এর আগে বাড়িতে গিয়ে যখন দেখা করেছিল তখন ভাল লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সেদিন ওকে কি

'তুমি' বলেছিল? মনে পড়লো না। ও নিজে তো 'আপনি আপনি' করেছিল।

অনীতা হেসে বললো, তুমি তো শুরু থেকে কেবল অভিযোগই করে যাচ্ছো।

—শুরু থেকেই? সহাস প্রশ্নের চোখ তুলে তাকালো অঞ্জলি।

—বাঃ, সেদিন তো অভিযোগ করতেই গিয়েছিলে! হাটে তোমাকে দেখেও নাকি চিনতে পারেন নি? বলে অনুপমের দিকে একবার, রণেনবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে হাসলো অনীতা।

রণেনবাবু লোকটি সুপুরুষ। দিব্যি লম্বা চেহারা। গরম কাপড়ের সাদা ট্রাউজার্স এবং নেভি ব্লু আর সাদায় মেশানো চমৎকার ছেলেমানুষি ডিজাইনের পুলওভারে সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাথার চুল সাদায় কালোয় মেশানো। নাক একটু বেশী টিকোলো। সব মিলিয়ে বেশ স্মার্ট, বছর দশেক বয়েস যেন অনায়াসেই ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন হাবভাবে চালচলনে।

ডান হাতের তর্জনী তুলে অঞ্জলিকে বললেন, ঠিক ঠিক, রাইট্‌লি সার্ভড্‌।

সবাই হেসে উঠলো।

আসলে অঞ্জলি বলতে চাইছিল, অনুপমের ঠাণ্ডা লেগেছিল একটু, তার জন্যে খাওয়ার নিমন্ত্রণটা নাকচ হলো কেন?

বুঝতে পেরে অনীতা বললে, এখান থেকে রাত্তিরে ফিরলে আর রক্ষে ছিল নাকি। সারা রাত হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে আমাদের ঘুমোতে দিত না।

সবাই হাসলো। সকলেই হঠাৎ চুপ করে গেল, যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

অঞ্জলি বললে, চলুন, ভিতরে চলুন।

একে একে সকলেই ঘরে এসে ঢুকলো। আর তখনই দেখা গেল ঝুমঝুম আর বাপ্পা বেরিয়ে যাচ্ছে।

অনীতা ওদের দেখতে পেয়ে হেসে বললে, ঝুমঝুম, কোথায় যাচ্ছো? তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম, আর ..

—প্লীজ মাসীমা, রোদ্দুর চলে যাবে, আলো পাবো না. .

বলে করুণভাবে তাকালো অনীতার দিকে, তার মা আর বাবার দিকে।

—আচ্ছা, আচ্ছা। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু, অনীতা হাসতে হাসতে বললে, কারণ ও ততক্ষণে ঝুমঝুমকে ভাল করে লক্ষ করেছে। একটা কোরা শাড়ী পরেছে ঝুমঝুম, পাড়টা খয়েরী আর শ্যাওলা-সবুজ স্ট্রাইপ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওর ছিপছিপে চেহারাটা, কাঁধ থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপে ঝুলছে ভারী ক্যামেরা। আসলে ওরা হয়তো ঐ শুঁড়িগ পাহাড়, কি আশপাশের প্রাকৃতিক শোভার ছবি তুলতে যাচ্ছে, অনীতা বুঝতে পারলো।

রণেনবাবু পিছন থেকে চিৎকার করে বললেন, ক্যামেরাটা হারিয়ে এসো না যেন।

সকলেই হেসে উঠলো। রণেনবাবু বললেন, ওর নিজের ক্যামেরা আছে, তবু আমারটা চাই। সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান করছে।

—তুমি তো আদর দিয়ে দিয়ে আহ্লাদী করে তুলেছো। অঞ্জলি রাগ দেখালো।

অনীতা বললে, আদর দেবারই তো কথা ভাই। কি সুন্দর মানিয়েছে শাড়িটায়। তোমার মেয়ে কিন্তু সত্যি খুব সুন্দরী।

অঞ্জলি বললে, হাসুর মুখটা কিন্তু আমার আরো মিষ্টি লাগে। বলে হাসুকে কাছে ডাকলো অঞ্জলি।—এসো হাসু, তুমি আমার কাছে এসে বসো.

হাসু মাথা নাড়লো। দূরেই বসে রইলো লজ্জা-লজ্জা মুখ ক'রে।

আর অঞ্জলি বললে, শাড়িটায় মানিয়েছে! জোর করে পরলো আমারটা, দেখো

এক্ষুনি ছিঁড়ে নিয়ে আসবে। বলে কপট বিরক্তি দেখালো।

অনুপমের কানে এসব কোনো কথাই যাচ্ছিল না। বসার ঘরে এমন কার্পেট, বিশেষ করে ঐ মোটা মোটা শরীরের গদিআঁটা শোফা কৌচগুলো দূরে দূরে থাকে বলেই মানুষকে কেমন দূরে সরিয়ে দেয়। প্রথমটা একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল অনুপম। কিন্তু দূরে বসার জন্যেই ওর চোখ যখনই একবার করে অঞ্জলির মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল তখন ঐ এক ঝলক দৃষ্টিতে তার সমস্ত শরীর, তার বসার ভঙ্গি, তার হাসি—সব দেখতে পাচ্ছিল। কাছ থেকে মানুষকে কতটুকুই বা দেখা যায়, কাছ থেকে মানুষকে কতটুকুই বা পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে তখন ওরা সবাই হঠাৎ চুপ করে গেছে। একেবারে নিস্তব্ধ। যেন কথা শেষ হয়ে গেছে সব। অনুপম অঞ্জলির দিকে তাকালো। মনে হলো অঞ্জলি হঠাৎ স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে একটি স্নিগ্ধহাস স্থির প্রতিমা হয়ে গেছে। সেই প্রথম যৌবনে বুকের মধ্যে অস্থির যন্ত্রণা নিয়ে, অসহ্য কান্না নিয়ে অনুপম যখনই ওর দিকে তাকাতো, ওর চোখের দৃষ্টিকে মনে হতো যেন কোনো দেবী-প্রতিমার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেওয়া পুষ্পাঞ্জলি। এখন ওকে সতি সত্যি প্রতিমা মনে হচ্ছে।

—আপনি এখনো ঠিক তেমনিভাবে হাঁটেন, হাঁটার সময় মাথা ঝুঁকে পড়ে, চোখ মাটিতে রেখে। অঞ্জলি অনুপমের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে।

রণেনবাবু লম্বা পা দুটো এগিয়ে দিয়ে শোফায় গা এলিয়ে বললেন, সমাজে মাথা যাঁদের উঁচু তাঁরা মাথা নিচু করেই হাঁটেন।

অনীতা হেসে উঠলো।—তাই বুঝি! ছেলেবেলাতেও ঐভাবে হাঁটতো? আমি তো ভেবছিলাম ঘাড় গুঁজে পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে ঐরকম হয়ে গেছে।

রণেনবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন।

অনুপম হাসতে পারলো না। কথাগুলো ওর কানেই যায় নি, ও মনে মনে তখন নাড়াচাড়া করছে—'আপনি এখনো ঠিক তেমনিভাবে হাঁটেন।'

অঞ্জলি, তুমিও তখন মাথা নিচু করেই হাঁটতে। খুব ভোরে উঠে তুমি কলেজে যেতে। বিদ্যাসাগর মর্নিং—তোমাদের তো সকালে কলেজ ছিল। অত ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু তোমার দেখা পাবো না এই ভয়ে সকালে উঠে আমি সেই লম্বা বারান্দার এক কোণে এসে দাঁড়াতাম। তোমার ঘরে তখন তোমার দেখা পাওয়া যেত না। আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করতাম তোমাদের নীচের তলায় দরজাটার দিকে চোখ রেখে। এক সময় খুট করে একটা শব্দ হতো, আমার বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠতো। তুমি বের হবার সময় একবার তিনতলার বারান্দায় তাকাতে, চোখাচোখি হতো মুহূর্তের জন্যে। আমার শার্টের বুকে তুমি একটা গোলাপের কুঁড়ি এঁটে দিয়ে যেতে। কুঁড়িটার নাম—সুখ। তারপর তুমি ধীর পদক্ষেপে চলে যেতে, আমি আশায় থাকতাম, তুমি একবার ফিরে তাকাবে। না, তাকাতে না। কিন্তু ঐ এক পলকের চোখাচোখি আমাকে সারাটা দিন তৃপ্ত করে রাখতো। কারণ তোমার কলেজ থেকে ফেরার আগেই আমার কলেজের সময় হয়ে যেত। বিকেল অবধি তুমি আমার কল্পনার সঙ্গী হয়ে থাকতে। কোনো কোনোদিন কলেজে যাওয়ার পথে দেখা হয়ে যেত, তুমি তখন ফিরছো, চোখাচোখি হলেই চোখ নামিয়ে নিতে। আমি তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত পৃথিবী হেঁটে বেড়াতাম।

—বিপিন! অঞ্জলি ডাকলো বিপিনকে। তারপর নিজেই উঠে গেল।

তন্ময়তাভাঙা চোখে অনুপম সেদিকে তাকালো একবার। ওর কিন্তু বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছিল না, একটুও না। ভিতরে ভিতরে ও বড়ো অস্থির

বোধ করছিল। রণেনবাবু মানুষটি তো দিব্যি সজ্জন, অনীতার কোনো কিছুই তো বিসদৃশ লাগছে না। তবু অনুপমের মন ওদের ওপর তিক্ত হয়ে উঠছিল। ও তো কিছুই চায় না, শুধু অঞ্জলির সঙ্গে নির্জনে দু-একটা কথা বলতে চায়। ওদের উপস্থিতিটা তাই অসহ্য লাগছে।

অনীতা অঞ্জলিকে যেতে দেখে উঠে দাঁড়ালো। অনুপম জানে, এখন ও কি করবে। অঞ্জলিকে গিয়ে বলবে, চলো তোমার বাড়িটা দেখি। বলে ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখবে, আসবাবপত্র, মনে মনে ওর সচ্ছলতা যাচাই করবে, কাজের লোক ক'জন, কিভাবে রান্না হয়, নিজের সঙ্গে তুলনা করে একটু অসুখী বোধ করবে, হঠাৎ কোনদিন অনুপমকে বলে বসবে, কিংবা বাড়ি ফিরে গিয়ে ঠোঁট ওল্টাবে।

না, ফিরে এসে অনীতা বললে, কি সুন্দর বাড়িটা তোমাদের! ঘরগুলো কি বড় বড়।

খাবারের প্লেট নামাতে নামাতে অঞ্জলি বললে, ছাই সুন্দর! তিনটি তো প্রাণী, রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে গা ছমছম করে।

খাবারের টুকরো মুখে তুলে অনুপম বললে, কড়াইশুঁটির কচুরীটা চমৎকার হয়েছে। এটা আমার খুব প্রিয় খাবার। বলে চোখ তুলতেই চোখে চোখে কি যেন কথা হলো।

অঞ্জলি মৃদু হেসে বললে, কত কি তো খেয়েছি, কিন্তু একবার পুজোর সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেয়েছিলাম, সে স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

রণেনবাবু বুঝলেন না, হেসে উঠে বললেন, ছেলেবেলার স্বাদটাই অন্যরকম।

ছেলেবেলার স্বাদটাই অন্যরকম। অনুপম মনে মনে বলে, কি আশ্চর্য দ্যাখো, ও যে কড়াইশুঁটির কচুরী ভালবাসতো অঞ্জলি তা ভোলেনি। কি আশ্চর্য দ্যাখো, সেই যে বিলু আর অঞ্জলি একবার প্রতিমা দেখতে বেরিয়েছিল পুজোর দিনে, অনুপমের সঙ্গে দেখা হতেই বিলু পয়সা চেয়ে নিয়ে ফুচকা খেয়েছিল ওরা দু'জনে, অঞ্জলি লাজুক লাজুক মুখ করে হাতে শালপাতা ধরে ফুচকা খাচ্ছিল, কিন্তু অনুপমের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি, সেই দৃশ্যটা ওর মনে পড়ে গেল।

ছেলেবেলার সেই স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে—অনুপমের সমস্ত শরীরে, প্রতিটি রক্ত কণিকায়।

৭

কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে গটগট করে বেরিয়ে এলো ঝুমঝুম, বাপ্পা তার পাশে পাশে। দু'জনে চোখাচোখি হতেই ঝুমঝুম ঠোঁটের কোণা দিয়ে, চোখের কোণা দিয়ে একটু ফিক করে হেসে নিল। বললে, খুব বেঁচে গেছি। আরেকটু হলেই আটকে পড়েছিলাম আর কি!

একটু থেমে বললে, মাসীমা অবশ্য ভীষণ ভালো।...আচ্ছা বাপ্পা, বুড়োদের সঙ্গে তোমার গল্প করতে ভাল লাগে?

বাপ্পা একটু গম্ভীর ভাব এনে বললে, যাঃ, ওরা কি বুড়ো নাকি! প্রৌঢ়।

—আহা, বুড়ো নয় তো কি, বাপীর তো কত চুল পেকে গেছে।

বলেই ঝুমঝুম এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়েই বাপ্পার জামার হাতা ধরে

টান লাগালো, এই দৌড়োও, এক্ষুনি রোদ্দুর চলে যাবে...

বেশ কিছুটা দূরে একটা ঢিবির মত হয়েছে, অনেক কাল আগে খাদের মাটি এনে ফেলে ফেলে সেটা এখন প্রায় ছোটখাটো একটা টিলা, সেখান থেকে গড়িয়ে নেমে গেলেই সবুজ মাঠ, গাছপালা, ছোট্ট একটা সাঁওতাল পল্লী দেয়ালে পাড়ের মত করে দেওয়া গেরুয়া আর শ্লেট রঙ, তার ওপর একটা সুন্দর ছবি এঁকেছে কোনো সাঁওতালী হাত, একটা মানুষকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে চিতাবাঘ আর মানুষটা তার মুখ থেকে ঝুলতে ঝুলতে একট তীর বিঁধিয়ে দিয়েছে বাঘের গলায়। ছাবটা এর আগে একদিন দেখে গিয়েছিল ওরা, সেদিন ক্যামেরা ছিল না।

ঝুমঝুম তাই বাপ্পার জামা ধরে টান মারলো।—এই দৌড়োও...

বলে নিজেও ছুটতে শুরু করলো। পিছনে পিছনে পাশে পাশে বাপ্পাও। দুজনেই হাসছে, হাঁপাচ্ছে, ছুটছে। ছুট, ছুট, ছুট।

ঝুমঝুমকে তার মা'র শাড়িটায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার আঁচল সামলানো, কুঁচি সামলানো, হাতে স্ট্র্যাপ থেকে ঝুলছে দুলছে ক্যামেরাটা—তার ছুটন্ত রূপটা দেখে হাসছিল বাপ্পা, সে নিজেও ছুটছিল।

কাছাকাছি এসে দুজনেই থামলো, হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। বাপ্পা তাকিয়ে দেখলো, ঝুমঝুম এই শীতেও ঘেমে গেছে, ওর সারা মুখ ঘামে আর পড়ন্ত রোদ্দুরের আলোয় ঝকঝক করছে। ওর মনে হলো, কি হবে সাঁওতাল পল্লীর দেয়ালের ছবি তুলে, বরং ঝুমঝুমের ঠিক এক্ষুনি এক্ষুনি একটা ছবি তুলে রাখতে পারলে অনেকদিন ধরে ও ফোটোটা বের করে করে দেখতে পারতো।

ঝুমঝুমের কিন্তু ওসব দিকে কোনো দৃষ্টি নেই, ওসব কোনো ভাবনাই নেই।

ও সেই মাটির ঘরখানার কাছে এলো। একটা বুড়ি চট গায়ে দিয়ে রোদ্দুরে বসে আছে, মাটির সরা থেকে নিয়ে কি যেন খাচ্ছে একটা ন্যাংটো ছেলে।

ঝুমঝুম ক্যামেরার লেন্স ঠিক করলো, ফোকাস মেলালো। তারপর খচাং করে একটা ছবি তুললো। তারপর আরেকটা, আরেকটা।

যেদিকে তাকায় সেদিকই যেন ছবি হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ হাসতে হাসতে বললে, বাপীরটায় ছবি তুলতে খুব মজা, থার্টিফাইভ তো। আমারটায় তুলতে না তুলতে ফুরিয়ে যায়।

বাপ্পার নিজেরও ইচ্ছে করছিল এই সুন্দর পটভূমিতে ঝুমঝুমের একটা ছবি তোলার।

ও হঠাৎ বললে, এই দাও তো, তোমার একটা ছবি তুলি।

—আমার? অবাক হয়ে বাপ্পার দিকে তাকালো ঝুমঝুম। শব্দ করে হেসে উঠলো। বললে, আমার ছবি কি হবে?

বাপ্পা কি বুঝলো কে জানে, ও প্রথমে একটু থমথমে মুখ করলো। আর ঝুমঝুম বলে উঠলো, এই, এই, নড়বে না, তোমার বরং...

খচ করে একটা ছবি তুললো ঝুমঝুম, বাপ্পা মুখ ঘোরালো, তখন আবার একটা—।

ঝুমঝুম হাসছে আর বাপ্পার একটার পর একটা ছবি তুলছে। বাপ্পা বিরক্ত হলো, বাপ্পা রেগে গেল। বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্যামেরাটা আমাকে ছুঁতে দেবে না সেকথা বললেই তো পারতে। রাগ দেখালো বাপ্পা।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমঝুম বলে উঠলো, বাপ্পা, এক সেকেন্ড, প্লীজ, দারুণ

রেগে গেছ তুমি, এমন চমৎকার দেখাচ্ছে না গাল ফুলিয়ে...

বলেই আবার একটা ছবি তুললো ঝুমঝুম। হেসে উঠে ক্যামেরাটা এগিয়ে দিয়ে বললে, এই নাও বাবা, এই নাও, কি রাগ ছেলের! তোলো, যত খুশি ছবি তোলো আমার।

বাপ্পা হেসে ফেলে ক্যামেরাটা হাতে নিল। অ্যাপার্চার ঠিক করলো।

—কি রকম পোজ দেবো, বলে দাও। ঝুমঝুম ভঙ্গি করে দাঁড়ালো।

পর পর বেশ কয়েকটা ছবি তুললো বাপ্পা, একটা তুললো ঝুমঝুমকে দেয়ালে আঁকা বাঘটার মুখের কাছে দাঁড় করিয়ে।

ঝুমঝুম হেসে হেসে বললে, শেষটায় বাঘের মুখে তুলে দিলে আমাকে!

—বাঘের মুখেই তো তুমি পড়েছো। বাপ্পা স্থির গলায় উত্তর দিল।

ঝুমঝুম যেন শুনতেই পায়নি কথাটা। হঠাৎ বললে, বাপ্পা, সন্ধ্যে হয়ে যাবে, শীগগির চলো। মাসীমা মেসোমশাই হয়তো বসে আছেন।

ঝুমঝুমের একটু আগে বলা কথাটাই আবার বললে বাপ্পা।—বুড়োদের সঙ্গে গল্প করতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

ওরা তখন উঁচুনীচু মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে বাড়ির দিকে। বাপ্পার কথাটা শুনেও হাসলো না ঝুমঝুম। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো ও। সামনে একটা চড়াই, বাপ্পার কাঁধে হাতের ভর দিয়ে উঠতে উঠতে ঝুমঝুম শান্ত ঠাণ্ডা গলায় হঠাৎ বললে, জানো বাপ্পা, আমার না এক এক সময় বাপীর জন্যে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

বাপ্পা ঝুমঝুমকে হাত ধরে টেনে ঢিবিটার ওপরে তুললে, তারপর দ্রুত নামতে নামতে বললে, কেন?

বিষাদের গলায় ঝুমঝুম বললে, কি জানি। মাত্র দিন কয়েক দেখছি হঠাৎ হঠাৎ কি যেন ভাবে বাপী। একটা কথাও কানে যায় না। কাল রাত্তিরে একটুও ঘুমোয়নি।

বাপ্পা বিস্ময়ের চোখে তাকালো ঝুমঝুমের দিকে।—ঘুমোন নি?

—না। একবার ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম বাপী জানালায় একা দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে, অন্ধকারে বাপীকে দেখে আমার গা ছমছম করে উঠেছিল। আবার একবার ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম মা ঘুমোচ্ছে, অন্ধকারে বাপী বসে আছে ইজিচেয়ারটায়। কেন বলো তো?

বাপ্পা মাথা নীচু করে চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে বললে, কি জানি।

ঝুমঝুম যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বলতে গিয়েও ও কথাটা বলতে পারলো না, কেমন লজ্জা লাগলো ওর। খুঁজে খুঁজেও কোনো কারণ বের করতে পারেনি। একবার ঈষৎ একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল ওর মনে। বাপী কি ওর কথাই ভাবছে? ঝুমঝুমের কথা? বাপ্পার সঙ্গে ওর এই বন্ধুত্ব, এই অবারিত মেলামেশা, এ-সব কি বাপী পছন্দ করছে না? না অন্য কিছু ভাবছে?

এই কথাটা মনে হতেই ঝুমঝুম হেসে উঠলো নিজের মনেই।

—হাসলে যে! বাপ্পা বুঝতে পারলো না ঝুমঝুম কেন হেসে উঠলো।

শুধু মাথা দোলালো ঝুমঝুম, বোঝাতে চাইলো 'কিছু না'। তারপর নিঃশব্দে হেঁটে চললো। একটাও কথা বললো না।

পাশাপাশি চুপচাপ অনেকখানি হেঁটে এসে বাপ্পা আস্তে আস্তে গাঢ় গলায় বললে, আচ্ছা ঝুমঝুম!

—উঁ।

—একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

ঝুমঝুম বাপ্পার দিকে তাকালো না, শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো।

—ঝুমঝুম, তুমি.. তুমি কাউকে ভালোবাসো ? গলার স্বরটা কেমন যেন হয়ে গেল বাপ্পার। হতাশা আর কান্নায় মিশে গেল যেন গলার স্বর।

আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো ঝুমঝুম।—না বাবা। আমি ও-সব দিকে নেই। ছেলেরা আজকাল যা একেকটি, শেষে রেগে গিয়ে কখন একটা অ্যাসিড বাল্‌ব্‌ ছুঁড়ে মারবে...

একটুক্ষণ চুপ থেকে ঝুমঝুম ঠাণ্ডা গলায় বললে, অ্যাসিড বাল্‌ব্‌ আজকাল বোধহয় আর ফ্যাশন নেই, না বাপ্পা ?

বাপ্পা কোনো কথা বললো না। ও কি যেন বলতে চেয়েছিল, কত কি বলবে ভেবে রেখেছিল, কিন্তু সব কেমন যেন ওলোটপালোট হয়ে গেল। ঝুমঝুমকে কিছুই যেন ধীরেসুস্থে বলা যায় না। ও কিছু বোঝে না, কিচ্ছু বোঝে না। বাপ্পার চোখের জল আটকে গিয়ে বুকের মধ্যে বরফ হয়ে গেল।

ঝুমঝুমদের বাড়িটা তখন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। সূর্য আড়াল পড়ে গেছে, নীল আকাশ একটু একটু করে কালো হয়ে যাচ্ছে, এক ঝলক বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে এলো, জংলা গাছের সবুজ আলো দৈত্যের মত ছায়া ছায়া রূপ নিচ্ছে, একটা পাখি মাথার ওপর দিয়ে চিংকি-চাক চিংকি-চাক শব্দ ছিটিয়ে উড়ে গেল।

একটু এগিয়েই একটা শান-বাঁধানো কালভার্ট। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

ঝুমঝুম হঠাৎ বললে, কার্ডিগানটা আনলে হতো।

কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না বাপ্পার। তবু কথা না বললেও চলে না।

বললে, এখুনি তো পৌঁছে যাবে। কার্ডিগান কি হবে!

ঝুমঝুম ফিসফিস করে বললে, ফিরলেই তো সেই বাড়ি। একটু বসা যেত এখানে।...একটু বসবে?

বাপ্পা সায় দিয়ে বললে, বসবে এখানে?

দুজনেই বসে পড়লো কালভার্টের বেদীতে। রাতকানা একটা সাঁওতাল লাঠি ঠুকে ঠুকে ওদের পার হয়ে গেল। ওরা অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। ঝুমঝুমদের বাড়িতে একটা একটা করে আলো জ্বলে উঠছে।

বাপ্পা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর এক সময় বললে, ঝুমঝুম!

—উঁ।

—ক্যামেরার ছবিগুলো এলে আমাকে একটা দেবে।

—বাঃ রে, তোমার সব কটা ছবিই তো দেবো। দেখো, খুব মজার হবে ছবিগুলো, যা রেগে গিয়েছিলে না...

বাপ্পা একটু চুপ করে থেকে বললে, আমার ছবি আমি চাই না।

ঝুমঝুম অবাক হলো।—তবে ?

—তোমার একখানা ছবি আমাকে দেবে বলো!

ঝুমঝুম হেসে উঠলো। অবাক হবার ভান করে বললে, আমার ছবি ? আমার ছবি নিয়ে কি করবে?

বাপ্পা ধীরে ধীরে বললে, আমি রেখে দেবো কোথাও। এখান থেকে তো চলে যাবো একদিন, তারপর হয়তো দেখাও হবে না তোমার সঙ্গে, তখন এক একদিন

বের করে দেখবো তোমাকে।

—বাঃ রে, ছবি দেখলেই মানুষটাকে দেখা হয় নাকি; বাপ্পা তুমি যেন কি! ছবি তো শুধু দেখাবার জন্যে। বন্ধুদের দেখানো যায়। আমার যদি কোনোদিন তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে, আমি দেখো, ঠিক তোমাদের বাড়ি চলে যাবো।

বাপ্পা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করলো, আমাকে দেখতে ইচ্ছে হবে তোমার? ঝুমঝুম, তুমি সত্যি করে বলো!

কালভার্টের সিমেন্টে হাত রেখে বসেছিল বাপ্পা। ঠান্ডা লাগছিল তবু হাত রেখেছিল। ঝুমঝুম তার হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে বললে, আমি নিজেই জানি না। আমার যে কখন কি ইচ্ছে করে ওঠে আমি নিজেই জানি না।

৮

খাওয়ার পর হাত ধোবার জন্যে অঞ্জলির পিছনে পিছনে কলঘরের দিকে যাবার সময় লম্বা বারান্দাটা, বারান্দার দু'পাশ দেখতে দেখতে গেল অনুপম। অঞ্জলি ওর খুব কাছে কাছে, দু'তিনবার ফিরে ফিরে অনুপমের দিকে তাকালো, মুখে কৌতুকের হাসি। কিন্তু কোনো কথা বললো না।

অনুপম নিজে থেকে ওদের বাড়িতে এসেছে এই আনন্দে অঞ্জলিকে সর্বক্ষণ খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। কেউ শুনছে কি শুনছে না সেদিকে ওর লক্ষই ছিল না, ও জানতো এই ভিড়ের মধ্যে একজন ওর কথা শুনছে। তার স্বামী, অনীতা, হাসু—সকলের সঙ্গেই কথা বলছিল ও, নানান কথা, সিমলা স্ট্রীটের দিনগুলির কথা, অনুপমের বাবা-মা'র কথা, বিলুর কথা। প্রাণ খুলে হাসছিল দু'একটা হাসির কথায়। অনুপম বেশ বুঝতে পারছিল, অঞ্জলি ভীষণ খুশি হয়েছে। বুঝতে পারছিল রণেনবাবু, অনীতা, হাসু এরা শুধু উপলক্ষ, অঞ্জলি আসলে সব কথা শোনাতে চাইছিল অনুপমকে। এক একবার অনুপম চোখ ফিরিয়ে দেখেছে, অঞ্জলি ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্থিরদৃষ্টিতে। একটু অপ্রতিভ বোধ করেছে, একবার রণেনবাবুর দিকে, একবার অনীতার দিকে তাকিয়ে দেখছে ওরা লক্ষ করেছে কিনা। ওর মনে হয়েছে অঞ্জলি যেন অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। আর সেজন্যেই অনুপমের একটু ভয়-ভয় করেছে। মনে মনে বলতে চেয়েছে, স্মৃতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলে লাভ নেই অঞ্জলি, এই বয়সে এতখানি দুঃসাহস আর মানায় না। অথচ ওর নিজেরই দুঃসাহসী হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে এক একবার।

খাবার খাওয়ার পর গ্লাসের জলে হাত ডোবাবে কিনা, রুমালে হাত মুছবে কিনা এই দ্বিধায় একবার অঞ্জলির দিকে তাকিয়েছিল ও। আর সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি বলে উঠলো, হাত ধোবেন? আসুন না, বেসিন আছে ওদিকে।

অঞ্জলির পিছন পিছন উঠে এলো অনুপম। দরজার পর্দা সরিয়ে অনেকখানি লম্বা করিডর, তার একপাশে পর পর কয়েকখানা অন্ধকার ঘর, আলো জ্বালা হয়নি। এগিয়ে এসে বারান্দার আলোটা জ্বাললে অঞ্জলি, সুইচ টিপে। সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের বুকের মধ্যে রক্তের স্পন্দন বেড়ে গেল। ওর এক মুহূর্তের জন্যে ইচ্ছে হলো সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিতে।

অঞ্জলি দ্রুত পায়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিল—

কৌতুকের চোখে। অনুপম পিছন ফিরে একবার বসার ঘরের দরজার পর্দার নিচে তাকালো। ডান দিকে ছোট ছোট কয়েকখানা ঘর, এক কোণে আলো জ্বলছে, রান্নার গন্ধ পেল অনুপম। বিপিন হয়তো রান্না করছে। কিংবা রান্নার হয়তো অন্য লোক আছে। অনুপম জানে না।

অনেকখানি এসে বারান্দার পাশেই বেসিন। কলটা খুলে দিল অঞ্জলি। একেবারে কাছটিতে দাঁড়িয়ে রইলো। অনুপম হাত ধুলো। কথা বললো না। এই নিঃশব্দতার মধ্যে কথা বলতে ভয় করছিল ওর।

অঞ্জলি মৃদু হেসে স্বাভাবিক শান্ত গলায় বললে, আপনার ভয় করছে!

অনুপম উত্তর দিল না। শুধু আশ্চর্য হলো অঞ্জলি এত স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে দেখে। কি আশ্চর্য, ওরা যে শুনতে পাবে!

অঞ্জলি নিজেই আবার বললে, এখন আর আমি একটুও ভয় করতে পারবো না।

প্রশ্রয় পেয়ে অনুপম অস্বাভাবিক চাপা গলায় বললে, তোমাকে একটুও একা পেলাম না অঞ্জলি!

অঞ্জলি কৌতুকে হেসে উঠলো। কল বন্ধ করে সামান্য কয়েক ফোঁটা জল হাতে নিয়ে অঞ্জলি অনুপমের মুখে ছিটিয়ে দিল।

আর অঞ্জলি এমন দৃষ্টিতে এক পলকের জন্যে তাকালো অনুপমের দিকে, ওর বুকের ভিতরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। মনে হলো ওরা দুজনেই যেন বাপ্পা আর ঝুমঝুমের বয়সে ফিরে গেছে।

এই প্রথম অনুপমের মনে হলো, ও যেন একটা নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করছে। এই করিডরে পা দিয়েই ওর প্রথম সেই অনুভূতি হয়েছিল। এখন মনে হলো এই নিষিদ্ধ বারান্দার যেন কি একটা নেশা আছে। এখানে এলে যেন মনেই হয় না সে একজন সংসারী মানুষ। অনীতা, বাপ্পা, হাসু সব যেন ঝাপসা হয়ে যায়। সকলকে যেন বৃষ্টির ছাট লাগা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায়, অস্পষ্ট। এমন কি ঐ রণেন-বাবু লোকটি এই বাড়িরই একটি আসবাবের মত। প্রয়োজনে যাকে যেখানে খুশি সরিয়ে রাখা যায়।

এর আগে হাট থেকে ফেরার পথে ও তো অনেক কথা বলেছে অঞ্জলির সঙ্গে, অঞ্জলির গলার স্বর তখন কান্না হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো কোনো অন্যায় বোধ জাগেনি। কিন্তু এই প্রথম অনুপমের মনে হলো, এই নিষিদ্ধ একাকীত্বের যেন একটা প্রচন্ড নেশা আছে। এই গোপনীয়তার।

অঞ্জলির পিছনে পিছনেই অনুপম ফিরে এলো।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই অনুপম মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেল। রণেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, বাইরে থেকে বোঝাই যায় না বাড়িটা এত বড়। বারান্দা যেন আর ফুরোয় না।

রণেনবাবু শুধু একটু মৃদু হাসবার চেষ্টা করলেন।—হুঁ।

অনুপমের মনে হলো রণেনবাবু যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অঞ্জলি ততক্ষণে অনীতার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। হাসুর খাওয়া তখনো শেষ হয়নি।

একটু পরেই অঞ্জলি আবার অনীতা আর হাসুকে নিয়ে বারান্দার দিকে গেল।

আর অনুপম অস্বস্তি কাটিয়ে রণেনবাবুর মুখের দিকে তাকালো একবার। দেখলো, মাথা ঝুঁকে পড়েছে রণেনবাবুর। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছেন।

অস্বস্তি, অস্বস্তি। রণেনবাবু কি কিছু ভেবে নিয়েছেন ? অঞ্জলির কথাগুলো

কি এখান থেকে শোনা গিয়েছিল? অনীতা, অনীতা কি কিছু সন্দেহ করেছে?

ভীষণ বিব্রত বোধ করলো অনুপম।

বিরাট ঘরখানায় অদ্ভুত একটা নিঃশব্দতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। রণেনবাবু আর অনুপম মুখোমুখি। অথচ কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না, কেউ কোনো কথা বলছে না। অনুপমের মনে হলো যেন এখনই একটা বজ্রপাত হতে পারে। কিংবা ওরা চলে যাওয়ার পর হয়তো...

এই শীতের মধ্যেও অনুপম কি ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠছে? এখনই কিছু না ঘটলেও, ওর মনে হলো, আজ ওরা চলে যাওয়ার পর হয়তো অঞ্জলিকে. .

অঞ্জলির জন্যে অনুপমের কষ্ট হলো। ওর মনে হলো, ছি ছি, শুধু ওর জন্যেই...যদি রণেনবাবু আর অঞ্জলির মধ্যে কোনো..

চোখ তুলে রণেনবাবুর দিকে তাকাতে পারলো না অনুপম।

দূরের বারান্দা থেকে অনীতা আর অঞ্জলির ভাঙা ভাঙা কথা ভেসে আসছে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো ও। না, কোনো কথাই বোঝা যাচ্ছে না।

চোখ না তুলেই সামনের টি-পয়ের উপর রাখা অ্যাশ ট্রে-টার দিকে তাকালো অনুপম। ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো।

তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। সিগারেট বের করে ডান দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলো। হাতটা দেশলাইয়ের বাক্সে ঠেকেছে পকেটের মধ্যে। তবু বের করলো না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে খালি হাতটা বর করে আনলো।

—আপনার লাইটারটা। রণেনবাবুর দিকে তাকিয়ে অনুপম হাত বাড়ালো।

রণেনবাবু অনুপমের মুখের দিকে তাকালেন, হাত বাড়িয়ে লাইটারটা দিলেন। কোনো কথা বললেন না। আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

অনুপমদের বিদায় দিয়ে ফিরে এলো অঞ্জলি। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো সমস্ত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। থেকে থেকে রান্নাঘর থেকে বাসনকোসনের ঠুংঠাং আওয়াজ আসছে। সেই শব্দটুকু যেন স্তব্ধতা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অনুপম চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত আনন্দও চলে গেছে।

অঞ্জলির নিজেরই অবাক লাগে, কুড়ি বছর যাকে ভুলে থাকতে পেরেছিল, যাকে শুধু কখনো কখনো স্মৃতির মধ্যে নাড়াচাড়া করেছে, সামান্য দুটো কথা বলার পর থেকে বুকের মধ্যে এমন তোলপাড় উঠলো কেন। কেন সর্বক্ষণ ওর অনুপমের কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছে করছে, সেই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণের মতই দেখতে এবং দেখা দিতে ইচ্ছে করছে।

একটু আগেই ঝুমঝুম ফিরে এসেছে। পড়ার টেবিলে বসে কি যেন লিখছে ও। জানতে ইচ্ছে হলো না। স্বামীর কথা মনে পড়লো না। নিশ্চয় কোথাও বসে বসে পাইপ টানছে। কিংবা ফাইলপত্র দেখছে অফিসের।

শোবার ঘরের জানালার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ও। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকার, অন্ধকার। শুধু দূরে দূরে দু'একটা আলো জ্বলছে। রোপ-ওয়ে থেমে গেছে, ঝিরঝির শব্দটা বন্ধ হয়ে গেছে।

অঞ্জলি অস্ফুটে হঠাৎ বলে উঠলো, পারবো না, পারবো না আমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ওর কান্না পেল। যেন অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পেলে ও শান্তি পাবে। বুকের জ্বালা জুড়োতে পারবে।

'কোলকাতায় আপনাকে আমি কত খুঁজেছি, কত খুঁজেছি। আমার কোথাও গিয়ে শান্তি ছিল না। সিনেমায় গিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাতাম, মনে হতো হঠাৎ কোনোদিন আপনাকে দেখতে পাবো। আউটরামে, গড়ের মাঠে, একজিবিশনে—যেখানেই যেতাম, খুঁজতাম। ভাবতাম, আপনিও তো কত জায়গায় যান, দেখা হয়ে যায় না কেন? পুজোর সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে একটার পর একটা প্রতিমা দেখে বেড়াতাম, কখনো ননদ আর জায়ের সঙ্গে, কখনো বোনদের নিয়ে। কেন জানেন? মনের মধ্যে একটুখানি আশা জাগতো, প্রতিমা দেখার ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কোথাও না, কোথাও আপনাকে দেখতে পাইনি। শুধু ক্লান্তি নিয়ে ফিরে আসতাম। অথচ আপনার ঠিকানা জানতাম আমি, বিলুর সঙ্গেও কখনো-সখনো দেখা হতো, সব খবর পেতাম। আশ্চর্য দেখুন, ইচ্ছে করলে আপনার বাড়ি গিয়ে উঠতে পারতাম যে কোনোদিন। কি এমন বাধা ছিল! দুবার এক নিমেষের জন্যে দেখা হয়েছিল, ইচ্ছে করলে তো কথাও বলতে পারতাম সেই বিয়েবাড়িতে! সমস্ত ইচ্ছেকে চেপে রেখেছিলাম। আজ আপনি এসে আমার সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছেন, আর আমি নিজেকে শাসন করতে পারছি না।'

অঞ্জলির হঠাৎ মনে হলো ও ভীষণ অসহায়, ও কোনোদিন যেন স্বামীর ভালবাসা পায়নি। ভালবাসা অন্য কিছু, ও বোঝে না। অঞ্জলি ভাবতে চেষ্টা করলো, স্বামী কোনোদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করেছে কিনা। মনে পড়লো না। সারা জীবন ধরে ও নিজেই শুধু অপেক্ষা করেছে স্বামীর জন্যে। যেদিন ফিরতে দেরী করেছে, ও অধৈর্য বোধ করেছে। হয়তো দু একবার স্বামীও ওর জন্যে অপেক্ষা করেছে, ও যখন অন্যদের সঙ্গে কোথাও গিয়ে ফিরতে দেরী করেছে। কিন্তু সে তো উৎকণ্ঠা। ওরা দুজনই পরস্পরের জন্যে উৎকণ্ঠা বোধ করেছে শুধু, আর অনুপম ওর জন্যে অপেক্ষা করেছে। প্রতিদানে কিছুই পাবে না জেনেও সেই সিমলা স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ভোরবেলায়। শুধু একটিবার দেখা পাবার লোভে। কলেজে যাবার মুখে এক পলকের দেখা পাবার জন্যে। সমস্ত পাড়া যখন নিঝুম হয়ে যেত, বাড়ির সকলের সঙ্গে একদিন বিয়েবাড়িতে গিয়ে ফিরতে রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল, অঞ্জলির ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল অনুপম ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে, ওকে রাত্রের শেষ দেখা না দেখতে পেলে ঘুমোতে পারতো না অঞ্জলি, কিন্তু বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ও বারান্দার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিল সেদিন। অনুপম অপেক্ষা করে আছে তখনো। অঞ্জলি জানতো অনুপম ওকে না দেখে ঘুমোতে পারবে না।

শুধু চোখের দেখা বুকের মধ্যে এত গভীর করে দাগ রেখে যায়, ও জানতো না।

'আপনি অনেক রাত অবধি পড়তেন। পড়া শেষ করে এসে দাঁড়াতেন। আমার জানালার মুখোমুখি। দেখতেন আমার ঘরেও আলো জ্বলছে। আমরা দুজনে দুজনকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতাম। তারপর আমি আলো নিভিয়ে শোবার ঘরে চলে যেতাম, আপনি আলো নিভিয়ে ঘুমন্ত বিলুর পাশে শুয়ে পড়তেন।'

অঞ্জলি একবার ভাববার চেষ্টা করলো, স্বামী কোনোদিন ওকে নিছক চোখের দেখা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করেছে কিনা। কিন্তু ও কি অঞ্জলির কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছে? কিছু কি ভাবছে?

সুইচ টেপার শব্দ হলো। ঝুমঝুমের ঘরের আলো নিভে গেল। ঝুমঝুম হয়তো শুয়ে পড়লো। অঞ্জলিদের ঘর আর ঝুমঝুমের ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে, রাতে খোলা থাকে। এখানে এসে একা শুতে ভয় পায় ঝুমঝুম।

অঞ্জলি জানালার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বারান্দার কাছে এগিয়ে এলো।

বিপিন ওকে দেখতে পেয়ে বললে, সাহেব ও ঘরে আছেন।

করিডরের শেষ প্রান্তের ঘর থেকে আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। অঞ্জলি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে। দরজার সামনে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো।

দেখলো টেবিলে মাথা রেখে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে স্বামী।

অঞ্জলি নিঃশব্দ পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার পিঠে হাত রেখে বললো, ঘুমোচ্ছো?

—উঁ? নাঃ—। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা তুললেন রণেনবাবু।

—শোবে চলো।.. কি হয়েছে তোমার বলো তো? উৎকণ্ঠ গলায় বললে অঞ্জলি।

—কই না, কিছু না তো। দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেল অঞ্জলি।

ও বড় বিব্রত বোধ করলো। ক'দিন থেকেই ও মাঝে মাঝে স্বামীকে লক্ষ করছে, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কিংবা কিছু ভাবছে। এই দূরত্ব ও কোনোদিন টের পায়নি। তবে কি...

রণেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা বললেন না। ধীরে ধীরে শোবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

অঞ্জলি দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে এসে শুয়ে পড়লো।

পাশাপাশি দু'জনেই শুয়ে আছে। দু'জনেই জেগে আছে, অথচ কেউ কোনো কথা বলছে না।

অঞ্জলির একবার ইচ্ছে হলো স্বামীর গায়ের ওপর হাতটা রাখার। কি এত দুশ্চিন্তা ওর? অঞ্জলিকে নিয়ে? তা হলে ও মুখ ফুটে বলছে না কেন? তা হলে তো সব বলে দিতে পারে, বলে দিয়ে হাল্কা হতে পারে—সব, সব।

—তুমি কি আমাকে কিছু বলবে? ফিসফিস গলায় অঞ্জলি বললে।

রণেনবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

—ক'দিন থেকেই তুমি মাঝে মাঝে বড় মন খারাপ করছো। ফিসফিস গলায় অঞ্জলি আবার বললে। কথা বলতে গিয়ে অঞ্জলির মনে হলো ও এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

রণেনবাবু এবার শান্ত ভাবে বললেন, তুমি ঘুমোও। আমার ঘুম আসছে না।

অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো, ওর মনে হলো যেন নিজেরই দ্রুত হৃদ্-স্পন্দনের শব্দটা ও শুনতে পাচ্ছে। ওর বুকের শব্দ যেন স্বামীও শুনতে পাবে।

একটু চুপ করে থেকে ও আবার বললে, ওদের সঙ্গে আজ তুমি ভাল করে কথাই বলছিলে না।

এবারও কোনো উত্তর এলো না।

অঞ্জলি অন্ধকারে চোখ চেয়ে শুয়ে রইলো। অন্ধকার সীলিং-এর দিকে চোখ রেখে। অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটা আলোর চাকতি বার বার ওর চোখের সামনে ঘুরছে, অবিরাম ঘুরছে।

স্বামীর গায়ের ওপর ও ধীরে ধীরে ওর হাতখানা রাখলে। স্বামীর হাতখানা ওর হাতের ওপর এসে পড়লো। একখানা অবশ হাত শুধু।

৯

প্রথম দিকে অতটা ভাবেনি অনীতা। কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা স্বাভাবিক নয়, ও এখনো ঠিক করে উঠতে পারে না। সব কিছু বিচার-বিবেচনার জন্যে বিয়ের পর থেকে স্বামীর ওপরই নির্ভর করে এসেছে, অনুপমের ওপর। ইদানীং নির্ভর করে বাপ্পার ওপর। অনেক কথা অনুপমকে বলতে ভরসা পায় না, বাপ্পাকে বলে, বাপ্পার পরামর্শ নেয়। বাপ্পার জন্যে ওর কম গর্ব নয়।

অনীতার বাবা পোস্ট-আপিসে চাকরি করতেন। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বদলি হয়েছেন। ফলে অনীতা কলেজের মুখ দেখতে পায়নি, প্রাইভেটে পড়ে স্কুলের গন্ডী পার হয়েছে এই যা। সংসারে অনটন দেখতেই অভ্যস্ত ছিল, শাসন মেনে মেনে নিজের মত প্রকাশ করার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল। তাই অনুপমের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ও শুধু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই করে এসেছে। অনুপমকে নিয়ে ওর কোনো দুশ্চিন্তাও ছিল না। কলেজের ম্যানেজিং কমিটি, পরীক্ষার খাতা দেখা, দু'একটি বড়লোক ছাত্রের বাড়িতে টুইশনি, প্রফেসর বন্ধুদের সঙ্গে ছুটির দিনে জমিয়ে পরচর্চা, এই সবের মধ্যেই মানুষটা বাঁধা পড়ে আছে। প্রফেসর পাত্র ওর মত মেয়েকে দেখে পছন্দ করেছে এ-খবর শুনে ওর পাড়ার বন্ধুরা একটু ঈর্ষা বোধ করেছিল, আর ওর বাবা তো রীতিমত গর্ব করতো বিয়ের পর। অনীতা অনুপমকে নিয়ে গর্ব করার মত কছুই খুঁজে পায়নি। কিন্তু বাপ্পাকে নিয়ে ওর গর্বের শেষ নেই। আত্মীয়-স্বজন যে আসে সেই বলে বসে, গর্ব করার মত ছেলে তোমার বাপ্পা। আজকালকার দিনে...

সত্যি তাই। পড়াশুনোয় ভাল তো অনেকেই হয়। কিন্তু বাপ্পাকে নিয়ে অনীতার অনেক স্বপ্ন। সে শুধু বাপ্পা ভাল রেজাল্ট করবে, বাপ্পা ভাল চাকরি করবে, সংসারে আরেকটু স্বচ্ছলতা আনবে বলেই নয়। আসলে আজকালকার দিনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না অনীতা, ওর সেই পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস নিয়ে ও অনুপমের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। পারে না। ও শুধু মেনে নিয়েছে। মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বাপ্পাকে ও আড়ালে আড়ালে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছে। বিনয়ী, নম্র, সৎ। বইয়ে পড়া গুণগুলো সত্যি সত্যি ওর মধ্যে দেখতে পেয়েছে। কে যেন একবার বলেছিল, বাপ্পাটা বড্ড ভালমানুষ, এত ভালমানুষি আজকের দিনে মানায় না। শুনে চটে গিয়েছিল অনীতা। অনীতা চায় ও আগেকার দিনের মতই থাকুক। ওকে যেন অনীতার মত মায়ের সঙ্গেই মানায়। আর কিছুর সঙ্গে মানাতে হবে না।

বাপ্পার ওপর ওর অগাধ আস্থা। তাই ভয় পায়নি অনীতা। বিশেষ করে ঝুমঝুম মেয়েটার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত সারল্য আছে যা অনীতাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই আপত্তি করার মত কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। একটু অস্বস্তি যদি বা উঁকি দিয়েছিল প্রথম দিকে, অনুপম হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল বলেই অনীতা ভরসা পেয়েছে।

কিন্তু ঝুমঝুমদের বাড়ি থেকে ও অনেকখানি দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরলো।

—জানো মা, বাড়িটা কি প্রকান্ড বড়ো, বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। বাপ্পা প্রথম দিনই ফিরে এসে বলেছিল।

সেই বাড়িটা নিজের চোখে দেখে এসেছে অনীতা। কিন্তু এত আশা নিয়ে

যে গিয়েছিল, কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলো না। হিংসে? ওর একবার সন্দেহ হয়েছিল, ও হয়তো অঞ্জলিদের এই স্বাচ্ছন্দ্যকে হিংসে করছে। কিংবা ঐ কার্পেট, দামী পর্দা, মাপা হাসি, চাপা কথাবার্তা এ-সবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি বলেই এই সংকোচ।

—রণেনবাবু লোকটিকে সেদিন কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল। ফেরার পথে অনীতা একবার বললে।

তারপর নিজেই বললে, তখনই বেশ হাসিখুশি, কথাবার্তা বলছেন, আবার হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। আজ এত খারাপ লাগছিল আমার!

অনুপম কোনো কথা বলেনি।

কিন্তু অনীতা আসলে যে-কথাটা বলতে চাইছিল সেটা বলতে পারেনি।

অঞ্জলিকে ওর সত্যি সত্যি খুব ভাল লেগেছে। সেই প্রথম দিন থেকেই অঞ্জলিকে খুব আপন মনে হয়েছে। আসলে অঞ্জলিই যেন ওকে আপন করে নিয়েছে। কোনো অহঙ্কার নেই, কোনো সঙ্কোচ নেই।

অঞ্জলি একবার বুঝি বলেছিল, যখন বেসিনের দিকে হাত ধুতে যাচ্ছিল ও, তখন ঐ লম্বা বারান্দা আর ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমাদের ঐ দুখানা ছোট ছোট ঘরের গেস্ট-হাউসের কাছে তোমার এ যেন রাজপ্রাসাদ! বলে হেসেছিল।

অঞ্জলি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিল, ছোট ছোট ঘর বলেই তো তোমরা সব সময় এত কাছে কাছে থাকতে পাও। ঘর যত বড় হয় মানুষগুলো তত দূরে দূরে সরে যায়।

তারপরই, পাছে অনীতা কিছু মনে করে বসে, তাই অঞ্জলি হেসে উঠে বলেছিল, মেয়েটার কাণ্ডই দ্যাখো না, এত বড় বাড়িতেও ওর জায়গা হয় না, ছিটকে বেরিয়ে যেতে পেলেই যেন বাঁচে।

—তুমি শাসন করো না কেন? অনীতা হেসে বলেছিল, তোমারই তো দোষ।

অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে কেমন যেন একটু অদ্ভুত গলায় বলেছিল, জানি না ভাই, শাসন করতে একটুও ইচ্ছে করে না। আমি শাসন মেনে মেনে বড় হয়েছি বলেই হয়তো কাউকে শাসন করতে ইচ্ছে করে না।

সেই কথাটাই অনীতার কানে বাজছিল। শাসন মেনে মেনে বড় হয়েছি। অনীতার ছেলেবেলাটাও তো শাসনের গণ্ডীর মধ্যেই কেটেছে। তার জন্যে তো ওর কোনো অনুশোচনা নেই, ও বরং গর্ব করে বলে। শাসনের মধ্যে কাটিয়েছে বলেই ও ছেলেমেয়েদের শাসনের মধ্যেই রাখতে চায়। এর মধ্যে অন্যায় কোথায় ও বুঝে উঠতে পারে না।

ও তো বাপ্পাকে বলেনি, তুই ঝুমঝুমের সঙ্গে মিশবি না।

ও তো অকারণ ভয় পায়নি। কিন্তু সেদিন যখন সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার অনেক পরে ফিরে এলো ওরা দু'জনে, বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্যে ওর বুকটা কেঁপে উঠেছিল। তাই, অনীতা বার বার ঝুমঝুমের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে।

অন্ধকারকে অনীতার ভীষণ ভয়। ওদের বয়েসটাকে আরো বেশী। অথচ অঞ্জলি, রণেনবাবু কেউই যেন এতটুকু বিচলিত নয়। যেন রাত্রি করে বাড়ি ফেরা খুবই স্বাভাবিক।

ঝুমঝুম ততক্ষণে হইচই বাধিয়ে দিয়েছে।—এই নাও বাপী, তোমার ক্যামেরা।

বাব্বা বাব্বা, একটা ক্যামেরা দিয়েও তোমার বিশ্বাস নেই আমার ওপর। সমস্ত রীলটা কিন্তু শেষ করে দিয়েছি আমি আর বাপ্পা। একটা যা গ্র্যান্ড ছবি তুলেছি, তুমি ভাবতেই পারবে না।

মায়ের দিকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, দেখে নাও। শাড়ির আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিজের শরীরটাকে ফ্যাশন প্যারাডের মেয়েদের মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে অঞ্জলিকে। বলেছে, এখনই দেখে নাও, মাসীমা সাক্ষী রয়েছে। ছিঁড়েছে কোথাও, বলো? তুমি তো ঐ ভয়ে একটাও পরতে দাও না।

বলেই অনীতার পাশে ধপ্ করে কৌচে বসে পড়েছে গায়ে গা দিয়ে। হাসতে হাসতে বলেছে, জানেন মাসীমা, মা-টা বড্ড কিপ্‌টে, নিজেও পরবে না, আমাকেও পরতে দেবে না শাড়িগুলো।

অঞ্জলি হেসে ফেলে ধমক দিয়েছে।—থাম তুই। কত ছিঁড়েছিস তার হিসেব নেই।

মা'র কথা ঝুমঝুমের কানেই যায়নি। ও তখন বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। —বাপী, কালই লোক পাঠিয়ে দিও প্লীজ, ছবিগুলো তাড়াতাড়ি করিয়ে এনে দিও। দেবে তো?

রণেনবাবু শুধু সম্মতিতে মাথা নেড়েছেন।

সেই দৃশ্যটা মনে পড়তেই, ঝুমঝুমের আদুরে আদুরে হাবভাব, কথা— অনীতার মন থেকে সব সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল।

তবু ওর ইচ্ছে বাপ্পাকে একটা চারা গাছের মত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে। কিংবা গোল করে ইঁটের পাঁচিল দিয়ে রাখতে। গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ক'বছর আগে এমন অনেক গাছের চারা দেখেছে, এবার বর্ষায় সেগুলো রাতারাতি যেন শাখা মেলে গাছ হয়ে গেছে।

একবার ছায়া দেবার মত বড় হয়ে গেলে তখন আর অনীতার কোনো ভয় থাকবে না।

পরের দিন সকালে তাই অনুপমকে কথাটা বলবে ভেবেছিল। এখানে আসার পর থেকে বাপ্পা তো থাকতেই চাইছিল না। এখন যদি বলা যায়, তোর যখন ভাল লাগছে না, কোলকাতায় ফিরেই যা। কিংবা অনুপম হয়তো ওকে কোনো কাজের অজুহাতেও পাঠাতে পারবে।

কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না অনীতা। ন'টা না বাজতেই ঝুমঝুম এসে হাজির হলো। বললে, এই বাপ্পা, রেকর্ড শোনাবে বলেছিলে, নতুন রেকর্ডগুলো এনেছি, রেকর্ড-প্লেয়ারটা আনো।

অনীতা একটুখানি নিশ্চিন্ত হলো। এ তবু চোখের সামনে বসে বসে গান শুনবে।

নিজেই রেকর্ড-প্লেয়ারটা দেখিয়ে দিল। বললে, তোমাদের বাড়িতে তো কত সুন্দর রেডিওগ্রাম দেখে এলাম।

ঝুমঝুম চোখ পাকিয়ে বলে উঠলো, উরিব্বাস, জানেন না তো মাসীমা, একটাও হিন্দি গান শোনা যাবে না। বাপী কানে আঙুল দেবে, মায়ের মুখ দেখলে মনে হবে চিরতা খেয়েছে।

ওর ভাবভঙ্গী দেখে অনীতা হেসে ফেললো। আর বাপ্পা বললে, কি টেস্ট তোমার, আমারও ওসব ভাল লাগে না।

ঝুমঝুম ওকে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে ততক্ষণে রেকর্ড চাপিয়ে বসেছে।

খাটের বিছানার ওপর পা গুটিয়ে বসেছে ঝুমঝুম, হাঁটুতে থুতনি রেখে, একটার পর একটা রেকর্ড বদলাচ্ছে। গানের তালে তালে মাথা নাড়ছে। শরীর দোলাচ্ছে। দেখে হাসি পেল অনীতার, কাজের অছিলায় সরে গেল।

বাপ্পা খাটের এক কোণে বসেছিল। গান শুনতে শুনতে কখন নিজের অজান্তেই পা নাচাতে শুরু করেছিল।

ঝুমঝুম হঠাৎ সেদিকে তাকিয়েই বলে উঠলো, ঈস্, কি টেস্ট তোমার, হিন্দি গানে পা নাচাচ্ছো, ছি ছি!

১০

পর পর কয়েকটা দিন অনুপম নিজেকে আটকে রাখলো। এই বয়সে সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে কেমন যেন বেমানান লাগছে। ভাবলে নিজেরই হাসি পায়। বন্ধু-বান্ধবরা জানলে তারাও নিশ্চয় হেসে উঠবে। কিন্তু অনুপম যখনই একা থাকে, যখনই ওর নিঃসঙ্গ লাগে, তখনই কি জানি কেন অঞ্জলির কাছে যেতে ইচ্ছে করে। অঞ্জলিকে একা পেতে ইচ্ছে করে। আসলে মনের যে কোনো বয়েস নেই। ওর কেবলই বলতে ইচ্ছে করে, অঞ্জলি, তুমি দেরী করে ফেলেছো, দেরী করে ফেলেছো। ওর কত কি স্বপ্ন ছিল, সে-সব সাধ মেটানোর এখন আর উপায় নেই, সেই উদ্দামতাও ওর জীবন থেকে চলে গেছে। তা না হলে অনুপম তো আজ আঠারো-উনিশের বাপ্পা হয়ে গিয়ে ছুটে বেড়াতো এই ছুটি-ছুটি রোদ্দুরে, এই শীত-শীত সন্ধ্যায়। অঞ্জলিকে নির্জনে কখনো হয়তো কাছে টেনে নিত।

স্মৃতির মধ্যে ডুব দিলেই জীবনটা এখনো রঙিন হয়ে ওঠে, কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথার কনকনানি থামতে চায় না। ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা, ওর শত সহস্র দীর্ঘশ্বাস, ওর লুকোনো কান্না, আর যৌবনের অসহ্য কষ্টের দিনগুলো মনে পড়লে অঞ্জলির ওপর তীব্র অভিমানে ওর বুক ভারী হয়ে ওঠে।

পর পর কয়েকটা দিন তাই নিজেকে আটকে রাখলো অনুপম। অঞ্জলির সঙ্গে দেখা করলো না, দেখা দিল না। ও জানতো, হাটের দিনে আবার অঞ্জলি মণিপুরী থলিটা হাতে নিয়ে যাবে, আশায় আশায়। তবু না। তার স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়ে স্বপ্ন দেখতে অনেক ভাল লাগছে ওর।

ছেলেবেলায় রথের মেলায় কেনা চার পয়সার রঙীন-কাচের দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে একটু নাড়া দিলেই এক-একবার এক-একটা নতুন ছক হয়ে যেত কত রকমব রঙ জায়গা পাল্টে নতুন চেহারা নিত। প্রেম জিনিসটাও ঠিক তেমনি কিনা কে জানে। আসলে হয়তো নানা রঙের কয়েকটা কাচের টুকরো নিয়েই জীবন। কাচের পিছনেই ছুটে বেড়ানো। কোনোটার রঙ লাল, কোনোটা সবুজ, আবার হলুদ নীল বেগুনী কিংবা কমলা রঙের। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে পড়লে তুমি, প্রেম তোমার বুকের মধ্যে একটু নাড়া দিয়ে গেল আর চতুর্দিক তোমার সাত-মিশালী রঙের মেঘ হয়ে স্বপ্ন বুনে দিল। তুমি রঙিন হয়ে উঠলে। কিন্তু আবার একটু নাড়া দাও, কোথায় কি, কাচ কাচ রঙিন কাচের টুকরো শুধু!

শুধু একটা জিনিসই অনুপম বুঝতে পারছে না। সিমলা স্ট্রীটে থাকার সময়ের এক-একটা ঘটনা মনে পড়লে সমস্ত মন আপ্লুত হয়ে ওঠে কেন, এক-একটা

বেদনার কথা মনে পড়লে আজও নিজেকে বিশুদ্ধ মনে হয় কেন!

—বাপ্পা, তুই যা, আমি আজ আর হাটে যাবো না।

বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করলো অনুপম। ওর বয়েসটাকে অনুপম খুব ভাল করে চেনে। হয়তো সকালেই ঝুমঝুমের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, হয়তো দুজনে কোথাও নিরিবিলিতে গিয়ে বসবে, কিংবা...কিংবা কি করবে অনুপম জানে না। বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপম বুঝতে চেষ্টা করেছে। না, প্রেম কি তা ও বোধহয় এখনো জানে না। ওদের মনে কিছুই বোধহয় দাগ কাটে না।

বাপ্পা বিরক্ত মুখে বললে, দাও মা, তাড়াতাড়ি, কি আনতে হবে।

বাপ্পা চলে যাওয়ার পর অনুপম কল্পনায় ভেবে নিল, অঞ্জলি থলি ঝুলিয়ে তেমনি ছন্দময় শরীর নিয়ে হাটে আসবে। ওকে খুঁজবে, খুঁজবে, অপেক্ষা করবে, তারপর চাপা কান্নার থমথমে মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ বাপ্পাকে দেখতে পাবে। উদ্বেগের চোখ নিয়ে এগিয়ে আসবে ওর কাছে। কিন্তু স্পষ্ট করে তো কিছু জিগ্যেস করতে পারবে না, শুধু বলবে, তোমাদের সব খবর ভাল তো বাপ্পা?

সমস্ত দৃশ্যটা ও মনে মনে উপভোগ করলো।

এতদিন তো ও জানতো না, অঞ্জলির কাছে ওর কোনো মূল্য আছে কিনা। জানতো না অঞ্জলি ওকে যত্ন করে মনের ঘরে তুলে রেখেছে। তাই প্রথমটা গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল ওর। কিন্তু এখন ক্রমশই অস্থির বোধ করছে। ও তো মানুষ, ও তো পুরুষ মানুষ। বুকের মধ্যে না পেলে তার বিশ্বাস হয় না, তার জ্বালা জুড়োয় না।

ওর তাই মনে হয়েছে অঞ্জলির এও এক ধরনের বিলাস। প্রেম জিনিসটাই এক ধরনের দুঃখবিলাস কিনা কে জানে।

—ওরা কিন্তু প্রচণ্ড বড়লোক, তাই না? অনীতা ওদের কোয়ার্টার থেকে ফিরে এসে এক সময় বলেছিল।

কথাটা অনুপমের ভাল লাগেনি।

—রণেনবাবুর নিশ্চয় খুব বড় চাকরি। কি রকম সব কার্পেট-টার্পেট আসবাব-পত্র দেখেছো? সব নাকি অফিস থেকে দিয়েছে। অফিসের যে-যখন আসে ঐ বাড়িতেই থাকে। ঝুমঝুম বলছিল, কোলকাতায় ওদের নাকি গাড়ি আছে। অফিস থেকে দিয়েছে।

অনুপম হাসবার চেষ্টা করে বললে, তোমার ভাগ্যটাই মন্দ, একটা কলেজের মাস্টার জুটলো শেষ পর্যন্ত।

অনীতা রেগে গিয়েছিল, দপ্ দপ্ করে পা ফেলে চলে গিয়েছিল ওর সামনে থেকে।

অনুপম কি করবে! ওর মনে হয়েছে অনীতা যেন ওকে রণেনবাবুর সঙ্গে তুলনা করছে। অনীতা নয়, যেন অঞ্জলি নিজেই।

—আপনাকে এখন একটা দিনও আর না দেখে থাকতে পারবো না। অঞ্জলির গলার স্বর তখন গাঢ় হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বলেছে, কথা দিন রোজ একবার অন্তত আসবেন। আমার আর কিচ্ছু চাই না। সেদিন হাট থেকে ফেরার পথে বলেছিল অঞ্জলি।

শুনে ভাল লেগেছিল অনুপমের। মনে হয়েছিল ও যেন বিশুদ্ধতায় স্নান

করে উঠলো।

কিন্তু অনুপমের যে শুধুমাত্র চোখের দেখায় তৃপ্তি নেই।

একটি মেয়ে জীবনে কী-ই বা পেতে চায়। সবই তো পেয়ে গেছে অঞ্জলি। সুপুরুষ স্বামী, স্বামীর ভালবাসা, ঝুমঝুমের মত মেয়ে, প্রাচুর্য, সুখের সংসার, সুখ—সব, সবই পেয়ে গেছে অঞ্জলি। এখন থেমে পড়া একঘেয়ে জীবনকে হয়তো স্মৃতির রঙে রাঙিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু কুড়ি বছর আগেকার ধুলো-জমা গ্রামোফোনের রেকর্ডগুলোকে টেনে বের করে অঞ্জলি এখন ঐ ঝুমঝুমের মতই রেকর্ড-প্লেয়ারে চাপিয়ে শুনতে চায়। ও নিজেই সেই ভাঙা রেকর্ড—অঞ্জলির ছোঁয়া পেয়ে নিজেই গান হয়ে গেছে।

অঞ্জলি, সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে? গরমের দিনে আমাদের ঐ পাড়াটায় কল খুললে জল পড়তো সুতোর মত সরু হয়ে। বর্ষাকালে সেটাই সুদে-আসলে শোধ দিত। ঠনঠনে কালীবাড়িতে একটু বৃষ্টি হলেই কোমর-জল। সিমলা স্ট্রীট থেকে রামদুলাল সরকার, বেথুন রো সব জলে জলাকার। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যেত। সেদিন তোমার কলেজ যাওয়া হয়নি। আমারও না। সকাল থেকেই বৃষ্টি, বৃষ্টি। তোমরা ক'জন তোমাদের ছাদে বৃষ্টিতে ছোটাছুটি করছিলে। কি ছেলেমানুষ ছিলে তখন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দু'হাত তুলে নাচ। একবার তুমি আঁচলটা টেনে মাথায় ঘোমটা দিয়েছিলে। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখছিলে আমি দেখছি কিনা। তারপর তোমরা সবাই হেসে জড়াজড়ি হয়ে কি যেন বলাবলি করেছিলে। তোমার মুখে কপালে জল চুঁইয়ে পড়ছিল, তোমার চুল ভিজে, তোমার ভিজে শাড়ি শরীরে লেপটে গিয়ে তোমার কাঁধে, বাহুতে, কণ্ঠতলের উন্মুক্ত সমতটে, তোমার স্তনের সুষমায়, তোমার চিবুকে এবং চোখে কি এক অপূর্ব রূপের বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা গুমরে উঠেছিল। আমি নিজেও আমাদের বারান্দা থেকে মাথা বাড়িয়ে, মুখ বাড়িয়ে বৃষ্টির ঘ্রাণ. একা ছিলাম। তুমি আমাকে ঐভাবে ভিজতে দেখে হেসে উঠেছিলে। আমাদের ছাদের ওপর আমাদের কোনো এক্তিয়ার ছিল না, থাকলে আমিও ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতাম। মুখ তুলে বারান্দা থেকে বৃষ্টির ছোঁয়া নিতে নিতে কেবলই মনে হচ্ছিল, একই বৃষ্টিতে আমরা দু'জনেই ভিজছি। একই বৃষ্টিতে।

—এই, আপনার একদিনের কথা মনে আছে? আমাদের বাড়িতে সেদিন একেবারে জল আসেনি, ভীষণ গরম সেদিন...

—তুমি মাকে ডেকে বলেছিলে, মাসীমা, আজ আমাদের একটুও জল আসেনি, দাদারা সব রাস্তার কলে গেছে, আমি কি করি বলুন তো?

—ঠিক বলেছেন! মাসীমা বললেন, তুমি আমাদের বাড়ি চলে এসো।

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বলেছিল, তোয়ালে কাঁধে নিয়ে আমি আপনার সামনে দিয়ে যখন গেলাম, কি ভয় করছিল কী বলবো! ভয়ে আমার হাত থেকে সাবানের কৌটোটা পড়ে গিয়েছিল।

অনুপম হেসে ফেলেছিল ওর কথায়। বলেছিল, আমি কিন্তু কৌটোটা তুলে দিইনি। আমার এত রাগ হয়েছিল, তুমি আমার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলে, অথচ কথা বলার জন্যে একটুও প্রশ্রয় দিলে না।

অঞ্জলি হঠাৎ থেমে পড়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিল অনুপমের দিকে। আপনার সব মনে আছে? আশ্চর্য। সত্যি এত হাসি পায় ভাবলে! স্নান হয়ে গিয়েছিল, তবু সেদিন কলঘরেব দরজা খুলতে ভয় হচ্ছিল, আমি জানতাম আপনি সিঁড়ির

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে তখন, আপনাকে দেখেই পড়ি কি মরি দে ছুট। বাড়ি ফিরে কিন্তু ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল।

রেকর্ড, রেকর্ড। পুরোনো রেকর্ডগুলো আবার বাজিয়ে শুনতে চাইছে অঞ্জলি। আর কিছু নয়। ওর সুখের পেয়ালা আরেকটু যাতে উপচে ওঠে। তবু ভাবতে ভাল লাগছে অনুপমের, অঞ্জলি ওকে মনে করে রেখেছে। রাখুক, ও যাবে না। নিজেকে ও আটকে রাখবে। শুধু আঠারো-উনিশের চোখ নিয়ে দেখার নেশায় এখন ওর তৃপ্তি নেই।

এই বয়েসটাকে ও চেনে, তাই বাপ্পাকে নিয়ে ওর ভয় নেই। অনীতার মত ও বাপ্পাকে আগলে রাখতে চায় না। অনুপম চায় না, বাপ্পাও ওর মত একটা ফাঁকির ওপর দাঁড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। ঝুমঝুমকে ও যদি ভালবেসে ফেলে, বাসুক না, একটুখানি স্বপ্নের স্বাদ যদি নিতে পায় তো নিক না। কিচ্ছু যায় আসে না।

কুড়ি বছর আগে জীবনটার কোনো স্বাদ ছিল না। বাবাও সাংঘাতিক গোঁড়া ছিল, অনুপমের মনে পড়লো। অথচ, ভাবলে আশ্চর্য লাগছে, বাবার তো তখন ওর এই এখনকার বয়স। হয়তো দু-এক বছর বড়ো। দু'এক বছরে অনুপম নিশ্চয় বাবার মত বুড়ো হয়ে যাবে না। কিন্তু বাবাকে তাহলে এত বুড়ো লাগতো কেন? ও তো বুড়ো হতে পারছে না, হলে কলেজের সবাই ওকে আরেকটু সমীহ করতো। মা তো এখনো তার হাজারো রকমের ব্রত পার্বণ, নীলের উপোস নিয়ে আছে। অনুপমের সব কিছুই তার কাছে অনাচার। খেতে বসে বাঁ হাতে গ্লাসে জল খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করে বিলুর কাছে চলে গেছে। কলেজে পড়ার সময় মাকে ভীষণ ভয় পেত অনুপম। বিলুকে আরো। বিলু বোধহয় সব বুঝতে পারতো। কে জানে, হয়তো বিলুকে কিছু বলেও থাকবে অঞ্জলি। ওর তো এক একদিন সন্দেহ হতো অঞ্জলি আসলে বিলুকেই ভালবাসে। ভেবে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল বলেই সে কথা আর ভাবতে চাইতো না। তাছাড়া পাড়ায় বাবাকে সবাই সমীহ করতো, সম্মান করতো। অনুপমের ভয় ছিল অঞ্জলির সঙ্গে কথা বলতে গেলে হয়তো এমন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে, ও একেবারে মাটিতে মিশে যাবে।

—শুনছো, রণেনবাবুর বাড়ি থেকে লোক এসেছে চিঠি নিয়ে।

তন্ময় হয়ে গিয়েছিল অনুপম। অনীতার কথায় চমকে ফিরে তাকালো। অনীতা চিঠিটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

অনুপম তাকিয়ে দেখলো কাঁধে ঝাড়ন নিয়ে বিপিন দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠিটা পড়লো। অনীতার দিকে তাকালো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

অনীতা বললে, কোথাও তো যাওয়া হয় না। বলছে যখন চলো না!

অনুপম এক মুহূর্ত ভাবলো। ও কি বলবে বিপিনকে!

ছোট্ট চিঠি। খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লেখা—

অনীতা,

ঝুমঝুম বাপ্পা আর হাসুকে শুঁড়াগি পাহাড় আর শাঁখ নদীতে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা দিয়েছিলেন উনি। আজ একটা জীপ জোগাড় হয়েছে। চলো না, সবাই মিলে একটু হইহই করা যাবে। দুপুরে।—

অঞ্জলি।

সবাই মিলে হইহই করা যাবে। ক'টা দিন নিজেকে আটকে রেখেছিল অনুপম,

এখন আর পারলো না।

বিপিনকে বললে, ঠিক আছে, যাবো সবাই।

বিপিন চলে গেল। অনীতা ওর কাজের গণ্ডীর মধ্যে।

অনুপম চিঠির টুকরোটা আবার খুলে পড়লো। বার বার। অক্ষরগুলো খুব আপন মনে হলো। হাতের লেখাটা মনে পড়ে গেল ওর। অঞ্জলি কি একটা খাতা ফেলে গিয়েছিল বিলুর টেবিলে। অনুপম লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল। ওর উদ্দেশে কোথাও কিছু লেখা আছে কিনা, ওর চোখে ফেলার জন্যেই খাতাটা রেখে গেছে কিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল।

তুচ্ছ একটা চিঠি, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারলো না অনুপম। ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। যেন একটা মূল্যবান কিছু। আর ওর মনের মধ্যে একটা লাইন বার বার ঘুরতে লাগলো—সবাই মিলে হইহই করা যাবে। অনুপমের ভীষণ ভাল লাগলো। সবাই মিলে, সবাই মিলে। অনুপম জানে, ও না গেলে অঞ্জলির মনে হবে কেউই আসেনি।

১১

ওরা প্রায় তৈরি হয়েই ছিল। জীপ এসে বার কয়েক হর্ন দিতেই বের হয়ে এল।

ঝুমঝুম জীপে বসেই এক হাত তুলে চিৎকার করে উঠলো, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে'

রণেনবাবু ড্রাইভারের পাশেই বসে ছিলেন, ওদের আসতে দেখে নেমে দাঁড়ালেন। ঝুমঝুমের 'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে' শুনে হাসলেন।

রণেনবাবু আবার উঠে বসতেই বাপ্পা গিয়ে তাঁর পাশে বসলো।

অনুপম হেসে ফেললো বাপ্পার কাণ্ড দেখে। ট্রেনে ট্যাক্সিতে সব জায়গায় ও জানালার পাশটিতে বসতে চাইবে। তাই ওকে হাত দেখিয়ে আশ্বস্ত করলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

অনীতা, অঞ্জলি, হাসু আর ঝুমঝুমের সঙ্গে অনুপমও পিছনে গিয়ে বসলো।

জীপ স্টার্ট দিতেই বাপ্পা বললে, মাসীমা, ঝুমঝুমকে ধরে রাখবেন, ও যা লাফালাফি করছে পাহাড়ে ওঠার সময় না গড়িয়ে পড়ে যায়।

অঞ্জলি হাসলো, অনীতা বললে, তুই থাম তো।

জীপটা তখন আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ট্রেঞ্চের মত সরু সরু খাদের পাশ দিয়ে জোর স্পীডে এগিয়ে চলেছে কানিয়ালুকা গাঁয়ের দিকে। সব শেষে সাঁওতালদের কানিয়ালুকা গ্রাম। গ্রামের মাঝখান দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে শুড়গি পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে পড়েছে শাঁখ নদীর ধারে।

অনীতাকে খুব খুশী খুশী লাগছিল। ঘর-সংসার রান্নাঘর, কোনো কোনোদিন মুসাবনির রাস্তা ধরে একটুখানি হাঁটা, একদিন শুধু রাখার দিকে গিয়েছিল। ও তাই বললে, যাক বাবা তবু খানিকটা বেড়ানো যাবে।

অঞ্জলি একটু আয়েসী, স্বামীর উদ্দেশে বললে, আমাকে হাঁটিও না কিন্তু, যদ্দুর জীপ তদ্দুর আমি।

সকলে হেসে উঠলো ওর কথা শুনে।

অনীতা আবার বললে, এসে থেকে সেই একঘেয়ে। এ তবু একটুখানি ছুটি পাওয়া গেল।

একঘেয়ে, একঘেয়ে! অনুপম ভাবছিল, আমাদের জীবনে তো সত্যিই কোনো বৈচিত্র্য নেই। আমাদের কালে আরো ছিল না। পড়াশুনো, চাকরি, সংসার করা—সবই একটা নিয়মের মধ্যে বাঁধা। প্রেম ভালবাসা তাও। এই যে অঞ্জলি ওর সামনে বসে রয়েছে, এক একবার চোখের দৃষ্টিটা চকিতে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এও যেন নিয়মে বাঁধা।

অনুপম তাই অনীতার কথায় সায় দিয়ে বললে, সত্যিই কোনো বৈচিত্র্য নেই। জানেন রণেনবাবু, আমার এক এক সময় মনে হয় আমাদের সমস্ত জীবনটাই এক ধরনের কনডাকটেড্ ট্যুর। কোনো বৈচিত্র্য নেই কোথাও।

রণেনবাবু চুপচাপ বসেছিলেন, শুধু দুবার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুধু কখনো কখনো সেই কনডাকটেড্ ট্যুরেও এক একটা সাংঘাতিক অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে যায়।

অনুপম চমকে উঠলো, ওর বুকের ভেতরটা ছমছম করে উঠলো। কথাটা বোঝার চেষ্টা করলো ও। আর অঞ্জলি একবার অনুপমের মুখের দিকে, একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

রণেনবাবু হঠাৎ হেসে উঠলেন, কেমন একটা বিষণ্ণ উদ্‌ভ্রান্ত হাসি। বললেন, কি জানি কখন অ্যাকসিডেণ্ট ঘটে যায়, তাই ভাবলাম, বাপ্পা আর ঝুমঝুমকে কথা দিয়েছি শুঁড়গি পাহাড় ঘুরিয়ে আনবো ..

—তুমি অ্যাকসিডেণ্ট অ্যাকসিডেণ্ট করো না তো! অঞ্জলি স্বামীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

জীপটা তখন চড়াই রাস্তা ধরে গোঁ গোঁ শব্দ করে ওপরে উঠছে, উঠছে তো উঠছেই।

রণেনবাবু এক একবার বলে উঠছেন, ঐ দ্যাখো বাপ্পা, ঐ যে সবুজ সবুজ, ওটা কায়ানাইটের লেয়ার...আবার কখনোঃ ঐ যে হলুদ হলুদ মাটি, ওতে কত পার্সেণ্ট রক-ফসফেট আছে জানো?

ঝুমঝুম হেসে উঠে বললে, বাপী, তোমার জিওলজি থামাও একটু, দ্যাখো দ্যাখো, গ্র্যান্ড দেখাচ্ছে পাহাড়টা, দারুণ!

ওরা সবাই পিছন ফিরে তাকিয়ে ফেলে-আসা পাহাড়ী ঢলটা দেখলো। সত্যি চোখ জুড়িয়ে যায়। ধনুকের মত বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সরু পাথুরে রাস্তাটা, আর তার দু' পাশে পাহাড়ের গা বেয়ে ঢলে পড়েছে জনারের ক্ষেত, বুনো ধানের ক্ষেত, সরষের ক্ষেত। নানা রঙের। যেন একটা টুকটুকে লাল শাড়ি মেলে রেখেছে কেউ রাস্তায়, শুকোতে দিয়েছে। কোনোটায় কালো কালো জংলা ধান, কোনোটা লাল টুকটুকে। কোথাও হলুদ সরষে, কোনোটা তুলোর মত সাদা।

রণেনবাবু বললেন, ঐ যে দেখছো ওগুলো বুনো ধান। কালো ধান, লাল ধান, দেখেছো কখনো?

অনুপম আর অঞ্জলি চোখোচোখি করে হাসি চাপলো।

পাহাড়ের ওপর উঠে তখন অনেকখানি সমতল। পাহাড়টার চূড়া নেই। তাই মাঝে মাঝে দু' একটা সাঁওতাল পল্লী দেখা যাচ্ছিল। পরিষ্কার ছিমছাম দু' একটা মাটির ঘর, সামনে উঠোন, একটুখানি শাকসবজির ক্ষেত।

জীপটা স্পীডে এগিয়ে চলেছে, বাঁক নিচ্ছে, ছুটছে। সামনের কাচের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল, রাস্তার দু'পাশের ঘন জঙ্গল। হঠাৎ দূরে শাঁখ নদীটা দেখা গেল। জল, জল।

কনডাকটেড্ ট্যুর! কথাটা ঠিকই বলেছেন অনুপমবাবু! অনেকক্ষণ একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন রণেনবাবু, হঠাৎ কি ভেবে যেন বলে উঠলেন।

অনুপম বুঝতে পারলো ওর কথাটা এখনো ওঁর মাথার মধ্যে ঘুরছে। এতক্ষণ বোধ হয় উনি কিছু ভাবছিলেন, তাই চুপ করে ছিলেন।

রণেনবাবু বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সামান্য একটা ভুলের জন্যে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। বৈচিত্র্য বৈচিত্র্য বলছিলেন না, তখন কিন্তু আমাদের চেয়ে অসহায় আর কেউ থাকে না।

অঞ্জলি এবার অনুযোগের স্বরে বললে, তুমি আবার ঐসব কথা শুরু করলে!

আর তখনই জীপটা দু'পাশের বনজঙ্গলকে দু' হাতে হঠাৎ যেন দুটো পর্দার মত সরিয়ে দিয়ে একেবারে নদীটার পাড়ে এসে পৌঁছলো। কুয়াশামাখা ঠান্ডা রোদ্দুরের মধ্যে।

ঝুমঝুম চিৎকার করে উঠলো, লাভ্লি!

জীপ থামতেই ঝুমঝুম এক লাফে নেমে পড়লো সকলের আগে। বাপ্পা নামতেই ঝুমঝুম বললে, বাপ্পা, চলো দেখি কে আগে জল ছুঁতে পারে। বলেই ছুটতে শুরু করলো, পিছনে পিছনে বাপ্পাও।

ওদের দেখাদেখি হাসুও ছুটলো। কিন্তু খানিকটা গিয়েই ও থেমে পড়লো। তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এলো।

রণেনবাবু বললেন, আমি টায়ারড্। বলে ধীরে ধীরে হাঁটতে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন।

—বাঃ রে, উনি কি একা একা বসে থাকবেন নাকি! অনুপম আর অঞ্জলি নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে অনীতা বলে উঠলো। এক মুহূর্ত থেমে পড়লো।

তারপর কি ভেবে বলল, চল্ হাসু, আমরা বরং ওখানেই গিয়ে বসি।

রণেনবাবু যেখানটিতে বসেছিলেন সেই দিকেই ফিরে গেল অনীতা আর হাসু। আর জলের দিকে যেতে যেতে অঞ্জলি দেখলে, ঝুমঝুম আর বাপ্পা দুজনেই ছুটতে ছুটতে গিয়ে একেবারে জলের ধারে বালির ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে হাসছে। বাপ্পা একবার সটান শুয়ে পড়লো চিত হয়ে, আবার পা ছড়িয়ে উঠে বসলো।

ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অঞ্জলি তাকালো অনুপমের দিকে। অনুপম কৌতুকে হাসলো ওদের দিকে তাকিয়ে।

—আমরা যা পারিনি, ওরা যদি পারে, আপনার আপত্তি আছে? অঞ্জলি ধীরে ধীরে বললে।

অনুপম হাসলো।—আমি ওদের ঠিক বুঝি না, বুঝতে পারি না। শুধু মনে হয়, ওরা—আজকালকার ছেলেমেয়েরা খুব লাকি। আমাদের মত ইচ্ছের টুঁটি টিপে চলতে হয় না ওদের।

—ছাই লাকি! অঞ্জলি বললে, ওরা চটপট আলাপ করতেই জানে, বন্ধু হয়, প্রেম কি তা ওরা জানেই না। ওরা যে কেন এমন হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি না।

অনুপম গাঢ় গলায় বললে, সকলেই ওদের দোষ দেয়, আমি কিন্তু ওদের কোনো দোষ দেখি না। আসলে আমরা যা হতে পারিনি, তাই হওয়াতে চেয়েছি মনে মনে।

—হয়তো তাই। অঞ্জলি দূর থেকেই যেন স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ঝুমঝুম আর বাপ্পার ওপর।—ওদের দুটিতে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে।

অনুপম কোনো কথা বললো না। ও বুঝতে পারলো অঞ্জলি স্বপ্ন দেখছে। বাপ্পা আর ঝুমঝুমকে ঘিরে ও স্বপ্ন দেখতে চাইছে।

অনুপমের কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো।

জুতো খুলে নদীর জলে পা ডোবালো ও, মুখের ওপর এক আঁজলা জল ছিটিয়ে নিল।—আঃ কি ঠান্ডা!

ওরা দু'জনেই আবার ফিরতে শুরু করলো।

—আপনি এ ক'দিন একবারও গেলেন না। আজ হাটে আপনাকে এত খুঁজলাম! অঞ্জলি বললে।

অনুপম অঞ্জলির শরীরের ওপর এক পলকের জন্যে চোখ বুলিয়ে নিল। —কি লাভ বলো! শুধু যন্ত্রণা।

অঞ্জলি বললে, কাল রাত্তিরে আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি। একটু ঘুমোতে পেলে আমি আপনাকে অন্তত স্বপ্নে দেখতে পেতাম।

অনুপম হেসে উঠলো।

অঞ্জলি বললে, আগে আপনি অনেক রাত অবধি পড়তেন। পড়া শেষ করে এসে দাঁড়াতেন বারান্দায়। আপনাকে একবারটি দেখে শোবার ঘরে চলে যেতাম, না দেখতে পেলে ঘুম আসতো না।

—তুমি আগে আলো না নেভালে আমার ঘরের আলো নেভাতাম না।

অঞ্জলি মুগ্ধ চোখ তুলে তাকালো।—আপনি যখন দরজা খুলতেন, কিংবা জানালা বন্ধ করতেন, শব্দটা আমার এখনো কানে লেগে আছে, আমি ঠিক বুঝতে পারতাম আপনি!

কথা বলতে বলতে স্মৃতির মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল অঞ্জলি, হঠাৎ সচেতন হয়ে দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করলো—রণেনবাবু, অনীতা, হাসু যেখানে গাছের ছায়ায় বসে ছিল সেইদিকে।

অনুপম হঠাৎ বললে, আর সময় নেই অঞ্জলি, আর সময় নেই। এই 'মনে পড়া মনে পড়া' খেলা আমার কাছে অসহ্য লাগছে। আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই, আমি তোমাকে একা চাই। বলো, বলো তুমি।

অঞ্জলি অনুপমের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। অনুপমের সমস্ত শরীর যেন আবেগে থরথর করে কাঁপছে; অনুপমের চোখের দৃষ্টি যেন বদলে গেছে।

অঞ্জলি অবাক হয়ে বললে, আমার তো কিচ্ছু চাই না। আমি কিচ্ছু পেতে চাই না। আমি শুধু দেখা পেতে চাই।

অনুপম হঠাৎ অমানুষিক গলায় বলে উঠলো, আমি কুড়ি বছরের জমানো জ্বালা জুড়িয়ে নিতে চাই। বলো অঞ্জলি, বলো তুমি।

অঞ্জলিকে ভীষণ অসহায় দেখালো। ও যেন হঠাৎ বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অনুপম আবার বললে, আর সময় নেই অঞ্জলি।

অঞ্জলি করুণ চোখ তুলে অনুপমের দিকে তাকালো, চোখ নামালো মাটির দিকে। পায়ের গতি থেমে গিয়েছিল ওর। ধীরে ধীরে বললে, আজ আপনাকে

ফিরিয়ে দেবার মত মনের জোর আর নেই আমার। গলার স্বর কান্না হয়ে গেল।

অনুপমের সমস্ত শরীর তখন একটা নাচের বাজনা হয়ে গেছে।

অঞ্জলি চাপা গলায় কিছু বললো, অনুপম সায় দিল। বুধবার বুধবার—একটা শব্দ, একটা দিনের নাম—ওর শরীরের রক্তের মধ্যে নেচে বেড়াতে লাগলো।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো ওরা দু'জনেই। হয়তো বা উত্তেজনায়।

অনুপম দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে একবার বাপ্পা আর ঝুমঝুমের দিকে ফিরে তাকালো।

দেখলো, ঝুমঝুম আর বাপ্পা ভিজে বালি নিয়ে একটা বালির ঘর তৈরি করছে বালির ওপর বসে। খুব বড় একটা ঘর, কিন্তু বালির ঘর!

১২

বুধবার, বুধবার। নিজের কথাটাই বার বার অঞ্জলির কানের কাছে প্রতিধ্বনি তুললো। এই দিনটির জন্যে ও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিল। 'তোমাকে কাছে পেতে চাই, তোমাকে একা চাই।' অনুপমের এই কাতর প্রার্থনা ওর বুকের মধ্যে রক্তের স্রোত চঞ্চল করে দিয়েছিল। ওর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। কুড়ি বছর ধরে অঞ্জলির নিজেরই প্রার্থনা এটা, ও নিজেই যে বার বার মনে মনে বলেছে, তোমাকে কাছে চাই, তোমাকে একা চাই। ও তা জানতো বলেই এ কথাটা উচ্চারণ করতে ভয় পেয়েছে, ও তা জানতো বলেই এ কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়েছে।

তারপর নিজেই এই দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনটিতে ওর সমস্ত শরীর ভয়ে আনন্দে উত্তেজনায় থরথর কেঁপে উঠেছে। মনে মনে বলে উঠেছে, আমি চাই না, চাই না এই পার্থিব সুখ, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে দুঃখ নিয়ে বাঁচতে দাও।

না, পারেনি, অনুপমকে ব্যথার মধ্যে, বিষাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

আমি পাপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি স্বপ্নের মধ্যে ঘুমোতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে ঘুমের মধ্যে জাগিয়ে দিও না।

পারেনি, অঞ্জলি নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আমি কি অন্যায়ের মধ্যে বেঁচে ছিলাম, না কি অন্যায়ের মধ্যে বাঁচতে চলেছি। হঠাৎ মনের মধ্যে একটা শব্দ ঘুরতে শুরু করেছে। অসতী, অসতী। অঞ্জলি ভাবলে, আমি কি অসতী ছিলাম, না অসতী হতে চলেছি!

আমি কুড়ি বছর ধরে মনে মনে একজনের সঙ্গে সহবাস করে এসেছি। আমি কখনো কি স্বপ্নেও তাকে স্পর্শ করেছি? আরেকজন কুড়ি বছর ধরে আমার শরীরের সঙ্গে বাস করেছে। সে কখনো কি আমার মন ছুঁতে পেরেছে? আমি স্বামী বলে যাকে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত আমি যে তার মধ্যে বার বার সেই স্মৃতির মানুষটিকে খুঁজতে চেয়েছি। অঞ্জলি, ভয় কিসের, তুমি তো এতদিন অসতীই ছিলে, পাপের মধ্যে ডুবে ছিলে। অন্ধকারের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে উঠে যেন নিজেকেই বলেছিল অঞ্জলি।

—কাছে এসো, কাছে, আরো কাছে।

অনুপমের কথাগুলো ওর কানের কাছে দৈববাণীর মত শুনিয়েছিল।

ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আলতো হাতে চিবুক তুলে ধরেছিল অনুপম। ওর মুখের ওপর মুখ নেমে এসেছিল।

অঞ্জলির সারা দেহে একটা শিহরণ খেলে গিয়েছিল। একটা অদ্ভুত আনন্দ, ভয়, কি যেন হারানোর অবোধ্য বেদনা, কি এক সুখের উল্লাসে ওর দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

আর সেই অশ্রুর স্পর্শ পেয়ে অনুপম বলে উঠেছিল, অঞ্জলি, ছি ছি, তুমি কাঁদছো। আমি চাই না। তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি কিছুই চাই না।

উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে উঠেছিল অঞ্জলি—না না, কাঁদিনি, এই দেখুন আমি কাঁদিনি। চোখের জল মুছে ও আবছা অন্ধকারে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। ও অনুপমের মুখ দেখতে পেল না, অস্পষ্ট মুখ; অনুপম ওর মুখ দেখতে পেল না, অস্পষ্ট মুখ; দু'জনে দু'জনের চোখ দেখলো ক্ষীণ আলোর অস্পষ্টতায়।

অঞ্জলির মনে পড়লো, মনে মনে বললো, তুমি কতটুকু ব্যথাই বা দিতে পারো, কতটুকু দুঃখ! আমি তোমাকে অনেক বেশী দুঃখ দিয়েছি।

—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। আমি সারা দিন কাঁদলাম। সবাই আনন্দ করে, স্বপ্ন দেখে ঐ দিনটির। অথচ কেন জানি না, আমি শুধু কাঁদলাম। আমার শুধু মনে হলো একজন আমাকে ভালবাসতে চেয়েছিল, আমি তাকে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছি।

—অঞ্জলি. তুমি আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছিলে, দুঃখের স্মৃতি নিয়ে এতদিন কেটে গেছে। আজকের এই সুখের স্মৃতি নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবো।

—আপনি যে আমাকে আরো বড় দুঃখ দিয়েছিলেন, দুঃখ দেবার দুঃখ। আমি ভেবেছিলাম. বিয়ের আগে আপনার সঙ্গে দেখা করবো, ক্ষমা চেয়ে নেবো, আজকের এই দিনটা আপনাকে সেদিনই দিতে চেয়েছিলাম।

অনুপম আবছা অন্ধকারের মধ্যে অঞ্জলিকে আদর করতে করতে তার গালে মুখ ঘষতে ঘষতে. তার চোখে চিবুকে গালে কপালে. রেশমের মত নরম চুলে পাগলের মত অসংখ্য চুমু খেতে খেতে বললে. অপমান লুকোবার জন্যে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম অঞ্জলি।

—জানি. জানি। আপনাকে আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলাম। আমার চোখ সেই ক'টি দিন সব সময়ে আপনাকে খুঁজে বেড়াতো। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে একদিন বিলুকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম। উত্তর শুনে আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

বুকের কাছটিতে অঞ্জলিকে টেনে এনে নিজের বুকের মধ্যে তার হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে শুনতে অনুপম বললে. আমি আর পালাতে চাই না অঞ্জলি। এখন আমরা যত দূরেই চলে যাই না কেন, সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবো।

অঞ্জলি প্রতিধ্বনি তুললো, সব সময়।

সমস্ত ঘটনাটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল অঞ্জলির। ও যেন মেঘের মত হাল্কা হয়ে গেছে। পালকের মত নরম। ও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথায় জানে না।

একটি একটি করে গত সন্ধ্যার প্রতিটি দৃশ্য ও যেন রোমন্থন করছিল, অনুপমের প্রতিটি কথা। তার স্পর্শ যেন এখনো অঞ্জলির শরীরে স্নানের আনন্দের মত লেগে রয়েছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও একবার বুকের রক্তিম চিহ্নটুকু দেখলো। ওর সমস্ত মুখ সুখের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বাড়িতে ও এখন একা, একা। ঝুমঝুম তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বিপিন কাছের ঐ চায়ের দোকানে বসে তাস খেলছে। সারা দুপুর লোকটা বসে বসে তাস খেলে।

স্বামীর কথা একবার মনে পড়লো। সে এখন কপার হাউসের আপিসে। স্বামীর কথা মনে পড়তেই ও কেমন যেন শিউরে উঠলো। মুহূর্তের জন্যে ও বিমর্ষ বোধ করলো।

গত রাত্রে স্বামীর পাশে—একই বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ও কেমন শিউরে শিউরে উঠছিল। মাত্র এক ফুট তফাতের মানুষটার কাছ থেকে ও যেন অনেক অনেক দূরে সরে গেছে।

সে কথা ভেবে দুপুরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও একবার উচ্চারণ করলো, শরীর। একটা ছোট্ট শব্দ, ওর কানে 'ঈশ্বরী'র মত শোনালো।

আর ঠিক তখনই বাইরের ফটকের দিকে একটা হইহই শব্দ শুনতে পেল অঞ্জলি। ও ভাবতেই পারেনি ওর এই সুখের মুহূর্তে ওর জন্যে কোনো দুর্ঘটনা অপেক্ষা করে আছে। হট্টগোল শুনে অঞ্জলি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল বাগানের দিকে।

দুস্তর উৎকণ্ঠা নিয়ে ও ছুটে গেল।

—না, না, চিন্তার কিছু নেই। রণেনবাবু একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। একজন কে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো অঞ্জলিকে দেখতে পেয়ে।

অঞ্জলি ছুটে গিয়ে উৎকণ্ঠায় জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

ওরা তিন-চারজন মিলে রণেনবাবুকে গাড়ি থেকে নামালো ধরাধরি করে, রণেনবাবু তাদের বিরত করার চেষ্টা করে নিজেই ধুঁকতে ধুঁকতে হেঁটে এলেন, ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

একজন বললে, একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

আরেকজন বললে, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে, এখুনি আসছেন।

কি আশ্চর্য, দূরে সরে যাওয়া মানুষটা, গত রাত্রে যার পাশে শুয়ে মনে হয়েছিল অনন্ত দূরত্বে চলে গেছে, অঞ্জলি সেই মানুষটারই বুকের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ওর দু' চোখের দু' কূল তখন জলে ভেসে যাচ্ছে। —বলো বলো, চুপ করে থেকো না, কি হচ্ছে তোমার! কি কষ্ট হচ্ছে, বলো।

রণেনবাবু ক্লান্তিতে মাথাটা পাশ ফেরালেন। অঞ্জলি দেখলো সারা মুখে কপালে ঘাম, ঘাম।

শাড়ির আঁচল দিয়ে সযত্নে ও ঘাম মুছে দিল, মুখের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো, কষ্ট হচ্ছে তোমার?

শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে বুকের ওপর হাত বোলালো। আর অসহায়ের মত কি একটা চাপা ব্যথার চোখে রণেনবাবু তাকালেন অঞ্জলির মুখের দিকে। কোনো কথা বললেন না, শুধু হাতখানা বুকের ওপর এনে অঞ্জলির হাতখানা মুঠো করে ধরতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

অঞ্জলি দেখলো স্বামীর দু' চোখের কোণে দু' বিন্দু অশ্রু চিকচিক করছে। চোখের পাতা বন্ধ করতেই বিন্দু দুটো গড়িয়ে পড়ে চোখের খাঁজে আটকে গেল। দুটি নরম আঙুলে সেটুকু মুছে নিল অঞ্জলি।

তারপর শাড়ির আঁচলে নিজের চোখ মুছল।

১৩

ঝুমঝুম ঘুমিয়ে পড়েছিল। সারা দুপুর কোনো কিছু করার থাকে না, তাই কখনো ছবির পত্রিকার পাতা ওল্টায়, কখনো গল্পের বই পড়ে। বই পড়তে পড়তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হইচই শুনে ও উঠে এলো।

প্রথমটা ও কিছুই বুঝতে পারেনি। বাপীর আপিসের লোকদের দেখে একটু অবাক হয়েছিল। মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, বিছানায় শোয়ানো বাপীর মুখের দিকে। কিন্তু জিগ্যেস করতে বাধলো ওর।

ঠিক সেই সময়েই বাপ্পা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো। তখনো হাঁপাচ্ছে ও। রাস্তায় কার কাছে খবর শুনেই ছুটে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলো, কি হয়েছে মাসীমা?

অঞ্জলি চোখ তুলে তাকালো একবার বিষণ্ন দৃষ্টিতে। কোনো কথা বললো না, শুধু হাতখানা উল্টে দিয়ে একটা হতাশ ভঙ্গি করলো, বলতে চাইলো, কি জানি।

—ডাক্তার? ডাক্তার সেনকে খবর দিয়েছেন? বাপ্পা লোকগুলির দিকে তাকিয়ে বললে। তারপর নিজেই বললে, আমি যাচ্ছি, আমিই যাচ্ছি।

বলে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঝুমঝুম দুশ্চিন্তার মুখ নিয়ে ওর পিছনে পিছনে আসতেই বাপ্পা হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে খুব আস্তে করে হাতটা ছোঁয়ালো, বলতে চাইলো, ভয় পেয়ো না। কিংবা ঐ রকমই কিছু একটা। হয়তো কোনো সান্ত্বনার কথা। কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না, ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওকে যতক্ষণ দেখা গেল ঝুমঝুম কেমন একটা ভরসার চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে আবার ঘরটিতে এসে ঢুকলো। খাটের এক কোণে গিয়ে বাজুটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো বাপীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

ওর মাথার মধ্যে তখন একটাই কথা ঘুরছে—স্ট্রোক। স্ট্রোক, স্ট্রোক! কথাটা অনেকবার শুনেছে। একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে শুধু। ওর মনে তখন একটাই প্রশ্ন, বাপীর কি স্ট্রোক হয়েছে? কাউকে জিগ্যেস করতে পারলো না।

স্ট্রোক হলে তো মানুষ অনেক সময় মারা যায়। ঝুমঝুমের এক বন্ধুর বাবার স্ট্রোক হয়ে হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন। তার পর থেকে অমন হাসিখুশী আর স্ফূর্তিবাজ মেয়েটা রাতারাতি বদলে গিয়েছিল। কেমন অসহায় লাগতো তাকে, কেমন একটা বিষাদের ছায়া মাখানো থাকতো তার মুখেচোখে। সেই কথাটা মনে পড়তেই ঝুমঝুমের নিজেকেও বড় অসহায় লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ হলো গেটের সামনে, সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। ঝুমঝুমও।

দেখলো গাড়ি থেকে বাপ্পা নামলো, বাপ্পার পিছনে পিছনে ডাক্তার।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাপ্পা পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

অঞ্জলি তখনো ঠায় বসে আছে স্বামীর পাশে। ডাক্তারের মুখের দিকে করুণ প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

সবাই চুপচাপ। ডাক্তার সেন পরীক্ষা করতে করতে জানতে চাইলেন কি হয়েছিল। কে একজন বললে, আপিসে হঠাৎ মাথা ঘুরে—

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে স্বস্তির মৃদু হাসি ফুটলো ডাক্তার সেনের মুখে। —না, ভয়ের কিছু নয়।

একটা ইনজেকশন দিলেন, একটা প্রেসক্রিপশন লিখলেন।—ওষুধটা এখানে পাবেন না। কেউ জামশেদপুর গিয়ে...

বাপ্পা বলে উঠলো, আমি যাচ্ছি, আমিই যাচ্ছি।

ঝুমঝুম বাপ্পার দিকে তাকালো, ওর সমস্ত মুখ একটা স্বস্তি আর নির্ভরতায় প্রসন্ন দেখালো।

বাপ্পা বললে, ট্রেন কখন? ট্রেনের সময়...

কে একজন বললে, বাসে চলে যান, হলুদপুকুরে বদলে...

অঞ্জলি উঠে গিয়েছিল বাপ্পার কথা শুনে। ব্যাগটা বের করে এনে কোনো রকমে ঝুমঝুমের হাতে দিল। টাকা-পয়সা, বাড়ি, আসবাব সব যেন ওর কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে।

চোখের সামনে শুধু একটিই মানুষ—স্বামী। চোখের সামনে শুধু একটিই দৃশ্য—অসুস্থ স্বামী।

একে একে ডাক্তার, আপিসের লোকজন চলে গেল।

কে একজন বললে, চিন্তা করবেন না। দরকার হলেই ডাকবেন আমাদের।

ঘরখানা হঠাৎ খাঁ খাঁ করে উঠলো।

অঞ্জলি স্বামীর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে প্রশ্ন করলে, কষ্ট হচ্ছে তোমার?

বাপ্পা বেরিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে ঝুমঝুম।

বাপ্পা হঠাৎ বললে, ঝুমঝুম, বিপিনদা এলে...

বাপ্পা তুমি কি! অভিমানের স্বর ফুটলো ঝুমঝুমের গলায়। বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি নিজে গিয়ে খবর দিয়ে আসবো মাসীমাকে।

বাপ্পা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে ঝুমঝুমের হঠাৎ মনে হলো বাপ্পা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে, নির্ভর করবাব মত একটা গোটা মানুষ।

সন্ধ্যের দিকে খবর পেয়েই অনুপম আর অনীতা এলো। অনুযোগ করলো অনুপম, অঞ্জলি, আমাদের তো আগেই একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

অঞ্জলি কোনো উত্তর দিল না। অনুপমের দিকে ও তাকাতে পারছিল না। ওর মনের মধ্যে তখন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঝড় বইছে। ওর কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল অনুপম উঠে যাক, চলে যাক, ওর চোখের আড়ালে সরে যাক অনুপম।

দেখতে চাই, দেখতে চাই, দেখতে চাই। অঞ্জলি বার বার এই কথাটা বলেছে অনুপমকে। আমি আর কিছুই চাই না, শুধু দেখতে চাই আপনাকে। আজ ওর মনের গভীর থেকে একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা যেন চিৎকার করে বলতে চাইছে, দেখতে চাই না, দেখতে চাই না, আপনি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যান।

এক পলকের জন্যে গত সন্ধ্যার একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্য একবার অঞ্জলির মনের কোণে উঁকি দিতেই ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অঞ্জলির মনে হলো আমি তো পাপে ডুবতে চাইনি, আমি শুধু স্মৃতিকে জাগাতে চেয়েছিলাম...

অঞ্জলি অনুপমের দিকে তাকাতে পারছিল না। রাগ, বিরক্তি, লজ্জা চাপা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

স্বামীর পাশটিতে ও স্থাণুর মত বসেছিল, অনুপমদের আসতে দেখেও নড়লো না, তাকালো না ওদের দিকে।

এক সময় অনুপমের দিকে না তাকিয়েই বলে উঠলো, আপনি চলে যান, রাত

অনেক হলো।

নিতান্তই একটা সৌজন্যের মত শোনালো কথাটা। কোনো আন্তরিকতা নেই যেন, কিংবা কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষাক্ত কাঁটা আছে।

চুপচাপ বসে রইলো অনুপম। ও দেখলো, পরম যত্নে ভিজে তোয়ালে দিয়ে স্বামীর কপালের ঘাম মুছে দিল অঞ্জলি। চাপা গলায় কি যেন জিগ্যেস করলো। গরম দুধ এনে একটু একটু করে খাওয়ালো। আর সেই সময়ে অঞ্জলির মুখে এমন একটা স্নিগ্ধ অসহায় পবিত্রতা দেখতে পেল যা অনুপম কোনোদিন দেখেনি। ওর হঠাৎ মনে হলো, অঞ্জলির কাছ থেকে ও অনেক দূরে সরে গেছে। আরো কাছে আসবে মনে করে অনুপম ওর শরীরের কাছ আসতে চেয়েছিল। শরীরকে কাছে পাওয়ার পর এখন যেন অচেনা মানুষ হয়ে গেছে, মাত্র একটি ছোট্ট ঘটনায়।

আপিসের একজন আবার দেখা করতে এলেন।

অনীতা অঞ্জলিকে একবার বললে, বলো তো আমি এখানে থেকে যাই, তুমি ভাই একা মানুষ!

অনুপম বললে, আমি, আমার তো...

কি বলতে চাইলো ও, স্পষ্ট করে বলতেই পারলো না, তার আগেই অঞ্জলি বলে উঠলো, না না, কিচ্ছু দরকার হবে না, বিপিন আছে...

ঝুমঝুম বলে উঠলো, বাপ্পা তো ফিরলো বলে...বরং বাপ্পা...

আসলে ভিতরে ভিতরে অঞ্জলি অস্থির হয়ে উঠছিল। ওর কাছে অনুপমের উপস্থিতিটাই তখন অসহ্য। কেবলই মনে হচ্ছিল ও উঠে যাক, চলে যাক, দৃষ্টির আড়ালে সরে যাক অনুপম।

অঞ্জলি কিছুক্ষণ পরেই অনীতাকে বললে, হাসুকে একা রেখে এসেছো, তোমরা ভাই চলেই যাও, দেরী করো না।

ওরা সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত উঠে চলে এলো। আসার সময় অনুপম আবার বললে, দরকার হলে খবর দিও কিন্তু।

অঞ্জলি কোনো সাড়া দিল না। আর অনুপম চলে যেতেই ওর নিজেকে কেমন বিশুদ্ধ মনে হলো। যেন একটা বিবেকের আয়না ওর চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

এখন ঘরের মধ্যে ওরা তিনজন। রণেনবাবু অঞ্জলি, ঝুমঝুম।

বড ঘরখানার এক কোণে একটা আরাম-কেদারা। পাশের পেডেস্টালের ওপর একটা সিল্কের রঙীন ঝালর দেওয়া নরম আলো। সমস্ত ঘরময় মৃদু জ্যোৎস্নার মত আলোর আভা ছড়িয়ে আছে। পাশে আরাম-কেদারায় পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে ঝুমঝুম। সেই চঞ্চল অস্থির মেয়েটা হঠাৎ যেন নিস্তব্ধ স্থির।

—অঞ্জু! অস্ফুটে ডাকলেন রণেনবাবু।

পাশেই বসে ছিল অঞ্জলি, ও উদ্‌গ্রীব হয়ে মাথা নীচু করলো।—কিছু বলবে?

—আমার কোনো অসুখ হয়নি অঞ্জু। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাসের মত কণ্ঠে রণেনবাবু বললেন।

স্বামীর বুকের ওপর একটা হাত রেখে অঞ্জলি বললে, জানি। তুমি কথা বলো না, লক্ষ্মীটি, চুপ করে থাকো—।

রণেনবাবু একটুখানি চুপ করে রইলেন। হাতের মধ্যে অঞ্জলির হাতখানা মুঠো করে শক্ত করে ধরবার চেষ্টা করলেন। ভেঙে-পড়া গলায় বললেন, তোমাকে বলতে পারছিলাম না, কয়েক দিন ধরেই বলবো বলবো ভাবছিলাম।

অঞ্জলি কান্নার স্বরে বলে উঠলো, চুপ করো এখন, তোমার যত ইচ্ছে বলো, যা ইচ্ছে বলো, এখন তুমি চুপ করে থাকো একটু।

—না, না। কান্নার মত শোনালো রণেনবাবুর গলা। বলে উঠলেন, আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম, খুব একটা অপমানের মধ্যে দিন কাটছিল আমার...

—আঃ, তুমি চুপ করো। ঝুমঝুমের কথা ভুলে গিয়ে দু' হাতে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে থামাতে চাইলো অঞ্জলি।

রণেনবাবু থামলেন না। বললেন, তোমাদের ওপর আমি কি যে অবিচার করলাম, নিজের আত্মসম্মানের কথা ভাবতে গিয়ে...

অঞ্জলি বলে উঠলো, কেন ভাবছো তুমি, তোমার আত্মসম্মান আমি আর একটুও নষ্ট হতে দেবো না।

রণেনবাবু চুপ করে রইলেন এক মুহূর্ত। তারপর বললেন, আমার কোনো অসুখ হয় নি অঞ্জু। আমি, আমি...আমার ভুলের জন্যে নাকি কোম্পানীর কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে গেছে।

অঞ্জলি অবাক হয়ে তাকালো স্বামীর দিকে।—কি বলছো তুমি, ওসব কথা এখন থাক।

—না, না। রণেনবাবু থরথর করে কেঁপে উঠলেন।—আমি অপমানিত বোধ করছিলাম প্রতিদিন, আমি রেসিগনেশন দিয়েছিলাম সহ্য করতে না পেরে, ওরা... ওরা অ্যাকসেপ্ট...আমার পায়ের তলায় মাটি নেই অঞ্জু।

অবাক চোখে বিস্ফারিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অঞ্জলি। আরাম-কেদারা থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ঝুমঝুম। সেও অবাক হয়ে গেছে যেন। এ রকম একটা কথা কোনোদিন ও শোনেনি। শুনতে হবে ভাবেনি। কথাটার কি অর্থ ও যেন ঠিক বুঝতে পারছে না।

অঞ্জলি শুধু হতাশভাবে বললো, কি বলছো তুমি? যা শুনেছে সব যেন স্বপ্নের মত মনে হলো ওর। যেন কোনো গুরুত্ব নেই কথাটার, শুধু একটা প্রলাপ। স্বামীর চাকরি নেই। পায়ের তলায় মাটি নেই। অঞ্জলি ভাবতেই পারছে না কথাটার কি অর্থ!

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা পায়ের শব্দ এলো, কেউ একজন অন্ধকারে রাস্তার মোরম মাড়িয়ে আসছে এদিকে।

ঝুমঝুম ঐ শব্দে যেন সংবিৎ ফিরে পেল। দ্রুত পায়ে বাইরে এলো, একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার কনকনানি ওর সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে গেল।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ঝুমঝুম, তাকালো রাস্তার দিকে। হ্যাঁ, বাপ্পা। বেচারা বাইরের প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত পায়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে। একটা সিলুট ছবির মত লাগছে ওকে।

বেচারী। ঝুমঝুমের মন বলে উঠলো, বেচারী, ওকে যাবার সময় একটা গরম চাদর দিইনি। ওর ভীষণ মায়া হলো বাপ্পার ওপর।

কিন্তু পরক্ষণেই বাপীর কথা মনে পড়লো। পায়ের তলায় মাটি নেই, মাটি নেই।

বাপ্পা ততক্ষণে গেট পার হয়ে উঠে আসছে বারান্দায়।

ঝুমঝুম কি যেন বলতে চাইলো, গলার স্বর আটকে গেল। ঠাণ্ডায় এতখানি পথ এসে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাপ্পা বারান্দায় উঠতেই ঝুমঝুম ছুটে গিয়ে ওকে একটা গরম চাদরের মত সমস্ত শরীর দিয়ে ভেঙে-পড়া কান্নায় জড়িয়ে ধরলো। কি যেন বলতে চাইলো, বলতে পারলো না।

১৪

অসুখ, অসুখ। অসুখের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। রণেনবাবু একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অঞ্জলি রাতারাতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যেন বন্দর হারানো একটা সুদৃশ্য ছোট্ট জাহাজ ভাঙা মাস্তুল নিয়ে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

অনুপম সকাল-সন্ধ্যা বার বার এসেছে। ও শুধু জানে রণেনবাবু হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মাথা ঘুড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। অঞ্জলির জন্যে তাই বেদনাবোধ না করে পারেনি। ওর কেবলই ইচ্ছে হয়েছে যে-কোন ভাবে অঞ্জলির এই বিপদের সময়ে পাশে এসে দাঁড়াতে। ও মন মনে চেয়েছে অঞ্জলি ওর ওপর কোনো দায়িত্ব দেবে, ওর ওপর নির্ভর করবে। অথচ, অঞ্জলি শুধু এড়িয়ে যেতে চাইছে। কেন? কেন? অনুপম বুঝতে পারেনি। ও তো শরীরের কাছে আসতে চেয়েছিল শুধু মনের কাছাকাছি আছে এই স্বীকৃতিটুকু পাবার জন্যে। শরীর তো এক ধরনের স্বীকৃতি। অঞ্জলি সেটুকু বুঝতে পারছে না কেন!

ও বুঝতে পারছে না, অঞ্জলির কাছে ও আজ মিথ্যে হয়ে গেছে। যার ওপর দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিল অঞ্জলি, সেই মাটি আজ পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারছে না ও। ঝুমঝুমের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। শরীরের নদীতে স্নান করে এসে সেদিন ঝুমঝুমের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি; আজ জীবনের চরম অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে ও কারো মুখের দিকেই তাকাতে পারছে না। এখন মনে হচ্ছে স্মৃতি শুধুই একটা সুখ-বিলাস। এখন মনে হচ্ছে স্বামী ওকে যে নিশ্চয়তা দিয়েছিল সেই নিরাপত্তাকেই ও ভালবেসে এসেছে। সেই নিশ্চয়তার মধ্যেই স্বামীর প্রতি ভালবাসা লুকিয়ে ছিল. ও কোনোদিন জানতে পারেনি। সেই ভালবাসা ঝুমঝুমের ভবিষ্যৎ।

বাপীর চাকরি নেই, বাপীর চাকরি নেই। কথাটার কি অর্থ ঝুমঝুম ঠিক এখনো বুঝতে পারছে না। শুধু বাপীর মুখের দিকে তাকিয়ে, মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে।

এ ক'দিন সব সময়ে বাপ্পা কাছে কাছে থেকেছে। ঝুমঝুমের মনে হয়েছে বাপ্পা যেন নিজেকে ওদের জন্যে উৎসর্গ করে দিতে চাইছে। সেই শীতের রাতটা ওর চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠেছে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে ক্লান্ত একটা মানুষ ফিরেছে ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে।

বাপ্পার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা।

বাপ্পা হঠাৎ বললে, ঝুমঝুম, তুমি শুধু মুখ গম্ভীর করে সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকছো। তুমি শেষে একটা অসুখ বাধিয়ে তুলো না।

অঞ্জলির কানে গেল কথাটা। ও ঝুমঝুমের দিকে তাকালো। বললে, যা ঝুমঝুম, তোরা একটু বেড়িয়ে আয়। এ ক'দিন তো বাড়ির মধ্যেই আটকে আছিস।

বাপ্পা তাকালো ঝুমঝুমের দিকে।

ঝুমঝুম একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে গেল, শাড়ি বদলে এসে বললে, চলো।

মিঠে রোদ্দুরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এলো ওরা। রাখা মাইন্স-এর

রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এসে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ধসে পড়া বাড়ির নিঃসঙ্গ শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ালো।

তারপর এক সময়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বললে, সেদিন তোমায় বলেছিলাম না, আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না, কারো কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না...

—বলেছিলে...কিন্তু তুমি অকারণ শুধু বাপীর কথা ভাবছো। মেসোমশাই তো ভালো হয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ কেঁদে উঠলো ঝুমঝুম। ও চোখ মেলে তাকালো বাপ্পার মুখের দিকে। বাপ্পা দেখলো ওর দু' চোখে জল টলমল করছে।

ঝুমঝুম ওর জলে-ভাসা চোখ চেয়ে বললে, তুমি কিছু বুঝতে পারো না। আমি এ ক'দিন সব সময়ে শুধু তোমার কথা ভেবেছি। যতবার চেষ্টা করেছি তোমার কথা ভাববো না, ততই তোমার কথা বেশী করে মনে পড়েছে।

বাপ্পা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। হঠাৎ ওর সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—ঝুমঝুম, তুমি সত্যি বলছো?

ঝুমঝুম স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো বাপ্পার মুখের দিকে।—তুমি একবারও ভেবেছো আমার কথা? তুমি তো শুধু কর্তব্য করে গেছ ভাল ছেলের মত। তুমি ঘুমোতে চাওনি বলে আমি সারারাত জেগে কাটিয়েছি। তুমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে এলে সেদিন, তোমার কষ্ট দেখে আমি একটা গরম জামাও পরিনি।

বাপ্পা ধীরে ধীরে বললে, আমার তো কতবার বলতে ইচ্ছে করেছে, সাহস হয়নি। ভেবেছি, তুমি হেসে উড়িয়ে দেবে। আমি চোখ বুজলেই তোমার মুখ দেখতে পাই ঝুমঝুম।

ঝুমঝুমের চোখের জল হেসে উঠলো।

ভাঙা পাঁচিলটা রাস্তা আড়াল করে আছে। একটা সাঁওতাল ছেলে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

বাপ্পা বললে, তোমার চোখে জল, ঝুমঝুম, মুছে ফেল।

ঝুমঝুম মুখ নীচু করে বললে, তুমি মুছে দাও।

বাপ্পা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, কি করবে ভেবে পেল না।

ঝুমঝুম আবার বললে, তুমি মুছে দাও। আমার চোখের জল সব সময়ে তুমি মুছে দেবে।

বাপ্পা পরম আদরে ওকে কাছে টানলো, ওর দুটি চোখের ওপর ঠোঁট ঠেকিয়ে চোখের জল মুছে নিল।

ঝুমঝুম হঠাৎ যেন ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। ও মাথা নীচু করে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। বাপ্পা নিজেও তখন লজ্জা পেয়ে গেছে।

অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে বললে, চলো, মাসীমা একা আছেন, হঠাৎ যদি...

ঝুমঝুম আড়চোখে তাকালো একবার। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। বললে, তোমার শুধু কর্তব্য আর কর্তব্য। ডাক্তার, ওষুধ, ইনজেকশন, ফল.. তুমি একটা ঘড়ির কাঁটা।

বাপ্পা হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলো। বললে, সবকিছুর মধ্যে তো তুমিই ছড়িয়ে আছ। ঘড়ির সব ঘরগুলোতেই যে তুমি।

—আমি তোমার মত এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারি না।

—তোমার চোখ আরো সুন্দর করে বলে।

চোখ বড় বড় করে তাকালো ঝুমঝুম। বললে, আমার চোখ যদি তোমার এত

সুন্দর লেগে থাকে, তুলে নাও।

—শুধু চোখ নয়, তোমাকেই আমি আমার ক্যামেরায় তুলে নিয়েছি।

—কবে, কোথায়? সেই সেদিন যখন ছবি তুলতে গিয়েছিলাম? ঝুমঝুম আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলো।

বাপ্পা হাসলো।—না। যেদিন প্রথম তোমাকে দেখলাম, সাইকেল চালিয়ে গিয়েছিলে, সেদিন...

ঝুমঝুম ঠাট্টার স্বরে হাসলো, সেদিন ক্যামেরা ছিল নাকি? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

বাপ্পা নিজের বুকের ওপর একটা আঙুল ঠুকলো।—এখানে, এখানে।

শুনতে ভাল লাগলো ঝুমঝুমের। ওর সমস্ত মন শিশিরে ভিজে যাওয়ার মত নরম হয়ে গেল।

বললে, ছবিটা চিরদিন থাকবে কি না কথা দাও। না কি কোলকাতায় ফিরে গিয়েই মিলিয়ে যাবে!

পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আরেকটা শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল পার হলো ওরা। ওপাশে একরাশ সাঁওতাল মেয়েপুরুষ কলরব করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কোমর জড়াজড়ি করে গোটা পাঁচেক মেয়ে সারি বেঁধে চলেছে হাসতে হাসতে।

বাপ্পা সেদিকে একবার তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, শুধু ছবিটা নিয়েই চিরদিন থাকতে হবে কিনা বলো।

ঝুমঝুম হেসে উঠলো।—এখনো অবিশ্বাস তোমার!

সামনে পরিচ্ছন্ন দূর্বা ঘাসের এক টুকরো কার্পেট বিছোনো রয়েছে মাটির ওপর। বাপ্পা হঠাৎ বসে পড়লো সেখানে। হাঁটু তুলে বসলো হাত পিছনে রেখে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ঝুমঝুম। তারপর বাপ্পার পায়ের কাছে বসে দুটি হাত দিয়ে ওর হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুর ওপর থুতনি রাখলো। কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে বাপ্পার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো স্থির ভাবে।

—কি দেখছো?

চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগছিল বাপ্পার। কিন্তু ভাল লাগছিল ঝুমঝুমের বসার ভঙ্গীটি। ওর দুটি হাঁটু দুটি নরম হাতের বাঁধনে, হাঁটুর ওপর চিবুকের স্পর্শ।

—শোনো!

—কি বলো!

—কাছে এসো।

বাপ্পা পিছনে দু'হাতে ভর দিয়ে বসেছিল। হাত তুলে নিয়ে মুখটা কাছে আনলো একটু।—বলো।

—আরো কাছে এসো।

বাপ্পা হেসে মুখটা আরো কাছে আনলো।

ওর গালে আস্তে একবার গাল ছোঁয়ালো ঝুমঝুম। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটা দু' হাতের মধ্যে নিয়ে কপালে একটা চুমু খেল বাপ্পা।

তারপর দু'জনেই চুপচাপ বসে রইলো। ঝুমঝুম হাত সরিয়ে নিয়ে একটু দূরে বসলো। দূরে দূরে বসে ওরা দু'জনে কি যেন ভাবতে ভাবতে না-ভাবার আনন্দের মধ্যে ডুবে গেল।

একটা লম্বা ঘাসের শিস ছিঁড়ে নিয়ে একপ্রান্ত দাঁতে চেপে ধরে শিসটা

ঝুমঝুমের মুখের ওপর বুলিয়ে দিতে গেল বাপ্পা। ঝুমঝুম মৃদু হেসে ঘাসের শিসটার অন্য প্রান্ত দাঁতে চেপে ধরলো।

একটু পরে ঝুমঝুম বললে, বাড়ি ফিরতে হবে না?

—আমার এখানে অনন্তকাল এমনিভাবে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।

দু'জনেই উঠে পড়লো। বাড়ির দিকে যেতে যেতে ঝুমঝুম বললে, তোমার কাছে আমার কোনো কিছু গোপন রাখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু আজকের এই সুন্দর দিনটাকে আমি নষ্ট করতে চাই না।

গোপন কথাটা জানবার চেষ্টা করলো না বাপ্পা। শুধু বললে, আজকের এই দিনটা আমার জীবনে সবচেয়ে সুন্দর দিন।

১৫

সুস্থ হয়ে উঠলেও একটা হতাশ বিষণ্ণতা রণেনবাবুকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল। সেটুকু ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই যেন মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারছিলেন না।

প্রকাশ করে কোনো দিন বলেন নি. তবু ভিতরে ভিতরে তাঁর একটা গর্ব ছিল। এখন বুঝতে পারছেন, তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব কত ঠুনকো একটা জিনিসের ওপর নির্ভর করে ছিল।

এই তো সেদিন. এখানে আসার আগে একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন, এক আত্মীয়-কন্যার বিয়েতে। সেজমাসীর দাঁত পড়ে গেছে, বয়স হয়েছে, তবু রণেনকে এখনো তেমনি ভালবাসেন। একঘর লোকের সামনে বললেন, হ্যাঁ রে রণু, তুই এখন বিরাট চাকরি করিস. কত খ্যাতি-প্রতিপত্তি তোর, শুনে গর্ব হয়, তা সেজ-মাসীকে একেবারে ভুলে গেলি। যাবি তো মাঝে মাঝে!

সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল, কে একজন জিগ্যেসও করেছিল। আর সেজমাসী বলেছিল. এই তো রণেন, আমাদের রণু।

চেনা-অচেনা সকলের চোখে কি যেন দেখেছিলেন রণেনবাবু, মনের মধ্যে খুব একটা অহঙ্কার জেগেছিল।

এই সেদিনও ক্লাবে বসে গুপ্তর কাছে তাচ্ছিল্য করে বলেছেন, কোম্পানী হয়তো কাপুর চালাতে পারে. কিন্তু চাবিকাঠি তো আমার হাতে।

তখনো ভিতরে ভিতরে একটা কোল্ড ওয়ার চলছিল।

মাত্র ক'টা দিনের ব্যবধান। এরই মধ্যে উনি একটা ফালতু লোক হয়ে গেছেন। রণেনবাবু মনে মনে ভাবলেন। শুধু একটা চাকরি. একটা ভাল চাকরি। মাস গেলে একটা মোটা অঙ্কের বেতন পাওয়ার নিশ্চয়তা। আর্থিক সচ্ছলতা। ব্যস্, ঐ একটা জিনিসের ওপর সবকিছু নির্ভর করে, আগে জানতেন না।

এখন সেজমাসীর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, যদি সমবেদনার কণ্ঠে বলে ওঠেন, হ্যাঁ রে রণু. তোর নাকি চাকরি গেছে! রণেনবাবু ভাবতেও পারছেন না। কিংবা গুপ্ত খবর পেয়ে যদি নিজেই এসে হাজির হয়. কি বলবেন তখন!!

'নিশ্চয়তা যত বাড়ে ততই অনিশ্চয়তার দিকে আমরা এগিয়ে যাই।' কথাটা ইংরেজীতেই বলে উঠলেন রণেনবাবু. যেন নিজেকে শোনাবার জন্যেই।

এখন মনে হচ্ছে, ধাপে ধাপে এমন উন্নতি না করলেই ভাল ছিল। গত কয়েক বছরে চটপট পদোন্নতি ঘটেছে, মাইনে বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শৌখিন সচ্ছলতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, অথচ পিছনে পিঠ দেয়ার মত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুদৃঢ় দেয়াল তৈরী হয়ে ওঠেনি। সেজন্যেই এতটা ভেঙে পড়েছেন। মাত্র তিনশো টাকায় ঢুকেছিলেন। আজ সেই তিনশো টাকার একটা চাকরি জোটাতে অত দুর্ভাবনা হতো না। মনে হতো না আত্মসম্মান খোয়া গেল।

না, ভুল হয়ে গেছে। রেসিগনেশন না দিলেই ভাল হতো। সম্ভব হলে সেটা এখনো ফিরিয়ে নিতে রাজী ছিলেন। ছোট ছোট অপমান কুড়োতে হচ্ছিল, কিন্তু সে আর এমন কি বড় লজ্জা। লজ্জা তো শুধু নিজের কাছে, আপিসের ক'টা লোকই বা টের পেত। এখন হয়তো সবাই হাসছে। অঞ্জলির কাছেও মাথা তুলে দাঁড়াতে অস্বস্তি। ঝুমঝুমের দিকে তাকাতে ভয়।

আমাদের সমস্ত গর্ব, অহঙ্কার, আমাদের যত কিছু ব্যক্তিত্ব কি শুধু টাকা দিয়ে গড়া? তা না হলে গর্ব করে বুক ফুলিয়ে বলছেন না কেন, আত্মসম্মান অনেক বড় জিনিস অঞ্জু, ঐ টাকা ক'টার জন্যে কি নিজেকে বিক্রি করে দেবো?'

তার বদলে, রণেনবাবু ফিসফিস করে বললেন, আর কেউ জানে অঞ্জু? ওরা কেউ শুনেছে?

অঞ্জলি চারপাশ চকিতে দেখে নিল। না, কাছেপিঠে বিপিন নেই। অঞ্জলি চাপা গলায় প্রশ্ন করলো, কাদের কথা জিগ্যেস করছো?

—ঐ অনুপমবাবুরা, ওঁরা কি জেনে গেছেন?

—না না, কেউ জানে না। তুমিও বলে ফেলো না যেন। আমি ঝুমঝুমকে নিষেধ করে দিয়েছি।

রণেনবাবু দু'হাতের মধ্যে মাথা রাখলেন। কি আশ্চর্য, কে এই অনুপম? দু' দিন আগে তো চিনতেনও না। দু' দিন পরে কোলকাতার ভিড়ে হারিয়ে যাবে। তবু তার কাছেও কি অপরিসীম লজ্জা!

রণেনবাবু একটুখানি চুপ করে থেকে অঞ্জলির মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে, নাকি লজ্জা লুকোবার চেষ্টায়, মৃদু স্বরে বললেন, তুমি ভয় পেও না অঞ্জু, আমি কিছু একটা জোগাড় করে নেবই। হয়তো ক'টা মাস একটু কষ্ট করতে হবে...

—কষ্ট করতে আমি একটুও ভয় পাই না। কথাটা যেন নেহাতই উচ্চারণ করলো, অঞ্জলি মনের মধ্যে কোনো জোর পেল না।

রণেনবাবু আরাম-কেদারাটায় বসেছিলেন সামনে ঝুঁকে পড়ে মাথা নীচু করে। অঞ্জলি দাঁড়িয়ে ছিল, হাতলটার ওপর বসলো। স্বামীর চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বললে, তুমি শুধু ভেঙে পড়ো না।

—না, না, ভেঙে পড়বো কেন! শুধু ঝুমঝুমের ভবিষ্যৎ ভেবে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যা কয়েক হাজার জমেছে, বেশী তো জমেনি, মাইনে তো ক'বছর মাত্র বেড়েছিল,...আমি বলি কি, যতদিন না আবার কিছু জুটিয়ে নিচ্ছি, আমাদের একটু খরচ কমানোই উচিত। কি বলো?

—সে তো ঠিকই। তুমি এত ভাবছো কেন। অঞ্জলি হাসবার চেষ্টা করে বললে, তুমি দেখো, আমি ঠিক চালিয়ে নেব।

—আমাদের ফিরে গিয়েই একটা কম ভাড়ার ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হবে।

—কবে ফিরবে! অঞ্জলি যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে।—এখানে

পড়ে থেকে কি লাভ!

দু' দিন আগে এই মুসাবানি-রাখা-হলুদপুকুরকে আত্মীয় মনে হয়েছিল। এত জায়গায় বেড়াতে গেছে, এত সব সুন্দর সুন্দর জায়গায়। কখনো এমন রঙিন হয়ে ওঠেনি সেখানকার মাটি-বাতাস। এমন অন্তরঙ্গ মনে হয়নি। অথচ, এখন এখানকার আকাশে-বাতাসে কোনো রঙ নেই। বিবর্ণ ম্লান। যেন ছেড়ে যেতে পারলেই মুক্তি।

প্রথম যৌবনের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কুড়িটা বছর কেটে গেছে। তখন অনুপম ছিল ধ্রুবতারার মত সত্য। মনে হয়েছিল, ও জীবনে কিছুই বুঝি পায়নি।

তারপর অনুপম এলো ওর জীবনে। আর নিজেকে যখন সবচেয়ে সুখী মনে করছিল, তখনই এই ভয়ঙ্কর কান্ডটা ঘটে গেল। স্বামীর কাছ থেকে ও দূরে সরে গিয়েছিল, এখন নতুন করে আবিষ্কার করল—ঐ মানুষটাই তার সবচেয়ে কাছের।

সত্যি কি পাপপুণ্য বলে কিছু আছে নাকি! ক্ষণিকের জন্য অঞ্জলি ভাবলো। একটু অনুশোচনা হলো। অনুপমই হয়তো দায়ী, কিংবা ও নিজেই। সেজন্যেই এমন একটা শাস্তি নেমে এলো নাকি! না, অঞ্জলি ওসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুশোচনা, ওর ওপর স্বামীর বিশ্বাসটুকু ও নষ্ট করেছে।

'তুমি আর কিছু চেয়ো না,' অঞ্জলি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিল অনুপমকে। অনুপম সত্যিই কিছু চায়নি, ও শুধু অন্ধের মত দুটি হাতের স্পর্শ দিয়ে অঞ্জলিকে দেখতে চেয়েছিল। ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে অঞ্জলির মুখ চোখ, গাল কপাল।

কিন্তু এখন ওর নিজেরই অবাক লাগছে। কই, অনুপমের জন্যে বুকের ভিতরে এখন তো কোনো অনুভূতিই নেই। অনুপমকে দেখলে বিব্রত বোধ করছে, অসহ্য ঠেকছে। এখন শুধু নিজের দুশ্চিন্তার মধ্যে নিঃসঙ্গ হতে চাইছে।

এই সেদিন অনুপমকে ও বলেছে, আপনার কাছে সব কথা বলা যায়। নিজের সংসারের সুখ-দুঃখ জটিলতা প্রকাশ করেছে অকপটে। বলেছে, আপনার কাছে আমার কিছুই গোপন করার নেই।

অঞ্জলির হাসি পেল। আজ অনুপমের কাছ থেকেই সবকিছু লুকোতে চাইছে।

বাড়ির আসবাবপত্রগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে গেল অঞ্জলি। কার্পেটে মোড়া মেঝে, সোফাকৌচ, দামী পর্দা, খাট, আলমারি—এই সচ্ছলতার মূল্যেই ও নিজেকে মূল্যবান ভেবে এসেছে এতদিন। সেখান থেকে নেমে দাঁড়াতে পারছে না, কারণ ও এখন আর একা নয়। একটা প্রচন্ড বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও এখন স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে—সেই ছোটবেলায় ঝুমঝুমের একবার খুব অসুখ করেছিল, মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার সময় ও যেমন স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ও ভেঙে পড়লে স্বামী সান্ত্বনা দিত, স্বামী ভেঙে পড়লে ও। ওরা দু'জনেই একদিন একই সঙ্গে কেঁদেছিল।

ঝুমঝুমের হয়তো বন্ধুদের কাছে খুব লজ্জা করবে।.. কয়েকটা মাস শুধু তারপর দেখো আমি ঠিক আবার উঠে দাঁড়াবো। রণেনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন।

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। ঝুমঝুম তো বড় হয়েছে, ও বুঝবে। মুখে বললো অঞ্জলি, কিন্তু একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ভেসে বেড়ালো ওর মন।

*

অঞ্জলি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল, ও যাবার আগে রানীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে। রানীর ভূমিকায়।

রণেনবাবু একবার বলেছিলেন, তুমি ওঁদের খেতে বলবে বলেছিলে!

সেই সুযোগটা লুফে নিয়েছিল অঞ্জলি।

এতদিন ও অনুপমের সামনে নিজেকে ভিখারিণীর ভূমিকায় দেখে এসেছে। নিজেকে ভেবেছে বঞ্চিত, দুঃখী, নিঃসঙ্গ। আজ ও অনুপমের সামনে অন্য রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

সমস্ত ঘরগুলো নতুন করে সাজালো নিজের হাতে। জানলা-দরজার পর্দা বদলালো। বিপিনকে সাইকেল নিয়ে হলুদপুকুর পাঠিয়ে দিল খাবারের ফর্দ বানিয়ে। সকালে মিষ্টি দই আনিয়ে রেখে দিয়েছে ফ্রীজে। নিজের হাতে সারা দুপুর পায়েস বানিয়েছে। অঞ্জলির মনে আছে, মাসীমা জন্মদিনে অনুপমকে পায়েস রান্না করে সামনে বসে খাওয়াতেন। অঞ্জলির মনে আছে, অনুপম বড় মাগুর মাছের কালিয়া খেতে ভালবাসতো। ও অনেক চেষ্টা করে কানিয়ালুকা গাঁ থেকে মাগুর মাছ আনিয়েছে সাঁওতাল মেয়েটিকে দিয়ে। অনুপম যে ওর কাছ থেকে দূরে চলে গেছে এ কথাটা জানতে দেবে না ও।

সন্ধ্যেবেলায় ওরা এলো। অনুপমকে দেখে অঞ্জলি মনে মনে হাসলো। মানুষটা জানেই না, ওর কাছে সে মিথ্যে হয়ে গেছে। শরীরকে ভেবেছিল স্বীকৃতি। শরীরকে কাছে পেয়েছিল বলে মনে করেছি হারাবার ভয় নেই। এখন অঞ্জলি নিজেই হারিয়ে গেছে।

অনীতা খুব সাজগোজ করে এসেছে। হাতে একরাশ চুড়ি পরেছে, গলায় একটা দামী হার। ও বোধ হয় অঞ্জলিদের বাড়িটা দেখে গিয়ে নিজেকে তুলনা করেছে, খাটো ভেবেছে অঞ্জলির কাছে। তাই এত সাজগোজ। অনীতা জানে না অঞ্জলি নিজের কাছেই আজ ছোট হয়ে গেছে।

সমস্ত সন্ধ্যা ও অনুপমের সামনে, অনীতার সামনে অভিনয় করে গেল। যেন ওদের জীবনে কোথাও কিছু ঘটে যায়নি। যেন সব কিছু আগের মতই আছে। কিছু বদলে যায়নি।

অঞ্জলি অকারণে হাসলো, সর্বক্ষণ। অনর্গল কথা বলে গেল।

—ঝুমঝুম, তুই একটা গান শুনিয়ে দে মাসীমাকে। অঞ্জলি হঠাৎ বললে, ওকে ওর বাপী কি যে বানাবে ঠিক নেই! দু'জন প্রফেসর ওকে বাড়িতে পড়ায়, তার ওপর গানের ওস্তাদ এসে...

—মা, তুমি চুপ করো। ঝুমঝুম খাবার টেবিলে মুখ নামিয়ে বললো।

—কেন, চুপ করবো কেন, তোর জন্যেই তো মাসে তিনশো টাকা খরচ। জানো অনিতা, ওর পোশাকআশাকেই...বাপের আদরের মেয়ে যে!

তারপর হঠাৎ বললে, আমরা চলে যাচ্ছি। ওর আপিস থেকে ডাক এসেছে কোলকাতায় ফিরে যাওয়ার।

খাবার টেবিলে একটা দুধ-সাদা ফুটফুটে কভার। মাঝখানে একটা সুন্দর ফুলের ভাস। অঞ্জলি খুব সুন্দর করে ফুলদানী সাজাতে জানে। ওর খুব ফুলের শখ।

—চলে যাচ্ছ? অনুপম প্রশ্ন করলো।—কবে?

অঞ্জলি খুশী খুশী মুখে বললে, বলছি বলছি। সমস্ত শরীর নাচিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—আরেকটু মুর্গী নিন। আপনি তো ভালবাসেন।

আসলে ও ওর শরীরটা দেখাতে চাইলো। অনুপম তাকিয়ে দেখলো, ওর সমস্ত

শরীরের রেখায় রেখায় একটা অপূর্ব খুশীর ছন্দ নেচে বেড়াচ্ছে। বয়েস হয়েছে বলে মনেই হয় না। প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে কি যেন লুব্ধতার হিল্লোল।

চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বসলো অঞ্জলি।—তা হলে সত্যি কথাটা বলি। ওর একটা প্রমোশন হচ্ছে।

অনীতা নিজের স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকালো।—তাই বুঝি?

—ও! অনুপম হাসবার চেষ্টা করলো।

অঞ্জলি খুশী হলো। ও বুঝতে পারলো অনুপম খবরটা শুনে খুশী হতে পারছে না। অঞ্জলি মনে মনে বললো, আমি আপনাকে অহঙ্কারী করে তুলেছিলাম। আমি আপনার অহঙ্কার চূর্ণ করে দেবো।

—অনীতা, তুমি ভাই কিছু খাচ্ছ না। আমাদের এমন একটা আনন্দের দিনে তোমার তো ডবল খাওয়া উচিত। বলে সশব্দে হেসে উঠলো অঞ্জলি, যেন নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে।

অঞ্জলি আবার উঠলো। সমস্ত শরীর, সিফনের শাড়ির আঁচলে বিলিতি সেণ্টের সুগন্ধি ছড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে হাঁসির মত অপূর্ব ছন্দে ও রেডিওগ্রামটার কাছে এগিয়ে গেল। চালিয়ে দিল সেটা। একটা উচ্চরোল বাজনা হচ্ছে তখন রেডিওতে।

'তা হলে সত্যি কথাটাই বলি, ওর একটা প্রমোশন হচ্ছে।'—

কথাটা শুনে প্রায় সায় দেয়ার মত করে রণেনবাবু মৃদু হেসেছিলেন।

শুধু ঝুমঝুম অবাক হয়ে যাচ্ছিল মাকে দেখে। মাকে এমন চেহারায় ও কোনোদিন দেখেনি। মাকে দেখলেই ওর মনে হতো কেমন একটা সুখী পদ্ম, কিছুতেই পাপড়ি মেলছে না। 'মা-টা কিছুই উপভোগ করতে জানে না', ওর এক সহপাঠিনীকে একবার বলেছিল।

কিন্তু অঞ্জলি আজ সারা সন্ধ্যেটা ওদের সামনে অভিনয় করে যাবে। কারণ এতদিন ও যে-আসনে বসে ছিল, সেখান থেকেই ভিখারিণীর মত নেমে আসা যায়, বলা যায়, আপনাকে আমি দেখতে চাই, দেখতে চাই, আপনাকে আমি এখনো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এখন ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে বলেই সোনার সিংহাসনে বসে না-দেখার অভিনয় করতে চায়।

অঞ্জলির ইস্কুলের বন্ধু বীণা একবার এসেছিল দেখা করতে। ওর সচ্ছলতা, ওর সুখের সংসার দেখে বলেছিল, অঞ্জলি, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তুই খুব সুখে আছিস।

বিষণ্ণ হেসে অঞ্জলি উত্তর দিয়েছিল, ভুল, ভুল। আমার এসব সত্যি ভাল লাগে না রে। তুই তো সবই জানতিস, ভালবাসা না থাকলে আর কিছুরই দাম থাকে না।

বীণা হেসেছিল।—আমাদের সকলেরই একটা কিছু আশা থাকে, একটা কিছু পাওয়ার থাকে। তোর তো সব চাওয়াই মিটে গেছে, তুই এখন তাই দুঃখ খুঁজে বেড়াচ্ছিস।

কে জানে, বীণার কাথাটাই ঠিক কিনা। এখন তো ওর মনে সেইসব বেদনার অনুভূতি নেই। এখন সামনে শুধু সমস্যা।

—তুমি বাপু গোমড়া মুখ করে থেকো না, আনন্দ তো তোমারই হবার কথা। অঞ্জলি স্বামীর দিকে সোহাগ-সোহাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে।

রণেনবাবু মৃদু হাসবার চেষ্টা করলেন। উনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছেন,

অঞ্জলি আজ অভিনয় করতেই নেমেছে। যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অভিনয় করে যাবে।

অনুপমের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যের মত লাগছে। অঞ্জলির এমন একটা সুখী চেহারা এই ক'দিনে একবারও দেখতে পায়নি। অঞ্জলি ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে ওর কাছে। দেবীর মত উ'চু বেদীতে বসে ও যেন শুধু প্রার্থনা শুনতে চাইছে।

বুকের ভেতরের ব্যথাটাকে গোপন করে অনুপম হাসতে হাসতে বললে, আরো উপরে উঠে গিয়ে আমাদের যেন ভুলে যেও না; কি ঝুমঝুম, আমাদের মনে থাকবে তো?

অঞ্জলি বুঝলো কথাটা ওরই উদ্দেশে বলা। ঝুমঝুম কিন্তু হাসতেও পারলো না, মুখ নীচু করে রইলো খাবারের দিকে চোখ রেখে।

অঞ্জলি হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, ফিরে গিয়ে তুমি একটা খুব বড় পার্টি দেবে বলেছিলে না? আমি কিন্তু সেদিন দারুণ সাজবো, বলে রাখছি।

অনীতা হেসে উঠলো, অনুপম হেসে উঠলো, ওর ছেলেমানুষি আনন্দ মনে করে।

অঞ্জলি ঝুমঝুমের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠলো, বাঃ রে, হাসছো কেন, ক'টা দিনই বা সাজবো। ঝুমঝুম তো বড় হয়েছে, বিলেত-ফেরত বেশ সুন্দর চেহারার কি যেন বলেছিলে...হ্যাঁ হ্যাঁ, কোভেনেণ্টেড অফিসার...আজকালকার আই এ এস আমার একদম পছন্দ নয়...

ঝুমঝুম মাথা নীচু করে খাচ্ছিল। সব সহ্য করে যাচ্ছিল। অবাক হচ্ছিল। কিন্তু এই কথাগুলো অসহ্য ঠেকলো।

ঝুমঝুম হঠাৎ শব্দ করে চেয়ারটা সরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। রূঢ় গলায় চিৎকার করে বললে, মা, তুমি থামো, তুমি থামো।

অঞ্জলি, অনুপম, অনীতা সবাই চমকে উঠে ওর দিকে তাকালো। দেখলো, ঝুমঝুমের চোখে জল এসে গেছে।

কিন্তু তাকে কিছু বলার আগেই ঝুমঝুম চেয়ার ঠেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সমস্ত ঘরখানা তখন নিস্তব্ধ, যেন থমকে চুপ করে গেছে সব শব্দ।

না, অনেকক্ষণ পরে অনুপম সচেতন হয়ে দেখলো, রেডিওতে খসখসে গলায় একটা ভাঙা রেকর্ডের গান বার বার ঘুরছে। বার বার।

অনুপম বাপ্পার মুখের দিকে তাকালো, তাকিয়ে দেখলো ওর মাথাটা আরো নীচু হয়ে গেছে। দেখলো, সমস্ত মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। বেচারা এতটুকু হয়ে গেছে লজ্জায় অপমানে।

অনুপমের বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা গুমরে উঠলো। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সমবেদনায় ওর বুকের ভেতরটা কে'দে উঠতে চাইলো। মনে মনে বলতে চাইলো, বাপ্পা, তুই মরেছিস। আমি ভাবিনি তুই আমার মতই বোকামি করে বসবি, ভালবাসবি। আমি ভেবেছিলাম তোরা একালের ছেলেমেয়ে, তোরা অন্তত বুকের মধ্যে কাঁটা গে'থে রাখিস না।

অনুপম মনে মনে বললে, অঞ্জলি, একদিন ঠিক ঐ বাপ্পার মতই অপমানে আমার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে তোমার? সেদিন কলেজে তোমাদের একটা ফাংশন ছিল। আমার একজন চেনা মেয়েকে বলেছিলাম তোমাকে ডেকে

দিতে। তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, বলেছিলে, ওকে চলে যেতে বলুন, চলে যেতে বলুন, দেখা করতে চাই না। অঞ্জলি, সেদিন আমার মুখ ঠিক এমনি ছোট হয়ে গিয়েছিল, সেদিন আমার অপমান লুকোবার কোনো জায়গা ছিল না। ঐ চেনা মেয়েটির কাছেই সেদিন আমার সবচেয়ে বেশী লজ্জা। অঞ্জলি, তারপর থেকে কোনোদিনই আমি আর তোমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারিনি। তুমি এখানে এসে সেদিন হেসে হেসে বললে, তুমি নাকি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, বিব্রত বোধ করেছিলে! জানি না, কিন্তু কুড়ি বছর পরে তুমি আমাকে তোমার সর্বস্ব দিয়েও আঠারো-উনিশের একটা অপমানে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মুখের ছবি মুছে দিতে পারোনি। একটা পবিত্র কিশোর মুখ চিরকালের জন্য মুখ নীচু করে থেকেছে, জীবনের আর সব কিছু পেয়েও একটা শূন্যতার মধ্যে হেঁটে বেড়িয়েছে।

অনুপম মনে মনে বললে, বাপ্পা, আমি ভুল ভেবেছিলাম। সব কালের মানুষই বোধ হয় এক। তোরাও আমার মতই। তুই মরেছিস বাপ্পা, আজ আমাদের সামনে তুই মুখ লুকোতে চাইছিস, সারা জীবন তোকে মুখ লুকিয়েই চলতে হবে।

কিন্তু অঞ্জলি যে আজ অভিনয় করতেই নেমেছে। রানীর ভূমিকায় ও অভিনয় করে যাবে।

অঞ্জলি হেসে উঠলো ঝুমঝুমের কাণ্ড দেখে।—মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো, যেন এখুনি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি! বেশ তো, বিলেত যাবি বিলেত যাবি বলিস, বিলেত থেকে ফিরে এসেই হবে...

রণেনবাবু হাসলেন।—ঝুমঝুম ছেলেবেলায় কি বলতো মনে আছে?

অঞ্জলি হেসে উঠলো, বলতো বরের দুটো গাড়ি থাকবে, একটা আমার।

বাপ্পার দম আটকে আসছিল। ও নিঃশব্দে উঠে জলের গ্লাসে হাত ধুয়েই চলে গেল।—আমি যাচ্ছি মাসীমা, বড্ড ঘুম পেয়েছে।

অঞ্জলি লক্ষই করলো না, ও বেসিনে হাত না ধুয়েই চলে গেল।

রণেনবাবু শুধু বললেন, বাপ্পা কিন্তু খুব ভাল ছেলে, ও না থাকলে এ ক'দিন কি বিপদেই না পড়তাম।

অনুপম কোনো কথা বললো না। হাসুকে শুধু বললে, তুইও তো চলে গেলে পারতিস। দাদার সংগে।

হাসু এমনিতেই চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। ও কোনো কথা বললো না।

অনীতার সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অসহ্য লাগছিল। ঝুমঝুমের হঠাৎ চিৎকার করে ওঠা, বাপ্পার চলে যাওয়া, এসবের মধ্যে অনীতা রহস্যের চাবিটা খুঁজে পেয়েছে। ছি ছি, ও যা ভয় পেয়েছিল ঠিক তাই। ও বুঝতে পেরেছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল এক্ষুনি উঠে পড়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাপ্পার গালে কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে। বোকা ছেলে!

—আপনাদের ঠিকানাটা কিন্তু লিখে দেননি রণেনবাবু! ভদ্রতার খাতিরেই অনুপম বললে। কি ভেবে বললে ও নিজেই জানে না।

সংগে সংগে অঞ্জলি বলে উঠলো, বাঃ রে, আমরা তো ফিরে গিয়েই আরো অনেক বড়ো একটা ফ্ল্যাটে উঠে যাবো...বরং আপনাদের ঠিকানাটা রেখে যান...

সারা সন্ধ্যেটা অঞ্জলি অভিনয় করে গেল। রানীর ভূমিকায়।

তারপর এক সময় ওরা সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। অনুপম, অনীতা, হাসু।

ঝুমেঝুম একবারও দেখা করতে এলো না।

রণেনবাবু বললেন, পরশু দিনই চলে যাচ্ছি আমরা। ন'টা পনেরোর ট্রেনে।

ওরা চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আকাশপ্রমাণ শূন্যতা নেমে এলো ঘরখানায়।

শূন্যতা আর হতাশা।

সারা সন্ধ্যার অভিনয় তখন অঞ্জলিকে ব্যঙ্গ করছে। ঘরের দু' প্রান্তে দু'জন। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। কেউ কারো উদ্দেশে একটা কথাও বলতে পারছে না। কেউ কারো চোখের দিকে চোখ তুলতে পারছে না।

বসে থাকতে থাকতে অঞ্জলির ভীষণ কান্না পেল। কেন, ও নিজেই বুঝতে পারলো না। ছোট্ট টেবিলটার ওপর মাথা রেখে সশব্দে ও গুমরে কেঁদে উঠলো।

রণেনবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন।—অঞ্জু লক্ষ্মীটি ওঠো, কাঁদে না। অঞ্জলির মাথায় হাত বোলালেন।

ডুকরে কেঁদে উঠলো অঞ্জলি। এ কী করে ফেললো ও! অনুপমকে ও তো আঘাত দিতে চায়নি। শুধু স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিল এই বিপদের মুহূর্তে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ও একটু নিশ্চয়তা দিতে চেয়েছিল। অনুপমকে স্মৃতির মধ্যেই ধরে রাখতে চেয়েছিল।

এই অনিশ্চয়তা নিশ্চয় কেটে যাবে, বিপদ সরে যাবে. সেদিনের জন্যে ওর ব্যথা, ওর আনন্দের স্মৃতিটুকুও আর রইলো না।

একটা পুঞ্জীভূত বেদনা ওর গলার কাছে আটকে আছে।

ও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জলে-ভেজা দুটি চোখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো, কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলো, তুমি আমাকে বাঁচাও।

রণেনবাবু ওর দু' কাঁধে দুটো হাত রেখে গভীর আবেগের স্বরে বললেন, তুমি তো নিজেই নিজেকে বাঁচিয়ে তুলেছো, অঞ্জু।

১৬

ওদের বাড়ি থেকে ফেরার সময় রাস্তায় বেরিয়েই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লেগেছিল মুখেচোখে। কিন্তু চাদরটা টেনে কান ঢাকা দেওয়ার কথা অনুপমের মনে হয়নি। অন্য দিন হলে অনীতা হয়তো বলতো, ঠাণ্ডা লাগাবে আবার, তোমার কিছু খেয়াল থাকে না। কিন্তু কিছুই বললো না, সারা মুখ তার থমথম করলো শুধু।

নিশ্চুপ নিঃশব্দ চতুর্দিক। শুধু অন্ধকার, অন্ধকার। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় কপার হাউসের আলোটা জ্বলছে শুধু। রোপওয়ের বাকেট চলছে না, ঝিরঝির আওয়াজটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ।

অনুপম আর অনীতা পাশাপাশি হেঁটে এসেছিল। বহুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি। চুপচাপ, চুপচাপ। দু'জনেই কি যেন ভাবছে। কি ভাবছে কেউ জানতো না, কিন্তু ওদের কেমন মনে হচ্ছিল ওরা দু'জনেই একই কথা ভাবছে। মনে হচ্ছিল ওরা পরস্পর ভীষণ কাছাকাছি এসে গেছে।

—কি করলে বলো তো তুমি! অনীতা হঠাৎ কান্না আটকে যাওয়া আর্ত গলায়

বলে উঠলো, তুমি বলেছিলে ওরা অন্যরকম।

অনুপম কি একটা বলতে গেল, বলতে পারলো না। ওর গলার ভেতর কি যেন এসে কথাটা আটকে দিল।

'তোমারই বোকামির জন্যে...তুমি বলেছিলে ওরা অন্যরকম।'

সমস্ত পথ চুপচাপ হেঁটে এসেছিল অনুপম। ওর মনে হচ্ছিল ও একজন ক্রিমিনাল, ও নিজেই অপরাধী। নিষ্পাপ একটা হৃৎপিন্ডের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধিয়ে ফেলেছে ও।

বাড়ি ফিরে এসে বাপ্পার ঘরের সামনে ও থমকে দাঁড়ালো একবার। এতটুকু পায়ের শব্দ করলো না। অনুপমের নিজেরই হৃৎপিন্ড হঠাৎ থেমে গেছে।

আলোটা জ্বালতে সাহস হলো না অনুপমের। একটা চাপা কান্নার মত শব্দ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। কান পেতে শুনলো অনুপম। ওর বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা গুমরে উঠলো। ফিরে তাকালো ও, আর সংগে সংগে অনীতা তার থমথমে মুখখানা ঘুরিয়ে নিল।

অনীতার চোখে জল, অনুপম স্পষ্ট দেখেছে। অনীতার কাছ থেকে অনুপম নিজেই মুখ লুকালো।

মাঝখানে শুধু একটা দিন। মুসাবনি-রাখা-হলুদপুকুরের এই পৃথিবী অনুপমের কাছে কোনোদিন এমন বিস্বাদ লাগেনি। সমস্ত পাহাড় বন আকাশ মাটি বিবর্ণ হয়ে গেছে। কোথাও কোনো রঙ নেই। বাতাসে শুধু তামার গন্ধ। কোথাও কোনো স্নিগ্ধতা নেই।

মাঝখানের একটা দিন ধুলোটে বিবর্ণ পাতার মত শুধু উল্টে গেল অনুপম।

অনীতা একবার বুঝি বলেছিল, বাপ্পা যা, একবার একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয়।

বাপ্পা কোনো উত্তর দেয়নি।

বাপ্পার চোখ শুধু বলতে চাইছিল, আমার যে আর কোথাও যাবার নেই। আমাকে শুধু ফিরে আসতে হবে।

সকাল সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা রাত্রি।

চলে যাবে, চলে যাবে, অঞ্জলিরা চলে যাবে!

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার সংগে সংগে অনুপমের মনে পড়লো, আজ অঞ্জলিরা চলে যাবে।

'অঞ্জলি, কুড়ি বছর আগে প্রতিদিন ঘুম ভাঙার সংগে সংগে ঠিক এমনিভাবে তোমার কথা মনে পড়তো। তোমার মুখ ভেসে উঠতো চোখের সামনে। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। খুট্ করে একটা শব্দ হতো দরজা খোলার। তুমি বইখাতা বুকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে, চোখ তুলে একবার তাকাতে বারান্দার দিকে। সেই চোখের চহনিটুকু আমার সারা দিনের সংগী হয়ে থাকতো।'

'অঞ্জলিরা আজ চলে যাবে', কথাটা বলতে গিয়েও অনুপম উচ্চারণ করতে পারলো না। বাপ্পার কথা মনে পড়ে গেল। অঞ্জলি, ঝুমঝুম, রণেনবাবু শব্দগুলো এখন নিষিদ্ধ জগতের শব্দ। উচ্চারণ করা যায় না। ওগুলো এখন গুলতি থেকে ছিটকে-যাওয়া নুড়িপাথরের মত। একটা সাঁওতাল ছেলে গুলতি করে সেদিন একটা পাখি মেরেছিল, একটা নিষ্পাপ পাখি।

চোখমুখ ধুয়ে এসে কি করবে ভেবে পেল না অনুপম। নিঃশব্দে গিয়ে আবার বাপ্পার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। দু' হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বাপ্পা বিছানার ওপর বসে আছে।

অনুপম জানে, বাপ্পা সারা রাত ঘুমোতে পারেনি।

অনুপম কোনো কথা বললো না। এখন বাপ্পার চোখের দিকে তাকালে কিংবা ছোট্ট একটা কথা বললেই কানায় কানায় জলে ভর্তি ঐ রুপোর বাটি দুটো থেকে সব জলটুকু উপছে পড়বে।

'বাপ্পা, তোর বয়েসটাকে আমি চিনি। তোর বুকের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ডের লাল মুনিয়া পাখিটা ধুকধুক করছে, ওটা আমারই, আমার আঠারো-উনিশের বুকের মধ্যে ছিল। তোরা একটুও বদলে যাসনি, বাপ্পা। তোদের শুধু বাইরের চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। ভিতরে ভিতরে তোর বুকের মধ্যে আঠারো বছরের আমি।'

—বাপ্পা, আমরা চলে যাচ্ছি, তুমি স্টেশনে যাবে তো! আগের বিবর্ণ ম্লান দিনটিতে অনুপমের সারাক্ষণই মনে হয়েছে ঝুমঝুম হয়তো হঠাৎ এসে হাজির হবে। চিৎকার করে ডেকে বলবে, বাপ্পা, আমরা চলে যাচ্ছি, তুমি স্টেশনে যাবে তো ?

কিন্তু না, ঝুমঝুম আসেনি।

অনুপমের কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল বাপ্পাকে ডেকে বলে, তুই একবার স্টেশনে যা বাপ্পা, দেখা করে আয়।

—কি করলে বলো তো তুমি!...তুমি বলেছিলে ওরা অন্যরকম।—

অনীতার কথাটা ওকে কাঁটার মত বিঁধছে বার বার।

'অঞ্জলি, আমার মত তুমিও ভুল করেছিলে। কিংবা আমরা দুজনেই বোধ হয় ওদের মধ্যে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমাদের হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত-গুলোকে ওদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলাম।'

অনুপম নিমেষের জন্যে কি যেন ভাবলো। হয়তো অঞ্জলির কথা, হয়তো ঝুমঝুমের কথা।

চলে যাবে, চলে যাবে। অঞ্জলিরা আজ চলে যাবে।

কুড়ি বছর ধরে শুধু একটা স্মৃতি আঁকড়ে কাটিয়ে দিয়েছে অঞ্জলি। আর অনুপমের জন্যে একটা অন্ধকার শরীরের স্মৃতি দিয়ে গেছে। কয়েকজা দিনের অহংকার দিয়ে গেছে। অনুপমের বাকী জীবনটা সেই অন্ধকারের মুগ্ধতায় রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। অনুপম এখন আর কিছুই চায় না।

চলে যাবে, ন'টা পনেরোর ট্রেনে ওরা চলে যাবে।

ট্রেনটা এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। ট্রেন কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। যে যার স্মৃতির কামরায় যাত্রী তুলে নিয়ে চলতে শুরু করে।

'অঞ্জলি, তুমি ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে গেছ। তোমার ট্রেনে এখন আর কোনো স্মৃতির কামরা নেই। অঞ্জলি, তুমি ঝুমঝুমকে, বাপ্পাকে বুঝতে চাওনি। তুমি ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে গেছ। তুমি ঘরের ভিতর থেকে বারান্দা দেখতে চেয়েছিলে। ওরা বারান্দা থেকে মস্ত বড় আকাশ দেখেছে।

—একবার স্টেশনে যাবো ভাবছি। ওরা আজ চলে যাচ্ছে। অনীতাকে বললে অনুপম। গলাটা খসখসে শোনালো।

অনীতা কোনো কথা বললো না।

আজ আবার একটু শীত পড়েছে। তৈরি হয়ে নিয়ে গরম চাদরটা গায়ে জড়িয়ে

নিলে ও।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো দূরে দূরে টিলার মাথায় কুয়াশা জমেছে। পাহাড়ের ঘন সবুজ শ্যামলিমায় কুয়াশা ভেদ করে সোনালী রোদ্দুর পড়েছে।

এখান থেকে স্টেশন অনেকখানি পথ। অনুপম দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো। ন'টা পনেরোয় ট্রেন, ন'টা পনেরোয়।

আরেকটু এগোলেই নবাব-বাড়ি। পুরোনো দিনের প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে অনেকখানি বাগান। বাগান পার হলেই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে স্টেশন অবধি।

নবাব-বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভিতরের বাগানের দিকে ওর চোখ পড়লো।

আঃ, চোখ জুড়িয়ে গেল অনুপমের। সারা বাগান রক্তগোলাপের বিছানা হয়ে গেছে। লাল গোলাপ, লাল গোলাপ।

মুহূর্তের জন্যে থেমে পড়লো অনুপম।

'আপনি যেবার ডক্টরেট পেলেন, একটা লাল গোলাপের তোড়া পাঠিয়েছিলাম। নাম জানাই নি। শুধু লিখে দিয়েছিলাম—যে আজ সবচেয়ে সুখী তার কাছ থেকে।'

ফটক খুলে বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল অনুপম। একটি একটি করে ক'টা গোলাপ তুলে নিল। বাগানের একটা লতা ছিঁড়ে নিয়ে বড় একটা তোড়া বানালো।

তারপর রক্তগোলাপের তোড়াটা নিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলো। ওর কেবলই ভয় হচ্ছিল, দেরী হয়ে যাবে, দেরী হয়ে যাবে।

দূর থেকেই, নির্জন প্লাটফর্মে ওরা অপেক্ষা করছে, অনুপম দেখতে পেল। রণেনবাবু, অঞ্জলি, ঝুমঝুম। বিপিন টিকিট-ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। মালপত্র রেখে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে দেখতে পেয়ে রণেনবাবু এগিয়ে এলেন; নিঃশব্দে 'উইশ' করার ভঙ্গী করে বললেন, আসছি। টিকিটটা কেটে আসছি।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে অঞ্জলির সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অঞ্জলিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু সেই ক্লান্তির ওপর একটা উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়লো।

ঝুমঝুম ছুটে এলো অনুপমের দিকে। প্রণাম করলো। কিন্তু হাসতে পারলো না।

অনুপম রক্তগোলাপের তোড়াটা ঝুমঝুমের দিকে এগিয়ে দিলে। —বাপ্পা তোমার জন্যে তোড়াটা পাঠিয়ে দিল ঝুমঝুম।

তোড়াটা দু' হাতে বুকের কাছে টেনে নিল ঝুমঝুম। ওর সমস্ত মুখ আনন্দের হাসি হয়ে গেল।—বাপ্পা পাঠিয়েছে? মেসোমশাই, সত্যি?

ও গোলাপের তোড়াটা দু' হাতে বুকের কাছে ধরেছিল, এবার বুক ভরে গোলাপের ঘ্রাণ নিল।

অনুপম কোনো রকমে বললে, ওর বড় অসুখ ঝুমঝুম। আসতে পারলো না।

ঝুমঝুমের সমস্ত মুখ ম্লান হয়ে গেল। করুণ দেখালো ওকে। ও চোখ বুজে আবার সেই গোলাপের ঘ্রাণ নিল।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অনুপম, অঞ্জলির দিকে।

—আপনি এসেছেন? অঞ্জলি বলে উঠলো, আমি ভেবেছিলাম আপনি আসতে পারবেন না।

ঝুমঝুমকে দেওয়া তোড়াটার দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি অনুপমের চোখে চোখ রাখলো। ওর মনে হলো ঝুমঝুমকে দেওয়া তোড়াটা আসলে অঞ্জলিকেই দিয়েছে অনুপম।

কি বলবে অঞ্জলি খুঁজে পাচ্ছিল না। ও হঠাৎ বললে, আপনাকে কিছু একটা দেবো ভেবেছিলাম, কিছুই দেওয়া হলো না।

—তুমি তো দিয়েছো। এই ক'টা দিনের স্মৃতি।

অঞ্জলি করুণভাবে তাকালো অনুপমের দিকে। ওর নিজের স্মৃতিও যে হারিয়ে গেল এখানে, ফেলে রেখে গেল। কুড়ি বছর ধরে আঁকড়ে ধরে রাখা সেই স্মৃতিটুকু এখন হারিয়ে গেছে।

ট্রেনের ঘণ্টি পড়লো। রণেনবাবু টিকিট হাতে করে এগিয়ে এলেন। ট্রেনের ঘণ্টিটা তখনো একটানা বেজে চলেছে। অনুপমের বুকের মধ্যে অঞ্জলির বুকের মধ্যে, ঝুমঝুমের বুকের মধ্যে। অবিরাম বেজে চলেছে।

ট্রেনটা হুড়মুড় করে এসে পড়লো। রণেনবাবু কামরা বেছে নিলেন। বিপিন মালপত্র তুলে দিল। অঞ্জলি আর ঝুমঝুম তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। ট্রেন এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। ট্রেন কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না।

ট্রেন চলে যাচ্ছে। একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। ট্রেনের প্রত্যেকটি জানালায় এক-একটি মুখ। অনুপম কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও শুধু একটি কামরার দিকেই তাকিয়ে আছে, পাশাপাশি দুটি জানালার দিকে। একটিতে অঞ্জলির মুখ, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অঞ্জলি। আরেকটিতে ঝুমঝুম, হাত নাড়ছে।

একটু একটু করে ট্রেনটা দূরে সরে যেতেই দুটি মুখ অস্পষ্ট হতে হতে একটি মুখ হয়ে গেল। ঝুমঝুমের মুখ, সতেরো বছরের মুখ। তারও পরে ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে একটা বিন্দু হয়ে গেল।

ফিরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলো অনুপম। টিকিট-ঘর পার হয়ে, স্টেশনের বাইরে এসে ডিসট্যান্ট সিগন্যালটার দিকে. রেললাইনটার দিকে একবার ফিরে তাকাতে গিয়ে ও থেমে পড়লো।

দূরে যেখানে প্লাটফর্ম শেষ হয়ে গেছে ফণিমনসার ঝোপে, সেদিকে তাকালো। ওর সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

বাপ্পা। বাপ্পা দাঁড়িয়ে আছে, চলে-যাওয়া ট্রেনটার দিকে, দিগন্ত রেখার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পরাজিত সম্রাট

সমস্ত পাড়াটা মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এক বাড়ির জানালা থেকে আরেক বাড়ির জানালায় খবরটা রটে যেতেই উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো সকলের চোখেমুখে। মিনুকে পাওয়া যাচ্ছে না। মিনু, মিনু। সাত বছরের সেই ফুটফুটে মেয়েটা। হাসলে যার দু' সারি ঝিকঝিকে দাঁত দেখা যেত, অমন বড় বড় দুটি চোখ যার হাসিতে বুজে আসতো।

এমন ঘটনার কথা কখনো কখনো খবরের কাগজের পাতায় ছাপার হরফের দূরত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছে। কখনো বা বাসন-মাজার ঝিয়ের মুখের গুজব হয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ মল্লিক রোডের সমস্ত পাড়া তটস্থ হয়ে উঠেছে। মনীষা নিজেও।

আচার্য বাড়ির বড় বউ রান্নার ফাঁকে ফাঁকে হলুদ-ছোপ শাড়ি পরেই বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে গেছে। টুকটুক খেলা করছে কি না, দৃষ্টির নাগালে আছে কি না। পাশের বাড়ির রুমিকে বলেছে, দেখিস টুকটুক যেন কোথাও যায় না।

মনীষা মিনুকে বাড়ির ঠিকানা, রাস্তার নাম মুখস্থ করিয়েছে। সন্ধ্যে হতে না হতে ধমক দিয়েছে, ঘরে আয়। মিনু আছে কি না দেখে আয় তো!—তপন কোথায় গেল! ইস্কুলের বাস সরু গলিটায় ঢুকতে চায় না বলে চাকরটাকে সঙ্গে পাঠিয়েছে বাসে তুলে দিয়ে আসার জন্যে। চারটে বাজতেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে, মিনু কখন ফিরবে!

কিন্তু যত আতঙ্ক আর সাবধানতা দু' দশ দিন। তারপর আপনা থেকেই কখন পাড়ার লোকের মন থেকে ভয়টা সরে গেছে। নেহাৎ চোখের আড়াল হলে তবেই হয়তো খোঁজ পড়েছে।—মিনু, টুকটুক কি তোমাদের বাড়িতে?—রুমি-দের বাড়িতে তপন?

গাড়ি এ-গলিতে কমই ঢোকে, তাই সেদিকে ভয় কম। তবু গাড়ির শব্দ কি হর্ন শুনতে পেলেই কেউ বারান্দায় কেউ জানালায় ছুটে আসে। বারান্দাই নেই অনেক বাড়িতে, ছাদ তো বিলাস। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় খেলা ছাড়া উপায় কি। রাস্তাই খেলার মাঠ। এতকাল লাল কাঁকরের রাস্তা ছিল, পড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়ে যেত বাচ্চাগুলোর। পীচমোড়া হওয়ার পর রাস্তার নাম হয়েছে শিবনাথ মল্লিক রোড। নামেই রোড, আসলে গলি। দুটো লাইটপোস্ট আছে, প্রায়ই তারা আলো জ্বালে না, অন্ধকার মেলে বসে থাকে। তবে পীচ দেওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের সুবিধে হয়েছে। এক্কাদোক্কা খেলার জন্যে খড়ির দাগ ফুটিয়ে ঘর আঁকা যায়। ক্রিকেটের পীচ হয়, ফুটবল গ্রাউন্ড। বল ছুটে এসে কারো জানালার কাঁচ ভাঙে, কারো রান্নার কড়াইয়ে পড়ে। ধমকধামক চিৎকার চেঁচামেচির পর আবার যা-কে তাই। সবাই জেনে গিয়েছে কোলকাতায় বাস করতে গেলে এ-সব সহ্য করতে হবে। উপায় কি, খেলার জায়গা তো চাই।

রাস্তায় খেলতে দিলেও গাড়িঘোড়ার ভয় যায় না। ঘোড়া না থাক, বে-ওয়ারিশ গরু ঢুকে পড়ে মাঝে-মাঝে, শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। গয়লাদের

কান্ড, দুধ দোয়ানোর পর ছেড়ে দিয়ে যায়। তাদেরও বেশী কড়া করে বলবে সাহস কার! হয়তো দুধের রোজ বন্ধ হয়ে যাবে। তবু তো সামনে দুয়ে দিয়ে যায়।

বেশী ভয় অবশ্য গাড়িকে। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু-একখানা ঢোকে বটে এ-গলিতে, কিন্তু দু-একখানা এই সরু গলি দিয়েও এত জোরে বেরিয়ে যায় যে, দেখলে মনে হয় চোরাই মাল নিয়ে পালাচ্ছে।

অ্যাকসিডেন্ট তো লেগেই আছে। অ্যাকসিডেন্টের আতংকটা তাই সকলেরই মনে। রাস্তায় খেলা করতে করতে চাপা না পড়ে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়ার খবর শুনলে তবেই দু-চার দিনের অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা।

কিন্তু সত্যি সত্যি এমন একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে, এ-পাড়াতেই, কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি।

সবাই একে একে শুনলো, পাওয়া যাচ্ছে না, ফুটফুটে সেই মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। একমাথা নরম রেশমের মত কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বড় বড় দুটো চোখ, ফর্সা ধবধবে রঙ—প্রায় মনীষার মতই, খুব ছোট ছিল যখন, আধো আধো ভাষা, তখনো কেমন কুটকুট করে পাকা পাকা কথা বলতো। খবরটা শোনার সংগে সংগে যেন মিনুর মুখখানা স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মিনু হারিয়ে গেছে। এ-খবর বুঝি সতেরো নম্বর শিবনাথ মল্লিক রোডের দুঃসংবাদ নয়। সমস্ত পাড়ার দুঃখ। একটি ছোট্ট মেয়েকে ঘিরে একটি ছোট্ট খবর যেন মুহূর্তে সমস্ত পাড়ার মানুষগুলির মুখের ওপর একটা বিভ্রান্ত শোকের ছায়া ফেলে দিয়ে গেছে। শুধু সেই চাপা কান্নার পাশে একটুকরো ক্ষীণ আশা উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য, মুহূর্তে সমস্ত পাড়াটা যেন পরস্পরের কাছে এসে গেছে। সব দূরত্ব ঘুচে গেছে। পুরনো ঈর্ষা দ্বন্দ্ব রেশারেশির জের মুছে গিয়ে হঠাৎ সকলে এক হয়ে গেছে।

মনীষার উদ্‌ভ্রান্ত সজল চোখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ ত্রিলোচনবাবু সান্ত্বনা দিয়েছেন।—কেঁদো না বউমা, পাওয়া যাবে, ঠিক পাওয়া যাবে। কোথায় আর যাবে!

কিন্তু কোন কথাই কানে যায়নি মনীষার। ও নিজেই নিজের মনকে কি কম আশা দিয়েছে? তবু হতাশায় বিস্ফারিত দুটি চোখের কানায় কানায় জল উপচে পড়া বন্ধ করবে কি করে!

শিবনাথ মল্লিক রোড পুরনো পাড়া। অবশ্য খুব পুরনোও নয়। আড়াই কাঠা তিন কাঠার এক একটা প্লট কিনে রিটায়ার করার পর যাঁরা এখানে বাড়ি করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই মারা গেছেন—এক ত্রিলোচনবাবু ছাড়া। ছেলেদের কেউ কেউ বাড়ি বেচে দিয়ে চলে গেছে। নতুন ভাড়াটে এসেছে অনেক। কিন্তু লাল কাঁকরের কাঁচা রাস্তাটার মধ্যে কি যেন ছিল। যতদিন ছিল, পাড়ার সবাই নিজেদের প্রায় এক পরিবারের লোক ভাবতো। সুখে-দুঃখে ছুটে আসতো। পীচের রাস্তা হয়ে পরস্পরের যাতায়াতের পথটাকেও কালো করে দিয়ে গেছে। মনের অলি-গলি কালো হয়ে গিয়েছিল সেদিন থেকেই।

আজ আবার সেই রাস্তাটাই যেন রক্তাক্ত বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গেছে সকলকে। এর আগে বোধ হয় সমস্ত পাড়া কখনো এভাবে একাত্ম হয়ে ওঠেনি। এক-

জনের উৎকণ্ঠা আর বেদনা সকলের মনে সমান বেজে ওঠেনি।

কোলকাতার কৃত্রিমতার বাতাস কখনো কখনো এ-পাড়ার জানালার পর্দাটুকুই দুলিয়ে দিয়ে গেছে।—জ্যাঠামশাই কেমন আছেন রে আজ? রাত্রে তো দু-বার ডাক্তার এলো দেখলাম। কিংবা হাসিঠাট্টা: ও দিদি, মেজ-জায়ের ছেলে হয়েছে শুনলাম। ছেলে না মেয়ে? তারপরই।—আবার মেয়ে?

আচায্যি বাড়ির বড় বউ রাস্তায় দেখা হলে মনীষার সঙ্গে গল্প করেছেন, তবু নিরুপমদের বাড়িতে কখনো পা ফেলেননি।

কিন্তু—কিন্তু মিনু হারিয়ে গেছে, মিনুকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তিনিও ছুটে এলেন।

না, মনীষা নেই, আবার বেরিয়ে গেছে।

পাওয়া গেছে কিনা জানতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখে নিরুপমের বৃদ্ধ বাপ একটা অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত সাদা ধবধবে উস্কখুস্ক চুল আর উদ্‌ভ্রান্ত চোখ নিয়ে ভারী চটির শব্দ তুলে দোতলা থেকে নেমে এলেন।—পাওয়া গেছে?

আচায্যি বাড়ির বড় বউ অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর প্রশ্নটাই যে নিরুপমের বাবা পাগলের মত তাঁর মুখে ছুঁড়ে দেবেন ভাবতে পারেননি। ভয় হলো, এভাবে ছোটাছুটি করতে গিয়ে রুগ্ণ মানুষটা হয়তো পায়ে পা জড়িয়ে গিয়ে এখনই পড়ে যাবে।

মনীষা আবার কোথায় গেছে, নিরুপমকে আপিসে টেলিফোন করা হয়েছে কি না, প্রশ্ন করতে বাধলো। শুধু চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে ডান দিক থেকে বাঁ দিক, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে মাথা নাড়লেন আচায্যিদের বড় বউ।

মিত্তিরদের মাদ্রাজী ভাড়াটে কল্যাণসুন্দরমের মেয়ে ঘাগরা দুলিয়ে এসে দাঁড়ালো। তার মুখখানাও থমথম করছে। কাপুরের মা ম্লান বিষণ্ণতার মুখে কি সব বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

সমস্ত পাড়াটা যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আছে।

একটু আগে খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকেলের রাস্তা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আতঙ্কিত মা-কাকীমার দল পলকের মধ্যে যে-যার ছেলে-মেয়েকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়েছিল। তাদের সামলে-নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়। যদি একটু আশার কথা শোনা যায়।

তারপর থাকতে পারেনি। নিজেরাই ছুটে এসেছে।

না, মনীষা নেই, নিরুপম নেই। মনীষা আবার বেরিয়ে গেছে। কোথায় কেউ জানে না, কেউ দেখেনি।

সেই চারটের সময় একবার মনীষাদের বাচ্চা চাকরটা বাড়ি বাড়ি খোঁজ করে গেছে, একবার মনীষা নিজেই।

তারপর আর কেউ জানে না, কিছুই জানে না।

মনীষা বাড়িতে বসে থেকেই বা কি করবে? সমস্ত পৃথিবীটা যে এখন তার মাথার ওপর ভেঙে পড়েছে।

মিনু, মিনু, মিনু। দুটি জলে-ভাসা চোখ এখন হয়তো সমস্ত কোলকাতা খুঁজে বেড়াবে। মিনুকে খুঁজে বেড়াবে। মিনু, মিনু, মিনু। পাড়ার বুকেও এই একটু আগে একটা কান্নার ঢেউ হয়ে ওই একটি নামই বেজে গেছে।

আহা! কি সুন্দর ফুটফুটে একখানা কচি মুখ। সকালে সেজেগুজে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে গেল দেখলাম। আমাদের চোখের সামনেই তো একটু একটু করে

বড় হতে দেখলাম, কি বলুন মাসীমা! আহা, ছোট্টটি ছিল যখন, সবাই কাড়াকাড়ি করে বাড়ি নিয়ে যেত। মনে আছে, মিনু আমাদের বাড়ি আসতো, এক মুঠো মুড়ি ছড়িয়ে দিলে কেমন ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো আঙুলে একটা একটা করে মুড়ি তুলে মুখে পুরতো। কি সুন্দর কুটুর কুটুর করে কথা বলতো, না বউদি? আহা!

পাড়ার একটুকরো উজ্জ্বল আনন্দের স্মৃতি আজ হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেছে।

মিনু হারিয়ে গেছে, মিনুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটু আগেও মনীষার মনে কোন উদ্বেগ ছিল না, কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। প্রতিদিনের মতই ধমক দিয়েছে তাড়াতাড়ি স্নান করে নেবার জন্যে, নিজে সামনে বসিয়ে খাইয়েছে মিনুকে, স্কুলের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছে। স্কুলের বাস এসে দাঁড়িয়েছে গলির মোড়ে। তুলে নিয়ে গেছে।

সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মিনু যখন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে গলির মোড়ে গিয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতো, মনীষা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো বারান্দা থেকে। অকারণ ছোটাছুটি করলে, কিংবা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রাস্তার ছেলেদের মার্বেল খেলা দেখলে ধমক দিতো। আর যখন পাড়াপড়শি কেউ যেতে আসতে মিনুর সঙ্গে হেসে হেসে দু-একটা কথা বলতো, চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতো, তখন স্কুল ইউনিফর্মে সাজানো ফুটফুটে ওই মিনুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনীষার বুকের মধ্যে এক ঝলক গর্বিত পুলকের নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে যেত।

আর আজ?

মিনু স্কুলে চলে গেলেই সমস্ত বাড়িটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নিরুপম তো মিনুরও আগে আপিস বেরিয়ে যায়। নিরুপমের বাবা বসে বসে খবরের কাগজের সম্পাদকের নামে চিঠি লিখতে বসেন। বসলে আর উঠতে চান না। অভিজ্ঞতায় জীর্ণ একটি শুভ্রকেশ প্রতিবাদ। বার্ধক্যের দুটি রূপ দেখেছে মনীষা। তার বাবাকে দেখেছে কাশফুলের মত স্নিগ্ধ বিনত। আর নিরুপমের বাবা যেন খেজুর গাছের মত রুক্ষ প্রতিবাদের মূর্তি। সকালের কাগজখানা পড়েই তিনি কোন না কোন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

যাকে কাছে পান তাকেই ডেকে বলেন, কি লিখেছে পড়ে দেখ। এই বুদ্ধি নিয়ে সব মন্ত্রী হয়েছে। একটা 'লেটার টু দি এডিটর' লিখতে হবে দেখছি।

তার পরই কাগজ-কলম নিয়ে বসে যান ত্রিদিববাবু। কাঁপা কাঁপা হাতে প্রবন্ধের মত দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলেন। সারাদিন ধরে সেই চিঠি নিয়ে কাটাকুটি করেন, সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেন, গ্রামার আর ইডিয়ম ঠিক আছে কিনা মিলিয়ে দেখেন। নিজের মনেই বলেন, কি যে ইংরেজী স্টাইল হয়েছে আজকাল!

দিনের পর দিন ওই একখানা চিঠি নিয়েই কাটিয়ে দেন। মনীষা কোন কোনদিন দুপুরে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখেছে, শাশুড়ী ছোট চৌকিটার ওপর কিছু না বিছিয়েই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন, আর বৃদ্ধ শ্বশুর নাকে চশমা এঁটে বারান্দায় বসে চিঠি নকল করছেন।

মনীষাকে দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। বলে বসবেন, শোন বউমা, নিরুপম

তো এসব বোঝে না...

অর্থাৎ নিরুপম কমার্স পড়েছে, হিসেবনিকেশ বোঝে শুধু। মনীষা যখন বি. এ. অবধি পড়েছে কলেজে, তখন সে নিশ্চয়ই নিরুপমের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে। মনীষা অবশ্য বোঝে, সে সব কথায় সায় দেয় বলেই শ্বশুরের কাছে তার এত দাম। আর নিরুপম—সে তো ভয়ে ওদিক মাড়ায় না। আর যখন শুনতে বাধ্য হয় তখনো ভিতরে ভিতরে হাসে।

চিঠি অবশ্য লেখাই হয়, পাঠানো হয় খুব কমই। আর কদাচিৎ দু-একটা ছাপা হয় তো কাগজের ওপরই রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। এত খেটেখুটে লিখলাম, এইটুকু করে দিয়েছে? কি বুঝবে লোকে এটা পড়ে। আসল কথাই তো বাদ গেছে।

সেকথা শুনে আড়াল থেকে নিরুপম আর মনীষা ফিক ফিক করে হাসে।

আবার কোন কোনদিন শ্বশুরের কাজ থাকে না, ঘুম আসে না, তাই তিনটে বাজতে না বাজতে চিৎকার জুড়ে দেন।—বৌমা, মিনু ফিরেছে? ঘুমোচ্ছে নাকি মিনু?

সাড়া দেয় মনীষা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে চটে যায়। নিরুপমের কাছে কখনো অনুযোগ করে, বাবার জন্যে ঘুমোবার উপায় আছে নাকি? দুটোর সময় শুয়েছি একটু, আর আধ ঘন্টা না যেতেই মিনু এসেছে, মিনু এসেছে!

গলার স্বরটা মনীষার প্রায় ভেংচি কাটার মত শোনায়।

নিরুপম আহত বোধ করে, কিন্তু সেটুকু লুকিয়ে স্তোক দেবার চেষ্টা করে।—মিনুর সঙ্গে গল্প করে তবু তো সময় কাটে। কি আর করবেন বলো, মিনু না থাকলে তো শুধু এডিটর আর এডিটর।

মনীষা হেসে বলে, বুড়ো হলে তুমিও অমনি হবে। তোমার হবে অডিটার আর অডিটার!

নিরুপম হাসি দিয়ে কথাটা চাপা দেয়। কারণ, শুধু বুড়ো হলে নয়, এখনো মাঝে মাঝে ও আপিসের গল্প করে বসে।

কিন্তু নিজের ঘুম হয় না, মিনু ইস্কুল থেকে এলে একটু জিরোতে পায় না—এসব অভিযোগ আজ আর নেই। অথচ, আজ যদি একবার মনীষাকে দুপুরে ডাকতেন, যদি জিজ্ঞেস করতেন মিনু এসেছে কিনা—

সংসারের কাজ সেরে প্রতিদিনের মত একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে যে এমন হবে ভাবতে পারেনি মনীষা। ঘুম থেকে উঠে দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছে ও। মিনু আসেনি?

নিশ্চয় মেয়েটা রাস্তায় কিংবা কারো বাড়িতে গিয়ে খেলা করছে। এর আগেও বকুনি দিয়েছে মনীষা, কিন্তু যত বড় হচ্ছে ততই যেন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে।

নিজেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'বার ডাক দিয়েছে—মিনু, মিনু।

পাশের বাড়ির জানালায় বকুকে দেখে জিজ্ঞেস করেছে, মিনু আছে তোমাদের বাড়ি?

ঘুম-ঘুম চোখে বাচ্চা চাকর বিশু উঠে এসেছে। কই না, তাকে তো বই-খাতার ব্যাগটা অন্য দিনের মত রাখতে দিয়ে যায়নি মিনু।

তবে? হঠাৎ একটা উৎকণ্ঠার ছাপ পড়েছে মনীষার চোখে-মুখে। বুকের ভেতরটা দুলে উঠেছে।

যাকে দেখতে পেয়েছে বারান্দা থেকে, তাকেই জিজ্ঞেস করেছে। বিশুকে

পাঠিয়ে দিয়েছে পাশাপাশি বাড়িগুলোয় খোঁজ নিয়ে আসতে।

নিজে ছুটে এসেছে শ্বশুরের ঘরে।—বাবা, মিনুকে দেখেছেন? ইস্কুল থেকে ফিরেছে?

শাশুড়ী রোদ্দুরে দেওয়া আমচুর তুলতে তুলতে ওপাশের বারান্দা থেকে ছুটে এসেছে!—মিনু আসেনি?

না, মিনু নেই। কোনো বাড়িতেই নেই। বিশু ফিরে এসে খবর দিয়েছে।

তবু একটা প্রচণ্ড আশার প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছে মনীষা। বিশু নিশ্চয় ভালভাবে জিজ্ঞেস করেনি, খুঁজে দেখেনি, সব বাড়িতে যায়নি। রঞ্জুদের বাড়ি গিয়েছিলি? তুবলি আর পুটপুটিদের বাড়ি?

নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে মনীষা। চারটে বেজে গেছে অনেকক্ষণ। এত দেরি হবার তো কথা নয়। চোখ ঠেলে বুঝি জল আসতে চায়। একটা হতাশার উত্তর শুনতে হবে এই আশঙ্কায় জিজ্ঞেস করতে গিয়েও গলার স্বর ফোটে না।

না।

মিনু আসেনি।

মনীষার প্রশ্ন শুনে কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কেউ খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে চেয়েছে, কেউ উপদেশ দিতে চেয়েছে কি করা উচিত। ও-সব একটুও কানে যায়নি মনীষার। এমন কি ও যখন হতাশায় ভেঙে পড়া শরীরের ভার টানতে টানতে বাসায় ফিরে এসেছে, বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী পাগলের মত হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসেছেন দরজা অবধি, তাঁদের কথাও তখন ওর কানে যায়নি।

ও শুধু নিজেকেই স্তোক দিতে চেয়েছে।—নাচের স্কুলে চলে যায়নি তো?

আজ বুধবার। কিন্তু, মনীষার হঠাৎ মনে পড়েছে, সকালে রুটিন দেখতে গিয়ে মিনু ভেবেছিল, আজ বৃহস্পতিবার। বিষ্যুৎবারে বিকেলে ওর নাচের ইস্কুল থাকে—তবে কি...

বড় রাস্তা পার হয়েই সামনের গলিতে নাচের ইস্কুল।

মনীষার মাথা ঘুরছে, পা টলছে। বড় রাস্তার ছুটন্ত বাস-ট্রামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে যে ও রাস্তা পার হয়েছে ও নিজেও টের পায়নি।

একটা সামান্য আশার মরীচিকা যেন ওর বিভ্রান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

না। মিনু এখানেও আসেনি।

—ওকি, কাঁদছেন কেন? অন্য একটি বাচ্চার মা এসে ওর হাত ধরেছে—ইস্কুলে টেলিফোন করে খোঁজ নিয়েছেন? বাস খারাপ হয়েছে হয়তো।

কি আশ্চর্য! এ-কথাটা একবারও কেন মনে হয়নি তার। টেলিফোন অবশ্য বাড়িতে নেই। কিন্তু ডাকঘর তো দূরে নয়। সেখান থেকে ফোন করতে পারতো।

সমস্ত উৎকণ্ঠার জ্বর যেন এক নিমেষে ওর শরীর থেকে ঝরে পড়েছে! পরম আশ্বাসে নিশ্চিন্ত মানুষের মত নিঃশ্বাস টেনেছে মনীষা।

কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত কয়েকের জন্যে। রিক্সায় উঠেই দুশ্চিন্তাটা আবার জেঁকে বসেছে মনে।

এক ফাঁকে কি যেন একটা মানত করে বসেছে মনীষা। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কি যেন বিড়বিড় করেছে।

তারপর স্কুলের গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

স্কুলের তিনখানা বাসই তো পর পর দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা বাসগুলোর মত মনীষার বুকের ভেতরেও যেন চাপ চাপ শূন্যতা।

তবু লোহার ফটকের দিকে এগিয়ে গেছে সে, দারোয়ানকে কি যেন জিজ্ঞেস করেছে, দারোয়ান কি উত্তর দিয়েছে—সব ভাল কানে যায়নি।

ও শুধু শুনেছে—মিনু নেই।

ও যখন ফিরে এসেছে বাসায়, পাড়ার কেউ কেউ এসে জড়ো হয়েছে, তারা দেখেছে মনীষার দু' চোখ থেকে উপচে পড়া জল দু' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

বুড়ো শ্বশুর উদ্‌ভ্রান্তের মত তখনো কেবল চটির আওয়াজ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে। একবার এ-ঘর থেকে ও-ঘর, একবার ওপর থেকে নীচে।

এরই ফাঁকে কে একজন বললে, নিরুপমকে টেলিফোন করা হয়েছে।

আরেকজন বললে, আসছেন, ওই তো নিরুপমবাবু আসছেন।

মনীষা ফিরে দাঁড়ালো।

নিরুপমও মুখেচোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এলো।

এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়ালো নিরুপম। মনীষার মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইলো।

যারা জড়ো হয়ে কথা বলাবলি করছিল তারা হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

জলে-ভাসা দু'খানা চোখ তুলে নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মনীষা।

একটাও কথা বলতে পারলো না।

তারপর হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো সেখানেই।

নিরুপমও দেখেও দেখলো না। চারপাশের লোকদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, হাসপাতালগুলো একবার ..

পাড়ার একজন এগিয়ে এলেন।—চলুন আমিও যাচ্ছি।

নিরুপমকে পকেট হাতড়াতে দেখে নিরুপমের বাবা খানকয়েক দশ টাকার নোট নিয়ে ছুটে এলেন, কাঁপা কাঁপা হাতে টাকাগুলো নিরুপমের হাতে দিয়ে বললেন, ট্যাক্সি করে যাস্।

তারপর হঠাৎ পাগলের মত হাউহাউ করে উঠলেন।—আমি? আমি কি করবো? থানায় যাবো?

নিরুপম ততক্ষণে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আর বৃদ্ধ ত্রিদিববাবুর চোখ পড়লো মনীষার দিকে। পাড়ার একটি মেয়ে তার মাথায় জল দিচ্ছে।

—বৌমা? বৌমা অজ্ঞান হয়ে গেছে? বলেই দ্রুতপায়ে টলতে টলতে বাড়ির ভিতর ছুটে গেলেন। হয়তো নিরুপমের মাকে খবর দিতে।

২

দু' সারি মুক্তোর হাসি আকাশের গায়ে ফুটফুটে তারার মত ফুটে ছিল, কালবোশেখীর ঝড় সরে যেতেই চাপা অশ্রুর আকাশ-জোড়া কালো মেঘ থমথমে অন্ধকার নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

একটা নিঃশব্দ অভিশাপ যেন সারা বাড়িটা গ্রাস করে বসেছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন যে খবর পেয়েছে সে-ই ছুটে এসেছে এ-ক'দিন। তারপর এই অসহ্য নীরবতা পিছনে ফেলে রেখে তারা একে একে বিদায় নিয়ে গেছে। এখন সমস্ত বাড়িটা যেন এক প্রাণহীন যন্ত্রের মত হয়ে গেছে। না কি যন্ত্রও প্রাণ হারিয়েছে। হয়তো সেজন্যেই ঘড়ির কাঁটাও থেমে গেছে কখন, দম দেওয়ার কথা কারো মনে হয়নি। আর কি হবে দম দিয়ে—জীবনের ঘড়িই যে থেমে গেছে!

কেউ কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, চোখে চোখ ফেলতে ভয় পায়। এক টুকরো ছোট্ট কথাও বুঝি নিস্তরঙ্গ বেদনার বিশাল দীঘিটার বুকে আলোড়ন জাগিয়ে তুলবে। নিস্তব্ধ বিষাদের তারে কখন অজান্তে আঙুলের স্পর্শ ঘটবে কোন্ কথায়, তারের মূর্ছনা কখন ককিয়ে কেঁদে উঠবে কে বলতে পারে।

কথার ঘরে কুলুপ দেওয়া যায়, কিন্তু স্মৃতির ঘরের কপাট যে খুলে যায় থেকে থেকে।

এক-একদিন স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে মনীষা। নিরুপম স্পষ্ট টের পায়! মাঝরাত্রেই উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায় মনীষা। নিরুপম একটাও কথা বলে না, সান্ত্বনা দেয় না, শুধু ঘুম-ঘুম চোখে মনীষার বালিশের ওপর হাত বাড়িয়ে দেয়, ভিজে-ভিজে কয়েকবিন্দু স্পর্শ ওর চোখ-জোড়াকেও সজল করে তোলে।

ভোর না হতেই উঠে পড়ে নিরুপম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয় মাঝে মাঝে। মিনুর ফুটফুটে সুন্দর মুখের ছোট্ট ছবিখানা কখন মনীষার চোখে পড়ে যায়, সেই ভয়ে পাতাটা লুকিয়ে রাখে।

সেদিনও খুব ভোরে উঠেছে নিরুপম। চটির শব্দে অনেক আগেই টের পেয়েছে, বাবা নীচে নেমে গেছেন। এত ভোর-রাত্রে কি করছেন বাবা? চোখেমুখে জল দিয়ে নিরুপম পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল।

তারপর। সিঁড়ির শেষপ্রান্তে পুরোনো কাগজ, লোহার শিক, কাঠের টুকরো আর ঘুঁটের রাশি পড়ে আছে—ধুলো-চাপা হয়ে পড়ে আছে ভাঙা পেরাম্বুলেটরটা। মিনু যখন খুব ছোট ছিল, ওই পেরাম্বুলেটরে করে রাস্তায় বেড়াতে নিয়ে যেত তুলসী-ঝি। বিকেল হলেই বেড়াতে না নিয়ে গেলে কান্না জুড়ে দিতো মিনু। আর রাস্তায় যখন ওটায় বসে একবার এদিক আর একবার ওদিক বেড়াতো, তখন বোকা-বোকা চোখ মেলে তাকাতো ওপরের দিকে। মনীষা কিংবা নিরুপমের দিকে। কখনো অকারণেই হেসে উঠতো। একটু বড় হয়ে যখন হাঁটতে শিখলো, পেরাম্বুলেটরে মোমের পুতুলটাকে বসিয়ে নিজেই বারান্দায় ঠেলে নিয়ে বেড়াতো। কখনো কখনো ঘরের ভিতরও ঢোকাতো ওটাকে। নিরুপম বিরক্ত হতো, মনীষা রেগে গিয়ে পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিতো। কোলে নিয়ে কান্না ভোলাতে হতো মনীষাকেই।

পা টিপে টিপে নীচে নেমে গিয়ে নিরুপম দেখলে, বাবা কোঁচার খুঁট ঘষে

ঘষে সেই পেরাম্বুলেটরটাকেই পরিষ্কার করছেন।

পা টিপে টিপেই পালিয়ে এলো নিরুপম, আরেকটু হলে হয়তো মনীষাকে বলেই ফেলতো, সমস্ত কান্নাটুকু নিজের বুকেই চেপে রেখে দিলো।

আপিসের ছুটির পর ওই দৃশ্যটাই মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আপিসে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তবু ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ছুটির পর বড় বেশি নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে।

প্রথম প্রথম নানা জন নানান কথা জিগ্যেস করেছে, নানান পরামর্শ দিয়েছে। এখন কেউ আর ওই বেদনার জায়গায় হাত দিতে চায় না। নিরুপমের সামনে তারা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই নিরুপমের। ভিড়ের মধ্যে থেকেও নিজেকে নির্জন মনে হয়। কচ্ছপের মত একটা কঠিন আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত। একটি মাত্র ব্যথার মোড়কে নিজেকে মুড়ে রাখতে পারলেই শান্তি।

কিন্তু ছুটির পরই একটা সময়হীনতার অভিশাপ নেমে আসে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয় না, শুধু ক্লান্ত, ক্লান্ত হতে ইচ্ছে করে। একমাত্র ক্লান্তিই ওকে ঘুম দেয়।

রেড রোডের ধারে ধারে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারপাশে, কিংবা কোন ভিড়ের রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে রাত দশটা বাজিয়ে বাড়ি ফেরে।

সেদিন ছুটির পর একা একা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে এসে একটা বেঞ্চিতে বসলো নিরুপম। উদাসভাবে বসে রইলো। কিন্তু না, বেশিক্ষণ উদাস-ভাবে বসে থাকতে পারে না ও। নিরুদ্দেশভাবে পথ হাঁটতে হাঁটতে কিংবা কোথাও নিঃসঙ্গ একাকীত্বে বসে থাকলেও ওর চোখ-জোড়া যেন আপনা থেকেই কিছু খুঁজে বেড়ায়। যে কোন শিশুর কণ্ঠ শুনলেই চমকে ফিরে তাকায়, যে কোন শিশুকে দেখলেই কাছে এগিয়ে যায়।

বেঞ্চে বসে বসেও ও ফুর্তিতে আনন্দে চঞ্চল একদল শিশুর দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ অদূরে আবছা অন্ধকারে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ক্ষণিকের জন্যে। তারপরই দ্রুতবেগে গাড়িটা রেড রোড ধরে এগিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে একটি ছোট্ট শিশুর মুখ যেন জানালা থেকে উঁকি দিল, হাত নাড়লো।

স্পষ্ট দেখতে পেল না নিরুপম। কিন্তু একটা আশার হাতছানি ওর সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে গেল। আভাসে দেখা একটি হাসি-হাসি মুখ, একটি ছোট্ট হাতের হাতছানি—নিরুপমের মুখের ওপর কেউ যেন হালকা হাতে ময়ূর-পেখমের পাখা বুলিয়ে দিয়ে গেল।

মিনু, মিনু। কোন কোনদিন নিরুপমের ঘুমন্ত মুখের ওপর চার বছরের মিনু যখন তার ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুলের হাতখানা বুলিয়ে তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতো, নিরুপম জেগে উঠতো।

সচকিত বিস্ময়ে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল নিরুপম। ছোট্ট শিশুর মুখটির সঙ্গে মিনুর মুখের মিল দেখতে পেয়েছিল বলেই হয়তো। হয়তো তা নয়, হয়তো অকারণ কৌতুকে হাতছানি দিয়েছে মেয়েটি, কিংবা অন্য কাউকে, তবু নিরুপমের মনে হলো মিনুকেই দেখেছে ও।

চলন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলো নিরুপম। গাড়িটা রেড রোড হয়ে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে গঙ্গার দিকেই হয়তো গেল।

বুকের ভিতরটা তখন হুহু করে উঠেছে। ওই ছুটন্ত গাড়িটার পিছনে

পিছনে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুধু একবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃসন্দেহ হতে চায় নিরুপম।

ও জানে সব বৃথা। মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটছে ও, এর আগেও তো কতবার কতজনকে মিনু বলে ভুল করেছে, ছুটে গেছে, তারপর ফিরে এসেছে এক-বুক হতাশা নিয়ে।

তবু ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল নিরুপম। গঙ্গার অচেনা কোন জেটীর দিকে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ফোর্ট উইলিয়ামের দিকটা অন্ধকারে ডুবে গেছে। অন্ধকার পীচের রাস্তাটার মাঝে মাঝে ম্লান আলোর প্রতিবিম্ব রেখায়িত হয়ে আছে। যেন একটা ডোরাকাটা অতিকায় সাপ নির্জীব পড়ে আছে অন্ধকারে।

সুতীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি আসছে, পার হয়ে যাচ্ছে, কোনোটা হয়তো বা জেটীর ধারের অলস রেললাইনের ধার ঘেঁষে থামছে।

হাঁটতে হাঁটতে সেই গাড়িখানা, সেই হাতছানির মুখখানা খুঁজে বের করার বৃথা চেষ্টা করলো নিরুপম। ওর মন বলছে, সে গাড়ি এখানে এসেই থেমেছে।

নিজের অজান্তেই কখন গঙ্গার দিকে তাকিয়েছে নিরুপম। গঙ্গার বুকে কয়েকখানা জাহাজ সিলুটের ছবির মত আবছা দেখা যাচ্ছে। এখানে-সেখানে আলো। অসংখ্য আলোর তারা ফুটে আছে। টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছে কয়েকটা নৌকোয়। একটা মোটরলঞ্চ এগিয়ে আসছে বিচিত্র হুইসল দিতে দিতে।

জেটীর সামনে এসে দাঁড়ালো নিরুপম। সুবেশ সৌন্দর্য নিয়ে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গের পুরুষের সঙ্গে স্নিগ্ধ আলাপের ফাঁকে ফাঁকে হেসে উঠছে। কেউ বা জেটীতে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু এসবের দিকে চোখ নেই নিরুপমের। সবুজ ফ্রক-পরা একটি মেয়ের দিকে ওর চোখ গেল, তা থেকে হলুদরঙা ফ্রকের দিকে। আরো, আরো অনেকের দিকে। ধীরে ধীরে কখন যেন ও নিজেও জেটীর শীর্ণ পথ ধরে নীচে নেমে এসেছে। যেখানে একটি জাহাজ লেগে রয়েছে জেটীর গায়ে।

কৌতূহলী তরুণীর দল জাহাজের গোল গোল জানালায় চোখ রেখে অজানা রহস্যের সন্ধান করছে। কেউ বা নোঙরের ভারী মোটা শিকলটা তুলতে পারে কিনা পরখ করে দেখছে!

সবুজ ফ্রকের বাচ্চা মেয়েটা চেষ্টা করে শিকলের একটা প্রান্তও নড়াতে পারলো না। শুধু হেসে উঠে বললো, বাব্বা, হরধনুর চেয়েও ভারী।

যারা জানালায় উঁকি দিচ্ছিল তারাও হেসে উঠে ফিরে তাকালো।

আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো নিরুপম।

নিরুপমের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই এক পলকের জন্যে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে সময় নিলো। গাড়ির কাচের ওপর এক পশলা বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জল জমে থাকলে যেমন ওপারের মানুষকে স্পষ্ট দেখা যায় না, সুমিতা আর নিরুপম ঠিক তেমনিভাবে পরস্পরকে দেখতে গেল।

বাচ্চা মেয়েটার কথা শুনে সুমিতার মুখে যে হাসিটা দুলে উঠেছিল, নিরুপমকে চিনতে পেরেই সেটা মুহূর্তে নিভে গেল।

নিরুপমই হয়তো কথা বলতো, কিন্তু তার আগেই নিরুপমের ম্লান হয়ে যাওয়া মুখখানা যেন দু'জনের মাঝখানে একটা স্বচ্ছ কাচের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলো।

কথা বলার জন্যে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আসতে গিয়েও অস্বস্তি বোধ করলো সুমিতা। আঘাত পেল। ভেবেছিল, যদি কোনদিন দেখা হয় নিরুপম আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠবে। কিন্তু...

—চিনতে পারছো? অস্বস্তি চাপা দেওয়ার জন্যে হাসলো সুমিতা।

নিরুপম ঘাড় নাড়লো।

সুমিতা এক-পা এক-পা করে সরে এলো, পিছনে পিছনে নিরুপম।

নিরুপম লক্ষ করলো, সঙ্গের মেয়েটি জেটীর অন্য ধারে সরে গেছে।

সুমিতার কোন বন্ধু কিংবা আত্মীয়া হয়তো।

নিরুপম হয়তো অকারণেই সুমিতার রক্তাক্ত সিঁথির দিকে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি বোধ করলো সুমিতা।

তাই হঠাৎ অপ্রতিভের মত হেসে উঠলো।

—বউদি কেমন হলো, দেখতেই তো পেলাম না।

নিরুপম শুধু বললে, যেও একদিন।

—ছেলেমেয়ে? ক'টি? সুমিতা ঠোঁট টিপে হেসে প্রশ্ন করলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের চোখের কোণে চাপা অশ্রু চিকচিক করে উঠলো। দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালো ওর কথাটা—একটিও না।

সুমিতা বিস্ময়ের চোখে তাকালো নিরুপমের দিকে। তারপর হেসে উঠে বললে, তবু ভাল।

পরক্ষণেই বুঝলো কথাটা বলা উচিত হয়নি।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, তুমি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছ।

নিরুপম উত্তর দিলো না, শুধু মাথা নাড়লো ধীরে ধীরে।

সুমিতা আশা করলো, নিরুপম বলবে, তুমি আরো সুন্দর হয়েছো সুমিতা। কিংবা, আগে অনেক সুন্দর ছিলে!

সুমিতা আশা করলো, খুঁটিনাটি আরো অনেক প্রশ্ন করবে নিরুপম।

না। নিরুপমের মন যেন অন্য কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে কি সুমিতা একেবারেই মুছে গেছে নিরুপমের জীবন থেকে?

—চাঁপামাটিতে বেশ ছিলাম। তাই না? হাসবার চেষ্টা করলো সুমিতা।

নিরুপম শুধু ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ। যেন নেহাৎ বাধ্য হয়ে কথার জবাব দিতে হচ্ছে ওকে। অথচ কয়েকটা দিন আগে, মিনু হারিয়ে যাওয়ার আগে এমন ভাবে হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যেত সুমিতার সঙ্গে. .

দু'জনে পাশাপাশি জেটী ছেড়ে ওপরে উঠে এলো। পুরনো দিনের দু-চারটে কথা হলো। কিন্তু কেউ কাছাকাছি আসতে পারলো না। মনে হলো পরস্পর থেকে ওরা বহু দূরে সরে গেছে।

এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সুমিতা। চলি আজ।

সুমিতা পিছন ফিরে তাকালো, ইশারায় ডাকলো বান্ধবীকে। তারপর তারা দু'জনেই একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল।

ঘাড় বেঁকিয়ে গাড়িতে বসতে বসতে সুমিতা আবার বললে, চলি।

তারপর ট্যাক্সিটা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

নিরুপম স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। কিন্তু সুমিতা আজ যেন শুধুই একটি অচেনা মানুষ। মনের মধ্যে সেই অসীম শূন্যতা। মিনু, মিনু। মিনু যেন ওর জীবনের প্রতীক। একটি বিন্দুতে এসে থামতে পেরেছিল নিরুপম।

শান্তি খুঁজে পেয়েছিল, পেয়েছিল আনন্দ। সেখান থেকে ও যেন হঠাৎ সরে গেছে। আকুল আগ্রহে সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে চাইছে। সাত বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে নয়। পায়ের তলার ভিত নড়ে গেছে। সেই স্থিতি, সেই চার দেয়ালের ছোট্ট ঘরখানাকে খুঁজে পেতে চাইছে নিরুপম—সেই আত্মস্থ পরিপূর্ণতা ফিরে পেতে চাইছে। মিনুর মত একটি ছোট্ট বিন্দুতেই যে ও সব কিছু ফিরে পেয়েছিল।

সুমিতা এলো, সুমিতা চলে গেল। কিন্তু কই, নিরুপমের মনের ওপর কোন ছায়া পড়লো না।

ঘোর ঘোর ভাবনা কাটতেই হঠাৎ নিরুপমের মনে পড়লো, ওরা কেউ কারো ঠিকানা জিগ্যেস করেনি।

নিরুপম সুমিতাকে বলেছে, যেও একদিন। তবু ঠিকানা জানতে চায়নি সুমিতা।

হয়তো হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা নতুন করে জানাতে চায় না সুমিতা। কিন্তু নিরুপমের ঠিকানাটাও কি জানতে চায় না সে?

৩

মানুষটাই যখন হারিয়ে গেছে, ঠিকানা জেনে কি লাভ হতো সুমিতার।

দু'জনে দু'জনের কাছে এসেও দূরে সরে রইলো। অপরের চশমা চোখে দিয়ে তাকানোর মত পরস্পর পরস্পরকে দেখলো শুধু। আবছা চেহারাটাই চোখে পড়লো তাদের, কেউ কারো কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইলো না।

এমন একটা অস্বস্তির মুহূর্তে নিরুপমের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারেনি সুমিতা। অথচ এমন একটা দিনের জন্যে মনে মনে একসময় কত আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নই না গড়েছে।

কিন্তু নিরুপম যে এভাবে ওকে অবহেলা করবে কে জানতো। সব মূল্যে হারিয়েও স্মৃতির পটে নিজেকে একজনের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান করে গড়ে তুলেছিল সুমিতা। আজ হঠাৎ মনে হলো, সেটুকুও বুঝি হারিয়ে গেছে।

মা'র কাছ থেকেও অনেক দূরে সরে গেছে সুমিতা। তাই মাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। নেহাৎ প্রয়োজন হলে তবেই দু-একটা কথা বলে। মা তবু ফুরসত পেলেই কাছে এসে দাঁড়ায়, হেসে কথা বলে দূরত্ব সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর বাড়িতে যতক্ষণ থাকে একা একা নিঃসঙ্গ থাকতে ভালবাসে সুমিতা। বড়জোর ছোটভাই বাচ্চুর সঙ্গে গল্প করে। বাবা বাড়ি থাকলে বাবার কাছে গিয়েও কোন কোনদিন বসে। কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে, ছোট বোনটির সঙ্গে একটু বসে গল্প করতে গেলেই কেন জানি মা কাছে এসে দাঁড়ায়। মনে হয় মা যেন চায় না, ও ছোট বোনটির সঙ্গে গল্প করে। মাকে ও তাই যেন সহ্য করতে পারে না।

আজ তবু মা'র কাছে কথাটা না বলে পারলো না।

মা দরজা খুলে দিতে দু-পা এগিয়েই ফিরে দাঁড়ালো ও। হেসে উঠে বললে, মা, আজ হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—কে রে? মেয়েকে বহুদিন এভাবে যেচে কথা বলতে দেখেননি বলেই হয়তো

খুশী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সুমিতার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গলার স্বর কৃত্রিম শোনালো। —টোটনদার সঙ্গে।

—কে? আনন্দময়ী হয়তো ঠিক চিনতে পারলেন না।

সুমিতা হাসলো আবার।—টোটনদা, নিরুপম; ভুলে গেছ? চাঁপামাটির...

মা'র মুখে হাসি ফুটলো।—ও মা, তাই নাকি? আসতে বললি? কোথায় থাকে?

সুমিতার পিছনে পিছনে আনন্দময়ী ঘরে ঢুকলেন বাইরের দরজায় খিল দিয়ে এসে।

কাপড় ছাড়তে ছাড়তে, শাড়িটা ভাঁজ করে বিছানার তলায় রেখে দিলো সুমিতা। কাপড়টা ওখানে রাখলে দিব্যি ইস্ত্রি হয়ে যায়।

মা তখনো উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সুমিতা ধীরে ধীরে বললে, টোটনদা একদম বদলে গেছে মা।

—তা তো যাবেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনন্দময়ী আবার বললেন, কতদিন হলো, ভাব না!

অভিযোগের স্বরে সুমিতা বললে, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বললো না।

—কথা বললো না? আনন্দময়ী আশ্চর্য হলেন।

সুমিতা হাসলো।—বললে, কিন্তু কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে।

এবার আনন্দময়ী নিজেও যেন অপমানিত বোধ করলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের সঙ্গে কেই বা কথা বলতে চায় বল!

হঠাৎ এবার দপ্ করে দু'চোখ জ্বলে উঠলো সুমিতার। মা'র দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইলো ও।

মা হয়তো বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেলেন। চৌকাঠের ওপার থেকে বললেন, খাবি আয়।

সুমিতার মাথার ভিতরটা তখনো ঝিমঝিম করছে। মা'র কথাটা সত্যি হতেও পারে সে-কথা ভেবে নিরুপমের ব্যবহার ওর কাছে আরো তীব্র উপেক্ষা বলে মনে হলো।

—খাবি আয়। মা আবার ডাকলেন।

সুমিতা উত্তর দিলো, খাবো না। খেয়ে এসেছি আমি।

মা আর কোন কথা বললেন না।

তবু ভাল, কোথায় দেখা হলো, কে সঙ্গে ছিল সুমিতার, মা জানতে চায়নি। আজকাল কিছুই জানতে চান না আনন্দময়ী। কিন্তু সুমিতা নিজেই হয়তো বলে ফেলতো।

মমতা সঙ্গে ছিল এ-কথাটা চেপে যেতে হতো তা হ'লে। মমতার নাম শুনলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে মা; সুমিতা জানে।

ঘরের মধ্যে বিশ্রী গরম। এতটুকু হাওয়া নেই। সারা বিকেল পশ্চিমের রোদ পায় ঘরখানা, তাই মাঝরাত অবধি গরম হয়ে থাকে। আর কি মশা। সারাক্ষণ চটাস চটাস করতে হয়।

এই অসুখী ঘরখানা, এই শীর্ণ গলি, এই দারিদ্র্যের হাওয়া থেকে মুক্তি পেতে

চায় সুমিতা।

চাঁপামাটির দিনগুলো মনে পড়ে থেকে থেকে। আজ মনে পড়লো।

কাশীবাবু তখনো এমনি পাগল ছিলেন। পাগল হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বটে, কিন্তু ছোট শহর চাঁপামাটির লোকজনদের কাছেই নয়, কাছাকাছি আরো দু-চার জায়গার লোকও তাঁকে চিনতো, শ্রদ্ধা করতো। বেশ মোটাসোটা চেহারা ছিল কাশীবাবুর, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটতেন। একটা খবরের কাগজের মাঝ-খানটা গোল করে কেটে মাথায় গলিয়ে নিয়ে খালি গায়ে সেটাকেই ফতুয়ার মত পরে নাপিতের সামনে বসে চুল ছাঁটতেন। নিজেই বলে দিতেন কোন দিকে কতটা চুল থাকবে। তারপর যখন উঠে আসতেন সারা মাথাটা বুরুশের মত মনে হতো।

ছোটবেলায় নিরুপমকে ধরে জোর করে একবার নাপিতের কাছে ওইভাবে চুল কাটিয়ে দিয়েছিলেন। নিরুপম নয়, টোটন বলেই চিনতো ওরা। সুমিতার মনে আছে, টোটনদার কি কান্না। আর তা দেখে ও হেসে লুটিয়ে পড়েছিল। খুব রেগে গিয়েছিল টোটনদা, বাবার ওপর যত না, তার চেয়ে সুমিতার ওপর বেশী।

চুল বড়ো রাখা কাশীবাবু পছন্দ করতেন না। তাই প্রায়ই বলতেন, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটবে টোটন, তা নইলে মাথা সাফ থাকবে না।

নিরুপমের বাবা মা ওকে খোকা বলে ডাকতেন, মামারা টোটন বলতো। তা থেকে কাশীবাবুও ওকে টোটন বলে ডাকতেন।

মাথা সাফ রাখার জন্যে তার মাথাটাই যে কাশীবাবু সাফ করে দেবেন সে-বেচারী বুঝতে পারেনি। তখন কতই বা বয়েস নিরুপমের। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়েছিল, আর সুমিতার মা কাশীবাবুকে খুব বকাবকি করেছিলেন। বলেছিলেন, পরের ছেলের ওপর ওসব সর্দারি করা তোমার কি দরকার। নিজে ভেলকি সেজে থাকো সেই ভালো।

কাশীবাবু চোখ কপালে তুলেছিলেন।—পরের ছেলে? টোটন আবার পরের ছেলে কি!

সুমিতার মা হেসে ফেলেছিলেন। ও-মানুষকে কি বোঝাবেন তিনি!

ছোট একটা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আপিসে কাজ করতেন কাশীবাবু। কিন্তু আপিস-টাকে তাঁর গলাবন্ধ সাদা কোটটির মতই খুলে রেখে দিতেন সকাল-সন্ধ্যে। হাত-কাটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে খুরপি হাতে নিয়ে বাগানে ফুলের চারা বসাতেন, মাটি ঢিলে করে দিতেন, ঝাঁঝরি দিয়ে জল দিতেন।

সুমিতা কোন্ বাড়িতে কি একটা বিলেতী ফুল দেখে এসে বসাতে চেয়েছিল একবার।

কাশীবাবু ঘাড় নেড়েছিল।—উঁহু ওসব নয় মা। দিশী ফুলই কম আছে? জবা বসাও, কলকে বসাও, সন্ধ্যামণি আছে, আর চাঁপা, জুঁই, বেল...

দিশী ফুলের গাছ বসানোর তাঁর নেশা ছিল বটে, কিন্তু পাগল হয়ে উঠতেন অন্য একটি ব্যাপারে। পাগল হিসেবে নামও ছড়িয়ে পড়েছিল সেজন্যেই।

কালির ব্যবসা। নিজের হাতে ঘরে বসে অবসর সময়ে কালি তৈরি করতেন। তাই আড়ালে ছেলেরা নাম দিয়েছিল মসীবাবু।

হৃষ্টপুষ্ট চেহারার খাটো মানুষটি, লংক্লথের ফতুয়া গায়ে দিয়ে হাতে একটা বেঁটে লাঠি নিয়ে যখন ছুটির দিনে রাস্তায় বেরোতেন, কিংবা থলি হাতে বাজারে, তখন অনেকে ঠাট্টা করে বলতো, মসীবাবু যাচ্ছেন। কিন্তু কাশীবাবুকে মসীবাবু

বলার সাহস তাঁর কানের নাগালের বাইরেই থাকতো।

নিজের হাতে এ-ও-তা মিশিয়ে লেখার কালি বানাতেন, ছোট ছোট শিশিতে বোতলে পুরে লেবেল লাগিয়ে দিতেন। লেবেল ছাপানোর কথা কোনদিন ভাবেননি, আপিসের টাইপরাইটারে লেবেল টাইপ করে এনে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন।

নিরুপমের বাবা ত্রিদিববাবু ছিলেন হাইস্কুলের হেডমাস্টার। তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি কাশীবাবুকে উৎসাহ দিতেন।

আর উৎসাহ পেয়ে অনর্গল কথা বলে যেতেন কাশীবাবু।—জানেন মাষ্টার-মশাই, বছরে কত টাকা বিলেতে চলে যায়, শুধু এই কালির জন্যে!

বলেই সুমিতাকে ডাক পাড়তেন।—সুমি, সুমি! ফাইলটা দিয়ে যা তো মা।

কালি সম্পর্কে যেখানে যা-কিছু ছাপা হতো কেটে রাখতেন কাশীবাবু। আর তা থেকে সঠিক হিসেবটা খুঁজে-পেতে ত্রিদিববাবুকে না শুনিয়ে শান্তি পেতেন না।

স্কুলের জন্যে কিছু কিছু কালি কিনতেন ত্রিদিববাবু, কিন্তু কেউ সে কালি ব্যবহার করতো কি না সন্দেহ।

সুমিকেও খুব ভালবাসতেন ত্রিদিববাবু। মাথায় হাত দিয়ে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করতেন।—ভালো করে পড়াশুনো করছো তো মা? বিদ্যাই সব, আর কোন কিছুর দাম নেই, বুঝলে!

সুমির কিন্তু পড়াশুনোর দিকে তেমন মন ছিল না, ছিল শুধু সাজগোজের দিকে।

কাশীবাবু সবুজ কালির জন্যে গুঁড়ো গুঁড়ো কি একটা বানাতেন সবুজ রঙের. সুমিতা চুরি করে তার টিপ পরতো। মোটা লালপাড় কি নীলপাড় শাড়ির বেশী কিছু দিতে পারতেন না কাশীবাবু, কিন্তু নিরুপমের মেজদি. ছোটবোন বাণী কিংবা অন্য কোন পড়শির কাছ থেকে ভালো শাড়ি চেয়ে এনে পরতো সুমিতা—বিয়েবাড়িতে যেতে হলে।

কাশীবাবু রাগ করতেন, ছি ছি মা, গরিবের ঘরে জন্মেছিস বলে কি ভিক্ষে করতে হবে?

আনন্দময়ী বাপ-মেয়ে দু'জনের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে কটূক্তি করতেন।—ভাত জোটে না বাপের রোজগারে, মেয়ের আবার সৌখীন সাজা চাই!

কাশীবাবু রাগ করতেন, সুমিতার মা রাগ করতেন, কিন্তু মেয়ে শুনতো না। একটু কড়া কথা বললেই চোখে জল এসে যেত তার।

আবার তার কান্না থামাবার জন্যে এমন সব কাণ্ড করে বসতেন কাশীবাবু যে না হেসে পারতো না সুমিতা। মা'র কাছে অনুযোগ করতো, বাবা কি বলো তো, আমি কি ছোট্ট খুকী নাকি?

কাশীবাবুর অবশ্য সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কবিরাজী ওষুধের বড়ির মত দেখতে ছোট ছোট কালির বড়ি যেদিন তৈরি করতে পারলেন, সেদিন কি আনন্দ তাঁর। যেন পৃথিবীতে এ-কাজ কেউ কোনদিন পারেনি।

রাস্তায় ইস্কুলের ছেলেমেয়ে কাউকে দেখলেই ধরে নিয়ে আসেন।—একটা বড়ি আধ পেয়ালা জলে ফুটিয়ে নিয়ে লিখবে. কেমন হয়েছে বলে যেও কিন্তু।

কে আর বলতে আসবে, রেহাই পেলে বাঁচে তখন তারা। কোনরকমে ছুটে পালাতো, তারপর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতো, বড়িগুলো নিয়ে মার্বেল খেলতো।

সে জন্যে লজ্জাও কম পেত না সুমিতা। কিন্তু বাবাকে একদিন নিষেধ করে

দেখেছে, বাবা মাথা হেঁট করে গুম হয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় বলেছে, না, একটা ট্যাবলেট তৈরীর ছোট্ট মেশিন না কিনলে ঠিক হবে না।

নিরুপম কিন্তু কোনদিন হাসাহাসি করতো না। এমন কি খাতা এনে এক একদিন দেখিয়ে যেতো কাশীবাবুকে।—এবারের কালিটায় কি চমৎকার লেখা হয়েছে দেখুন কাকাবাবু।

নিরুপম এলেই তাই গল্প জুড়ে দিতেন কাশীবাবু।

বলতেন, আরে লেখাপড়া তো সাহেবদের শিখিয়েছি আমরা। ভূর্জপত্র, কালি, কলম সব তো ভারতবর্ষের দান, আর এখন কিনা সাহেবরা কালি বেচে টাকা নিয়ে যায় এদেশ থেকে?

বলেই ডাক দিতেন সুমিতাকে।—সুমি, সুমি!

সুমি কাছেই থাকতো। এগিয়ে এসে হাসিহাসি মুখে দাঁড়াতো।

—সেই বাঁধানো বইটা দিয়ে যা তো মা।

খুঁজে খুঁজে একটা পাতা বের করে পড়ে শোনাতেন কাশীবাবু—দেখলে তো, সব আমাদের ভারতবর্ষের দান।

কথায় কথায় সুমিকে ডাকা সুমিতার মা তখন পছন্দ করতেন না। ছোটবেলায় দুটিতে খুব বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু সুমি তখন বড় হয়েছে।

শাশুড়ির দেখাদেখি, নিজেও কি করে যেন খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেমেয়েদের মেলামেশা দেখলে শিউরে উঠতেন। চাঁপামাটির দু'জাতের দুটি ছেলেমেয়ে একবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। খবর শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, কড়া দৃষ্টি দিতে শুরু করেছিলেন মেয়ের দিকে। ভাবতেন, ভালবেসে বিয়ে করার মত নোংরামি আর আছে নাকি।

তাই নিরুপম চলে গেলেই বলতেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি হলে না? অত বড় মেয়েটাকে কথায় কথায় ডাকো কেন!

কাশীবাবু বোকার মত চোখ করে তাকাতেন স্ত্রীর মুখের দিকে। মেয়ে বড় হয়েছে বলে তাকে ডাকতে পাবেন না? তাঁরই তো মেয়ে!

স্ত্রী হাসতে গিয়েও হাসি চাপতেন। বলতেন, টোটন বড় হয়েছে, ওর সামনে বারবার ডাকা কেন। তোমাদের কথাবার্তার মধ্যে ওকে নিয়ে যাওয়া কেন।

কাশীবাবু হঠাৎ বলতেন, ঠিক বলেছো, ডাকা উচিত নয়। ডাকবো না।

কিন্তু পরের দিনই সে-কথা ভুলে যেতেন।

সুমিতার মা কিন্তু সব কিছুর মধ্যেও চোখ রাখতেন মেয়ের ওপর। কারো সঙ্গে মিশতে দিতেন না, একা একা কোথাও বড় একটা যেতে দিতেন না। মেয়ে রাগ করলে বলতেন, তোর ভালোর জন্যেই বলছি।

তোর ভালোর জন্যেই বলছি। ভালো, ভালো, ভালো। নিজের ভালো চায় না সুমিতা, ভালো মেয়ে হতে চায় না। মা'র সব বাধানিষেধের বিরুদ্ধে ও তখন ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠতো।

টোটনদা বাঘ না ভালুক, যে তার সামনে গেলেই খেয়ে ফেলবে।

তবু মা'র বকুনি খেয়ে টোটনদার ওপরই রেগে গিয়েছিল একদিন। কাশীবাবুর কাছ থেকে এক শিশি কালি নিয়ে সবে বেরিয়েছে, একেবারে সুমিতার সামনাসামনি।

সুমিতা ঠাট্টা করে বলেছিল, একগালের জন্যে ব্যবস্থা তো হলো, অন্য গালের?

হেসে উঠে নিজেই বলেছিল, মা চুণটুকুরও ব্যবস্থা করছে। তারপর অনুযোগের স্বরে বলেছিল, তোমার আর কি, চুণকালি আমার মুখেই পড়বে।

নিরুপম বুঝতে পারেনি। শুধু বিস্ময়ের চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

তারপর মা কলঘর থেকে বেরিয়েছে কিনা দেখে এসে সুমিতা অভিযোগের স্বরে বলেছিল, তুমি রোজ রোজ আসো কেন বলো তো?

সত্যি, নিরুপম কি বোকাই না ছিল। ভয় না লজ্জা, কে জানে, তারপর বহুদিন আর এ-মুখো হয়নি। সে-কথা ভাবলে সুমিতার আজও হাসি পায়।

কাশীবাবু কিছু বুঝতে না পেরে নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন, তুমি নিশ্চয় কিছু বলেছো ওকে।

—আমি? সুমিতার মা চোখ কপালে তুলেছিলেন।

সুমিতার এত ইচ্ছে হয়েছিল, টোটনদাকে বলে, ওকে সত্যিই আসতে বারণ করেনি ও। বলে, ও না আসায় সুমিতা নিজেই কষ্ট পেয়েছে।

না, ঘুম আসছে না সুমিতার। বিছানায় পড়ে পড়ে কেবল নিরুপমের কথা মনে পড়ছে।

এভাবে আজ নিরুপমের সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল। তবু কল্পনার মানুষটিকে নিয়ে সুখী হতে পারতো।

মনের মধ্যে এতদিন একটা গভীর অনুশোচনা পুষে এসেছে সুমিতা। নিরুপমকে একদিন দুঃখ দিয়ে এসেছে বলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। কোথায় আছে নিরুপম, কেমন আছে, কতবার জানতে ইচ্ছে হয়েছে। ভয় পেয়েছে কখনো কখনো, সুমিতার জন্যে নিরুপমের জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়নি তো!

বিয়ের দিনে বাণী এক সময় কানে কানে বলেছিল, এমন কেন করলি সুমি!

যেন সব দোষটাই সুমিতার। নিরুপমের কিছুই করার নেই। সে কি এসে বাবাকে বলতে পারতো না, জোর করে সুমিতাকে নিয়ে যেতে পারতো না।

বাণী ফিসফিস করে বলেছিল, তুই বিশ্বাস করবি না সুমি, দাদা যেন কেমন হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে ভয় পেয়েছিল সুমিতা। নিজের দুঃখের চেয়েও নিরুপমের দুঃখটা বড় মনে হয়েছিল।

টুকরো টুকরো সব কথা মনে পড়ছে সুমিতার। আর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে। এতদিন কত কি স্বপ্ন দেখে এসেছে সে। আজ সব স্বপ্ন যেন ভেঙে দিয়ে গেছে নিরুপম।

ট্রেনের কামরায় পরিচয় হলেও মানুষ হয়তো এর চেয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। অথচ সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে এতটুকু সাড়া জাগেনি নিরুপমের মনে। তার কাছে যেন সুমিতা শুধুই একটি চেনা মুখ। বেশী কিছু নয়। মমতার কাছেও তাই স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি সুমিতা। অপমানে অবহেলায় ও তখন এতটুকু হয়ে গেছে।

ট্যাক্সিতে উঠেই মমতা হেসে উঠেছিল।—কে ভাই উনি? চোখের ভুরুতে একটু কৌতুক ছিল মমতার।

মমতার কাছে তো কোন কিছুই গোপন নেই সুমিতার। সব, সব জানে মমতা। দিনে দিনে মনের কপাট খুলে দিয়েছে তার কাছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাঁপামাটির সমস্ত খবর শুনেছে মমতা, নিরুপমের বর্ণনা, কেমনভাবে কথা বলতো সে, কি বলতো। লাজুক ছিল কি না।

ঔৎসুক্য জেগেছে।—ভদ্রলোককে একবার দেখতে ইচ্ছে হয় এত।

সুমিতা হেসেছে।—সে ইচ্ছে তো আমারও হয়।

আশ্চর্য। ট্যাক্সিতে উঠেই মমতা জিগ্যেস করলো, কে ভাই উনি? ঈষৎ অর্থপূর্ণ বিদ্রূপও ছিল ওর কথায়।

কিন্তু নিরুপমের নামটা মুখে আনতে পারলো না সুমিতা। উপেক্ষা দিয়ে তাকে এভাবে যে অতখানি তুচ্ছ করে দিয়ে গেছে তার পরিচয় মমতাকে জানাবে কি করে ও।

সুমিতা শুধু বলেছে, কেউ নয়, চিনতাম। বলতে গিয়েও বুকের মধ্যে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করেছে ও।

আলো জেবলে বিছানা থেকে উঠে পড়লো সুমিতা। ঘুম আসছে না, ঘুম আসবে না।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিজের ট্রাঙ্কটা খুললো সুমিতা। একেবারে সব কিছুর নীচে হাত বাড়িয়েই মনে পড়লো। না, রুপোর ব্রোচটা আজ আর নেই। মনে ছিল না।

এই ব্রোচটা নিয়ে একদিন শ্রীনাথের সঙ্গে কি ঝগড়াই না করেছিল। স্বামী। ভাবলেও হাসি পায়। শ্রীনাথের সব মূল্য, সব অধিকার সেদিন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল যার জন্যে, সে নিজেই আজ সুমিতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে গেছে।

অথচ, যেদিন চাঁপামাটি ছেড়ে কোলকাতার কলেজে পড়তে এলো নিরুপম, সমস্ত জীবনটা সেদিন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বোবা হয়ে গিয়েছিল সুমিতা।

নিরুপমকে নির্জনে দু'একটা কথা বলতে চেয়েছিল সুমিতা। সুযোগ পায়নি।

কাশীবাবু তখন উপদেশ দিচ্ছেন, না না, টোটন, কমার্স পড়ে লাভ নেই। সায়েন্স পড়ো, কেমিস্ট্রিতে অনার্স নাও। কেমিস্ট্রি—চমৎকার সাবজেক্ট।

নিরুপম নরম সুরে বলেছে, বাবা বলেন...

সুমিতা হেসে ফেলেছে কাশীবাবুর কথায়।

—হাসছিস কেন মা। কেমিস্ট্রি চমৎকার সাবজেক্ট ; এটা ওটা মিশিয়ে দিলি, অমনি নতুন জিনিস হয়ে গেল। আমারই পড়তে ইচ্ছে হয়।

নিরুপম ওসব কিছুই শোনেনি। ও শুধু আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে সুমিতা মাথা হেঁট করে সিমেণ্টের মেঝের ওপর পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষছে।

বাবাকে মাকে প্রণাম করে নিরুপম চলে গিয়েছিল সেদিন, আর সুমিতার সমস্ত মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। নির্জনে একটি মাত্র কথা বলতে চেয়েছিল সুমিতা, বলার সুযোগ পায়নি।

ভেবেছিল আর বুঝি দেখা হবে না।

পরের দিন ভোর বেলায় খিড়কির দরজায় এসে অপেক্ষা করেছিল। এই পথ দিয়েই তো টোটনদাকে স্টেশনে যেতে হবে।

একটু পরেই দেখতে পেয়েছিল রিক্সায় সতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানা আর একটা স্যুটকেশ নিয়ে টোটনদা আসছে। আর ছাতা হাতে রিক্সার পাশে পাশে হেঁটে চলেছেন ত্রিদিববাবু।

মা কি ভাববে, মা কি বলবে এ-সব কথা মনে আসেনি। ও ছুটে এসেছিল রাস্তায়। ত্রিদিববাবু ওর সজল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেও চোখ মুছে-ছিলেন। ছেলেকে কাছছাড়া হতে দেননি কখনো, এবার তাই বিচ্ছেদের ব্যথাটা বেশী করে লাগছে।

সুমিতার মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলেছিলেন ত্রিদিববাবু। তারপর এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আর নিরুপম চলন্ত রিক্সায় বসে ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল সুমিতার দিকে। দু'জনের চোখের দৃষ্টি না-বলা কথায় মুখর হয়ে উঠেছিল। নিঃশব্দে দুটি মন বুঝি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

৪

মনীষার দিকে তাকাতে ভয় হয় নিরুপমের। কখন চোখে পড়ে গিয়ে অঘটন ঘটে যায় এই ভয়।

সুমিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা মনীষাকে বলতে পেলেও যেন শান্তি পেত নিরুপম। তবু বলতে পারলো না।

মনীষার দিকে চোখ তুলে কথা বলতেও অস্বস্তি।

সমস্ত সংসার যন্ত্রের মত চলছে। জনশূন্য বাড়ির দেয়ালে ঘড়িটা যেমন আপন মনেই দিন কয়েক টিকটিক করে চলতে থাকে, অথচ কেউ তার কাঁটার দিকে চোখ তুলে তাকায় না, তেমনি।

নেহাৎ প্রয়োজনে দু'একটা কথা হয়, তাও অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে। নিরুপমের সঙ্গে মনীষার একবার একটা মান-অভিমানের পালা চলেছিল দিনকয়েক। প্রথম প্রথম কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতো না, রাত্রে দু'জনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়তো। কিন্তু তখন পরস্পরের মনে একটা জিদ ছিল, দু'জনের মনেই বিশ্বাস ছিল দু'দিনেই পুরনো সম্পর্ক ফিরে আসবে। এখন কোন আশা নেই, বিশ্বাস নেই। দুঃসহ দুঃখ মানুষকে এক করে দেয়, মিনু ওদের দু'জনকেই বুঝি পৃথক করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু মিনু যেন সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে একটা গোপন ক্ষতের মত লুকিয়ে আছে। জ্বালার মত।

সব সময়েই তাই সতর্ক আর সন্ত্রস্ত। মনীষার চোখের সামনে থেকে মিনুর স্মৃতি সরিয়ে রাখতেও ব্যস্ত। নিজের ব্যথা বেদনা যেন কিছুই নয়। ভয় মনীষাকে। কোন একটা সামান্য জিনিস, একটা ভাঙা পুতুল কিংবা পুরানো জুতো চোখে পড়লেই সেটা তার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ও।

দিনে দিনে মনীষা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কোটরে ঢোকা চোখের চার পাশে কাজলের টানে কে যেন দুটি শূন্য এঁকে দিয়েছে। বুকের ভিতরের শূন্যতাই যেন।

কিন্তু মনের ওপর তো হাত নেই কারো।

সেদিন আপিসে বেরোনোর সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ নিজেরই অজান্তে নিরুপম চিৎকার করে উঠলো।—মিনু, চশমাটা ফেলে এসেছি, দিয়ে যাও তো।

কথাটা বলে ফেলেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো নিরুপমের। মনে হলো সমস্ত বাড়িখানা যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল ওই একটি ডাক শুনে।

ত্রিদিববাবুর ভারী চটির শব্দ ভেসে আসছিল, হঠাৎ থেমে গেল। হয়তো চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

কলঘরে কাপড় কাচছিল মনীষা, ওর হাত থেমে গেল।

নিরুপমের মা এককোণে বসে গীতা পড়ছিলেন সুর করে, হঠাৎ চশমা খুলে দেয়ালের দিকেই মুখ করে বসে রইলেন।

অস্বস্তিতে, অসহ্য বেদনায় স্থাণুর মত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো নিরুপম। নিজেই ছুটতে ছুটতে এসে চশমাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়েই বেরিয়ে গেল।

তারপর থেকে অনেক সাবধান হয়ে গেছে নিরুপম।

সপ্তাহে সে একবার করে থানায় খবর নিতে যায়, অনুনয়-বিনয় করে আসে, কিন্তু সে-কথা এখন আর মনীষাকে বলে না।

প্রথম প্রথম মনীষা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো, নিজেও যেতে চাইতো নিরুপমের সঙ্গে।

ও-সি অবিনাশবাবু আশা দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন।—কাজ থেমে নেই নিরুপম-বাবু, সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

কখনো দু'চারটে ছবি দেখাতেন বাচ্চা মেয়েদের। বলতেন, এদের পাওয়া গেছে।

মনীষার উদ্বেগের চোখ সে-কথায় ক্ষীণ আশা দেখতে পেত। এখন আর ও নিজেই যেতে চায় না।

নিরুপমও অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসে কোন নতুন খবর শোনায় না মনীষাকে। কি হবে তার দুঃখ বাড়িয়ে।

শুধু মিনুর কথাই নয়, কোন কথাই বলে না।

তাই সুমিতার সঙ্গে এতকাল বাদে দেখা হওয়ার কথাও বললো না। কিংবা মনেই ছিল না। অথচ বিয়ের পরে কোন এক মুগ্ধ মুহূর্তে তার কথা মনীষাকে আভাসে একবার বলেছিল নিরুপম।

সকৌতুক প্রশ্নে সুমিতার কথা কখনো কখনো জানতে চেয়েছে মনীষা, দেখতে চেয়েছে তাকে।

সুমিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তে সে-সবের কিছুই মনে পড়লো না। গ্রীষ্মের খররৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে এক নিমেষের জন্যে এক টুকরো ছায়া অনুভব করার মতই সুমিতা ক্ষণিকের স্নিগ্ধতা এঁকেই মিলিয়ে গেল।

স্নিগ্ধ ছায়ার স্মৃতিটুকু পড়ে রইলো শুধু। আর মিনু একটা বিশাল বটের ছায়ার মত ছিল। এখন নিরুপম নিজেই এক নিষ্পত্র রিক্ত গাছের মত খাঁ খাঁ করছে।

আপিসে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তবু ভুলে থাকা যায়, কিন্তু ভুলে থাকতে না পারলে কাজের দীঘিতে ডুব দেওয়া যায় না।

নিরুপম বেশ বুঝতে পারে সহকর্মীরা ওকে যেন সহানুভূতির চোখে দেখে, সমব্যথীর দৃষ্টিতে! আড্ডায় আলোচনায় কখনো কখনো মিনুর প্রসঙ্গ ওঠে—নিরুপমের অনুপস্থিতিতে। একদিনের আলোচনা বড় নির্মমভাবে ওর কানে এসে-ছিল।

চায়ের দোকানটিতে দুপুরের চা খেতে গেছে নিরুপম, চুপচাপ একটি আধো-অন্ধকার নির্জন কোণ বেছে নিয়ে বসে আছে। একটু পরে অদূরে জ্ঞানবাবুর দল এসে বসলো।

নিরুপমকে তারা কেউ হয়তো লক্ষ করেনি। মিনুর প্রসঙ্গে কখন আলোচনা মোড় নিলো।—পুলিস চেষ্টা করলে কি আর খুঁজে বের করতে পারে না। কে একজন বললো।

আরেকজন পুলিসের বিরুদ্ধে একটা অশিষ্ট মন্তব্য করলো।—ব্যাটাদের কথা আর বলবেন না। প্রথম যেদিন থানায় খবর দিতে গেল, পাক্কা দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল কিছু না শুনে।

—একজন তো ডায়েরীর খাতা টেনে নিয়ে বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়েছিল, হারাবার আগে সাবধান হন না কেন!

নিরুপমের কানে যাচ্ছিল কথাগুলো, ওর কাছে অসহ্য লাগছিল, অথচ উঠে যাবারও উপায় নেই। তাহ'লেই ওদের চোখ পড়বে, অস্বস্তি বোধ করবে ওরা।

তবু উঠে না গিয়েও শান্তি নেই। উঠবে কিনা ভাবছিল নিরুপম, দুম করে অরুণ বক্সী বলে বসলো, আহা ফুটফুটে মেয়েটাকে শেষে হয়তো ওই খারাপ পাড়ায় সারা জীবন...

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। সমস্ত মাথাটা, সারা শরীর টলছে। দু'চোখ বুজে একটা শারীরিক যন্ত্রণার তীব্রতাকে সহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করতে হয় যেভাবে তেমনি ভাবেই চোখ বুজে দু'হাতের ফাঁকে মাথা রেখে বসে রইলো নিরুপম!

ওর নিজেরও যে কখনোসখনো এমন আতঙ্ক হয়নি তা নয়। ও-সি অবিনাশবাবু দু'একটা মেয়েকে সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু এমন একটা আশঙ্কা মনের আড়ালে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে ও।

নিজের কানে এমন একটা আশঙ্কার কথা শোনার পর নিরুপমের সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো।

আপিসের ছুটির পর প্রচন্ড একটা শূন্যতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিল নিরুপম।

পিছন থেকে একখানা হাত এসে পড়লো কাঁধের ওপর।

—শোনো নিরুপম! কাঁধের ওপর জ্ঞানবাবুর হাতের সস্নেহ আবেগের চাপ অনুভব করলো ও।

মাথা জুড়ে টাক, হাফ-হাতা সার্ট, মুখে পানের ছোপে কালো হয়ে যাওয়া দাঁত —প্রৌঢ় জ্ঞানবাবু। তবু এই মানুষটির বিষণ্ণ হাসির মধ্যে কোথায় যেন অন্তরঙ্গতার সুর আছে।

জ্ঞানবাবু ধীরে ধীরে বললেন, এভাবে নিজেকে পুড়িয়ে খাঁক করে লাভ কি নিরুপম। বরং আমাদের সঙ্গে চলো...

—কোথায়? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো নিরুপম।

—আমাদের ক্লাবের রিহার্সালে।...না না, অভিনয় করতে বলছি না, শুধু বসে থাকবে, দেখবে। নাটকের নেশা আমাদের অনেকেরই নেই নিরুপম, আমরাও অনেক কিছু ভুলে থাকতে চাই।

জ্ঞানবাবু একটু থেমে বললেন, জানি ভুলে থাকবার মত দুঃখ তোমার নয়, তবু যদি...

নিরুপমের গলার স্বর সমবেদনার স্পর্শ পেয়ে গাঢ় হয়ে এলো। বললে, আমাকে মাপ করবেন জ্ঞানদা।

বলেই হাতটা কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হনহন করে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল নিরুপম।

ভগবানকে ডাকলো মনে মনে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধা মা'র মত ইদানীং অনেক কিছুতেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে নিরুপম। গোপনে গোপনে ঠিকুজী কোষ্ঠী বানিয়ে গণৎকারের কাছে অসহায়ের মত বসে থেকেছে। মনীষার হাতে

মানতের টাকা তুলে দিয়েছে। আরো কত কি।

এককালে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তার কাছেই কখন হার মেনে বসেছে ও। ভগবানের নাম স্মরণ করেছে গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর। মিনুকে ফিরে পাবার প্রার্থনা জানিয়েছে।

কিন্তু আজ সহকর্মীদের চায়ের দোকানের আলোচনা ওর মনের চারপাশকে যেন একটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষের ব্যস্ততার মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজেকে নিঃসঙ্গ করে নিয়ে নিরুপম ভগবানকে ডাকলো। মিনুকে কি সত্যিই আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না? প্রার্থনা করলো, ভগবান, তা হ'লে, মিনুর যেন মৃত্যু হয়।

মৃত্যু!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিরুপমের অনুশোচনা জাগলো মিনুর মৃত্যু কামনা করার জন্যে।

নিরুপম অনুভবে বুঝতে পারলো মনীষা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে শুয়ে আছে, মনীষার চোখেও ঘুম নেই।

এক একদিন ওর ইচ্ছে হয়েছে মনীষার নির্ঘুম শরীরের ওপর ওর অবশ হাতের ভার নামিয়ে দেয়। একটু সান্ত্বনা দেয়, সান্ত্বনা পায়। কিন্তু পারেনি। এত কাছে শুয়েও ওরা যেন পরস্পর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কোন যোগ নেই, সম্পর্ক নেই। ট্রেনের কামরার অপরিচিত দুটি যাত্রীর মত কাছাকাছি শুয়ে আছে শুধু।

অথচ বিয়ের পর এত দূরে থেকেও পরস্পরকে কত কাছের মানুষ মনে হতো। দুটি অপরিচিত যাত্রী রাতারাতি আপন হয়ে উঠেছিল সেদিন।

বাড়িতে তখন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। একে একে অনেকেই চলে গেছে, শুধু ঘনিষ্ঠ কয়েকজন রয়ে গেছে। আর সকলেরই যেন একটি মাত্র মানুষকে প্রয়োজন—মনীষাকে। তার পায়ে পায়ে চলে শিশুর দল, সে বসে থাকলে তারা গালে হাত দিয়ে তার মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে। বড়রা ঘিরে বসে। বাড়িশুদ্ধ লোক যেন একদল শিশু—সুন্দর একটা মোমের পুতুল পেয়ে খেলায় মেতেছে। কেউ সাজায়, কেউ সকৌতুক সাজা দেয়।

বৃদ্ধ ত্রিদিববাবুর মুখে বৌমা আর বৌমা। তিন তিনটি মেয়ের পর একটিমাত্র ছেলে নিরুপম। সমস্ত আশা ভরসা আনন্দ তাকে ঘিরে। যেমনভাবে তাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, নিরুপম তো সেইভাবেই গড়ে উঠেছে। মনীষাকে নিয়ে বাকী স্বপ্নটুকুও সার্থক করতে চেয়েছিলেন।

হেডমাস্টার ছিলেন চাঁপামাটি ইস্কুলের। সামান্য সঞ্চয় থেকে তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তাও বোধহয় তাদের শিক্ষিত করতে পেরেছিলেন বলেই।

তারপর চোখের সামনে দেখতে পেলেন, মানুষ বদলে যাচ্ছে, সমাজ বদলে যাচ্ছে, আদর্শ বদলে যাচ্ছে। শুধু টাকা টাকা।

তাঁর দাপটে ইস্কুলের ছেলেরা স্বাধীনতার জন্যেও কোনদিন ধর্মঘট করতে সাহস পায়নি। বলতেন, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ, রাজনীতির সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক!

বলতেন, সর্বনাশ হবে, নেতারা সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

তার জন্যে অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে কর্মজীবনের শেষে। হয়েছে বলেই

হয়তো ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে মূর্তিমান প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। একটা কণ্টকিত বাবলা গাছের মত।

—খোকা, আমি যা বলেছিলাম, এই দেখে যাও।

নিরুপমকে ছোটবেলার মতই 'খোকা' বলে ডাকতেন। খবরের কাগজটা মেলে ধরে বলতেন, এই দেখো, লীডাররা এখন আমার কথাই বলছেন, ইস্কুল কলেজে স্ট্রাইক হওয়া উচিত নয়। এতদিনে বুঝলেন সব...

শুধু বলেই ক্ষান্ত হতেন না, কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেতেন। লিখতে হবে...

নিরুপম মনে মনে হাসতো, সায় দিতো ঘাড় নেড়ে, কখনো কখনো বিরক্ত হতো।

বিয়ের পর নিরুপম হঠাৎ লক্ষ করলো তার আর ডাক পড়ে না—বৌমা, বৌমা!

নিজের মেয়েদের শিক্ষিত করেছিলেন, শিক্ষিত মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। তাই সব যুক্তি তার সঙ্গে।

নিরুপম ঠাট্টা করে বলতো, টাইপ করাটা শিখে নাও এবার, সেক্রেটারির চাকরিটা পাকা হয়ে যাবে।

আর মনীষা যখন বুঝতে পারতো নিরুপম অধৈর্য হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে, তখন তাকে চটাবার জন্যেই বলে বসতো, চিঠিটা আপনি ডিকটেশন দিন না বাবা, আমি লিখে নিই।

বলে দরজার ওপারে অপাঙ্গ দৃষ্টির কৌতুক ছুঁড়ে দিতো।

কিন্তু ডাক তো শুধু একজনের নয়।

নিরুপমের মা ডাক দিতেন।—বৌমাকে ছেড়ে দাও একবার, ছুঁচে সুতোটা পরিয়ে দিয়ে যাবে, চোখে কি আর দেখতে পাই ছাই।

নিরুপমের বড়দি পুজোর ঘর থেকে ডাক দিতো, শাঁখটা বাজিয়ে দিয়ে যা না ভাই।

নিরুপমের মেজদি বলে বসতো, শাঁখ বাজিয়ে দিয়েই এসো মনীষা, আমাদের সঙ্গে তো একটু গল্পগুজবও করতে পাচ্ছো না।

মনীষার ছোট ননদ বায়না ধরতো, একটা শাড়ি কিনবো, চলো না বৌদি পছন্দ করে দেবে।

এক ফাঁকে দু'চার মিনিট সময় করে নিয়ে নিরুপমের কাছে এসে হাজির হতো মনীষা, দুষ্টুমির হাসি হাসতো নিরুপমের রাগ দেখে।

বলতো, কি করি বল তো। সতী তবু মরার পর বাহান্ন টুকরো হয়েছিল, আমি বেঁচে থাকতেই।

নিরুপম বুঝতে চাইতো না, ভাবতো মনীষা ইচ্ছা করেই আসতে চায় না। যদি বা দু'চার মিনিটের ফুরসত পেতো মনীষা, বাচ্চাগুলো ঝুমঝুম নূপুরের মত পায়ে পায়ে লেগে থাকতো।

নিরুপায় হয়ে একদিন কি একটা গোপন কথা ইংরাজীতে বলেছিল নিরুপম। যাতে বাচ্চাগুলো না বুঝতে পারে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে মনীষা লজ্জার মাথা খেয়ে একটি মাত্র কথা বলে ছিল ইংরেজীতে।—হোয়াই ?

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে রটে গেল নিরুপম আর মনীষা নাকি ইংরেজিতে কথা বলে।

বাচ্চা মেয়েগুলো তারপর থেকে বলতে শুরু করলে, মেম মামীমা।

বড় ননদ চোখ পাকিয়ে বললে, দেখিস বাপু আমাদের সঙ্গে ইংরিজী বলিস না, বুঝতে পারবো না।

কি লজ্জা, কি লজ্জা।

বৃদ্ধ ত্রিদিববাবুর কাছেও খবরটা এলো।—দাদু, মামীমা ইংরিজী বলে মামার সঙ্গে।

শুনে নিরুপমের মা ধমক দিলেন বাচ্চাটাকে।

কিন্তু ত্রিদিববাবু বাঁধানো দাঁতের হাসি হেসে বললেন, ভালো, খুব ভালো। ইংরেজী বলা অভ্যাস করা ভালো, কখন কি কাজে লাগে...বলেই হাঁক দিলেন, বৌমা, বৌমা!

—কি হচ্ছে কি? স্ত্রী তাঁর চোখের ওপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেললেন না, যেন ঝামা ঘষে দিলেন।

এমনি ভাবেই সেই মুগ্ধস্বপ্নের দিনগুলি কেটে গেল। একে একে সকলেই প্রায় বিদায় নিলো। সকলেরই সংসার আছে, দায়দায়িত্ব আছে। ননদাইরা এসেছে নিজের নিজের মানুষটিকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

যাবার সময় বলে গেছে, জুড়ি বেঁধে এনেছিলাম, জোড়ে বিদেয় নিচ্ছি। তোরা নয় বেশ আছিস দুটিতে, আমাদেরও তো ইচ্ছে হয়।

কেউ বলেছে, পাপ বিদেয় হচ্ছে দেখে কি ফুর্তি বাবা!

বলেই মনীষাকে জড়িয়ে ধরেছে।—ছি ছি কাঁদছিস কেন, আবার তো আসবো।

সত্যি, এরা ঘর জুড়ে ছিল বলে ইচ্ছে থাকলেও নিরুপমের কাছে বড় একটা আসতে পারেনি মনীষা। রাত বারোটা বাজিয়ে তবে আড্ডার আসর থেকে উঠতে দিয়েছে ননদরা। মাঝে মাঝে তাই নির্জনতা চেয়েছে মনীষা। কিন্তু বাড়ী ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বিদায়ের ক্ষণে তাই চোখ ভরে জল এসেছে। সানাই থেমে যাওয়ার পর ভাঙা রোশনচৌকির নিস্তব্ধতার মত ফাঁকা ফাঁকা।

আর সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা হয়ে গেছে তার মন।

শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বসেছে।—মোচাটা কুটে দেবো মা!

—না, না, হাতে দাগ লাগবে।

সব কাজ থেকে মনীষাকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। আর মনীষার সদাসর্বদা মনে হয়েছে ও যেন এ-বাড়ির মানুষ না, অতিথি এসেছে।

মনীষার ইচ্ছে হয়েছে ও নিজে রান্না করে খাওয়াবে নিরুপমকে। মুখ ফুটে বলতে পারেনি। শুধু বলেছে, মাছটা আমি ভেজে নেবো মা?

—না, না, বউমা, পরের ঘরের মেয়ে এনে হাতটা পুড়তে দিই আর কি। তোমার বাবা আমাকে দুষবে শেষে!

কোন কাজেই হাত বাড়াতে পারেনি মনীষা। ভিতরে ভিতরে তাই শাশুড়ীর ওপর একটু অসন্তুষ্ট না হয়ে পারেনি। তবু মুখে হাসিটুকু বজায় রেখেছে।

তখন তো এমনভাবে সংসার ছেড়ে দেননি।

আপিস যাওয়ার আগে নিজেই তিনি নিরুপমের কোট-প্যান্ট বের করে দিয়েছেন। বিকেলের ছুটির পর নিরুপম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে।

মা ডেকেছেন।—হাত-মুখ ধুয়েছিস খোকা? আয় খাবি আয়।

নিজের সামনে বসিয়ে খেতে দিয়েছেন নিরুপমকে। মেঝের ওপর হাঁটুগেড়ে বসে খাবার খেয়েছে নিরুপম, মা বঁটিতে পেঁপে কেটে দিয়েছেন।

মনীষা আড়ালে আড়ালে থেকেছে, উসখুশ করেছে।

সেদিন তাই শাশুড়ীর ওপর মনীষা খুব খুশী হয়ে উঠেছিল, যেদিন ওকে

ডেকে বললেন, বউমা, খোকাকে জলখাবার দিয়ে এসো। নীলের উপোস করে আমি আর পারছি না আজ।

তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরে বিশেষ কোন লাভ ছিল না, তবু না ফিরেও পারতো না নিরুপম।

কাছাকাছি আসতে পেতো না, নির্জনে বসে দু'দণ্ড কথা বলতে পেতো না। তবু নিশ্চিত বিশ্রামের মত মনে হতো। এই একই বাড়িতে, একই ছাদের তলায় মনীষা আছে, ওই তো পর্দার আড়ালে ওর আঁচল চমকে গেল, বাবার সঙ্গে কি কথা হচ্ছে মনীষার—নিরুপম শুনতে পাচ্ছে, ওর চুড়ির শব্দ ঝর্ণার আওয়াজ তুলে মিলিয়ে গেল—দূরে থেকেও নিরুপম যেন মনীষার সঙ্গ অনুভব করতো।

কখনো হঠাৎ পর্দাটা তুলে মাথা বাড়িয়ে তর্জনী তুলে নিরুপমকে ইশারায় বলে যেত—কেমন জব্দ!

সেদিন তাই বিস্ময়ের শেষ ছিল না।

খাবারের প্লেট এক হাতে, অন্য হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। টুলের ওপর সে-দুটো নামিয়ে রাখলো ঠোঁট টিপে হাসি চাপতে চাপতে, চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে আদুরে আদুরে গলায় বললে, খোকাবাবু, খাবেন আসুন।

এই প্রথম ব্যতিক্রম। প্রতিদিন বারান্দায় মা'র কাছে বসে বিকেলের জলখাবার খেতে হয়েছে তাকে, মনীষা সে-সময় কাছে বসতেও লজ্জা পেয়েছে। শুধু দু-একটা হুকুম তামিল করেছে শাশুড়ীর, প্লেট এনে দিয়েছে, জল গড়িয়ে দিয়েছে।

মনে মনে ভীষণ খুশী হয়ে উঠেছিল নিরুপম। কিন্তু মুখের ভাবে সেটুকু প্রকাশ করতে চাইলো না। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইলো।

কৌতুকের চোখে সেদিকে তাকিয়ে প্লেট থেকে এক টুকরো আম নিয়ে নিরুপমের মুখের মধ্যে পুড়ে দিল মনীষা, আর নিরুপম একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মনীষাকে খাইয়ে দিতে গেল।—না না করে মাথা নাড়লো মনীষা, কিন্তু শেষ অবধি দাঁতে চেপে ধরলো সন্দেশটা।

সঙ্গে সঙ্গে উঃ বলে চিৎকার করে উঠলো নিরুপম। দুষ্টুমি করে মনীষা তার আঙুলের ওপরও একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

আর সেই মুহূর্তে নিরুপম দেখতে পেল, মা পর্দা তুলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে গেলেন।

সে-সব দিনের ছোট ছোট দৃশ্য, কথা-কৌতুক, এই সেদিনও মনীষা মাঝে মাঝে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আজ আর কেউ মনে পড়ায় না।

হাল্কা রঙের আবছা কল্পনার ওপর তুলির গাঢ় রঙের ছবিটা যখন ফুটে ওঠে তখন তার মধ্যেই শিল্পী আনন্দ পায়। কিন্তু ভিতরে সেই অফুরন্ত কল্পনার হাল্কা রঙটা চিরকালই লুকিয়ে থাকে। ঘুম-ভাঙা সকালের অস্পষ্ট স্বপ্নের মত। মনীষার মধ্যে সুমিতার স্মৃতি তখন কিভাবে ডুবে গিয়েছিল নিরুপম নিজেও তা জানে না। না কি মনীষার মধ্যেই ও সুমিতাকে খুঁজে বেড়িয়েছে।

আজ মিনু ওদের সকলকে আড়াল করে দিয়ে গেছে।

কবে থেকে কিভাবে যে মনীষা এত আপন হয়ে উঠলো মনে পড়ে না। নিরুপম শুধু লক্ষ করলো, একে একে সংসারের সব দায়দায়িত্ব মনীষা কাঁধে তুলে নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের সব ভার। না কি মুক্তপক্ষ একটি বিহঙ্গকে যত্নের খাঁচায় বন্দী করেছে মনীষা?

ননদরা ঠাট্টা করে বলেছে, কি মন্তর জানিস ভাই, দে না শিখিয়ে।

নিরুপমের বন্ধুরা বলেছে, আঁচলের চাবি হয়ে গেলে যে হে।

মনীষা আর নিরুপম তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, ঠোঁট টিপে হেসেছে। কিন্তু সত্যিই ভাল লেগেছে নিরুপমের, যেদিন থেকে স্নানের আগে তেল, সাবান আর তোয়ালেটা হাতে হাতে জুগিয়ে দিয়েছে মনীষা, আপিসের পোশাক গুছিয়ে রেখেছে।

মনীষার পিঠে ঝোলানো, খুঁটে বাঁধা একগোছা চাবির দিকে তাকিয়ে একটা বিচিত্র তৃপ্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে নিরুপম।

নিরুপম তখন গলায় টাই বাঁধতো। মনীষা তাই একদিন তার সঙ্গে দোকানে গিয়ে পছন্দ করে এক জোড়া টাই কিনে এনেছিল।

তারপর আনাড়ির হাতে টাই বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছিল মনীষা। যতবার চেষ্টা করে, ততবারই পারে না। নিরুপম দু'একবার দেখিয়ে দিয়েছে। তারপর বলেছে, থাক্, আমিই বেঁধে নিচ্ছি।

—না, আমিই বাঁধবো। সকৌতুক হেসেছে মনীষা, চেষ্টা করেছে বার বার। তার-পর এক সময় হাল ছেড়ে দিতেই দু'জনেই হেসে উঠেছে।

একটু একটু করে রান্নার ঘরখানা মনীষার হাতে ছেড়ে দিয়ে শাশুড়ী পুজোর ঘরে সরে গেছেন। আর খুশী হয়ে উঠেছে মনীষা।

খাবার সময় নিরুপমের সামনে বসতে পাওয়ার লোভকেই সবচেয়ে বড় লাভ মনে হয়েছে।

কিন্তু অন্তরঙ্গতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে বেঁধে দিল দুটি ছোট্ট হাত। মিনু। জীবনের সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল একটি ছোট্ট শিশু। মনীষার মধ্যে হয়তো সুমিতার স্মৃতিকে হারিয়ে ফেলেছিল নিরুপম, আর মিনুর মধ্যে সমস্ত পৃথিবী।

মিনু নেই। এ কথাটা বিশ্বাসই হয় না নিরুপমের।

একদিন ভুল করে মিনুকে ডেকে ফেলেছিল সে, আর সমস্ত পৃথিবী যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তবু এই বাড়িটার আনাচে-কানাচে, ঘরের কোণে, বারান্দায়, জানালায়—যেখানেই তাকায় সেখানেই মনে হয় মিনু বুঝি এখনই খিল খিল করে হেসে উঠে একটা কোন উদ্ভট আব্দারের কথা শোনাবে।

রাস্তায় খেলা করতে করতে কোন বাচ্চা মেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে কিছু একটা বলে ওঠে, আর নিরুপমের মনে হয় যেন মিনুই কথা বলে উঠলো। মনে মনে ও জানে, ভুল, সব ভুল, তবু দু'পা এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে রাস্তার দিকে না তাকিয়ে পারে না। শুধু সাবধান থাকে যাতে মনীষা না বুঝতে পারে। একে একে টুকিটাকি খেলনা, পুরনো জুতো, এমন কি ছেঁড়া বর্ণপরিচয়টাও মনীষার দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে দিয়েছে নিরুপম। কিন্তু ওর বুকের ভিতর থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনা ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন বুঝতে পারে মনীষাও ওর সঙ্গে একই লুকোচুরি খেলা খেলছে।

বিয়ের সময় পাওয়া লোহার আলমারিটা খুললেই আগে মিনুর রঙিন ফ্রকের সারি চোখে পড়ত। ইদানীং নিরুপম লক্ষ করেছে সেগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলেছে মনীষা। ভয় তার, পাছে নিরুপমের চোখে পড়ে যায়।

আশ্চর্য। ওরা দু'জনে দু'জনের দুঃখের ভার লাঘব করতে চায় বলে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে মিনুর স্মৃতি লুকিয়ে ফেলতে চায়। অথচ নিরুপমের এক এক সময় মনে হয়, এই লুকোচুরি বন্ধ করে দু'জনে একসঙ্গে কেঁদে উঠতে পারলে, দু'জনে একসঙ্গে মিনুর কথায় ডুবে যেতে পারলে অনেক বেশী শান্তি পেত।

কিন্তু সব চিহ্ন মুছে ফেলতে গিয়েও একটা জায়গায় দু'জনের হাতই থেমে গেছে।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কবে যেন সাদা চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে গোটা গোটা হরফে কয়েকটা কথা লিখেছিল মিনু। তখন সবে আঁকাবাঁকা অক্ষরে দু'চারটে শব্দ লিখতে শিখেছে। পেনসিল দিয়ে দেয়ালে লিখেছিল : 'মিনুর বাবা', তার নীচে আরো বড় অক্ষরে 'মিনুর মা', তার নীচে শুধু 'মিনু'। মনীষা সেদিন খুব রেগে গিয়েছিল মিনুর ওপর। দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়েছিল ওর পিঠে। বহুক্ষণ ধরে কেঁদে-ছিল মিনু, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল।

নিরুপম বাড়ি আসতেই মা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল মিনু।

নিরুপম বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, এভাবে দেয়াল নষ্ট করা উচিত নয়।

—বাঃ রে, কাঁদো কাঁদো গলায় মিনু বলেছিল, তুবলিদের বাড়িতে, পুটপুটিদের বাড়িতে দরজায় নাম লেখা আছে ওদের বাবার।

মনীষা আর নিরুপম দু'জনেই হেসে উঠেছিল। কি বোকা মেয়ে দেখ। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট রাখা আর দেয়ালে পেনসিল দিয়ে নাম লেখা এক?

অনেক বুঝিয়ে নিরুপম বলেছিল, যাও, নামগুলো ঘষে ঘষে তুলে দিয়ে এসো।

মুখ নীচু করে চলে গিয়েছিল মিনু। কিন্তু মনীষা নিরুপম কেউই দেখতে যায়নি, মিনু সত্যিই পেনসিলের লেখা তুলে দিয়েছে কিনা।

পরে একদিন হঠাৎ চোখে পড়েছিল, মিনু শুধু নিজের নামটিই তুলে দিয়েছে। 'মিনুর বাবা', 'মিনুর মা' কথা দুটো তুলে দিতে তার ছোট্ট বুকেও হয়তো ব্যথা লেগে-ছিল, পারেনি। ও দুটোও কোন একদিন মুছে দিতে হবে মনে মনে ভেবেছে নিরুপম। কিন্তু কোনদিনই ফুরসত হয়নি।

আপিসে বের হবার সময় সেদিকেই হঠাৎ আবার চোখ পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণ দুটো ভিজে এলো। মিনুর স্মৃতি জাগিয়ে দেবার মত কত তুচ্ছ ব্যাপারে যখন মনীষার চোখ, তখন এটুকুও নিশ্চয় তারও চোখে পড়েছে। তবু সেও মুছতে পারেনি। নিরুপমই বা পারবে কি করে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল নিরুপম।

মনে হলো, সাত বছরের মিনুও যেন ওই কয়েকটা অক্ষরের মধ্যে দেয়ালের লিখন জানিয়ে দিয়েছিল সেদিন। শুধু নিজের নামটাই মুছে দিয়েছিল।

৫

জ্ঞানবাবুদের আলোচনা শুনে ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলো নিরুপম। এ আশঙ্কা, এই দুঃসহ ভয় যে ওর মনেও কখনো কখনো উঁকি মারেনি তা নয়। তবু মনকে অন্যদিকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। সেই বীভৎস আতঙ্কের সামনে তাকে মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে জ্ঞানবাবুর দল। সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায়

মিনুর মৃত্যু কামনা করেছে ও। প্রার্থনা করেছে মিনুর নামটা যেন সত্যিই পৃথিবী থেকে মুছে যায়।

আপিসের ছুটির পর ও-সি অবিনাশবাবুর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ভদ্রলোক হয়তো বিরক্ত হবেন। এই তো দুদিন আগেই ঘুরে এসেছে সে, অবিনাশবাবু যথারীতি আশা দিয়েছেন।

পুলিসের ওপর সেই প্রথম দিন চটে গিয়েছিলেন ত্রিদিববাবু। অসহায়ের মত সেই ছোকরা ও-সির হাতে পায়ে ধরেছিলেন। কিন্তু তারপর তার ব্যবহার দেখে রাগে ফেটে পড়েছিলেন।

নিরুপম নিজে অতশত ভাবতে পারেনি। ওর তখন একটি মাত্র চিন্তা। মিনুকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর মনে হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী যার জন্য অন্ধকার হয়ে গেছে তার কাছে, তাকে খুঁজে বের করার জন্য এ-কি অসহায় অকর্মণ্যতা। মনে হয়েছে, সারা শহর তোলপাড় করে তার মিনুকে খুঁজছে না কেন এরা!

আজ অন্য এক ভাবনায় ওর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো।

ওই কুৎসিত পল্লীটার কথা শুনেই এসেছে নিরুপম। নানাজনের কাছে নানান গল্প শুনেছে।

বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারেনি, কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। কিংবা লক্ষ করে কোন কিছু দেখার আগ্রহই ছিল না ওর। শুধু কখনো কখনো বইয়ের পাতায় পড়া একটা অস্পষ্ট ছবিই আঁকা হয়ে গিয়েছিল ওর মনে। ক্লেদাক্ত, ঘৃণ্য, নোংরা একটা নারকীয়তার ছবি। ওর পরিচ্ছন্ন রুচি সে-সব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পেরেই তৃপ্তি পেয়েছে। তাই চিরকাল ওই পল্লীর দিকে চোখ বুজে থাকতে চেয়েছে ও।

বেশ্যা কথাটা ওর কাছে শুধু ঘৃণ্যই মনে হয়নি, ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে। আলাপে-আলোচনায় উচ্চারণ করতেও বেধেছে ওর।

মিনুর মত নিষ্পাপ একটি শিশুর জন্যে এমন একটা নরক অপেক্ষা করতে পারে এ-কথা ভাবতে গিয়েও মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছে নিরুপমের। ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলে উঠেছে ও মুহূর্তের জন্যে। ওর মনে হয়েছে, ওর হাতে তেমন শক্তি থাকলে এই সমাজকে নিরুপম ধ্বংস করে দিতো। নীতিবাদের ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়েই তৃপ্ত হতো না, যারা দিনের পর দিন এই নরক পুষে চলেছে, এই অকরুণ বিষাক্ত বাষ্পের পৃথিবীকে যারা উচ্ছেদ করতে চায় না, পারে না, সমাজের সেই শক্তিধর উপরতলার মানুষগুলিকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে হলো নিরুপমের। অসহায় ক্রোধের জ্বালায় ওর মনে হলো, ও যদি একটি দিনের জন্যেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই আদিম বন্য মানুষের মত বীভৎস কঠিন দু' পাটি দাঁত আর ধারালো বড় বড় নখ নিয়ে প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠতে পারতো!

কিন্তু ক্রোধের রক্তচাপ ধীরে ধীরে নেমে এলো। বড় অসহায় বোধ করলো নিরুপম।

অসহায়ের মতই ও যেন অস্ফুটে বলে উঠলো, তার চেয়ে যেন মিনুর মৃত্যু হয়, ভগবান!

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলো নিরুপম। পর পর ভিড়ে বোঝাই অনেকগুলি বাস এলো, চলে গেল। তখনও নিরুপমের মন বলছে, ওই নরকের মধ্যেই কোথাও হয়তো মিনু আছে, মিনুকে বন্দী করে রেখেছে।

একটা ক্ষীণ আশার পিছনে বারবার ছুটে চলেছে নিরুপম। কক্ষপথের অক্লান্ত গ্রহের মত।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে একটা ঝকঝকে গাড়ির জানালায় ছোট্ট হাতের হাতছানির মত বারবার তাকে কে যেন ডেকে নিয়ে যায় ব্যর্থতার দিকে।

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললো নিরুপম। নীলকণ্ঠের আত্মবিশ্বাস নিয়ে নরকের দিকে এগিয়ে গেল।

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে একবার সূর্যাস্ত দেখেছিল নিরুপম। কতই বা বয়স তখন মিনুর। চার বছর। এই এইটুকু ছোট্টাটি, মুখে আধো বুলির স্পষ্ট কথা ফুটেছে।

সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে নিরুপম আর মনীষা পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল।

দিগন্তের শেষ বৃন্তে তখন একটা বিরাট সিঁদুর-রঙা থালার মত দেখাচ্ছে সূর্য।

মিনু আধো আধো ভাষায় বলে উঠলো, তমাতো। দ্যাখো, তমাতো।

অর্থাৎ টমাটো।

মনীষা আর নিরুপম দুজনেই হেসে উঠেছিল। লাল রঙ দেখে টমাটোর কথাই মনে হয়েছিল মিনুর।

টুপ করে এক সময় সেটা ডুবে গেল, হারিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। আর সন্ধ্যা ঘন হয়ে অন্ধকার নেমে এলো সমস্ত পৃথিবী জুড়ে।

কোলকাতায় সন্ধ্যা নামে না। পাকা টমাটোর মত সূর্যকে এখানে কেউ বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়তে দেখে না। শুধু আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার সারির আড়াল থেকে ছিটকে আসা মৃদু রৌদ্রাভ আলোর কাঁপন হঠাৎ কখন মাথার ওপরের সরু চৌকো আকাশ থেকে সরে যায়। আর মনে হয় যেন পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়ার রাশি নেমে আসছে।

সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মত চওড়া রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে নিরুপমের কতবার মনে হয়েছে দু'পাশের দৈত্যগুলো যেন এই মুক্তির সুড়ঙ্গটুকুর টুঁটি চেপে ধরতে চাইছে। সন্ধ্যা নয়, যেন একটা সুদীর্ঘ গো-ডাউনের বন্ধবাতাস-ঘরের দু'পাশে বস্তার ওপর বস্তা ফেলে পাহাড় বানানো হয়েছে, আর তার মাথায় দাঁড়িয়ে কেউ একটার পর একটা বস্তা উজাড় করে শুধু কালো কালো ধোঁয়ার পুঞ্জ ঢেলে দিচ্ছে।

কিন্তু এমন বিস্ময়ের চোখ নিয়ে বাড়িগুলোর দিকে, এই অন্ধকারের দিকে, গলির মোড়ের আলো-জ্বলা জানালার দিকে কোনদিন তাকায়নি নিরুপম।

বাস থেকে নামলো।

আন্দাজে আন্দাজে একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালো ও। এই অঞ্চলটার পাশ দিয়ে বহুবার পার হয়ে গেছে। কলেজ-জীবনে এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় বন্ধুদের দু'একটা হাল্কা রসিকতা কানে এসেছে। তবু এ অঞ্চলটা ওর কাছে চিরকাল অজ্ঞাত পৃথিবীই রয়ে গেছে। নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা ভাসা ভাসা খবর কানে এসেছে শুধু। বইয়ের পাতায় কিছু গোপন তথ্য। তবু আগ্রহ জাগেনি, বিরক্তিও না। নির্লিপ্ত অনাগ্রহে এ জগতের দিকে পিছন ফিরে কাটিয়েছে এতকাল।

কিন্তু আজ এই দূরের পৃথিবীই তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে পরম বিস্ময় আর অনন্ত রহস্য নিয়ে।

একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো নিরূপম। এই বিস্ময়ের ঘরের চাবি খুঁজে পাওয়ার জন্যে আজ অধীর হয়ে উঠেছে সে। তার মন বলছে, মিনু আছে, মিনুকে সে খুঁজে পাবে।

মনীষা একদিন কান্নাকাটি করে একজন জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যথারীতি স্তোক দিয়েছিল জ্যোতিষী। আর মনীষার মত নিরূপমও সান্ত্বনা পেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় সান্ত্বনা ওর নিজের মন। নিরূপম জানে মিনুকে ও খুঁজে পাবে, ওর বিশ্বাস...

দুটি চোখে শুধু প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়ালো নিরূপম। ভয় নেই, লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই। ঠিক এমনভাবে কেউ বুঝি কোনদিন এখানে এসে দাঁড়ায়নি।

মাথায় আলোর সঙ্কেত জ্বালিয়ে খানকয়েক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে বড় রাস্তায়। তার পরেই একটা অন্ধকার গলি। অন্ধকার প্রান্তরে দপ্ দপ্ করে জ্বলে ওঠা আলেয়ার মত খানকয়েক পানের দোকান বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে আছে। সোডা লেমনেডের বোতলে ঠিকরে পড়া আলোয় ঈষৎ রঙিন হয়ে উঠেছে দোকানগুলো। অদ্ভুত অলস অপটু হাতে পান সেজে চলেছে লোকগুলো, যেন কারো কোন ব্যস্ততা নেই এখানে। স্তব্ধ অকর্মণ্যতা সারা পল্লীটাকে গ্রাস করে রয়েছে। মোড়ে মোড়ে সক্ষম সবল মানুষের জটলা, নিঃশব্দপদচারণ। শব্দহীন। হাসি। তারই ফাঁকে চতুর চোখে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে কি যেন সন্ধান করছে তারা।

একটি কালোকুলো সুদৃঢ় পুরুষ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে হাতের শালপাতার আলুকাবলি নিয়ে। যে বেচছে তারও কোন ব্যস্ততা নেই। ফর্সা পাঞ্জাবী, আধ-ময়লা ধুতি আর মাথায় পরিপাটি টেরী—লোকটি ডান হাতের কাঠিটা সযত্নে বাঁ হাতের শালপাতায় ধরা আলুকাবলিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটি একটি করে মুখে পুরছে। লম্বা ঠোঁট একটা সারসের মত দেখাচ্ছে তাকে।

আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেই লোকটা কখন নিরূপমের পিছনে এসেছে ও লক্ষ করেনি। হঠাৎ কানের পাশে ফিসফিস স্বরে কথা শুনে চমকে উঠলো নিরূপম। এই বীভৎস অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় কানের পাশে ফিসফিসানি শুনে গা-ছমছম করে উঠলো।

তার বক্তব্যের কোন জবাব না দিয়ে, তাকে উপেক্ষা করে গলির অন্ধকারে ঢুকে গেল নিরূপম। আর পরমুহূর্তেই একটি বাড়ির দরজায় চোখ গেল। দরজার ম্লান আলোয় কয়েকটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল—হঠাৎ তারা দুদ্দাড় ভিতরে ঢুকে পড়লো।

নিরূপম চারিপাশে তাকিয়ে কোন কারণ খুঁজে পেল না। কেন এভাবে ভয়ে ছুটে পালালো তারা! নিরূপমকে দেখে? না, হয়তো অন্য কোন কারণ আছে। হয়তো এই ছায়া-ছায়া পুরুষের আনাগোনার মধ্যে কোথাও কিছু আতঙ্ক দেখেছে মেয়েগুলি।

এক গলি থেকে আরেক গলিতে মোড় নিলো নিরূপম। ও যেন কোন দেশান্তরী পর্যটক রাত্রির কোন বিদেশী শহরে এসে পেঁৗছেছে। যে শহরের কোন ঠিকানা জানে না, রীতিনীতি জানে না, ভাষা জানে না।

গলির ধারের রহস্যময় বাড়িগুলির দিকে তাকালো নিরূপম, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ালো। দু'চারটি খোলা জানালা, নীল আলো জ্বলছে কয়েকটি ঘরে।

সাত আট বছরের রুগ্ন শরীর এক পাল ছেলে জটলা করছে এখানে ওখানে।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ এক একটি ট্যাক্সি এসে থামছে। ধীর পায়ে এক-একজন

এক একটি বাড়িতে ঢুকছে। দ্রুত বেরিয়ে আসছে কেউ কেউ। পলকের মধ্যে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠছে।

বাচ্চা ছেলেগুলির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল নিরুপম।

—এদিকে, এদিকে!

হঠাৎ একটি ছেলে একটি বাড়ির দিকে নিরুপমকে ইঙ্গিত করলো। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সেই বাড়িটির দিকেই এগিয়ে গেল নিরুপম।

টাকার দুনিয়ায় এই সব অবাঞ্ছিত সন্তানদের হয়তো কোন মূল্যই নেই। খালি গা, খালি পা, মুখে অশিক্ষার অশ্লীল বুলি, জীর্ণ শরীর। তবু এরা হয়তো টাকার মূল্য জেনেছে। ওই একটি বাড়ির দিকে আঙুল দেখানোর পিছনে হয়তো ছেলেটির কোন স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

কি মনে হলো, নিরুপম সেই বাড়িটার ভিতরেই ঢুকে পড়লো।

পর পর কয়েকটি ঘর, প্রতিটি ঘরের দরজায় ময়ূরের মত নানারঙের সাজে পোষাকে সুসজ্জিতা এক একটি মেয়ে। কেউ বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে নিরুপমের দিকে তাকিয়ে কৌতুকে হাসলো, কেউ পার্শ্ববর্তিনীর উদ্দেশ্যে কিছু গোপন ভাষায় টিপ্পনী কাটলো, কেউ নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রতিটি কথাই নিরুপমের কাছে রহস্য মনে হলো।

সামনেই একটি শীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে।

উপরতলার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে একবার তাকালো ও।

একটি বুড়ি ঝি গাম্ভীর্য-সরল কণ্ঠে বললে, যান না।

এক পলক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পায়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো নিরুপম। রাস্তায় নেমে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস নিলো!

সমস্ত পরিবেশ তার কাছে গ্লানিময় মনে হলো। কুৎসিত বিষাক্ত বাতাস যেন জমাট বেঁধে আছে ওখানে। কিন্তু মেয়েগুলির ওপর এতটুকু ঘৃণা হলো না তার। সমস্ত জীবন ঘৃণা দিয়ে যাদের গড়ে তুলেছে, আজ তাদের জন্যে বুকের গোপনে কোথায় যেন একটু ব্যথা অনুভব করলো।

নিরুদ্দেশ ভাবে আরো কিছুক্ষণ এ-গলি ও-গলি টহল দিলো নিরুপম। এ পল্লীতে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাছে রহস্য-ঘেরা এই পল্লীটা এমন দৈত্যের মত বিশাল মনে হয়নি। এখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো তার।

মিনু, মিনু। মিনু যদি সত্যিই এখানে কোথাও কোন ঘরে একটি মৃত্যুহীন ভবিষ্যতের জন্যে বন্দী হয়ে থাকে, কি করে খোঁজ পাবে ও।

ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আবার একটি বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালো নিরুপম। সামনের একটি দোকানের আলো এসে পড়েছে বাড়ির দরজায়। কোলাপ-সিবল্ গেটের একপাশে অতি ভদ্র চেহারার একজন টুলে বসে আছে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের ব্যাকব্রাশ।

লোকটি তন্দ্রাঘোর চোখ তুলে মুচকি হাসলো, সেলামের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাত তুললো কার দিকে।

মাড়োয়ারী লোকটি ভিতরে ঢুকে গেল পরক্ষণে।

একটি শীর্ণ বৃদ্ধ বগলে একখানা নতুন শাড়ী চেপে তার পিছনে পিছনে ঢুকে গেল। তার বয়স আর ভাবভঙ্গী দেখে দুটি ছোকরা কৌতুকে হেসে উঠলো।

নিরুপম একটুক্ষণ কি ভাবলো, তারপর সেও ঢুকে পড়লো বাড়িটির ভিতরে।

সেই একই দৃশ্য। পাশাপাশি সারি সারি ঘর, শীর্ণ সিঁড়ি, কয়েকটি ঘরের দরজায় ভারী পর্দা দুলছে, কোনটির দরজায় আমন্ত্রণের কটাক্ষদৃষ্টি।

নিঃশ্বাস রোধ করে নিরুপম বুঝি কার কণ্ঠস্বর শোনার আশায় চুপ করে রইলো। নিস্তব্ধতার মাঝে যদি কোন শিশুকণ্ঠ শোনা যায়!

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল নিরুপম। আর মুহূর্তে তার বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠলো। সিঁড়ির বাঁকে একটি ছোট্ট ঘরের জানালার গরাদ ধরে আছে একটি কচি হাত—সে হাতে একটি কালো কাঁচের চুড়ি।

দ্রুত পায়ে ওপরে উঠে এলো নিরুপম, উঁকি দিলো। কিন্তু না, তার আগেই হাতটি সরে গেছে। কোন শিশুর মুখ দেখতে পেল না নিরুপম। তবে কি মনের ভুলই শুধু?

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকালো নিরুপম। আর সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে একটি তরুণী শরীর ললিত ভঙ্গিমায় মৃদু হেসে এগিয়ে এলো।

তার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালো নিরুপম।

কালো শীর্ণ রুগ্ণ চেহারার একটি তরুণী, মুখে বসন্তের দাগ। কিন্তু চোখ দুটি বড় করুণ।

সুপুষ্ট বেণীতে বেলফুলের মালা জড়ানো।

—আসুন না।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কি এক কোমলতার সুর বাজলো। মৃদু হাসির অভ্যর্থনা জানালো মেয়েটি।

নিবুপম তখনো দ্বিধাস্থির।

মেয়েটি আবার বললো, ভিতরে আসুন না।

নিরুপম এবার ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলো।

৬

সুমিতার কাছে নিরুপমের কথা শোনার পর থেকে কেমন একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল মনে, চাঁপামাটির দিনগুলির কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল আনন্দময়ীর।

স্বামীকে না বলে কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না। কে এমন নাম রেখেছিল এখন আর স্পষ্ট বলতে পারেন না, নামটাও একমাত্র তাঁর বড়দাদুর মৃত্যু পর্যন্ত টিকে ছিল। এখন আর ও নামে ডাকবার একজনও নেই। কেউ যে ডাকে না সেটুকুই স্বস্তি, তা না হলে ঠাট্টার মত শোনাতো। জীবনে আনন্দের মুখ তো কোনদিনই দেখলেন না।

তবু চাঁপামাটির দিনগুলি এই বিরস যাত্রাপথে একমাত্র উজ্জ্বল স্টেশন। কাশী-বাবু তখন যত অল্প মাইনের হোক, চাকরি করতেন। পাড়াপড়শির সঙ্গে সদ্ভাব ছিল, পাঁচটা মানুষ খাতির করতো।

কোলকাতার এক সীমান্তে এই শীর্ণ গলির আড়াইখানা ঘরে থাকতে থাকতে নিজেদের অস্তিত্বেই অবিশ্বাস এসে যায়। কোলকাতা? সুমিতা হাসে। বলে. একে আর কোলকাতা বলে না মা, শুধু একটা বাস যাতায়াত করে তাই'

দোষ নেই সুমিতার, কোলকাতার শেষ প্রান্ত ছেড়ে আরো খানিকটা এসে তবে

এই গলি, এই বাড়ি। তাও যদি এ-পাড়ার বেশীর ভাগ লোকের মত নিজের বাড়ি হতো। মাসে মাসে ভাড়া না গুনতে হতো।

কড়াইয়ের খুন্তি নাড়তে নাড়তে আনন্দময়ীর হঠাৎ মনে হলো নিরুপমের সঙ্গে সুমিতার বিয়ে হলে অনেক ভালো হতো। তখন তো বুঝতে পারেননি। শাশুড়ীর সংস্কার নিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। তাই মেয়েকে সদাসর্বদা বেড়া দেওয়া চারাগাছটির মত মানুষ করতে চেয়েছিলেন।

তাঁরই বা দোষ কি, সবই অদৃষ্ট। শুধু সান্ত্বনা আর বাচ্চুর জন্যে ভয় হয়। ওদের অন্তত যদি মানুষ করে তুলতে পারেন, পাস করে বেরিয়ে চাকরি পায় ছেলেটা, তা হলে হয়তো সব দুঃখ ঘুচে যাবে সংসারের। আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে সকলে।

কাশীবাবু কোন নতুন খদ্দের জুটিয়ে এনেছেন আবার। নিজের কালির প্রশংসা নিজেই করছেন। কানে আসছে আনন্দময়ীর। জানেন, খবর দেবো বলে ওরা চলে যাবে, আর আসবে না। ঠিক সেই সুমির বিয়ের আগে মেয়ে দেখানোর মত। আর যদি বা অর্ডার দেয় সামান্য কিছু, সে টাকায় দুটো দিনও চলবে না। যা বিক্রী হয়, সবই সুমিতার হাত দিয়ে। সুমিতা কখনো কখনো এসে বলে, একটা আপিসে নিয়েছে কিছু, এই নাও টাকা।

কাশীবাবু খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠেন। বলেন, তবে? বিক্রী হবেই। তোমরাই বিশ্বাস করতে না। এত ভাল কালি...আরে কোলকাতায় আবার টাকার অভাব, টাকা ছড়িয়ে আছে এখানে। কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো।

সুমিতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কোন-কোনদিন এমন কথা শুনেছে। ধক্ করে লেগেছে তার বুকে। টাকা ছড়িয়ে আছে!

আনন্দময়ীও হাসতে পারেননি। তবু স্বামীর পাগলামি সহ্য করেছেন। সত্যি তো ওঁর আর দোষ কি? নিজের দোষে তো আর চাকরি যায়নি। ব্যাঙ্ক ফেল হলো। দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো। কি করবেন, কোথায় যাবেন ভেবে পেলেন না। সামান্য মাইনের একটা চাকরি পেয়ে কাশীবাবু কলকাতায় এলেন, কিন্তু সে চাকরিও টিকলো না। আর এই বুড়ো বয়সে চাকরি জোটাবেনই বা কি করে।

আনন্দময়ী রান্না করতে করতে শুনতে পেলেন খদ্দেরদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন কাশীবাবু, বাইরের বারান্দায় বসে। ইতিহাসে চাকা আবিষ্কার বড়ো, না কালি? চাঁপামাটির ছেলেরা সাধে কি আর ঠাট্টা করে ওঁকে মসীবাবু বলতো!

কয়েকটা জুতোর শব্দ শুনতে পেলেন আনন্দময়ী, কথাও কানে এলো। বিদেয় হয়েছে তা হ'লে সকলে।

কাশীবাবুর গলা শোনা গেল।—এক পেয়ালা চা হবে নাকি?

এইবার হয়তো দাড়ি কামাতে বসবেন।

আঁচলে হাত মুছে হাসিহাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়ালেন স্বামীর কাছে।—শুনেছো, সুমির সঙ্গে সেই চাঁপামাটির মাস্টারমশাইয়ের ছেলের দেখা হয়েছিল।

—কে?

—টোটন বলতাম, সেই যে নিরুপম।

হঠাৎ মোড়াটা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন কাশীবাবু।—সুমির সঙ্গে?

বলে চীৎকার করে ডাকলেন, সুমি!

আনন্দময়ী বললেন, ঘুমোচ্ছে ও, ওঠেনি এখনো।

—ও। দমে গেলেন কাশীবাবু, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ধরে নিয়ে

এলো না কেন?

বলেই হেসে উঠলেন, দিতাম নাপিতের সামনে বসিয়ে কদমছাঁট করে।

আনন্দময়ীও হাসলেন, সত্যি, কি কান্ড করেছিলে সেবার, বেচারী কেঁদেকেটে...

কাশীবাবুও হাসলেন।—আরে না না, সে ওই সুমির জন্যে। কি দুষ্টু ছিল তখন, বেচারিকে ক্ষেপিয়ে ছাড়তো।

আনন্দময়ী চুপ করে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দুটিতে খুব ভাব ছিল।

কাশীবাবু জোরে জোরে ঘাড় নাড়লেন।—খুব ভাব।

তারপর হঠাৎ বলে বসলেন, তা ঠিকানা কি, নিজেই না হয় যাই একবার। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা তো হবে। উঃ। কতদিন হলো বলো তো।

অনেকদিন। অনেকদিন পার হয়ে গেছে, চাঁপামাটির দিনগুলো স্মৃতির কাছেও এখন ম্লান। না কি দারিদ্র্যে অভাবে, দুঃখে অশান্তিতে জীবন কাটাতে হয়েছে বলে সেই দিনগুলিই এত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ঘরের এক কোণে পড়ে থাকা কালির বড়ি তৈরীর ছোট্ট যন্ত্রটার দিকে আঙুল দেখালেন কাশীবাবু।—নিরুপম এনে দিয়েছিল।

আনন্দময়ী হাসলেন।—তুমি তখন টোটন বলতে।

একটু থেমে বললেন, বাণী তো ছিল সুমির সব সময়ের সঙ্গী। আর মনে আছে, টোটন আমাদের বাচ্চুকে সান্তুকে কত কি দিতো। যখনই কোলকাতা থেকে যেত, কিছু না কিছু নিয়ে যেত ওদের জন্যে। খুব ভালোবাসতো।

আনন্দময়ী হঠাৎ বাচ্চুকে ডাকলেন।—হ্যাঁরে, টোটনদাকে মনে পড়ে?

বাচ্চু বোকার মত চেয়ে রইলো।

আনন্দময়ী হাসলেন, কি করেই বা পড়বে, কত ছোট তখন। তোকে কত কি দিত...

কাশীবাবু হেসে উঠলেন হঠাৎ।—বাঃ, আর আমাদের জন্যে একবার ল্যাংড়া আম!

আনন্দময়ী স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। তারপর ওই স্নিগ্ধ হাসির ওপর একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়লো।

বাচ্চু চলে গেল বই খাতা নিয়ে। ওর কোন আগ্রহ নেই এ আলোচনায়।

চাপা স্বরে আনন্দময়ী বললেন, আমার কি মনে হয় জানো।

—কি?

—ওদের দুটিতে বিয়ে হলে মেয়েটা সুখী হতো।

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন কাশীবাবু। চোখ তুলে তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

আর আনন্দময়ী কথাটা বলে ফেলেই চট্ করে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখলেন। না, সুমিতা ঘুমোচ্ছে। কানে যায়নি ওর।

আনন্দময়ী ফিরে এসে বললেন, আমারই দোষ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হয়তো।

কাশীবাবু চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললেন না। ও'র মন তখন চাঁপামাটিতে ফিরে গেছে।

আনন্দময়ী ধীরে ধীরে রান্নার জায়গায় ফিরে এলেন। চোখে উনোনের ধোঁয়া লাগলো, না কি অন্য কারণে, আনন্দময়ী চোখ মুছলেন।

নিরুপমের কথা শোনার পর থেকে কেবলই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে তাঁর।

স্বামীর কাছে সে-কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে পারলেও যেন শান্তি। সারাজীবন ধরে জাতগোত্র কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে এসে সব কিছুই হারিয়েছেন। সুমিকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সুখী করতে চেয়েছিলেন, উল্টে তাকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিয়েছেন।

অথচ রাতারাতি সব বদলে গেল যেন সারা দেশটায়। সমাজ এমনভাবে বদলে যাবে, নিজেও বদলে যাবেন, তখন যদি জানতেন!

সুমিতার তো দোষ নেই। নিজেরা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি যে এমন হবে কে জানতো। নিজেদের অঙ্কের হিসেবই কি মিললো শেষ পর্যন্ত।

আনন্দময়ীর মনে পড়লো, একদিন তাঁকে না বলে সুমি ইস্কুল পালিয়ে নিরুপমের সঙ্গে টোটো করে রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে এসেছিল। পাড়ার কে যেন দেখতে পেয়ে তাঁকে জানিয়ে গিয়েছিল সে-কথা।

রাগের মাথায় সুমির চুলের মুঠি ধরে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন।

আর মার খেয়ে জেদ বেড়ে গিয়েছিল সুমির। মা'র চোখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুমি স্পষ্ট স্বরে বলেছিল, আমরা তো বিয়ে করবো!

—কি করবি! আকাশ থেকে পড়েছিলেন আনন্দময়ী।

তারপর ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিয়ে ঘরে বন্দী করেছিলেন সুমিকে। অথচ সে-বছরই ওর পরীক্ষার বছর। কাশীবাবু অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রীকে। বোঝাতে পারেননি।

—তা হলে আর সান্তুর বিয়ে হবে ভেবেছ? আনন্দময়ী বলেছিলেন। কিন্তু আসলে অন্য জাতে বিয়ের কথা ভাবতেও শিউরে উঠেছিলেন।

পড়াশোনা এভাবে বন্ধ করে না দিলে তো মেয়েটা আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো!

রাগের মাথায় একদিন সে-কথা বলেছিল সুমি। সেই প্রথম যখন বেকার বাপের ঘাড়ে ফিরে এলো।

আনন্দময়ী বেশ বুঝতে পারেন, সুমি আজকাল ওঁকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। হঠাৎ যে-কোন সামান্য কথায় দপ করে রেগে ওঠে। কিন্তু কেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। উপায় নেই বলেই মুখ বুজে থাকেন, ভয় পান সুমিকে।

কখনো ভাবেন সুমি তার অসুখী জীবনের জন্য মাকেই দায়ী করে। অথচ তাকে সুখী করার চেষ্টাই তো করেছিলেন। আজ হঠাৎ নিরুপমের কথা মনে পড়ছে বলেই মেয়ের ওপর মনটা অত্যন্ত নরম হয়ে গেল।

সুমির ঘরে ঢুকলেন নিঃশব্দে।

ডাকলেন, সুমি!

—উঁ। চোখ বুজেই সাড়া দিল সুমিতা।

আনন্দময়ী ধীরে ধীরে সুমিতার পাশে বসলেন খাটের ওপর। তারপর স্নেহ-কোমল হাতখানা সুমিতার পিঠের ওপর রাখলেন স্নিগ্ধ আদরের স্পর্শ দিয়ে।

বললেন, উঠবি নে? অনেক বেলা হয়েছে।

বিস্রস্তবাস শরীরটা একটুও নড়লো না। যেমন উপুড় হয়ে চোখ বুজে শুয়েছিল সুমিতা তেমনি শুয়ে রইলো।

আনন্দময়ী নিঃশব্দে মেয়ের পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আর সুমিতার খুব ভাল লাগলো, খুব, খুব। কতদিন মা এভাবে এসে কাছে বসেনি, পিঠে হাত দেয়নি। না কি সুমিতা নিজেই আসতে দেয়নি তাঁকে এভাবে।

ঘুমভাঙা আলস্যের আমেজে বিছানায় পড়ে রইলো সুমিতা। আর কেবলই মনে হতে লাগলো, মা কত ভালো!

অনেক আগেই ঘুম ভেঙেছিল সুমিতার। তবু চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থেকে ফেলে-আসা দিনগুলির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়েছিল। এত হৈ-হট্টগোলের মধ্যে থেকে, চারিপাশে এত মানুষজন, এত আনন্দের উপকরণ থাকতেও নিজেকে হঠাৎ এক এক সময় বড় একা একা লাগে। সে-সময় ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে চাঁপামাটির কয়েকটি স্নিগ্ধ মুহূর্তে স্নান করে আসতে ইচ্ছে হয়।

নিরুপমের সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাওয়ার পর বড় অসহায় বোধ করে-ছিল সুমিতা। অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারেনি। নিরুপমের ব্যবহারে এমন একটি অবহেলা পাবে ভাবতে পারেনি।

অথচ সব দুঃখ দারিদ্র্য আত্মগ্লানির মধ্যে সেই স্মৃতিকে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন কোণে লুকিয়ে রেখে এসেছে। মা'র ঠাকুরঘরটির মত। এত অভাব, জঞ্জাল. স্বার্থ —কিন্তু সেই বাড়িরই এক কোণে এতটুকু একটা কুলুঙ্গিতে যেমন ধূপধুনো জেবলে পৃথক করে রাখা যায়. সুমিতার মনের লুকোনো কোণটিও ছিল তেমনি পবিত্র।

তাই কল্পনায় যখনই নিরুপমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছে, তখনই মনে হয়েছে সত্যিই যদি কোনদিন দেখা হয় তা হ'লে হয়তো ওরা দু'জনেই আবার যৌবনের উত্তাপে একটা জ্বলন্ত তুবড়ির মত উচ্ছল হয়ে উঠবে।

অথচ দেখা যখন হলো তেমন কিছুই হলো না। একটা বিদ্যুতের ঝলক যেন অন্ধকারটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেল। তবু কুলুঙ্গির উঁচু আসনটা থেকে মানুষ-টাকে নীচে নামিয়ে আনতে মন চাইলো না।

এই একটা নোঙর ধরেই তো ভেসে বেড়াতে চেয়েছে সুমিতা. ভেসে বেড়াতে পেরেছ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাই বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছিল সুমিতা। তারপর কখন যেন মা'র কথা কানে গিয়েছে। বাবা আর মা'র কথাগুলো অস্পষ্ট টুকরো টুকরো ভাসা ভাসা হাল্কা পালকের মত তার সারা শরীরে স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

ছোটবেলাকার কয়েকটা তুচ্ছ ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় সুমিতার। তখনো তাকে অবহেলা বলেই তো মনে হয়েছিল।

মা তখন কথায় কথায় বলতো, বয়েস হয়েছে তোর। ওভাবে যখন-তখন...

নিরুপমের বোন বাণী ছিল ওর সমবয়সী বন্ধু। তার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাবে ও। কিন্তু নিরুপম যখনই ছুটিতে চাঁপামাটিতে ফিরে আসতো কেমন একটা ভীরু সঙ্কোচে ও জড়োসড়ো হয়ে যেত।

মা ওর মুখেচোখে কি আবিষ্কার করতো কে জানে. ওর প্রতিটি পদক্ষেপ সন্দেহের চোখে দেখতো, বাড়ির বাইরে পা বাড়ালেই বাধা দিতো। নিরুপমের বোন বাণী ডাকতে এলে হেসে হেসে মা বলতো, তুমি এলেই তো পারো ; ওই বা রোজ

রোজ যাবে কেন বাপু।

নিরুপম অবশ্য ছুটিতে যখনই ফিরে আসতো, কাশীবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেত। আর প্রতিবারেই কিছু না কিছু নিয়ে আসতো। কখনো বাচ্চুর জন্যে ছবির বই, কখনো মা'র জন্যে জর্দা, বাবার কালি তৈরীর কোন ফরমাশ। সান্ত্বনার জন্যেও কিছু না কিছু। আর প্রতিবারেই সুমিতা বড় ভয়ে ভয়ে থাকতো। ওর জন্যেও না কিছু নিয়ে আসে নিরুপম। ভয় হতো, নিরুপম মা'র সামনেই ওকে কিছু না দিয়ে বসে।

তা হ'লেই মা'র চোখ হয়তো সন্দেহে কুঁচকে উঠবে।

একটা আতঙ্কিত সন্দেহের দৃষ্টিতে দগ্ধ হতে হবে এই ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো ও কপাটের আড়ালে। সাহস করে যদি বা কখনো কখনো কাছে আসতো, লাজুকতার হাত ওর মুখ চেপে ধরতো। কথা সরতো না।

নিরুপম হয়তো খুবই সাধারণ দু' একটা প্রশ্ন করতো। কেমন আছো। পড়াশোনা করছো তো। কিংবা, মাসীমা, এত রোগা দেখাচ্ছে কেন সুমিকে।

মৃদু হাসির কণ্ঠে দু' একটি উত্তর দিয়েই মাথা নীচু করতো সুমিতা, হাতের বুড়ো আঙুলে শাড়ির পাড়টা জড়াতো, খুলতো। কি করবে, কি বলবে খুঁজে পেত না।

তারপর হঠাৎ একদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলে জানালা খুলে বাইরের রোদ্দুর-ধোয়া পথঘাটের দিকে তাকিয়ে যেমন একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে, কৈশোরের ভোর পার হয়ে এসে সুমিতার মনেও তেমনি বিচিত্র শিহরণ জেগেছিল।

—টোটনদা এসেছে? খবর শুনেই ছুটে যাবার মত চটুল কৈশোর পার হয়ে এসে কবে থেকে লজ্জা আর ভীরুতায় নিজেকে মুড়ে ফেলেছিল সুমিতা। কবে থেকে যেন নিরুপমের সঙ্গে ওর সহজ সম্পর্কটা ভেঙে গিয়ে সঙ্কোচের দূরত্বে ওরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু বাণীর সকৌতুক রসিকতাকে ও বড় ভয় পেত।

তাই নিরুপমের ঘরের দিকে চোখের ইশারা করে বাণী খবরটা শোনানোর পরও ও বিশ্বাস করেনি। তারপর উঁকি মারতে গিয়ে চোখাচোখি হতেই নিরুপম ডাক দিয়েছিল।—এসো।

কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল সুমিতা।

সুমিতার কল্পনায় নিরুপম ছিল একটি স্বচ্ছ শুভ্র সুন্দর মোমবাতির মত। মোমবাতির ম্লান স্নিগ্ধ শিখাটির মত। কী যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ তার।

সুমিতা কাছে আসতেই নিরুপম উঠে দাঁড়ালো।

দু' একটা সাধারণ কথা। তারপরই গাঢ় স্বরে নিরুপম বললে, সুমি!

—উঁ। চোখ তুলে তাকালো সুমিতা।

নিরুপম এক মুহূর্ত কি ভাবলো। তারপর বললে, তোমাকে কখনো তো কিছু দিইনি, একটা জিনিস দিতে চাই, নেবে?

বিস্ময়ের আতঙ্কের চোখে নিরুপমের মুখের দিকে তাকালো সুমিতা। আর সেই সময়েই বাণী এসে হাজির হলো।

হাতে তার দুটো রুপোর জালি কাজ করা ব্রোচ। সে-দুটো দেখিয়ে বললে, তোমার স্যুটকেশে ছিল দাদা! একটা তো আমার, আরেকটা কার?

ফাজিল মেয়ে। সুমিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলো বাণী, ওর মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো।

—বেশ, নিবিনে তো নিবিনে। একটা ব্রোচ দাদার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখেই বেণী দুলিয়ে ছুটে পালালো সে।

আর সেটা তুলে নিয়ে সুমিতার মুঠোর মধ্যে রেখে হাতখানা নিরুপম নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো এক নিমেষের জন্যে। নিরুপমের হাতখানাও সেদিন সুমিতার সমস্ত শরীরের মত থরথর করে কেঁপে উঠেছিল কিনা সুমিতার মনে নেই।

মাকে বলতে পারেনি। সেই রুপোর ব্রোচটা একান্ত গোপনে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল সুমিতা। পৃথিবীর আর কারো যেন জানবার অধিকার নেই। ওই ছোট্ট উপহারটুকুর মধ্যে নিরুপমের স্পর্শ পেতে চেয়েছে।

মা কেবলই বলতো, বয়েস হয়েছে তোর। সেই প্রথম সুমিতার নিজেরও মনে হলো ও যেন সুদীর্ঘ পথ ঘুমের মধ্যে পার হয়ে এসে হঠাৎ জেগে উঠেছে। এতদিন নিজেকে বড় তুচ্ছ, বড় মূল্যহীন মনে হয়েছে তার। নিরুপমের স্পর্শ তার কানে কানে ফিসফিস করে বুঝি বলে গেল, সুমি, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

সেই স্বচ্ছশুভ্র মোমবাতিটা যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা স্ফটিকস্তম্ভের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেদিন।

তারপর গোপন একান্তে কত দিনের পর দিন কেটে গেছে। চাঁপামাটির আঁকা-বাঁকা গলি, ভাঙা মসজিদ, গঙ্গার ধারের নির্জন বটের ছায়ায় কত নীরব প্রতিশ্রুতি লেখা হয়ে গেছে।

কিন্তু একটা দিনের ভুলের জন্যে সব স্বপ্ন তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কি বোকা, কি বোকা—সেদিন যদি মা'র ওপর রেগে গিয়ে ওভাবে গোপন সত্যটুকু প্রকাশ করে না ফেলতো।

নিপুণ শিল্পীর মত ধৈর্য ধরে একটু একটু করে রঙে রেখায় তুলির টানে বিশাল মুক্তির যে ছবিখানা এঁকে চলেছিল সুমিতা, মা হঠাৎ একদিন বাবার তৈরি সেই কালির বোতলই যেন ঢেলে উজাড় করে দিলো তার ওপর।

সব লজ্জা উপেক্ষা করে সব আনন্দ কোলাহলের মধ্যে লাল চেলীর ঘোমটার তলা থেকে দুটি উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত চোখ সেদিন কেবল একজনকেই বার বার খুঁজে বেড়িয়েছিল। কিন্তু একবারও সে চোখে পড়েনি। মুখ ফুটে বাণীর কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্নের দৃষ্টি তুলে ধরতে পারেনি।

বাণী নিজেই চাপা দীর্ঘশ্বাসে দু'একটি কথা শুনিয়েছিল।—দাদা যেন কেমন হয়ে গেছে! শুনে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করেছিল সুমিতা। তবু মা'র বিরুদ্ধে, বাবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ মুখরিত হয়নি তার মনের মধ্যে, আত্মনিপীড়নের পথই বেছে নিতে চেয়েছিল।

ঘুম-ভাঙা চোখ বুজে বিছানায় পড়ে পড়ে সেই সব দিনের ছোট ছোট দৃশ্য মনে পড়ছে সুমিতার। মা ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কি আরাম, কি আরাম।

মা নিশ্চয় এখন ভুল বুঝতে পেরেছে। তা না হলে এমন স্নেহের আদরের স্পর্শে তার বুক ভরিয়ে দিতে চায় কেন।

মা ভুল বুঝতে পেরেছে, এইটুকুই যেন তার চরম সান্ত্বনা। সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ।

মা বলেছিল, খুব ভাল ছেলে। ভাল চাকরি করে।

বাবা বলেছিল, কলকাতায় থাকবি, কত কি দেখবি। সুখী হবি তুই, আমি জানি, সুখী হবি।

অচেনা-মানুষ শ্রীনাথের সঙ্গে যেদিন ইছাপুরের ছোট্ট অন্ধকার বাসাটিতে এসে উঠলো সুমিতা, সেদিন নিজেও ভেবেছিল ও সুখী হবে। ভেবেছিল বাতাসে-কাঁপা প্রদীপের শিখার মতন সুন্দর স্মৃতিটুকু শুধু গোপনে দুটি হাতের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখবে।

বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শ্রীনাথ তার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত কল্পনা নির্মম দস্যুর মত ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল।

আর নিরুপম? সেও কি সুমিতার বুকের কোণে লুকানো সবচেয়ে মূল্যবান ঐশ্বর্যটুকুও অবহেলায় লুটিয়ে দিয়ে গেছে?

কিন্তু কেন, কেন। জেটীর ধারে নিরুপমের সঙ্গে দেখা হওয়ার দৃশ্যটা, টুকরো টুকরো কথা, তার চোখের দৃষ্টি—সব বুঝি বুকের ভেতর গাঁথা হয়ে গেছে। সেই দৃশ্যটা রোমন্থন করতে করতে একটা অসহ্য ব্যথার মোচড় অনুভব করলো সুমিতা। চোখ ঠেলে কান্না উপচে আসতে চাইলো।

দুঃসহ বেদনায় হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো ও! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে, কেন, কেন ও এমন করলো মা।

কোলের ওপর তার সজল চোখজোড়ার স্পর্শ পেয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মা চোখ নামালো।

৭

একটি নোংরা গলি ছেড়ে আরেকটি নোংরা গলি, একটি আলোকোজ্জ্বল কক্ষ ছেড়ে আরেকটি আলোকিত কক্ষে ঘুরে বেড়িয়েছে নিরুপম। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কোথাও এক টুকরো শিশুমুখের আভাস দেখতে পেয়ে, কখনো একটি কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থেকেছে কোন উপরতলার বারান্দা বা সিঁড়ির বাঁকের প্রায়ান্ধকার ঘরের দিকে। তার-পর একসময় ভুল ভেঙেছে, হতাশায় নিজেই ভেঙে পড়েছে নিরুপম।

বিনত অনুনয় আর ক্ষীণ আশার দৃষ্টি নিয়ে ও-সি অবিনাশবাবুর কাছে ছুটে গেছে মাঝে মাঝে।

এই মানুষটির মধ্যে আধিপত্য ও অহঙ্কারে স্ফীত সেই পরিচিত হঠকারিতার অভাব দেখেছে বলেই বার বার ছুটে যেতে পেরেছে। চটপটে স্বভাবের দোহারা গড়নের মানুষটি হয়তো তখনো অপরাধীর সংস্পর্শে এসে অসামাজিক হয়ে ওঠেননি। তাই টেবিলের ফাইল আর রিপোর্টের স্তূপে মুখ ডুবিয়ে কাজ করতে করতে দূর থেকে নিরুপমকে হঠাৎ দেখতে পেলেই কেমন অস্বস্তি বোধ করেছেন।

কিন্তু সেদিন বুঝি একটু আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়েছেন অবিনাশবাবু।

তাঁর চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা তেমন সুদীর্ঘ নয়। নয় বলেই হয়তো অনু-ভূতির সূক্ষ্ম বোধগুলি হারিয়ে ফেলেননি। প্রথম দিনের বিরস কাঠিন্যের ব্যবহারের জন্য পরে তাই অনুতাপ বোধ করেছেন।

তাছাড়া...

সহকর্মীদের একজন ঠাট্টা করে বলেছিল, কি ব্যাপার অবিনাশবাবু, ও কেস-টাকে আপনি যে পার্সোনাল কাজ করে তুললেন!

অবিনাশবাবু হেসেছেন।

কেউ ভেবেছে, কেরিয়ার তৈরী করতে চান অবিনাশবাবু।

সে বিদ্রূপেরও কোন উত্তর দেননি।

কিন্তু অবিনাশবাবু ভিতরে ভিতরে একটা প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে চেয়েছেন। জীবনে, তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, অনেক অনুনয় বিনয় শুনেছেন। কিন্তু এমনভাবে কেউ তাঁর ওপর ভরসা করে জীবনের ভেলা ভাসিয়ে দেয়নি। ক্ষয়-ক্ষতির সন্ধানে গিয়ে একটি উজ্জ্বল সংসারকে এভাবে তাঁর ওপর অসহায়ের মত ভর করতে দেখেননি।

সেই জন্যেই নিরুপমকে দেখলেই বড় অস্বস্তি বোধ করতেন অবিনাশবাবু। নিরুপমের মুখের আড়ালে হয়তো মনীষার বিষণ্ণ করুণ মুখখানি ভেসে উঠতো তাঁর চোখের সামনে।

সেদিন কিন্তু স্বাভাবিক বোধ করলেন তিনি।

দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, আসুন, আসুন নিরুপমবাবু।

নিঃশব্দে বিনত চোখে অন্যান্য দিনের মতই তাঁর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো নিরুপম। কোন কথা বললো না।

অবিনাশবাবু নিজেই আশা দিলেন।—অদৃষ্ট মানতেই হয় নিরুপমবাবু, অদৃষ্টে কি আছে জানি না। কিন্তু একটু যেন আশা দেখছি। একটা বিরাট গ্যাঙের পিছনে আছি, হয়তো শেষ অবধি...

নিরুপম আবেগে অস্থির দুটি হাতে অবিনাশবাবুর হাত চেপে ধরলো। কোন কথা বলতে পারলো না।

তাব মনে হলো, সে যদি কোনভাবে অবিনাশবাবুকে সাহায্য করতে পারতো, যদি কোন কাজের ভার দিতেন তিনি, তা হলে নিরুপম কৃতার্থ হয়ে যেত।

কিন্তু কিছুই মুখ ফুটে বলতে পারলো না ও। কৃতজ্ঞ বিনয়ের দৃষ্টিতে বিদায় নিয়ে চলে এলো।

তারপর কিছুক্ষণ নিরুদ্দেশভাবে পথে পথে কাটিয়ে প্রতিদিনের মতই আবার সেই পুরানো পথেই পা বাড়ালো নিরুপম।

রূপ। রূপ এদের জীবিকা, রূপের আকর্ষণেই নাকি পুরুষ এদের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু কোথায় সে রূপ, যার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মানুষ উন্মুখ হয়। যা কিছু কুৎসিত, যত গ্লানি আর বীভৎসতা এখানে এসে জড়ো হয়েছে।

এ এক বিচিত্র রাতের শহর।

আশ্চর্য চাপা গলায় গম্ভীর ডাক ভেসে আসছে গলির কোন এক প্রান্ত থেকে।

মা-লা ই ব-র-ফ!

মালাই বরফ ফিরি করছে কে। কুলপি বরফের শীতল আমেজ আর সুরার উষ্ণ নেশা এখানে পাশাপাশি বিরাজ করে। অন্ধকার আর আলো। কোথাও দামী আস-বাবে সাজানো সুন্দর এক একটি কক্ষ—রঙ-ঝলমল পর্দা, বড় আয়না, পরিপাটী শয্যা। অভিসারিকা নায়িকার মত অপরূপ প্রসাধিত বিভ্রমের পাখা মেলে প্রতীক্ষার

প্রহর গুনে চলেছে কেউ। কোথাও কোনো কক্ষ জীর্ণ দীন লজ্জাতুর নায়িকার কৃত্রিম কটাক্ষে নির্বিকার।

রূপ এদের জীবিকা। কিন্তু সেই রূপ এখানে কোথাও নিরুপমের চোখে পড়ে না। রূপ এখান থেকে অন্তর্হিত। নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রিতে বেহুঁশ মদ্যপের অর্থহীন চিৎকারের মত একটা অনন্ত হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুধু নিরুপমের কানে বাজে। লাস্যোল্লাসের হাসিকে বিদ্রুপের মত মনে হয়।

শুধু একটি মানুষের মধ্যেই রূপ পেয়েছিল নিরুপম। সুমিতার মধ্যে। সে রূপের মধ্যে নেশা ছিল, আনন্দ ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল।

চাঁপামাটির সেই দিনটি এখনো তার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে বেদনায় ম্লান হয়ে। সানাইয়ের সুর ককিয়ে কেঁদে ওঠেনি। উচ্চকিত আলোর উল্লাস ছিল না সেদিন। সে সংগতি ছিল না কাশীবাবুর। অত্যন্ত দীনদরিদ্রের মতই সামান্য পুঁজির মধুলগ্নে বিয়ে দিয়েছিলেন সুমিতার। আর নিজের বেদনায় নিজেই জ্বলেছিল নিরুপম. দূর থেকে একবার সুমিতাকে দেখে আসার সাহসও হয়নি। শুধু সুমিতার যাত্রাপথের সামনে একটি নীরব সান্ত্বনার ইচ্ছা মেলে দিয়েছিল।

আর সুমিতা চলে যাওয়ার পর কাশীবাবুর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সমস্ত বুক যেন হাহাকার করে উঠেছিল। শূন্য, নিঃসঙ্গ।

তারপর।

কাশীবাবু একদিন চাঁপামাটি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেলেন। বাবার চিঠিতে শুধু খবরটুকুই পেয়েছিল নিরুপম। পুজোর ছুটিতে স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে, তবু বার বার কাশীবাবুর বাড়িটায় উঁকি দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছে।

তারপর নতুন বাসিন্দে আর নতুন মুখ দেখতে পেয়েছে জানালায়। যেখান থেকে বহুদিন সুমিতার ম্লান মুখখানিকে তার দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্যে স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হতে দেখেছে।

ঘুড়ির সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল, জীবনের শেষ যোগসূত্র লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তারপর।

একদিন মনীষার মধ্যে তার অতৃপ্ত হৃদয় নতুন আশ্রয় খুঁজে পেল। কিন্তু সুমিতার সেই অম্লান সুন্দর রূপ, তার সেই শান্ত দুটি চোখের তারা মনের গভীরে কোথায় মেঘের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল।

কখনো কখনো নিরুপমের সন্দেহ হয়েছে. মনীষার মধ্যে ও সুমিতাকেই খুঁজে বেড়ায়। বাইরের রূপ নয়। মনীষার হাসি, মনীষার কথার মধ্যে বিগত স্মৃতির এতটুকু মিল দেখতে পেয়ে হঠাৎ এক একদিন তাই সুমিতার কথা মনে পড়ে গেছে।

সেইসব দিনের কোন কথাই কি ভাবছিল নিরুপম ?

নিজেরই অজান্তে ও কখন যে একটি গলির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, একটি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে, একটি কক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে ও নিজেই বুঝতে পারেনি।

বারান্দার একপ্রান্তে নিলাজ নায়িকাদের জটলা হঠাৎ কোন বিচিত্র রঙ্গে সশব্দে হেসে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়তা ভেঙে গেছে তার।

দরজায় হাত রেখে দাঁড়ানো নমনীয় ভঙ্গিমার কটাক্ষে আমন্ত্রণ দেখতে পেয়েছে নিরুপম।

তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকেছে ও!

মেয়েটার মধ্যে হঠাৎ একদিন সুমিতার মুখের আদল দেখতে পেয়েছিল বলেই কি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে ও। তবে কি মিনু নয়, সুমিতাকেই খুঁজেছে নিরুপম!

হঠাৎ তার মনে হয়েছে, রূপের সন্ধানে বুঝি কেউ এখানে আসে না, হারানো হৃদয় খুঁজে বের করতে আসে।

ধীরে ধীরে গদি-মোড়া কুশনটিতে বসেছে নিরুপম। অথচ প্রথম যেদিন এসেছিল ও এই নতুন পৃথিবীতে সেদিন এই দামী পর্দা, ওই কুশন, ওই শয্যা স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করেছে। কি আশ্চর্য, আজ আর কোন দ্বিধা জাগলো না।

রূপলুব্ধ পুরুষের মতই সেও কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে। অন্য এক আকর্ষণে। তারপর হঠাৎ কোনদিন এক একটি কক্ষে বিশ্রাম চেয়েছে।

আজও তেমনিভাবে এসে আরেকটি অজ্ঞাত রহস্যের ঘরে ঢুকলো।

—কি নাম তোমার? কেন জানি প্রশ্ন করে বসলো, নিরুপম।

মেয়েটি স্মিতহাসি হেসে উত্তর দিলো, যে নাম তোমার ভাল লাগে!

নিরুপম চুপ করে রইলো।

মেয়েটি লীলায়িত ভঙ্গিতে ওর পাশে এসে বসলো। হাসলো।—বলো না, কি নাম চাও?

একটি সুপটু নায়িকার কোমল বাহু তার কাঁধের ওপর এসে পড়লো। আর নিরুপমের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো।

কি নাম বলবে নিরুপম! হঠাৎ সুমিতার নামটা ক্ষণিকের জন্যে মনে পড়তেই শিউরে উঠলো ও। না না। সুমিতা তার জীবনে একটি বিশুদ্ধ পদ্মের মত। কোন অশুচি অন্যায় তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

সুমিতা যে নিরুপমেরই আরেকটি রূপ।

মেয়েটি আবার হাসলো। তার নাম বললো।

—প্রিয়া।

তারপর হাসতে হাসতে উঠে গেল মেয়েটি, দরজার খিলে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে 'না না' করে উঠলো নিরুপম।

বিস্ময়ের চোখে তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো মেয়েটি। কৌতুকের স্বরে বললে, শুধু কথা বলবে নাকি সারাক্ষণ?

ব্যঙ্গের মত শোনালো কথাটা। নিরুপম লজ্জিত বোধ করলো, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ও শুধু ঘরটির চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।

অজানা অচেনা দেবদেবীর রঙিন বড় বড় ছবি দেয়ালের চারিধারে টাঙানো। কাচের আলমারীতে একটি নিকেলের ফ্রেমে একটি ছোট্ট শিশুর মুখ।

উঠে গিয়ে ছবিটি দেখলো নিরুপম। প্রশ্ন করলো, কে ও?

—আমার মেয়ে। হেসে উঠলো মেয়েটি, বললে, মারা গেছে।

আশ্চর্য নির্দয় আর মমতাহীন মনে হলো মেয়েটিকে। এ পল্লীর সকলকে। আশ্চর্য, মেয়ে মারা গেছে বলতেও এরা হেসে উঠতে পারে!

পরক্ষণেই নিরুপম বুঝতে পারলো, ফাঁকি, সব ফাঁকি। তা হলে মেয়েটির ছবি এমন সযত্নে সাজিয়ে রাখতো না প্রিয়া। তবে কি প্রিয়ার হাসির নেশায় কান্নার শব্দ চাপা পড়ে আছে?

সত্যি, এ এক বিপরীত পৃথিবী, বিপরীত সমাজ।

কি খেয়াল হয়েছিল কে জানে, একদিন দুপুরে এখানে এসে হাজির হয়েছিল ও। দেখেছিল, দ্বিপ্রহরের মত জগৎ। রাত্রি এখানে জেগে থাকে। দিনের

আলোর কদর্য নোংরামি, দারিদ্র্য আর মলিনতা কোন এক রূপের কাঠির স্পর্শ পেয়ে অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তা হলে হয়তো প্রিয়ার হাসিটাও আসলে কান্না। ও নিজেও তা জানে না, বোঝে না।

প্রিয়া এসে আবার দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। শরীরে লুব্ধতার নেশা জাগিয়ে নিরূপমের চোখে চোখ রেখে হাসছে।

হয়তো একটি পুরুষের সামনে এই প্রথম পরাজিত বোধ করছে প্রিয়া।

হাসছে, কথা বলছে প্রিয়া। রঙ্গমত্ত একটি শরীরী নেশা যেন। একটি কম্পমান বিদ্যুৎ। ক্ষণে ক্ষণে আঁচল খসে পড়ছে। একটি বিক্ষুব্ধ কামনার তরঙ্গ যেন একটি দেহের তটে আছড়ে পড়তে চায়। নিরূপমের চোখের সামনে দুটি আগুনের ঘূর্ণি তাকে অন্ধ করে দিতে চায়। অকারণ হাসিতে ভেঙে পড়ে, খসে-পড়া আঁচলের স্বচ্ছতার আবরণ হাতছানি দেয় বারে বারে।

নিরূপমের রক্তও কি চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়? নিরূপম জানে, ওর একটি ইশারায় প্রিয়ার যৌবনদেহের লজ্জাবল্কল একটি একটি করে খসে পড়বে। একটি নিষ্পত্র শ্বেতশুভ্র ঋজু বৃক্ষের মত এসে দাঁড়াবে মেয়েটি। ভাষাহীন একটি দেহ মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠবে।

অকারণ কৌতুকে মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। শরীরের স্পর্শ দিয়ে নিরূপমের পাশে বসে পড়লো।

আর নিজেরই অজান্তে কখন তার পিঠের ওপর নিরূপম তার অসহায় হাতখানা রাখলো। উন্মাদের মত তাকে কাছে টেনে নিলো। ক্রমশ বুঝি নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে নিরূপম। বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে ক্ষণিকের জন্যে অশুচি মনে হলো। আপিস থেকে ফিরে কোট-প্যান্ট-টাই খুলে রেখে যেভাবে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠে ও, সেইভাবে যদি গ্লানির ভিতর থেকে তার মনটুকু বের করে আনতে পারতো!

না, কোন পাপ, কোন অন্যায় করেনি ও।

আপিসের টাক-মাথা জ্ঞানবাবু একদিন তাকে রিহার্সাল দেখতে যাবার জন্যে ধরাধরি করেছিলেন। রাজী হয়নি নিরূপম। তাই জ্ঞানবাবু বলেছিলেন, দুঃখ আমাদের সকলেরই আছে নিরূপম। দুঃখ ভোলার জন্যেই ওখানে যাই।

নিরূপম ভাবলো, ওর জীবনের দুঃখ, ওর কষ্ট কারো সঙ্গে তুলনা করার মত নয়।

না, ও কোন অন্যায় করেনি। ভুল করেনি। ক্ষণিকের মোহের পেয়ালায় সব দুঃখ ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে। আর কিছু নয়।

একটা দিনের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গেল।

একতলার ঘরটিতে সেদিন একটি মেয়ের মুখোমুখি বসেছিল নিরূপম। সন্ধ্যা যখন ঘন হয়ে এসেছে তখন।

শান্ত পুরুষ গলার একটি ডাক ভেসে আসছিল।—বে-ল-ফু-ল! চা-ই বে-ল-ফু-ল।

ক্রমশ ডাকটা কাছে এলো, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো লোকটি।

মেয়েটি ফুল কেনার জন্যে অনুরোধ করলো নিরূপমকে।

একটি মালা কিনলো নিরূপম, মেয়েটিকে দিলো।

দীন আসবাব, জল চুঁয়ে পড়া বিবর্ণ দেয়াল আর তার চেয়ে বিবর্ণ মুখ

মেয়েটির। মালা পেয়ে সে মুখেও খুশী উপছে পড়েছিল।

বেণীতে বেলফুলের মালাটি জড়িয়ে সামনে এসে বসেছিল মেয়েটি। নিরুপমকে খুশী করতে চেয়েছিল।

সেদিনের সেই মেয়েটি—কি নাম যেন, ভুলে গেছে ও। কি রঙের শাড়ি ছিল তার শরীর ঘিরে, মুখটা কেমন, সব মুছে গেছে। এরা সবাই মুছে যায়। শুধু একটি শরীরী আকর্ষণ হয়ে বেঁচে থাকে।

মেয়েটির সঙ্গে কত কি কথা হয়েছিল। মনে নেই। তার জীবনের অনেক কথা জানতে চেয়েছিল ও। কি কথা মনে নেই। কৌতুকের হাসির মধ্যে কিভাবে সে তার অতীত জীবনকে প্রকাশ করেছিল, কিছুই মনে নেই আজ আর।

শুধু একটি কথাই মনে আছে, মেয়েটিকে একবারও সে স্পর্শ করতে পারেনি, চায়নি। শুধু হঠাৎ এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, চলি আজ।

মেয়েটি বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে।

—তোমার টাকাটা। হাত বাড়িয়ে টাকাটা দিতে গিয়েছিল নিরুপম।

আর তার হাতের নোট ক'খানার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করেছিল মেয়েটি।

কৌতুক-বিস্ময়ের কণ্ঠে বলেছিল, টাকা কেন?

কি যেন বোঝাতে চেয়েছিল নিরুপম। আর হাসতে হাসতে নোট ক'খানা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল সে।

নিরুপম কি যেন বলতে চেয়েছিল, তার আগেই মেয়েটি শান্ত সংযত কণ্ঠে বলেছিল, আমরা শরীর বেচি, কথা বেচি না।

কেন জানি, অপমানিত বোধ করেছিল নিরুপম। বিব্রত পায়ে পালাতে চেয়েছিল ও। আর হঠাৎ চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে বসে পড়েছিল, পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে।

নখের পাশ থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে তখন।

—আহা, কি হলো। তার গলার স্বরে দরদের স্পর্শ পেল নিরুপম। তবু উঠে চলে যেতে চাইলো।

কিন্তু না, কিছুতেই ছাড়েনি মেয়েটি।

নিরুপমকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে এনে সযত্নে বেঁধে দিয়েছিল।

তারপর নোট ক'খানা কুড়িয়ে নিরুপমের পকেটে গুঁজে দিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল।—আবার আসবেন।

—আসবো। স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মত করে উচ্চারণ করেছিল নিরুপম।

কিন্তু না, আর আসেনি। শুধু মেয়েটিকে অকারণে টাকা দিয়ে অপমান করেছিল ভেবে অনুশোচনা বোধ করেছিল ও।

বাসের দোতলায় বসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে নিরুপম ভাবলো, ও কোন অন্যায় করেনি।

নিরুপম ভাবলো, আমিও মানুষ!

নিরুপম ভাবলো, দুঃখের পৃথিবী থেকে, নিঃসঙ্গতা থেকে ও শুধু পরিত্রাণ চেয়েছে।

নিরুপম ভাবলো, সেদিনের মেয়েটির মত প্রিয়াকেও অপমান না করে ও আজ শুধু নিজেকে সম্মানিত করেছে।

বাড়ি ফিরে অদ্ভুত সঙ্কোচ বোধ করলে নিরুপম। ওর মনে হলো একটা

পাপের তিলক ওর কপালে আঁকা হয়ে গেছে। মনীষা চোখ তুলে তাকালেই বুঝি সেটা তার চোখে পড়ে যাবে।

এরই নাম বোধহয় পাপবোধ।

তা হোক, তবু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলো নিরুপম। আপিসের পোশাক ছেড়ে স্নান করবার জন্যে কলঘরে গিয়ে ঢুকলো। কলে জল থাকে না কোনদিনই, তাই চৌবাচ্চায় উঁকি দিলো। সেখানেও জল সামান্য, অনেক নীচে পড়ে আছে। ক্ষণিকের জন্যে একটু বিরক্ত বোধ করলো নিরুপম। তার জন্যে কারো কোন চিন্তা নেই, কারো কোন সহানুভূতি নেই, যেন অন্য একটা জগতের মানুষ আসে, থাকে, খায়দায়। তার বেশী কোন অধিকারই নেই তার। দিকে তাকাবার, তার কথা ভাববার অবসর বা ইচ্ছে নেই কারো।

সারা শরীরে সাবান ঘষে ঘষে স্নান করলো নিরুপম, স্নান করে তৃপ্তি পেল। আত্মগ্লানিটা যেন ঘামের মত শরীরের বাইরেই আঠার মত লেগে থাকে। সাবান মেখে স্নান করলেই উঠে যাবে।

মনীষা প্রতিদিনের মতই নিঃশব্দে আসন পেতে জলের গ্লাস নামিয়ে রেখেছে। নিরুপম বেরিয়ে আসতেই বিষণ্ণ চাপা গলায় প্রশ্ন করলো, খেতে দেবো?

ওদিক থেকে ত্রিদিববাবু ডাকলেন, খোকা।

নিরুপম গিয়ে দাঁড়ালো—বলছো কিছু?

—হ্যাঁ। তোমার মা বলছিল বৌমাকে নিয়ে দিনকয়েক এলাহাবাদ থেকে বেড়িয়ে এসো না।

নিরুপমের মাও হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন।—যা বাবা দিনকয়েক, নইলে মুখ বুজে কাজ করতে করতে মেয়েটা যে মরে যাবে।

প্রথম প্রথম নিরুপমের নিজেরও এক একবার মনে হয়েছে কোথাও কিছুদিন কাটিয়ে আসতে পারলে হয়তো মনীষার বুকের ওপর চেপে-বসা পাথরটা একটু হাল্কা হতো।

ও ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, দেখি।

কিন্তু মন থেকে সায় দিতে পারলো না। বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলেই ভয় হয়, যদি মিনুকে হঠাৎ একদিন পাওয়া যায়, যদি কাগজের সেই বিজ্ঞাপনের জবাবে কোন চিঠি আসে, যদি থানা থেকে নতুন কোন খবর জানতে চায়!

ত্রিদিববাবু হাতের চিঠিখানা দেখালেন। বেলা খুব কান্নাকাটি করে লিখেছে। তোমাদের দু'জনকে একবার যেতে বলেছে।

মা নিরুপমের মুখের দিকে তাকালেন।—যা বাবা, মেয়েটা তা নইলে মরে যাবে।

নিরুপম চুপ করে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। টেবিলের উপর খানকয়েক চিঠি। প্রতিদিন ডাকপিওনের জন্যে অপেক্ষা করার অভ্যাস তাঁর তেমনি আছে। নিজে গিয়ে তার হাত থেকে চিঠিগুলো নেন। নিরুপম বা মনীষার চিঠি এলে নিজে গিয়ে তাদের হাতে দেন। ইলেকট্রিকের বিল পেলে পরের দিনই নিজেই গিয়ে জমা দিয়ে আসেন।

কাউকে বিশ্বাস করেন না। পৃথিবীতে কারো কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই সে-কথা জেনে গেছেন। তা না হলে নিজের মেয়েরা, আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর একটা চিঠির উত্তর দিতে দেরী করে!

শুধু তাঁর নিজের চিঠি হলে চোখে পুরু লেন্সের চশমাটা এ'টে আগে একবার পড়ে নেন। তারপর নিরুপমের মাকে ডেকে পড়ে শোনান। কি উত্তর দিতে হবে যুক্তি করেন তার সঙ্গে, কখনো নিরুপমের সঙ্গে। তারপর নিজেই বসে বসে চিঠি লেখেন, ডাকঘরে গিয়ে নিজের হাতে ফেলে দিয়ে আসেন। কারো নিষেধ শোনেন না। কাছেই একটা ডাকবাক্স আছে, কিন্তু সেটাকে বিশ্বাস করেন না একটুও।

শুধু নিজের মনেই এক একসময় ভাবেন, এত সাবধানী হয়েই বা কি হলো।

মিনুর কথা মনে এলেই কেমন গুম হয়ে যান। কারো কথা কানে যায় না, কোন কিছু চোখে পড়ে না। আকাশপাতাল কি যেন ভাবেন বসে বসে।

ছেলেমেয়ে হারিয়ে যাওয়া নিয়ে খবরের কাগজে একদিন একটা চিঠি দেখেছিল নিরুপম। ও জানে, বেনামীতে ওটা বাবারই লেখা। অন্য চিঠির মত এটা আর কাউকে পড়ে শোনাননি, লুকিয়ে লুকিয়ে কবে হয়তো লিখে পাঠিয়েছিলেন।

নিরুপম চুপ করে আছে দেখে আবার প্রশ্ন করলেন এবার।—বেলাকে তা হলে কি জবাব দেব?

চিঠির উত্তরটা যেন এই রাত্রেই না লিখলে নয়।

নিরুপম শুধু বললে, ছুটি পাই কিনা দেখি।

তারপর নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এসে খেতে বসলো।

বেলা অর্থাৎ মেজদি, আর মেজজামাইবাবু নিরুপমকেও পর পর কয়েকখানা চিঠি দিয়েছে এর আগে। ও কোন উত্তর দেয়নি, দিতে ইচ্ছে হয়নি।

কি হবে খানিকটা কান্নাকাটি করে। যখনই যার সঙ্গে দেখা হয়, তার চোখ ছলছল করে ওঠে মিনুর কথা ভেবে। মিনুর দু'একটা কথা দু'একটি বিস্মৃত মুহূর্তের প্রতিধ্বনি তোলে তারা। নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুকে দুঃসহ ব্যথার শব্দ বেজে ওঠে। অথচ সে-কথা কেউই বুঝতে পারে না।

মাথা নীচু করে খেতে বসেছিল নিরুপম। মনীষাও চুপ করে এতক্ষণ তার সামনে বসেছিল।

হঠাৎ ফু'পিয়ে কে'দে উঠলো মনীষা।—না, না, এঘর ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না, কোথাও না।

চমকে চোখ তুলে তাকালো নিরুপম। মনীষার চোখে চোখ রেখে এর আগে বহুদিন ও এভাবে তাকায়নি। এমন স্পষ্ট চোখে মনীষাকে দেখেনি।

দীর্ঘ নিঃশব্দতার পর নিরুপম মনীষার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার!

শরতের মেঘের মত আস্তে আস্তে মনীষার মুখের বিষণ্ণ ভাব কেটে গেল। হাসবার চেষ্টা করে হতাশ সুরে বললে, চেহারা কে চায়!

হাসবার চেষ্টা করলো মনীষা, কিন্তু গলার স্বর তার দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালো। চাপা কান্নার মত।

৮

চেহারা নিয়ে কি হবে? মনীষার কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

মিনু হারিয়ে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল নিরুপমের। টাকা? কি হবে টাকা নিয়ে? মাসের শেষে কয়েকটা টাকার প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে।

অথচ আজ টাকার দিকেই ও লোভের হাত বাড়াতে চায়।

টাকা চায় নিরুপম।

আপিসের হলঘরখানা চার দিক থেকে চাপা। একদিকে বারান্দা আছে, কিন্তু আলো হাওয়া সেদিক থেকেও আসে না। পাঁচতলা একটা নতুন বাড়ি উঠেছে হাত কয়েক দূরেই। আপিসবাড়িটা অবশ্য পুরোনোদিনের, ঘরগুলো বেশ উঁচু, দরজাগুলো প্রকান্ড প্রকান্ড। কিন্তু সেখান দিয়ে একটুও হাওয়া ঢোকে না, আলো উঁকি দেয় না। শুধু পীতাভ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বড় বড় ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌। আকাশ মেঘলা হয়, ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে অঝোরে। কিন্তু ঘরের ভিতর কেউ টেরও পায় না। হঠাৎ কখনো কোন ঠিকাদারের লোক ভিজে সপসপে জুতো নিয়ে ঢুকলে তবেই বোঝা যায়। বাইরের প্রচন্ড ঝড়ের হাওয়া দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে এ ঘরে যখন ঢোকে তখন বড়জোর ফাইলের দু'একটা কাগজের টুকরোকে ঈষৎ কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। আপিস ছুটির পর বাইরে বেরিয়েই অবশ্য অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ জাগে ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শে, বৃষ্টিধোয়া চকচকে পীচের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে, কিংবা বিকেলের আলোকিত স্নিগ্ধতার দিকে চোখ মেলে।

অফিস ক্লাবের নাটক অভিনয়ের দিন এগিয়ে আসছে। রিহার্সাল আর মাত্র কয়েকদিন বাকী। তারপরই স্টেজে উঠবে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনাও বাড়ছে তাই ক্রমশ, কোন্‌ কোন্‌ কণ্ট্রাক্টারের বিল পাশ করাবার সময় কত চাঁদা ধরতে হবে।

অকৃপণ দরাজ হাতেই অবশ্য তারা চাঁদা দিয়ে যায়।

ঘুষের টাকার সঙ্গে এ ধরনের হাজারো চাঁদার হিসেব ধরে নিয়েই তো তারা টেণ্ডার দেয়। হাসতে হাসতে কখনো তাই বলে, হামার টেক্সো তো বাড়িয়েই চলেছেন হুজুর, ইনকামভি জেরা বাড়ায়ে দিন।

তাদের চোখে অন্য অনেক ট্যাক্সের মত এও এক ধরনের ট্যাক্স।

নিরুপম অবশ্য প্রথম প্রথম জানতো না সহকর্মী কেউ কেউ তাকে হঠাৎ কেন এসে ধরতো : নগরমলের বিলটা চেক করা হয়ে গেছে নিরুপমবাবু? সাঠে কনস্ট্রাকশনের ব্যবস্থা করে দিন না, বেচারা ঘুরে যাচ্ছে বার বার। মালকানি অ্যান্ড আনন্দরামের ফাইলটা কদ্দূর, লোকটা খুব ভালো।

একটু একটু করে সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু আপিসের আরো দু'চারজনের মত ওদিকে হাত বাড়ায়নি নিরুপম।

ত্রিদিববাবু নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন নিরুপমকে। তাই অন্যায়কে ভয় পেত ও, লোভ জয় করতে শিখেছিল।

কিন্তু যেদিন মাইনের টাকাটা নিয়ে গিয়ে বাবার হাতে তুলে দিলো, আর ত্রিদিববাবু বারবার নোটগুলো গুণে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, টাকা এত কম কেন

খোকা?... সেদিন থেকে ওর মনের মধ্যেও লোভ জাগলো।

সেদিন কি ওজুহাত দিয়ে ও এড়িয়ে গিয়েছিল আজ আর মনে নেই।

মনীষার শীর্ণ ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনা অনুভব করেছে ও, কিন্তু শরীরের তীব্র আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি।

টাকা চায় নিরুপম, আরো টাকা।

—সাঠের বিলটা কি হলো ভাই? জ্ঞানবাবু এসে প্রশ্ন করলেন সেদিন।

নিরুপমের জীবনে সেই প্রথম ব্যতিক্রম। মাথা না তুলে ধীরে ধীরে ও বললে শুধু, তাকে পাঠিয়ে দিন।

বিস্মিত হয়েছিলেন জ্ঞানবাবু।

আধ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে লোকটির হাত থেকে লম্বা খামখানা নিরুপমকে সেদিন নিতে দেখলেন জ্ঞানবাবু।

কিন্তু অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং খুশীই হলেন। এতকাল নিরুপমকে নির্বোধ বলে এসেছেন গোপন আলোচনায়। উপহাস করেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন নিজেকে ছোট মনে হয়েছে নিরুপমের কাছে। না, বিবেকের পরোয়া করেন না জ্ঞানবাবু। জানেন, ও বস্তুটা সভ্যতার শরীরে একটা অর্থহীন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। ইচ্ছে করলেই কেটে বাদ দেওয়া যায়, কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নির্বোধ মানুষগুলোকে ভিতরে ভিতরে কেমন যেন ভয় পান।

তাই খবরটা অন্তরঙ্গ কয়েকজনকে না জানিয়ে পারলেন না।

অরুণ বক্সীকে টিফিনের সময় চায়ের দোকানে ফিসফিস করে বললেন, তোমাদের নিরুপম দি অনেস্টও লাইনে এসেছে। মানে, সাঠের কাছ থেকে...

তারপর একসময় অরুণ বক্সী সেই চায়ের দোকানে এসে ফিসফিস করে বললে, জ্ঞানদা! নিরুপম ছোকরা আরো গভীর জলের মাছ।

—কি রকম? চোখ কপালে তুললেন জ্ঞানবাবু।

অরুণ বক্সী হাসলো—রিপোর্ট পেলাম, গুণের ঘাট নেই ওর, ওসব দিকেও দিব্যি যাতায়াত আছে। বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো।

জ্ঞানবাবু শুনলেন, বিশ্বাসও করলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। কি ভাবলেন যেন, তারপর হঠাৎ উঠে গেলেন।

নিজে হাত পেতে ঘুষ নিয়ে আসছেন এতদিন। নিজের মনকে স্তোক দেন, এ বাজারে ঘুষ না নিলে সংসার চলে না। কিন্তু তা বলে দুশ্চরিত্র মানুষকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেননি। বৃদ্ধ রামেশ্বরকে তাই ঘৃণ্য মনে হয়েছে চিরকাল।

রামেশ্বর ঘুষ নেন না। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই কিসের টানে কে জানে ওই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেন।

কারো কাছে সে-কথা গোপন রাখেননি। যেন এর মধ্যে বিশেষ কোন বাহাদুরী আছে এমনভাবে বলে বেড়ান। জ্ঞানবাবুকেও একবার বলেছিলেন, কিছুই তো জীবনে দেখলে না জ্ঞান, চলো একবার...

জ্ঞানবাবু হেসে বলেছিলেন, কাঞ্চনেই অতৃপ্ত আমার, কামিনীতে নয়।

সারাজীবন থিয়েটারপাগল মানুষ। তাই রিহার্সালে না গিয়ে পারেন না। দু'একটি মেয়ে আসে। নিজের নিজের পার্ট করে, চলে যায়। তাদের সম্পর্কে বাইরে দু'চার কথা শুনেছেন,কিন্তু জ্ঞানবাবু জানেন, সব মিথ্যে। রিহার্সালের সময়টুকু'তে লক্ষ করে দেখেছেন। নেহাৎ অভাবের সংসার চালাবার জন্যেই তারা

সামান্য কিছু অর্থের লোভে আসে। তাই তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই তাঁর।

অরুণ বক্সীর মত দু'একটি ছোকরা তাদের সঙ্গে হয়তো অভিনয়ের ছলে হাসি-ঠাট্টা করে, অকারণ হাত চেপে ধরে, গায়ে গা ঠেকায়।

গা-সওয়া হয়ে গেছে অ্যামেচার পার্টির অভিনেত্রীদের। চোখের তির্যক বাণ কিংবা চতুর কৌশলে তারা সে-সব এড়িয়ে যেতে জানে।

শুধু কখনো কখনো জ্ঞানবাবুকে গম্ভীর গলায় হাঁক ছাড়তে হয়, ফাজলামি বন্ধ করো অরুণ।

বলেন, আবার মাঝে মাঝে ঢিলেও দেন। তারুণ্যের ধর্মকে অস্বীকার করে লাভ কি। একটু রসিকতা, হাসাহাসি, দুটো কথা—ছুতোনাতায় ঈষৎ স্পর্শ। এর মধ্যে যদি তৃপ্তি পায় ছেলেগুলো, আপত্তি নেই জ্ঞানবাবুর। কিন্তু ভদ্রঘরের ক'টি মেয়ে দায়ে পড়ে এপথে এসেছে যখন, তাদের মান-অপমানের দায়িত্ব নিতে হবে বৈকি। তাই কোনদিনই কাউকে মাত্রা ছাড়াতে দেন না।

কিন্তু বুড়ো রামেশ্বরবাবুকে সহ্য করতে পারেন না। বলেন, ব্যাটা ঘুষ নেয় না বলে কি স্বর্গে গেলে ভগবান ওকে চেয়ার এগিয়ে দেবে?

অরুণ বক্সী হাসে। বলে, আপনার জ্ঞানদা, বড় বেশি শুচিবায়ু। একটু ফুর্তিফার্তা...

জ্ঞানবাবু চটে যান। বলেন, ল্যাজে লোম গজাচ্ছে আজকাল, তাই না?

তারপর পানের ডিবে থেকে গিন্নীর সাজা গোটা চারেক ক্ষুদে সাইজের পান গালে পুরে বলেন, বিয়ে করে ফেলো একটা, সব নাচনকোঁদন বন্ধ হয়ে যাবে।

অরুণ বক্সী এতকাল কথাটা শুনেছে, প্রতিবাদ করেনি। শুধু হেসেছে।

কিন্তু সেদিন দুম করে বলে বসলো, কেন দাদা, নিরুপমবাবুকেই দেখুন না।

গুম্ হয়ে গেলেন জ্ঞানবাবু। সত্যি, নিরুপমকে একেবারেই বুঝতে পারছেন না। নিরুপমের ছোট্ট মেয়েটি হারিয়ে যাওয়ার খবর যেদিন প্রথম শুনেছিলেন অদ্ভুত এক মমতায় ভেঙে গিয়েছিল তাঁর মন। আহা, সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি। নিজে দেখেননি অবশ্য কোনদিন, কিন্তু আপিসের দু'একজনের মুখে শুনে-ছিলেন। আপিসের সকলেই দুঃখ পেয়েছিল।

নিরুপম যেদিন প্রথম আপিসে এলো, মৃত মানুষের মুখ নিয়ে ঢুকলো, সেদিন সহ্য করতে পারেননি জ্ঞানবাবু। ছোটসাহেব নিজের কামরায় ডেকে পাঠিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, উপদেশ দিয়েছিলেন।

তারপর কবে থেকে যেন সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছিল আপিসের সকলে। কদাচিৎ কখনো আলোচনায় দু'একবার মনে পড়েছে। কিন্তু নিরুপমের জীবনে যে একটা অন্ধকার শূন্যতা প্রেতের মত তাকিয়ে আছে, মনে থাকেনি।

আজ জ্ঞানবাবুর সে কথাটা আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল।

না, দোষ নেই নিরুপমের। নিছক দুঃখ ভোলার জন্যেই দুঃখের রাজ্যে ছুটে যায় ও।

ওকে এ-পথ থেকে ফেরাতে হবে।

জ্ঞানবাবুর হঠাৎ মনে হলো, পৃথিবী সত্যিই বদলে যাচ্ছে! এতদিন এক একটা বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বাঁচতো, আজ এক একটা পাপ—এক একটা অন্যায় যেন প্রতিটি মানুষের সঙ্গী হতে চাইছে। অবিশ্বাস তার সঙ্গী।

ছুটির পর তাই সিঁড়ির মোড়ে এসে নিরুপমের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

লিফট বেয়ে অফিসারের দল নেমে যাচ্ছে। বাধানিষেধ নেই, কেরানীরাও ও লিফটে যেতে পারে। তবু বড় একটা কেউ যেতে চায় না। সবাই বুঝতে পারে লিফটম্যান তাদের কেমন একটা তাচ্ছিল্য করে। যেন কেরানীদের কোন অধিকার নেই লিফটে ওঠার। কিংবা তাদের উপস্থিতি ঘটলে লিফটম্যানেরই মর্যাদার হানি হয়। একদিন তো কার সঙ্গে যেন মাইনের অঙ্ক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করার ছলে জানিয়ে দিয়েছিল, বাবুজীর চেয়ে সে দশ টাকা কম পায়, সংসার চালাবে কি করে।

লিফটে জায়গা থাকলেও সেটা ওপর থেকে নামার সময় দাঁড়ায় না, ওঠার সময় তাড়াতাড়ি উঠে যায় তাদের ফেলে রেখেই। তাই জ্ঞানবাবু অনেককাল আগেই ওপথ ছেড়ে দিয়েছেন। সিঁড়ির মোড়ে তাই অপেক্ষা করছিলেন।

নিরুপম হয়তো ওঁকে লক্ষ করেনি।

জ্ঞানবাবু নিরুপমকে দেখতে পেয়েই হাসলেন।—আজ আর ছাড়ছি না। চলো, রিহার্সাল দেখতে যাবে আজ।

—রিহার্সাল? জ্ঞানবাবুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বললে, আরেক-দিন জ্ঞানদা।

—উঁহু, আজই।

নানান ওজর ওজুহাত দেখাবার চেষ্টা করলো নিরুপম। কিন্তু জ্ঞানবাবু নাছোড়বান্দা।—হয় তুমি আমার সঙ্গে চলো, আর নয়তো আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। সে হাসি দেখে বিস্মিত হলো নিরুপম, ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ভয় ভয় লাগলো।

কি আশ্চর্য। নিরুপম নিজেই বুঝতে পারে না, আজকাল কেন ও সকলকে ভয় পায়। লজ্জা পায়। প্রথম যেদিন সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে সেই গলির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন কোন ভয় ছিল না, লজ্জা ছিল না, দুশ্চিন্তা ছিল না। কারো কাছ থেকে নিজেকে গোপন করার কথা মনেও আসেনি।

কিন্তু কবে থেকে যেন সব কিছু গোপন করতে চেয়েছে ও।

তাই ওই গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালেই ভয় আর লজ্জা এসে গ্রাস করেছে ওকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ ওকে লক্ষ করছে কিনা নিঃসংশয় হতে চেয়েছে।

জ্ঞানবাবুর কথায় ও ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠেছিল। তাই সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ঠিক আছে, যাবো।

—হুররে। বলে চিৎকার করে অরুণ বক্সীকে ডাক দিলেন জ্ঞানবাবু।

জ্ঞানবাবুর পিছনে পিছনে রিহার্সালের ঘরটিতে এসে পৌঁছলো নিরুপম।

আপিসপাড়া থেকে বেশ খানিকটা দূরে। একটা আঁকাবাঁকা নোংরা গলির মধ্যে জীর্ণ বিবর্ণ বাড়ি। দেয়ালে শ্যাওলা, ঢোকার মুখেই ডাস্টবিন উপচে-পড়া যত রাজ্যের নোংরা। পাশেই একটা মেসবাড়ি, ফেততা দিয়ে কাপড় পরে জনকয়েক ছোকরা জানালা থেকে এ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটি ঘরে এসে বসলো নিরুপম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আশেপাশের ঘর থেকে রিহার্সালের চিৎকার কানে এলো। কোন ঘরে উচ্চস্বর গুলতানি।

ঘরের মধ্যে পুরু ধুলো, সতরঞ্চি বিছোনো। কয়েকজন ইতিমধ্যেই এসে

গেছে। তারা নিরুপমকে দেখে হৈ-হল্লা করে উঠলো।

লাজুক লাজুক মুখে এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো নিরুপম। ঘরটির চার পাশে তাকিয়ে দেখলো। ভাঙা পুরোনো বাড়ি, দেয়ালের একদিকে ফুটো ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে রীতিমত একটা মানচিত্র আঁকা হয়ে গেছে। বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের খানকয়েক ছোট বড় বাঁধানো ছবি একদিকে। দেয়ালে চুনকাম হয়নি বহুকাল, তাই পেন্সিলে বড় বড় করে লেখা গোটাকয়েক নাম, ভিন্ন ভিন্ন হাতে লেখা। তার মধ্যে কয়েকটি মেয়ের নাম। কারো চোখ পড়ে না সেদিকে, মুছে দেয়ার কথাও ভাবেনি কেউ।

নামগুলি একে একে পড়লো নিরুপম, ক্যালেণ্ডারের ছবিটা দেখলো: কড়িবরগা।

ওদিকে নাটক সম্পর্কে আলোচনা, রসিকতা, হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গেছে। ছোট ছোট কানাকানির দলে বিভক্ত হয়ে গেছে সকলে।

একটি বাচ্চা ছেলে কেটলি হাতে এসে দাঁড়াতেই চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলেন জ্ঞানবাবু।

আর অরুণ বক্সী কৌতুকের স্বরে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, হিরোইন আসছে না কেন?

কেউ কেউ হেসে উঠলো।

জ্ঞানবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, রিহার্সাল শুরু করে দাও।

কে একজন বললে, তা হয় না জ্ঞানদা। আসল সীনটাই তো আজ...

—একজন কেউ প্রক্সি দাও। জ্ঞনদা বললেন।

অরুণ বক্সী হাসলো।—কি যে বলেন জ্ঞানদা, হিরোইনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার দৃশ্য, প্রক্সিকে জড়িয়ে ধরে সেই ফীলিং আসবে!

জ্ঞানদাও হেসে ফেললেন, তারপর সাবধান করে দিলেন, আজ কিন্তু কেউ বাড়াবাড়ি করে বসো না।

কে একজন টিপ্পনি কাটলে, এসটিম্‌ড গেস্ট আছে আজ আমাদের। অর্থাৎ নিরুপম।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

হাসি থামতেই জ্ঞানবাবু বললেন, গেস্টের কথা কেন, ইয়ার্কি করতে গিয়ে অরুণ একটা চড় খেয়েছিল মনে নেই? আরে বাবা, এ লাইনে দু-একটা বাজে মেয়ে আছে বলে কি সবাই সমান!

চড় খাওয়ার কথায় অরুণ বক্সী এতটুকু অপ্রভিত হলো না।

সামাজিক নাটক। রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। কাহিনীটা একজনের কাছে জেনে নেবার চেষ্টা করল নিরুপম। না, তবু ভাল লাগছে না। এই ভ্যাপসা গরমে গুমোটের মধ্যে অসহ্য ঠেকছে। কিন্তু কারো দৃষ্টি নেই সেদিকে। সকলেই মেতে আছে, কিংবা ভুলে আছে। থেকে থেকেই হিরোইনের জন্যে আক্ষেপ করছে সকলে।

কখন বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল নিরুপম। সকলে মিলে হৈ হৈ করে উঠতেই তন্ময়তা ভাঙলো।

আর পরমুহূর্তেই দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো ও।

সুমিতা!

সুমিতা তখন নানা অজুহাত দিচ্ছে।—কি বিষ্টি, কি বিষ্টি, বাস বন্ধ ছিল।

সুমিতার বেশবাস, সুমিতার চটপটে ভাব, সপ্রতিভ কথাবার্তা বলার ধরন থেকে বিস্ময় বোধ করলো নিরুপম। ঠিক এই চেহারায় এখানে, সুমিতাকে কোনদিন আশঙ্কা করেনি ও। সুমিতা ওকে দেখতে পাওয়ার আগে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো ওর।

সেই প্রথম যেদিন গঙ্গার ধারে দেখা হয়েছিল সেদিনই চমকে উঠেছিল নিরুপম। চাঁপামাটির সেই সরল স্নিগ্ধ রূপ যেন শহরের স্পর্শ গায়ে মেখে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেই শীর্ণ চেহারা সুশ্রী শিথিল। কিন্তু এসব কথা ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল না সেদিন। আজ সুমিতাকে আরো উগ্র পোশাকে দেখে কেমন একটা কৃত্রিমতার শরীর বলে মনে হলো। এখানে, এভাবে —না, এ যেন সুমিতার নয়, ওর নিজেরই লজ্জা।

না, নিরুপমের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। সুমিতারও না।

অরুণ বক্সী হাসছে।—কোনদিন বাস খারাপ হয়, কোনদিন মা'র অসুখ, কোনদিন রিহার্সালে দেরী হয়ে গেল। বেশ অভিনয় করতে পারেন কিন্তু..

জ্ঞানবাবুও টিপ্পনি কাটলেন।—শুধু আসল অভিনয়ের সময় যত গোলমাল।

এদের কথাবার্তা, সুমিতার ব্যবহার—না, ঘৃণা নয়, লজ্জায় নিরুপমের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। একটা বিশুদ্ধ স্বপ্নকে ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে দেখলে যেমন হয়।

নিরুপমের ভয় হচ্ছিল কেবলই, এখনই না জ্ঞানবাবু পরিচয় করিয়ে দেন ওর, সুমিতার হঠাৎ তার দিকে না চোখ পড়ে যায়।

যা আশঙ্কা করেছিল নিরুপম ঠিক তাই ঘটলো।

জ্ঞানবাবুর দিকে তাকিয়ে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ নিরুপমকে দেখতে পেল সুমিতা। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল সে।

জ্ঞানবাবু, অরুণ বক্সী—কেউ বুঝলো না। শুধু জ্ঞানবাবু হেসে বললেন, ও আমাদের নতুন মেম্বার।

সুমিতা বা নিরুপম কেউ কোন কথা বললো না।

রিহার্সাল শেষ হলো অনেক রাত্রে। এতক্ষণ নিরুপম বা সুমিতা কেউ কোন কথা বলেনি পরস্পরের সঙ্গে। ওরা যে পরস্পরকে চেনে তার কোন আভাসই দেয়নি।

অন্য দিনের মত রিহার্সাল দিয়েছে। বার বার অভিনয় ভুল হয়েছে, সংলাপ ভুলে গেছে, কিন্তু তার গূঢ় কারণটা কেউ টের পায়নি।

অভিনয় সম্পর্কে কারই বা দুশ্চিন্তা। দু'চারজন শুধু নাটকপাগল। আর সকলেই ওই গুমোট বন্ধ ঘরের মধ্যে কয়েক ঘণ্টার মুক্তি খোঁজে। একটু আনন্দের স্পর্শ পায়, একটু রোমান্সের ছোঁয়া। হিরোইন কিংবা অন্য কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে দু-এক টুকরো চটুল রসিকতা, স্মিতহাস কটাক্ষ, কখনো নাটকের চরিত্র আলোচনার নামে একটু ঘন হয়ে বসা। কখনো অভিনয়ের ফাঁকে নিরুত্তাপ ছোঁয়া। জটিল বিক্ষুব্ধ জীবনের মেঘে ক্ষণিক বিদ্যুতের রোমাঞ্চ। গ্রীষ্মের দুপুরে ছায়াহীন পথ চলতে চলতে পানের দোকানের সঙ্কীর্ণ শেডের তলায় দাঁড়িয়ে এক বোতল ঠান্ডা সরবত খাওয়ার মত। যেন সকলেই নারীসঙ্গ-লোলুপ ভীরু কিশোরের দল।

একে একে সকলেই বেরিয়ে এলো।

একটু আগে ঝমঝম বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে জল জমেছে, লাইট-

পোস্টের আলো ভেজা কাকের মত বিষণ্ণ। ডাস্টবিন উপছে-পড়া নোংরা ছত্রাকার হয়ে গেছে বৃষ্টির জলে। ঠুনঠুন করে রিক্সার শব্দ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। আর একটা অদ্ভুত নিঃশব্দতা চতুর্দিকে। লোক-চলাচল ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

সকলেই বিদায় নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। কেউ কেউ ছুটন্ত বাসের পিছনে ধাওয়া করলো।

অরুণ বক্সী হয়তো সুমিতাকে কিছু বলছে। বাড়ি পৌঁছে দিতে চায় বোধহয়।

জ্ঞানবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, অরুণ, বাড়ি যাও এখন, অনেক রাত হয়ে গেছে।

অরুণ বক্সী জবাব দিলো, সবে তো ন'টা। বৃষ্টির জন্যে ভাবছেন অনেক রাত হয়ে গেছে।

সুমিতা কি জবাব দিলো শুনতে পেল না নিরুপম। পিছন ফিরে তাকালো না। জ্ঞানবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়ালো।

নিরুপমের কেমন যেন মনে হয়েছিল, সুমিতাও ওর পিছনে পিছনে আসবে। অরুণ বক্সীর অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে আসবে।

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে এবার গলির মোড়ের দিকে তাকালো নিরুপম। হ্যাঁ, সুমিতা আসছে। চটির ছিটে কাপড়ে লাগছে কিনা মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে।

তিনতলার ছাদের কোন একটা নিওন-আলোর বিজ্ঞাপন থেকে এক টুকরো জ্যোৎস্না ছিটকে এসে পড়েছে সুমিতার শরীরে। তার সুন্দর মুখখানা আরো সুন্দর লাগছে, ফর্সা পায়ের গোড়ালির ওপর কিছুটা অংশ ধবধব করছে।

সুমিতা কাছে এগিয়ে এলো, দাঁড়ালো কাছ ঘেঁষে। মৃদু হেসে তাকালো নিরুপমের মুখের দিকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে নিরুপম বলে উঠলো, ছি ছি, শেষে থিয়েটারে নামলে!

মুহূর্তে সংকুচিত হয়ে গেল সুমিতা। মুখ রঙ হারালো। রিহার্সালের ঘরে প্রথম যখন নিরুপমকে দেখতে পেয়েছিল সুমিতা, তখনই ভিতরে একটা অসীম লজ্জা অনুভব করেছিল ও। সঙ্কোচ বোধ করেছিল। পৃথিবীতে আর কারো কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই তার। দু' আঙুলের টুসকি দিয়ে সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারে প্রয়োজন হলে। কিন্তু একজনের কাছ থেকে সবকিছু গোপন করে রাখতে ইচ্ছে হয়েছে। অথচ...

প্রথম দিন কাশীবাবুও আপত্তি করেছিলেন, আঘাত পেয়েছিলেন। শুনে বলেছিলেন, অ্যাঁ, থিয়েটার!

বলে হঠাৎ উদাস হয়ে গিয়েছিলেন। কোন মতামত দেননি। শুধু মৌনতার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

কিন্তু নিরুপমের কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। রিহার্সাল দেখতে দেখতে রাগে জ্বলে উঠেছিল ও। আক্রোশে ফেটে পড়তে চেয়েছিল। নিরুপম যাকে গোপন হৃদয়ের পবিত্র আসনে তুলে রেখেছিল তার নিজেরও বুঝি সেখান থেকে নেমে আসার অধিকার নেই। কিংবা এতখানি বিচ্ছিন্ন দূরত্বে থেকেও তার মনে হয়েছে সুমিতার ওপর তার অধিকারের দিন শেষ হয়ে যায়নি।

তাই ক্ষোভের স্বরে নিরুপম বলে উঠলো, ছি ছি, শেষে থিয়েটারে নামলে?

সুমিতাকে ম্লান দেখালো। এভাবে কেউ বুঝি কখনো তাকে অপমান করেনি।

হঠাৎ তাই সপ্রতিভ হয়ে উঠলো সুমিতা। মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বললে,

থিয়েটার দেখায় দোষ নেই, থিয়েটার করাতেই দোষ, না?

নিরুপম চুপ করে রইলো। সুমিতা চুপ করে রইলো। কেউ কারো মুখ দেখছে না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। নিওনের আলো এসে পড়েছে ওদের ওপর। রাস্তার পথচারীদের কেউ কেউ ওদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। কিন্তু কোনদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর স্তব্ধতা ভাঙলো সুমিতা।—অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকাই বুঝি ভাল ছিল!

বিস্ময়ের চোখে তার মুখের দিকে তাকালো নিরুপম।

আর সুমিতা চাপা রাগে ফেটে পড়লো।—তুমি, তুমি কতটুকু জানো, কি জানো আমার। বিচার করতে বসার আগে একদিনও মনে হয়েছে তোমার, সুমির খবর নিই, কিভাবে আছে, কোথায় আছে?

আবেগে থরথর করে কাঁপছে তখনও সুমিতা।—তুমি সুখী হয়েছো, সুখে আছো, তোমরাই তো বিচার করবে। 'ছি-ছি-ছি-ছি', কথাটা কত সহজে বলতে পারো তোমরা।

বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল সুমিতার। গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললে, আর যেই বিচার করতে আসুক, তুমি এসো না।

নিরুপম সংযত শান্ত কণ্ঠস্বরে বললে, বাস এসে গেছে।

দোতলা বাসটা এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। নিরুপমের পিছনে সুমিতাও উঠে পড়লো।

এসপ্ল্যানেডে এসে বাস বদলাতে হয় সুমিতাকে।

বাস থামতেই উঠে দাঁড়ালো। নিরুপমও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লো। বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের হাতের ঘড়িটা মেলালো—না, রাত বেশী হয়নি।

দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু পানের দোকান আর কয়েকটা চায়ের দোকান খোলা আছে তখনো। বাসের অপেক্ষায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। বৃষ্টি-ধোয়া পীচের রাস্তায় আলো পড়ে চকচক করছে। তীব্রগতিতে ট্যাক্সি ছুটছে। হেডলাইটের আলো ছুটছে।

নিরুপম ধীরে ধীরে বললে, তোমার কি দেরি হয়ে যাবে? একটু বসবে কোথাও গিয়ে?

স্মিত হাসি ফুটলো সুমিতার মুখে চোখে। ঘাড় নেড়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে সায় দিলো ও। দুজনে এসে একটা রেস্তরাঁয় বসলো।

একপাশে জনতিনেক লোক বসে বসে শূন্য চায়ের পেয়ালায় সিগারেটের ছাই ঝাড়ছে। বয়দের দল ক্লান্ত। ছুটি-ছুটি ভাব এসেছে তাদের।

কেবিনগুলো একেবারে খালি, তবু বাইরের একটা টেবিলেই মুখোমুখি বসলো দুজনে।

সুমিতা হঠাৎ যেন সেই চপল কিশোরীর দিনটিতে ফিরে গেছে। চামচটা তুলে নিয়ে নিঃশেষ চিনির বাটিটায় ঠুনঠুন করে বাজাচ্ছে। নিরুপম সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে ধরতেই মৃদু হেসে তার হাত থেকে দেশলাইটা কেড়ে নিয়ে ফস করে একটা কাঠি জ্বাললো সুমিতা। সিগারেট ধরিয়ে দিলো নিজের হাতে। জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে রইলো যতক্ষণ না আঙুলে তাপ লাগে।

কাঠিটা পুড়ে শেষ হতেই সেটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে সুমিতা ঠোঁট চেপে

হাসলো।—খুব রেগে গেছ আমার ওপর, তাই না?

—রাগ! বেয়ারা এসে দাঁড়াতে তাকে কি অর্ডার দেবে প্রশ্ন করলো নিরুপম। সুমিতা বললো, তোমার যা খুশী। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল। নিরুপম তখন ধীরে ধীরে বললে, আমি রাগ করলেই বা তোমার কি যায় আসে!

সুমিতা মাথা নীচু করলো। কোন উত্তর দিতে পারলো না।

অনেকক্ষণ মুখোমুখি দুজনে চুপচাপ বসে রইলো।

বয় খাবার রেখে গেল। দুজনেই নিঃশব্দে ছুরি আর কাঁটা তুলে নিলো। ক্ষিদেয় পেট চিনচিন করছিল সুমিতার, তবু খুব ধীরে ধীরে খেতে শুরু করলো ও। যেন অনিচ্ছার সঙ্গে খেতে হচ্ছে।

নিরুপম প্রশ্ন করলো, বাচ্চু কত বড় হয়েছে? কি পড়ছে? আর সান্তু?

সুমিতা সংক্ষেপে জবাব দিলো।

—তোমার বাবা?

সুমিতা হাসলো।—তেমনি আছেন। কালি নিয়ে—

খাওয়ার পর বাসের টিকিটের উল্টোপিঠে সুমিতা তার ঠিকানা লিখে দিলো। —আসবে একদিন?

ঠিকানাটা সযত্নে ব্যাগের ভিতরে রেখে দিল নিরুপম।

—যাবো।

—বাবা খুব খুশী হবে, মা-ও।

নিরুপম মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুমিতার মুখের দিকে তাকালো। প্রশ্ন করলো, তুমি?

ঈষৎ লজ্জায় সুমিতার মুখখানা আরো সুন্দর দেখালো। ও কোন উত্তর দিলো না।

তারপর বললে, কবে কি রিহার্সাল থাকে, একটা চিঠি দিয়ে দিও যাবার আগে, কেমন?

নিরুপম ঘাড় নাড়লো। তারপর হাত বাড়িয়ে সুমিতার হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিলো।—কিছু মনে করো না, দুঃখ পেয়ো না। হঠাৎ রাগ হয়েছিল...

সুমিতা ধীরে ধীরে বললে, অনেকে অনেক কথা ভাবে, তুমি অন্তত আমাকে বিশ্বাস করো।

বাইরে বেরিয়ে এলো দুজনে। বয়কে একটু বেশী বকশিশ দিয়ে ফেললো নিরুপম।

বাস ছেড়ে দিতেই জানালা দিয়ে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় সুমিতা নিরুপমকে বললে, আসবে তো? ছোট কথা, কিন্তু তার মধ্যে হৃদয়ের তাপ অনুভব করলো নিরুপম।

সুমিতা চলে যাওয়ার পর সমস্ত শরীর তার আনন্দের গুঞ্জন তুললো।

'ছি ছি, শেষে থিয়েটারে নামলে!'

কথাটা মনে পড়তেই আত্মধিক্কারে নিজেকে ছোট মনে হলো নিরুপমের। নিরুপম প্রশ্ন করেনি, সুমিতা প্রকাশ করেনি, তবু ও কল্পনা করেছে কী অসীম দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে সুমিতাকে। আরো সহজ পথে পা না বাড়িয়ে ও বরং আত্মসম্মানের পথই তো বেছে নিয়েছে।

অকস্মাৎ মনে হলো, সুমিতা যদি এই ব্যর্থতার স্তরে না থেকে বিখ্যাত হয়ে উঠতো! অভিনেত্রী জীবনের সাফল্য দেখতে পেত। যদি খ্যাতি আর ঐশ্বর্যে

উজ্জল হয়ে উঠতে পারতো, তা হলে কি এভাবে ধিক্কার দিতে পারতো নিরুপম? তা হলে হয়তো এভাবে মুখোমুখি বসতে পেত না, কথা বলতে পেত না, রঙিন রোমাঞ্চ বুনতে পেত না হারানো অতীতকে সাক্ষী রেখে। লক্ষ জনের ভিড়ে তার মুখ কোথায় হারিয়ে যেত কে জানে।

সাফল্যের পথ অনেক বেশী বঙ্কিম কুটিল। সুমিতার অভিনয়-জীবনের ব্যর্থতার জন্যে মনে মনে খুশী হলো নিরুপম। এই ব্যর্থতাই যেন সুমিতাকে অম্লান অমলিন রেখেছে। এই ব্যর্থতাই সুমিতাকে নিরুপমের কাছে এনে দিয়েছে।

৯

বুকের মধ্যে গানের সুর গুনগুন করছিল। মা দরজা খুলে দিতেই অস্ফুট আনন্দটুকু গানের কলি হয়ে ফুটে উঠলো। গানের কলিটা ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরে ঢুকলো সুমিতা, মা পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো চৌকাঠের কাছে।

—খাবি তো!

কি ভাবছিলো সুমিতা কে জানে, হয়তো নিরুপমের কোন কথা, কিংবা তার আহত মুখখানার ছবি ভাসছিল চোখে, তাই সুমিতার মুখে তখনো খুশি-খুশি হাসিটুকু লেগেছিল।

ঘাড় নেড়ে বললে, বাঃ রে, খাবো না?

আনন্দময়ী কিছু বলতে চাইছিলেন। সুযোগ খুঁজছিলেন। এর আগে একদিন সুমিতা ফিরতে না ফিরতে বলে ফেলেছিলেন কথাটা, আর দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল সুমিতা। রাতের খাওয়াটাই মাটি হয়ে গিয়েছিল তার। তাই সাবধান হয়ে গেছেন ইদানীং।

মেয়ের মেজাজ বুঝতে পারেন না আনন্দময়ী। কোনদিন বেলা অবধি বিছানায় গড়িয়ে কাটিয়ে দেয়, কোনদিন রাত্রে ফিরে এসে খেতে চায় না। বলে, খেয়ে এসেছি। আবার এক একদিন সকালে নিজেই উনোন ধরায়, মা'র হাত থেকে কড়াই-খুন্তি কেড়ে নেয়।

আনন্দময়ী তাই নিঃশব্দে সরে এসে ভাত বাড়তে গেলেন। আর সুমিতা তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে এসে বললে, সরো তো তুমি, আমি বেড়ে দিচ্ছি। শুধু নিজের নয়, মা'র ভাতটাও বেড়ে দিলো সুমিতা। আসন দিলেও তো মা সেটা সরিয়ে দিয়ে মেঝেতে বসবে। তাই ভাত বেড়ে গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে বললো, এসো।

তারপর অনুযোগের স্বরে বললে, তুমি তো খেয়ে নিতে পারো, কখন ফিরি তার ঠিক নেই। রিহার্সাল দিতে দিতে দেরী হয়ে যায়, আর যেদিন স্টেজে ওঠে বই, সেদিন তো কথাই নেই।

আনন্দময়ী খুশী হলেন মেয়ের কথায়, মেয়ের ব্যবহারে।

বললেন, এমন কি আর দেরী।

তারপর খেতে খেতে এক সময় বললেন, আজ আবার শ্রীনাথ এসেছিল।

মুহূর্তে সমস্ত আনন্দ উবে গেল সুমিতার মুখ থেকে। হাত থেমে গেল।

আনন্দময়ী একটু থেমে বললেন, অনেকক্ষণ বসেছিল।

—তাড়িয়ে দিলে না কেন। রাগে ফেটে পড়লো সুমিতা।

আনন্দময়ী চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, তোর বাবা ছিল যে। কি বলতে কি বলে বসবে শ্রীনাথ...

বাবা! এই একটি আত্মভোলা মানুষকে দুঃখ দিতে চায় না সুমিতা, লজ্জা থেকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু শ্রীনাথকে আর কত সহ্য করবে সে। অসহ্য, অসহ্য।

আনন্দময়ী ধীরে ধীরে বললেন, কাল সকালে আসবে বলে গেছে।

চমকে চোখ তুলে তাকালে সুমিতা। বললে, এলে তাড়িয়ে দিয়ো।

আনন্দময়ী হাসবার চেষ্টা করলেন।—মুখে তো বলিস, আবার তুই-ই তাকে মাথায় করে রাখিস।—

—কি করি? হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো সুমিতা।—আমি তাকে মাথায় করে রাখি? না তোমরাই তাকে আদর করে বসিয়ে রাখো।

আনন্দময়ী এক মুহূর্ত ভাবলেন জবাব দেবেন কি দেবেন না। যে কথাই বলবেন, তাতেই রেগে উঠবে সুমিতা। অনেকবার দেখেছেন। মেয়ের মন যুগিয়ে কথা বলতে গিয়েও ফল হয়েছে উল্টো। তাই আজকাল চুপ করে যান।

তবুও না বলে পারলেন না।—তুই সেদিন টাকা দিলি না ওকে? সম্পর্কই যখন নেই তখন ওটুকুই বা কেন!

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে পড়লো সুমিতা। কিছুক্ষণ কি ভাবলো নিজের ঘরটিতে এসে। ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে গিয়ে দাঁড়ালো মা'র কাছে।

মা অন্তত সেটুকুই ভাবুক। কিন্তু টাকার জন্যে হলে কি শ্রীনাথের ওপর এত রাগতো ও!

আনন্দময়ী ঝাঁটা হাতে রান্নাঘর ধুচ্ছিলেন। ফিরে তাকালেন।

সুমিতা নোটটা হাত বাড়িয়ে দিলো। কাল এলে ওকে দিয়ে দিও। আমি তার আগেই বেরিয়ে যাবো।

আনন্দময়ী ঝাঁটা ফেলে হাত ধুলেন। নোটখানা আঁচলের খুঁটে বাঁধলেন।

সুমিতা আর কোন কথা না বলে সরে এলো।

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ও তখন ভিতরে ভিতরে গুমরে মরছে। একটা গোলক-ধাঁধার পথ ধরে নেমে গিয়ে অতুল ঐশ্বর্য হাতে পেয়েছে ও, কিন্তু সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। একটা রঙিন প্রজাপতি হতে পারতো যে, সে যেন গুটিতে আবদ্ধ একটি অন্ধ কীট, ক্ষোভে আক্রোশে শুঁয়োপোকার মত বিষাক্ত হয়ে উঠতে চাইছে। মুক্তির পথ খুঁজছে।

হঠাৎ এক একদিন এসে হাজির হয় শ্রীনাথ। কোন দিন বলে, গোটাকয়েক টাকার জন্যে এলাম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম নিয়ে যাই, যদি দরকার পড়ে কাল দিয়ে যাবো।

স্বামী পেয়েছিল, ঘর পেয়েছিল সুমিতা। ভেবেছিল, সময়ের স্নিগ্ধ প্রলেপ সব জ্বালাযন্ত্রণা দূর করে দেবে। ভেবেছিল, নিরুপমকে হারানোর দুঃখ ভুলতে পারবে।

কিন্তু ছ'টা মাস পার না হতেই সব ভুল ভেঙে গেল। মা বলেছিল, খুব ভাল

ছেলে, ভাল চাকরি করে। বাবা বলেছিল, ছেলেটির বেশ শান্ত স্বভাব।

একটু একটু করে সব ভুল ভেঙে গেল সুমিতার। তবু সহ্য করেছে, অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে। সব কিছু লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে মা আর বাবার কাছ থেকে, মিছিমিছি তাদের কষ্ট দিয়ে কী লাভ।

ইছাপুরের সেই বাসাটার কথা ভাবলে এখন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অথচ তখন ওরই চার-দেয়ালের মধ্যে নিজেকে সুখী করতে চেয়েছিল। শ্রীনাথকেও।

একটা মোটর সারাবার কারখানা ছিল বাসার কাছেই, দিনরাত ঠুকঠাক শব্দ রাত বারোটা অবধি। মোটরের হর্ন। কোন কোনদিন কল বিগড়ে গিয়ে হর্ন বেজে যেত একটানা। থামতো না। কুলি মিস্ত্রীদের বস্তি আশেপাশে।

প্রথম প্রথম সুমিতা বুঝতে পারেনি শ্রীনাথ কি কাজ করে। এক একদিন একটা অদ্ভুত নাম বলতো। তার কোনটারই মানে বুঝতো না ও। জিজ্ঞেস করতো, কাজটা কি তাই বলো না।

শ্রীনাথ হেসে বলতো, সে তুমি বুঝবে না।

সুমিতা না বুঝুক, শ্রীনাথের বুড়ি পিসীমা বুঝতো। বিধবা বুড়ি গামছা পরে উঠোনের একপাশে আলাদা রান্না করতো, আলাদা খেতো। আর সদাসর্বদা বিড়বিড় করতো নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে, শ্রীনাথের মৃত বাপের বিরুদ্ধে, শ্রীনাথের বিরুদ্ধে।

সাদা শনের মত এক পিঠ চুল, কাঠির মত চেহারা। প্রথম দিন দেখে ভয় পেয়েছিল সুমিতা। ডাইনির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করেছিল বুড়ি, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল শ্রীনাথের বাবার কথা বলতে বলতে।

তারপর কখন থেকে যেন বুড়ি পিসশাশুড়িকে ভাল লেগে গিয়েছিল তার। হয়তো শ্রীনাথ বুড়ির সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করতো, তাকে গালাগাল দিতো, দূর হয়ে যেতে বলতো বলেই বুড়ির ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল।

বুড়িই একদিন দুপুরে, শীতকাল তখন, রোদে পিঠ দিয়ে বসে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ ডাকলো সুমিতাকে।—বউ, ও বউ।

সুমিতা এসে দাঁড়ালো। বুড়ি ইশারায় কাছে বসতে বললো। আর সুমিতা তার পাশে উবু হয়ে বসতেই তার পিঠে হাত রেখে বুড়ি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, গয়নাগাঁঠি সব সামলে রেখো বউ। ছিনাথ পেলেই নিয়ে গিয়ে জুয়ো খেলে উড়িয়ে দেবে।

জুয়ো!

একে একে সব জানতে পারলো, বুঝতে পারলো সুমিতা। বিয়ের দিনকয়েক আগেই শ্রীনাথের চাকরি গেছে। জুয়ো খেলেই সর্বস্ব গেছে তার, চাকরিটাও। মাঝে-সাঝে উটকো কাজ করে ইলেকট্রিকের, দু' পাঁচ টাকা পায় কোন কোন দিন। সেই টাকাই প্রথম প্রথম এনে দিতো সুমিতাকে। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ি পিসীমা সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু তখন বিশ্বাস করেনি ও। যখন বিশ্বাস হলো তখন আর হাতে-কানে বিশেষ কিছু নেই।

কিছুই যখন পেল না ও, দু'টুকরো সোনার মধ্যে কি পাবে সুমিতা। কিন্তু হ্যাঁ, নিরুপমের দেওয়া রুপোর ব্রোচটা শ্রীনাথের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল শুধু। নিজের হারানো হৃদয়টুকু যেন ওর মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

তবু শ্রীনাথকে একটা চাকরি খুঁজে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে সুমিতা। উপদেশ দিয়েছে জুয়ার নেশা ছেড়ে ভাল হবার। শ্রীনাথ তার ভালমানুষির সুযোগ নিতে ছাড়েনি।

শ্রীনাথ মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছে, চাকরি তো একটা ঠিক হয়েছিল, ব্যাটা কিছু ঘুষ চায় যে।

কত মাইনে কি চাকরি,—সব জিজ্ঞেস করে নিঃসন্দেহ হয়েছে সুমিতা, তারপর হাতের কিংবা কানের সোনাটুকুও খুলে দিয়েছে তার হাতে।

বুড়ি পিসীমা চোখের সামনে সব দেখেও চুপ করে থেকেছে। কিছু বলতে গেলেই হয়তো ঘাড় ধরে বের করে দেবে। শ্রীনাথ চলে যাবার পর বিড়বিড় করেছে। দাসীর কথা বাসি ঠেকে রে বউ, এখনো শোন। সব গেছে। সব যাবে।

শ্রীনাথ ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে অনেক রাতে। বলেছে, সব ব্যাটা জোচ্চোর, ঘুষের টাকা মেরে দিয়ে অন্যকে চাকরিটা দিয়ে দিলে।

আবার কখনো বলেছে, বড়বাবু তো কথা দিয়েছে, দেখি এখন ম্যানেজার কি বলে।

এদিকে উনোনে আঁচ ধরানো হয় না, হাঁড়ি কড়াই নড়ে না এমন অবস্থা। সুমিতার হাতে গলায় তখন আর কোন সম্বলই নেই।

এমন সময় বাবার চিঠি পেলো সুমিতা। বাবার ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে, চাকরি গেছে। কোলকাতায় কি একটা সামান্য মাইনের কাজ পেয়ে চলে আসছে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে কেঁদে ফেললো সুমিতা।

শ্রীনাথ তার হাবভাব দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, কেউ মরেটরে গেল নাকি?

সুমিতা চিঠিটা এগিয়ে দিলো, এই দ্যাখো। তুমি, তুমি যেমন করে পারো একটা চাকরি জুটিয়ে নাও। তা না হলে বাবার কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে!

শ্রীনাথ পড়লো চিঠিখানা। হাসলো।—আরে সে কোলকাতা আর এ ইছাপুর। এলেই হলো নাকি।

কি আর বলবে সুমিতা। বিয়ের পর একবারই চাঁপামাটি গিয়েছিল, তারপর চিঠির জবাবই দেয়নি বহুবার। বাবাও একবার এসে আর আসেনি। হয়তো সবই জলের মত পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন কাশীবাবু।

কিন্তু কতটুকুই বা জানতে পেরেছিলেন তিনি। এখন যে সুমিতা নিজেও অনেক কিছু জানতে পেরেছে।

শ্রীনাথের হাত দু'খানা ধরে অনুনয়ের স্বরে সুমিতা বললে, একটা চাকরি তুমি জোগাড় করে নাও, যত তাড়াতাড়ি পাও। তোমার পায়ে পড়ি।

এমনভাবে বললো সুমিতা যে, শ্রীনাথও নরম হয়ে গেল। সুমিতার ওপর হঠাৎ যেন মমতা বোধ করলো ও। আর কোন বাসনা নেই, ক্ষোভ নেই, শুধু বাপের কাছ থেকে নিজের অবস্থা গোপন করতে চায় সুমিতা।

শ্রীনাথ ওর পিঠের ওপর হাত রাখলো।—দেখি।

—দেখি না, আমি জানি তুমি চেষ্টা করলেই পারো। সজল দুটি চোখ মেলে সুমিতা বললো, তুমি, তুমি বুঝবে না, তোমার সম্পর্কে কেউ খারাপ ভাবলে বাপের বাড়িতে কি লজ্জা!

বুড়ি পিসীমা কাছেপিঠেই কোথায় ছিল, কান পেতে শুনছিল হয়তো। এগিয়ে এসে হাত নেড়ে নেড়ে বললে, শুধু লজ্জা নয় লো বউ। পাড়াপড়শির

কাছে হাত পেতে পেট চলবে কদ্দিন, শুনি।

অন্যদিন হলে শ্রীনাথ চেঁচামেচি করতো, বুড়িকে ধমক দিতো। কিন্তু কিছুই বললো না সে।

জামাটা মাথায় গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলো শ্রীনাথ।

দরজা খুলে দিয়ে সুমিতা প্রশ্ন করলো, পেলে কোন খবর?

শ্রীনাথ হাসলো।—খবর একটা আছে।

—তোমার চাকরির?

—আমার নয়, তোমার। বলে আবার হাসলো সে।

হতাশায় বিস্ময়ে সুমিতা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। ও চাকরি করবে? ঘরের বউ বাইরে গিয়ে চাকরি করবে? শ্রীনাথ ঠাট্টা তামাশার সময় পেলো না?

না, ঠাট্টা নয়। শ্রীনাথ একে একে সব খুলে বললো। কোলকাতায় একটা চায়ের দোকানের কাজ। ভাল মাইনে, ভাল বকশিশ। যে ক'দিন শ্রীনাথ চাকরি না পাচ্ছে, মন্দ কি। তারপর শ্রীনাথ চাকরি পেলে...

—তাছাড়া তুমি তো একা নও, আরো কত ভদ্রঘরের মেয়ে কাজ করছে সেখানে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সুমিতা।

কোন উত্তর দিতে পারলো না।

পরের দিন বুড়ি বাড়ি বাড়ি ঘুরে এসে বললে, কেউ দিলে না বউ, কেউ এক মুঠো আটা অবধি দিলে না। সব বাড়িতে গিয়েছিলাম।

বলেই ভগবানের বিরুদ্ধে, যমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো বুড়ি। —বাড়ি বলিহারি বউ, সব ক'টাকে একে একে নিয়ে গেল, এখন এ বুড়িকে যমেও ছুঁতে চায় না।

অনেকক্ষণ ধরে বুড়ির কথাগুলো শুনলো সুমিতা, হেঁসেলের শূন্য হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো। শেষে বুড়ির কাছে এসে তার চাকরির কথা বললো।

—নিয়ে নে বউ, নিয়ে নে। উল্লাসে অধীর হয়ে বুড়ি জড়িয়ে ধরলো সুমিতা-কে।—এখনই নিয়ে নে। তবু নিজে বাঁচবি।

চায়ের দোকানের সেই কাজটা শেষ অবধি নিয়েছিল সুমিতা। কিন্তু রাখতে পারেনি।

দিনকয়েক পরেই রাগে ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে, লজ্জায় ভেঙে পড়ে বলেছিল, এ কোথায় নিয়ে গিয়ে চাকরি দিলে আমায়।

মুচকি মুচকি হাসছিল শ্রীনাথ।—কেন, কি হলো আবার।

—না না। ওখানে আমি আর যাবো না। দোকানের মালিকটা ভেবেছে কি! না না, আমি ওখানে আর যেতে পারবো না।

শ্রীনাথ তখনো হাসছে।—আরে বাবা পুরুষ মানুষকে কাজ করতে গিয়ে গালাগালি খেতে হয়, চড়চাপড়ও খেতে হয় কখনো কখনো। মেয়েমানুষদের নয় স্রেফ একটু আদর করে।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলো শ্রীনাথ।

আর সুমিতা স্থিরদৃষ্টিতে শ্রীনাথের দু চোখের দিকে তাকালো। ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা—কী ছিল না সে-দৃষ্টিতে! শ্রীনাথকে বার বার ক্ষমা করে এসেছে সুমিতা, আশা রেখেছে ভাঙা সংসার আবার গড়ে তুলবে, কিন্তু সেই প্রথম শ্রীনাথের বিশ্রী বীভৎস চেহারাটা তার চোখের সামনে মুখোশ খুলে অট্টহাসে হেসে উঠলো। কী

কুৎসিত সে হাসি। সুমিতা আতঙ্কে শিউরে উঠলো তার দিকে তাকিয়ে।

একটা চাপা ক্রোধে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে সুমিতা। অসহ্য লেগেছে শ্রীনাথকে। ভেবে পায়নি, এই মানুষটাকে কি করে সে দিনের পর দিন ক্ষমা করে এসেছে। কেন এতকাল তার ভিতরের চেহারাটা দেখতে পায়নি।

সুমিতার জ্বলন্ত চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে নির্লজ্জ হাসি হেসে সরে গিয়েছিল শ্রীনাথ। আর সুমিতার ইচ্ছে হয়েছিল নৃশংস মানুষটার কাছ থেকে যেখানে খুশী পালিয়ে যায়, যেদিকে দু'চোখ যায়। স্বামী নয়, যেন একটা হিংস্র পশু তার দিকে বীভৎস চোখে তাকিয়ে আছে।

বাবার চিঠিখানা আরেকবার খুলে পড়লো সুমিতা। ঠিকানাটা দেখলো। একটা রাস্তার নাম শুধু, একটা বাড়ির নম্বর। অচেনা অজানা। তবু তার মধ্যেই আশ্রয়ের ইশারা দেখলো।

কিন্তু, না, চিঠিখানার মধ্যে কোথায় যেন ব্যর্থতার হতাশার সুর আবিষ্কার করেছিল সুমিতা। জীবনের সব বিশ্বাস ভেঙে যাওয়াব কান্না। সুমিতা ভাবলো, তার নিজের জীবনের চাপা কান্নাকে বাবা-মা'র দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে কি লাভ। তবু একটা সান্ত্বনা তো তাদের আছে, সুমিতা সুখী!

সুখী! হাসলো ও নিজের মনেই।

আগের মতই, শ্রীনাথ আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। কেন কে জানে। থেকে থেকেই হঠাৎ উধাও হয়ে যায়, পর পর কয়েকটা দিন কোন খবরই রাখে না সুমিতার। তারপর হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়।

কখনো মিথ্যা স্তোক দিয়ে সুমিতার কাছে হাত পাতে, গোটাকয়েক টাকা পেলে একটা ছোট্ট কণ্ট্রাক্ট পেতাম। কখনো শ্রীনাথ হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার পর সুমিতা আবিষ্কার করে, মামীমার দেওয়া কানের দুলজোড়া নেই।

সব সহ্য করেছে সুমিতা। শুধু একটা মিথ্যা স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছে। শ্রীনাথ বদলে যাবে। শ্রীনাথ ভাল হবে। চাকরি জুটিয়ে নিয়ে একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে চাইবে।

কিন্তু সেদিন ট্রাংকটা খুলে কেন কি জানি কাপড়ের নীচে হাত বাড়িয়ে কি খুঁজলো। কপালের রেখা কুঁচকে উঠলো সুমিতার। একে একে সব কাপড় নীচে নামিয়ে পুরানো খবরের কাগজটাও তুলে ফেললো।

না, নেই। সমস্ত মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। সমস্ত শরীর শিথিল শক্তি-হীন। এর চেয়ে মূল্যবান কোন কিছু কখনো হারায়নি বুঝি সুমিতা। এর চেয়ে মূল্যবান কিছুই বুঝি কখনো পায়নি সে।

নিরুপমের দেওয়া সেই রুপোর ব্রোচটা নেই। যা ছিল তার গোপন মনের একান্ত নিজস্ব স্মৃতি, সেইটুকুকেই যেন শ্রীনাথ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে।

নেই, রুপোর ব্রোচটা নেই।

নিরুপমের হাত থেকে কাঁপা কাঁপা হাতে নিয়ে যেটা বুকের মধ্যে, বুকের সবচেয়ে কাছে সেদিন লুকিয়ে রেখেছিল। মাকে বলেনি, বাবাকে বলেনি, বাচ্চুকে দেখায়নি। একটি আনন্দের ইতিহাস সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে শুধু নিজের জন্যে গোপন করে রেখেছিল।

শ্রীনাথ যেদিন ফিরলো, সুমিতা সেদিন শুধু কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালো।

রুঢ় নির্মম স্বরে সুমিতা বললো, আমার ব্রোচ!

সুমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীনাথ নির্লজ্জের হাসি হাসতে গিয়েও পারলো না। এমন দৃষ্টিতে সুমিতা তার দিকে কখনো বুঝি তাকায়নি, এমন নির্মম স্বরে কথা বলেনি।

শ্রীনাথ অপ্রতিভের মত বলতে চাইলো, ভারী তো পাঁচটা টাকা দাম।

—কি বললে? একটা ক্ষিপ্ত শ্বাপদ যেন সুমিতার শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো।

বুড়ি পিসিমাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সুমিতার দিকে। সুমিতার এমন রূপ কখনো দেখেনি বুড়ি।

আরো কি যেন বলতে চেয়েছিল সুমিতা। পাগলের মত কি কাণ্ড করে বসতো কে জানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার গলা শুনতে পেল ও। কাকে যেন শ্রীনাথের নাম ধরে কি প্রশ্ন করছেন। হয়তো বাড়ি খুঁজছিলেন কাশীবাবু।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনলো ও একটু পরেই।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

কাশীবাবু হাসি মুখে বললেন, তোদের দেখতে এলাম রে!

সুমিতা বাবাকে প্রণাম করতে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো।—আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো বাবা, আমি একদণ্ডও আর...

সেদিনই চলে এসেছিল সুমিতা। ভেবেছিল, পরিত্রাণ পাবে। বাঁচবে। কিন্তু, না, রাহুর মত আজও তার পিছনে লেগে আছে শ্রীনাথ।

মা'র কাছে শ্রীনাথের নাম শুনেই তাই সারা শরীর বিষিয়ে উঠেছিল। বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে ভাবলো, বাবা যদি সেবার ঠিকানাটা না দিয়ে আসতো!

একবার যদি কোথাও টুপ করে সরে যেতে পারতো, কোন ঠিকানা না রেখে, তা হলে হয়তো এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত ও।

কি আশ্চর্য, আজ এতদিন বাদে নিরুপমকে ও ফিরে পেয়েছে। ভোরের আলোর মত নির্মল পুলকের হাওয়া বইছে সারা শরীরে, অথচ সেটুকুকে পলকের মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেল একটি নাম। শ্রীনাথ।

১০

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। ক'দিন ধরেই অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে থেকে থেকে। বিরাম নেই। আকাশ জুড়ে আলোকিত স্বচ্ছতা, অথচ বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি। কার্নিসের নীচে, ঘুলঘুলিতে ভিজে কাক আর আয়েশী পায়রা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে ধুঁকছে বসে বসে, পায়ে বাত হয়ে যাবার যোগাড়। রাস্তার মোড়ে জল জমেছে। দু' একটি গাড়ি মাঝে মাঝে এসে পড়ছে, শিং-বাগানো ষাঁড় দেখার মত ভয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে। তারপর জল এড়িয়ে পাশের গলি দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। খালি গায়ে এক পাল ছেলে জলে হুটোপাটি করতে করতে গাড়িগুলোর অবস্থা দেখে মজা পেয়ে হৈ-হৈ করে উঠছে।

বেশ রাত হয়েছিল ফিরতে। দরজার কড়া নাড়তেই মনীষা ছুটে এলো হুড়মুড় করে। আর ত্রিদিববাবুর ভারী চটির আওয়াজ শোনা গেল, দ্রুত পায়ে নেমে এলেন।

মনীষা উদ্বেগের কণ্ঠে কি বলতে গেল। তার আগেই ত্রিদিববাবু চটে গিয়েছেন।—কি, করো কি এত রাত অবধি!

নিরুপম কি জবাব দিতে চেষ্টা করলো, শুনলেন না। বললেন, এক্ষুনি লালবাজারে যাও একবার। থানা থেকে দু-দু'বার এসেছিল। অবিনাশবাবু দেখা করতে বলেছেন।

মনীষা উৎকণ্ঠার স্বরে শুধু বললে, আমি যেতে চেয়েছিলাম, বাবা তো...

—এই বৃষ্টিতে এত রাত্তিরে তুমি কোথায় যাবে বৌমা! ধমক দিলেন ত্রিদিববাবু।

নিরুপম আর অপেক্ষা করলো না।—চলি।

ততক্ষণে নিরুপমের কোটপ্যান্টের দিকে চোখ পড়েছে মনীষার। বললে, ইস, ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে জামাকাপড়, বদলে যাও।

—থাক্। নিরুপম নিজেও তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কাপড় বদলানোর জন্যে দু' মিনিট সময়ও নষ্ট করতে ইচ্ছে হলো না।

অবিনাশবাবু দু-দু'বার খবর পাঠিয়েছেন, দেখা করতে বলেছেন নিরুপম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। কেন, কি কারণ থাকতে পারে কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধু একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিলো মনের মধ্যে। পরক্ষণেই নিজের মনকে শান্ত করতে চাইলো। না, আশা নয়। হয়তো বিশেষ কোন খবর জানতে চান অবিনাশবাবু। আর কিছু নয়।

অবিনাশবাবুর ঘরটিতে ঢুকে সব আশা দপ্ করে নিবে গেল। টেবিলের ফাইলে মাথা গুঁজে খসখস করে কি লিখে চলেছেন। হাঁক দিয়ে একবার দরওয়াজাকে ডাক দিলেন, তারপর মাথা তুলে নিরুপমকে দেখতে পেয়েও কোন কথা বললেন না। দরওয়াজা ততক্ষণে সেলাম করে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে কি আদেশ দিলেন। সে চলে গেল।

গম্ভীর মুখে এবার নিরুপমকে বললেন, বসুন।

তারপরও অনেকক্ষণ কি লিখে গেলেন।

এক ফাঁকে বললেন, একটু বসুন। কাজটা সেরে নিই।

ভিতরে ভিতরে নিরুপম তখন হতাশায় অধৈর্য হয়ে উঠছে। ভিজে জামাকাপড় চুপসে বসে আছে গায়ে। পাখার হাওয়ায় শীতশীত করছে। নিরুপমের একবার মনে হলো, কাপড় বদলে এলেই ভাল হতো। এভাবে এতক্ষণ অকারণ বসে থাকতে হবে জানলে কাপড় বদলেই আসতো। অবিনাশবাবুর ওপর একটু রাগও হলো। তবু উপায় নেই।

কাজ শেষ করে ফাইল বন্ধ করলেন অবিনাশবাবু। ফিতে বাঁধলেন সযত্নে। তারপর বললেন, আসুন।

লম্বা করিডর ধরে হেঁটে চলেছেন অবিনাশবাবু, পিছনে পিছনে নিরুপম। নিঃশব্দ বারান্দায় শুধু জুতোর ঘট ঘট শব্দ। ভারী জুতোর পুরু সোলের একটানা আওয়াজ।

একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু। দরজা খুলে বললেন, আসুন।

নিরুপম ঘরে ঢুকতেই বললেন, প্রমিস ফুলফিল্‌ড?

কথাটা নিরুপমের কানেও গেল না। ও তখন এক পলক তিনটি মেয়ের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে মিনুকে জড়িয়ে ধরেছে। বাবার ঘাড়ে মাথা গুঁজে সশব্দে কেঁদে উঠেছে মিনু।

অনেকক্ষণ পরে মিনুকে বুকে জড়িয়ে ধরেই হাসিহাসি চোখে ফিরে তাকালো নিরুপম। দেখলো, অবিনাশবাবুর মুখে তৃপ্তির হাসি, তাঁর চোখের কোণেও জল।

ভিজে কোটের হাতায় চোখ মুছল নিরুপম, হাসলো। মনে হলো, জীবনে এর চেয়ে বেশী আনন্দ ও কোনোদিন পায়নি, পাবে না।

মিনুকে ছেড়ে অবিনাশবাবুর কাছে এলো নিরুপম, তাঁর দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে কি বলতে চাইলো, বলতে পারলো না। গলার স্বর গাঢ় হয়ে থেমে গেল। গুছিয়ে বলার কোন কথাই খুঁজে পেল না।

এতক্ষণে অন্য দু'টি শিশুর দিকে চোখ গেছে অবিনাশবাবুর। তাদের দিকে নিরুপমও ফিরে তাকালো।

বয়সে মিনুর চেয়েও ছোট। বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে আছে তারা। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।

অবিনাশবাবু হেসে কাছে এগিয়ে এলেন তাদের। পিঠে হাত দিয়ে আদর করলেন। বললেন, ভয় নেই, তোমাদের বাবা-মাও আসবেন।

মেয়ে দু'টি কিন্তু একটুও খুশী হলো না। মনে হলো, তারা অবিনাশবাবুর কথা বিশ্বাস করছে না। ভয় পাচ্ছে।

অবিনাশবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটা ম্লান দেখালো। ধীরে ধীরে বললেন, এই পোশাকটাকে এইজন্যেই ঘেন্না হয় মাঝে মাঝে, বুঝলেন নিরুপমবাবু।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—ওরাও আমাকে ভয় পাচ্ছে। বলে হাসলেন।

একটু থেমে বললেন, আবার ভালও লাগে। আপনার আজকের আনন্দ, এর চেয়ে বড় প্রাইজ আর কি আছে, বলুন!

নিরুপম কি বলতে চাইলো। কৃতজ্ঞতায় থর থর কাঁপলো।

আর সেই মুহূর্তে একটি মেয়ে কাতর অনুনয়ের আদুরে গলায় নিরুপমকে বললে, তুমি নিয়ে যেও না ওকে।

—না, যাবে না!

কি আশ্চর্য, রুক্ষ কঠিন গলায় মিনু বলে উঠলো, না, যাবে না!

নিরুপমের নিজেরও নির্দয় মনে হলো মিনুকে। ও কি করে বুঝবে মিনুও তার এই দুঃস্বপ্নের জগত থেকে ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করছে।

কিন্তু না, মিনুও যেতে পাবে না।

মিনুকে কি একটা স্তোক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অবিনাশবাবু বোঝালেন নিরুপমকে।

কিন্ত মনীষা, মনীষাকে এখনই খবর দিয়ে শান্তি নেই। এখনই একবার তাকে এখানে নিয়ে এসে এই আনন্দের ভাগ দেবার জন্যে নিরুপম নিজেও যে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মিনুকে পাওয়া গেছে, মিনুকে পাওয়া গেছে। সতেরো নম্বর শিবনাথ মল্লিক রোডের খুশীর হাউই সমস্ত আকাশ জুড়ে রঙিন ফুল আর ফুটফুটে তারা ফুটিয়ে দিয়েছিল। যা ছিল সমস্ত পাড়ার দুঃখ, একটি ছোট্ট খবর এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে পায়রার খসে-পড়া পালকের মত উড়ে উড়ে যেন আনন্দের বার্তা নিয়ে এলো।

বৃষ্টির সঙ্গে এলোপাথারি হাওয়া বইছে। হঠাৎ দমকা বাতাস দিলো। ছাতা মাথায় হাঁটছিল লোকটা, ঝ'ড়ো হাওয়ায় ছাতার কাপড় শিকসমেত উল্টে গেল। নিরুপমের বুকের মধ্যেও ঠিক অমনি আনন্দ। বুকের এইটুকু পরিসরে এক আকাশ আনন্দকে ধরে রাখতে পারছে না নিরুপম।

অথচ কি সংশয়ই না ছিল সেদিন।

প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন। কত প্রশ্নের উত্তর দেবে মিনু। ও শোনে আর লাজুক হাসি হাসে।

এ-পাড়ারই মেয়ে, কত ছোটবেলা থেকে সকলে দেখেছে, আদর করেছে, কিন্তু আজ সবাই নতুন চোখ নিয়ে দেখতে চায়।

আচায্যি বাড়ির বড় বউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির।—ধন্যি মেয়ে, এত বড় হয়েছিস...

বৃদ্ধ ত্রিলোচনবাবু ছুটতে ছুটতে এলেন, কি বউমা, বলেছিলাম না, ঠিক পাওয়া যাবে।

মনীষা হাসে। ওর মনেও পড়ে না কবে এ-কথা বলেছিলেন তিনি। যেদিন মিনু হারিয়ে গেল সেদিন কি কারো কথা কানে গেছে ওর।

মিত্তিরদের মাদ্রাজী ভাড়াটে কল্যাণসুন্দরমের মেয়ে ঘাগরা দুলিয়ে এসে দাঁড়ালো। কোন কথা বললে না, শুধু মুখে তৃপ্তির হাসি।

নিরুপমের বাবা মাঝে মাঝে বাঁধানো দাঁত বের করে হাসছেন, আর পাড়া-পড়শির কথার জবাব দিচ্ছেন।

—হ্যাঁরে মিনু, তারপর কি হলো বল। তুই এত বড় মেয়ে, বিশ্বাস করলি লোকটার কথা?

মিনু শোনে আর চোখ নামিয়ে লজ্জার হাসি হাসে।

সব কথা কি ছাই ওর মনে আছে। কি ভয়ঙ্কর দিনগুলো কেটেছে এরা কেউ বুঝতেই পারছে না।

নিরুপমকে ডেকে ত্রিদিববাবু বললেন, যাই খানকয়েক খাম-পোস্টকার্ড কিনে আনি। সব চিঠি দিতে হবে তো।

নিরুপম বাধা দিতে চাইলো।—থাক্ না, এত তাড়া কিসের।

—না না, সবারই তো দুর্ভাবনা। বলবে হারানোর খবর দিলো, ফিরে পাওয়ার খবরটা আর দিলে না।

বলেই ভারী চটির শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

সারা দুপুর বসে বসে চিঠি লিখতে হবে।

গুছিয়ে বসে কি মনে পড়তে নিরুপমকে ডাকলেন, খোকা, খোকা।

নিরুপম আসতেই বললেন, আমি বলছিলাম কি, অবিনাশবাবুকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে।

ঈষৎ ঘোমটা টেনে কপাটের আড়ালে ছিল মনীষা। দু'পা এগিয়ে বসে বললে,

হ্যাঁ বাবা, আমিও তাই ভাবছিলাম। ওঁর জন্যেই তো...

বৃদ্ধ ত্রিদিববাবুর মুখে আজ আর হাসি থামছে না।

বললেন, দ্যাখো খোকা, পুলিসের বিরুদ্ধে কাগজে কাগজে কত চিঠিই তো লিখেছি, এবার একটা প্রশংসা করে চিঠি দেবো।

একটু থেমেই কি মনে পড়তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পুলিস কি করবে, গবর্নমেণ্ট কি করবে। রিয়েল কালপ্রিট তো সমাজ, সমাজের মানুষগুলোই।,

ধক্ করে নিরুপমের বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগলো। কি বলতে চাইছেন ত্রিদিববাবু? বাবার কথার মধ্যে কি কোন সূক্ষ্ম কটাক্ষ আছে?

ত্রিদিববাবু তখনো বলে চলেছেন, এভরি ক্রাইম ইজ ক্রিয়েটেড বাই দি সোসাইটি। ইটস্ ওনলি কমিটেড বাই দি আনসোস্যাল্স্।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন ত্রিদিববাবু। উত্তেজিত হলেই শিক্ষক-জীবনে পড়া দু-একটা ইংরেজী উদ্ধৃতি তাঁর মুখে এসে জড়ো হয়।

নিরুপম তখন সরে যেতে পারলে বাঁচে। এই আনন্দের মুহূর্তে মিনুর সঙ্গে নিভৃতে কিছুক্ষণ কাটাতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। মিনুকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ত্রিদিববাবু বোধ হয় বুঝতে পারলেন। বললেন, না না যেও না, শোনো।

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো নিরুপমকে।

ত্রিদিববাবু বললেন, ট্র্যাজেডি কি জানো। অসামাজিক মানুষগুলো সমাজেই বাস করে। তাদের চেনা যায় না, তারা আছে বলেই দেয়ার আর ক্রাইম্স।

নিরুপম সায় দিলো—মানুষ যদি ভালো না হয়...

কথাটা বলতে গিয়ে ব্যঙ্গের মত শোনালো। নিরুপম যেন নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করছে।

ত্রিদিববাবু প্রতিধ্বনি তুললেন।—ঠিক, আমিও তাই বলি। এ বিষয়ে একটা চিঠি লিখবো ভাবছি খবরের কাগজে, তুমি কি বলো! ওসব আইন করে অন্যায়কে ঠেকানো যায় না।

নিরুপম শুধু ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলো। নিরুপম এতদিন বাবার মুখে প্রতিটি অন্যায়, অকর্মণ্যতা, অভিশাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুনে এসেছে। আজ একটি-মাত্র কৃতজ্ঞতার কাছে তার মনে হলো, তাঁরও বিবেক বুঝি বিক্রি হয়ে গেছে। মিনুকে পাওয়া গেছে এটাই আজ বড় হয়ে উঠেছে বাবার কাছেও। এও তো এক ধরনের স্বার্থ। অথচ বাবার প্রতিবাদের রুক্ষ মূর্তিটাকেই ভিতরে ভিতরে শ্রদ্ধা করে এসেছে নিরুপম। বিদ্রূপ আর উপহাসের আড়ালে শ্রদ্ধাই লুকিয়ে ছিল এতদিন, আজ তাঁর কৃতজ্ঞতায় কোমল চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করলো নিরুপম। মিনুর মত আরো কত মেয়েই তো হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাবে। কিন্তু, কিন্তু নিরুপমরাই কি তার জন্যে দায়ী? বাবার কথাগুলো আজ হঠাৎ বড় অসহ্য লাগছে তার। অসহ্য।

১১

চারপাশের দেয়ালে গাঁ ঘেঁষে সিলিং-ছোঁয়া র‍্যাকের সারি, ধুলোতে বিবর্ণ ফাইলের স্তূপ। কোনোদিন একটা পুরনো ফাইল খুঁজে নামাতে গেলে আপিসসুদ্ধ লোকের হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ যায়। টেবিলগুলো ফাটা ভাঙা, কালির দাগ, ব্লেড বা ছুরির কাটা দাগ। চেয়ারগুলো জোড়াতালি দেওয়া। সমস্ত ঘরখানার চেহারা দেখলেই মনমরা হয়ে যেতে হয়। কাজে মন বসে না। দেরাজে চাবি লাগে না, তালা খারাপ হয় বার বার, তালা সারালেও কোথায় একটা কাঠের কুচি দেরাজের আনাগোনার পথটাকে আটকে দেয়। অনেক কসরত করে খুলতে হয়, বন্ধ করতে হয়। তাই বড়-একটা কেউ দেরাজ খুলতেই চায় না।

জ্ঞানবাবু বলেন, বাপু হে, ঘুষ আছে তাই ওটা মাঝে মাঝে খুলি বন্ধ করি। তা নইলে কি অত কসরত পোষাতো?

অরুণ বক্সী টিপ্পনি দেয়।—বড়সাহেবদের ঘর দেখবেন যান, তাক লেগে যাবে। ঘরে ঘরে আয়না তোয়ালে, আরো কত কি। কাজ তো আপনা থেকেই করতে ইচ্ছে হতো ওসব পেলে।

কেউ কেউ আপত্তি করে। বলে, সে-কথা বলবেন না। ওখানে কনট্রাকটররা মাঝে মাঝে এসে বসে কিনা তাই। তাও তো হুকুম দিয়েই খালাস ও'রা, লাঞ্চের পর আর ফেরেন না।

অনেকের অনেক অভিযোগ। আপিসের চেহারাটা দেখলে সত্যিই কাজ করার সব উৎসাহ চলে যায়। নিরুপমও কোন ব্যতিক্রম নয়। আর সকলের সঙ্গে সায় দিয়ে সেও নানান অভিযোগ তুলছে। চেয়ারটা নড়বড় করে, টেবিলটা ভাঙা।

কিন্তু সেই প্রথম বোধ হয় বিবর্ণ ফাইলগুলোও ভালো লাগলো। জ্ঞানবাবুকে, অরুণ বক্সীকে, বুড়ো রামেশ্বরকে—সকলকে হঠাৎ আপন মনে হলো।

মনের মধ্যে তখন শুধু মিনু। নিরুপমের অন্ধগলি বুকটুকু হঠাৎ যেন একটা প্রকাণ্ড বাগান হয়ে গেছে। আর মিনু তার মধ্যে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, হাঁটছে, কথা বলছে, লাজুক মাথা নামিয়ে ফিকফিক করে হাসছে।

সুখ আর দুঃখ—দুটোই মানুষকে বড় আপন করে তোলে। সেই মিনু যেদিন হারিয়ে গিয়েছিল, সেদিন সকলেই নিরুপমের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। যে দু-একজনের সঙ্গে একটু রেষারেষি, মনোমালিন্য—কিংবা সিনিয়রিটির স্বার্থ যাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে তারা সকলেই ঘন হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল নিরুপমের চারপাশে। ছোটসাহেবের ঘরে অ্যাটেন্ডেন্সের খাতা খোলা পড়ে থাকতো নিরুপমের জন্যে। দেরী হলেও লাল দাগের আঁচড় পড়তো না।

ঠিক সেদিনের মতই।

মিনুকে পাওয়া গেছে শুনেও খুশীতে উচ্ছল মানুষগুলো নিরুপমকে ঘিরে ধরলো। তারাও যেন সুখের ভাগ নিতে চায়।

জ্ঞানবাবু ফুর্তিতে ডগমগ। কড়মড়ে একখানা একটাকার নোট বের করে পিওন বরদার হাতে দিলেন।—এক টাকার পকৌড়া নিয়ে এসো। লেট আস সেলিব্রেট, কি বলো অরুণ।

সারাটা দিন খুব ভালো লাগছিল নিরুপমের।

সুখ আর দুঃখ। কত প্রভেদ।

অথচ...

প্রিয়ার কথা মনে পড়লো। আরো অনেকের। কারো কারো নাম চেষ্টা করেও মনে আনতে পারলো না নিরুপম। মুখ? না, একজনেরও মুখ মনে পড়লো না। সব মুখ এক হয়ে গেছে। শুধু একটি মুখই মনে পড়ে—সুমিতা।

প্রিয়া, শ্যামলী, রেণু। অনেক নাম। নামই শুধু। ওরা সকলেই যেন একটি শরীর। একটি চরিত্র।

কথার ফাঁকে ফাঁকে কত বিচিত্র জীবনের কাহিনী শুনেছে নিরুপম। কেউ নিজের অতীত সম্পর্কে নির্বাক থেকে গেছে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে নিরুপমের প্রশ্ন।

কিন্তু এরা সকলেই একটি নারী। অদ্ভুত নির্লিপ্ত মন, নিখুঁত অভিনয়। ওদের জীবনে যেন সুখ আর দুঃখ নেই। কিংবা সুখ আর দুঃখ একটি সীমান্তে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে।

একটি অভ্যস্ত নেশার মত শুধু। কিন্তু সত্যিই কি তাই? প্রিয়াকে উপেক্ষা করে শ্যামলীর দিকে এগিয়ে যাবার সময় কি প্রিয়ার নির্লিপ্ত মুখের আড়ালে কোন ঈর্ষাম্লান বিকৃত হাসি দেখতে পায়নি নিরুপম? তুচ্ছ ঈর্ষা, লোভ, মোহ—সব আছে, নেই শুধু সুখ আর দুঃখ। কিংবা তাও কখনো কখনো আসে, ক্ষণিকের জন্যে গোপন মনে দোলা দিয়ে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এ এক বিচিত্র নেশা।

কি আশ্চর্য। মাঝে মাঝেই সেই বিচিত্র নিশির ডাক শুনতে পায় নিরুপম। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে।

এভরি ক্রাইম ইজ ক্রিয়েটেড বাই দি সোসাইটি, ইট ইজ ওনলি কমিটেড বাই দি আনসোস্যালস্। বাবার গম্ভীর মুখের কথাটা একটা সংস্কৃত স্তোত্রের মত অন্তস্তল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেদিন। অন্যায়, পাপ সবই সমাজের সৃষ্টি। সমাজের মধ্যেই তারা ছড়িয়ে আছে।

ছড়িয়ে তো আছেই। নিরুপমও কি তাদেরই একজন? নিরুপমরাই কি সেই সমাজ গড়ে তুলেছে? তার মত মানুষ—অনেক মানুষ—নিশির ডাকে সাড়া দেয় বলেই কি পাপ আছে, অন্যায় আছে। মুহূর্তের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হলো তার। ওই ঘৃণ্য পল্লীটা আছে নিরুপমের জন্যেই! নিরুপমের জন্যেই মিনুরা হারিয়ে যায়!

মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো।

না, নিরুপম নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারছে না। ভুল, ভুল ভাবছে ও। ওই পাপের অস্তিত্ব তো হাজার বছর ধরে চলে আসছে, নিরুপম নিজেকে বোঝাতে চাইলো। একজন নিরুপমের ক্ষণিক মোহের জন্য নয়। নিরুপম না থাকলে, নিরুপম ওই নেশার হাতছানি উপেক্ষা করলেও কিছু এসে যায় না।

ওরা থাকবে। মিনুরা হারিয়ে যাবে।

না, মিনুকে আর হারাতে দেবে না নিরুপম। মনীষা সাবধান হয়ে গেছে। নিরুপম সাবধান হয়ে গেছে।

কিন্তু ত্রিদিববাবুর কথাগুলো বড় নির্মম আঘাত দেয় থেকে থেকে।

—আইন করে অন্যায়কে রোধ করা যায় না খোকা। সমাজ সমাজ বলি বটে, কিন্তু মানুষগুলোর মুখোশ খুলে দিয়ে আসল রূপটা যদি টেনে বের করা যেত...

শৈশবের স্মৃতিতে বাবাকে দেখতে পায় নিরুপম, সেই আগের চেহারা নিয়ে

যেন নিরুপমের সামনে এসে দাঁড়ান তিনি। সেই অগ্নিকুণ্ডের মত দুটি ভয়ঙ্কর চোখ। গলাবন্ধ কালো কোট পরে যখন স্কুলের গেটের ভিতরে ঢুকতেন, মুহূর্তে সব চিৎকার বন্ধ হয়ে যেত।

ডিসিপ্লিন। ওই একটি কথাই বুঝতেন। বলতেন আর সব মিথ্যা।

হতশ্রী রুগ্ন চেহারা নিয়ে নিরুপমের সামনে এসে দাঁড়ালেও পুরোনো দিনের সেই মানুষটিকেই যেন দেখতে পায় নিরুপম।

নিরুপম কত বদলে গেছে। সেই ত্রিদিববাবুর ছেলে ও? ওর নিজেরই হাসি পায় এক একসময়।

আগরওয়ালার লোকের হাত থেকে ঘুষের খামটা নিতে গিয়ে কই আজ আর তো হাত কাঁপে না।

নিজের মনেই এক একসময় হেসে ওঠে ও। বোকা, বোকা। ন্যায়, নীতি, আদর্শ নিয়ে কি পেয়েছেন ত্রিদিববাবু! জীবনের কাছে, অদৃষ্টের কাছে প্রবঞ্চিত হয়েছেন শুধু। নিরুপম ঠকবে না। জীবন উপভোগ করবে।

এতকাল তো ঘুষ নেয়নি ও। কি লাভ হয়েছে তাতে? সমাজ বদলে গেছে, সমাজ ভাল হয়েছে?

না, নিরুপম জানে, তার ওপর কোন কিছুই নির্ভর করে না। বন্যার বিরুদ্ধে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে নিজেকে শেষ অবধি ভেসে যেতে হয়।

না, কোন দোষ করছে না নিরুপম। অপরাধ করছে না।

ছুটির পর আপিস থেকে বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে মনটা ফুর্তিতে ভরে উঠলো।

মিনুকে ফিরে পাওয়ার পর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। সমস্ত সংসার যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। মনীষা তেমনি উচ্ছল, বাবার মুখে তেমনি প্রতিবাদের সুর।

আর। হ্যাঁ, নিরুপম তেমনি নিঃসঙ্গ। সমস্ত ভিড়ের মধ্যেও ও যেন একা।

আগরওয়ালার দেওয়া নোট ক'খানা বুক পকেটে অনুভব করছে নিরুপম। খসখস শব্দ হচ্ছে হাত ছোঁয়ালেই।

মনীষা জানে না। মনীষার কাছে ছোট হতে পারবে না নিরুপম। একদিন রসিকতা করে বলবার চেষ্টা করেছিল নিরুপম।—আপিসের অনেকেই তো নেয়।

—ছি ছি। কি আন্তরিক ঘৃণা দেখতে পেয়েছিল মনীষার মুখে।

যদি এই টাকাটা মনীষা দেখতে পায়, কি বলবে সে? হয়তো চোখ কপালে তুলে বলে উঠবে, তুমি ঘুষ নাও!

না, মনীষার কাছ থেকে সব গোপন রেখেছে ও। গোপন রাখবে।

মনীষার দিকে ফিরে তাকালো নিরুপম। সেই ম্লান মুখখানায় দুদিনেই যেন হারানো লাবণ্য ফিরে এসেছে। তৃপ্ত খুশী খুশী মুখে মিনুকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

কিছুতেই ঘুমোবে না মিনু। আমার ঘুম পাচ্ছে না, মা। আমি ঘুমোবো না।

আগে এমন আব্দার বহুবার করেছে ও। ধমক দিয়েছে মনীষা। কখনো সাংসারিক তিক্ততার বশে দু-এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে তার পিঠে।

কিন্তু এখন সামান্য একটা কড়া কথা বলতেও বাধে মনীষার। নিরুপম লক্ষ করেছে, মিনুর প্রতিটি আব্দার ও আজকাল প্রশ্রয় দেয়। নরম আদরের কণ্ঠে উপদেশ দেয় শুধু। অবাধ্যতা মেনে নেয়।

ভয়। মিনুকে ফিরে পেয়ে হারাবার ভয় বুঝি বেড়ে গেছে। সদাসর্বদা

ওকে চোখে চোখে রাখে।

স্কুলে যাওয়া নিয়ে একদিন দু'জনে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি সেটাকে দূরে ঠেলে রেখেছিল মনীষা।—স্কুলে তো যাবেই, এত তাড়ার কি দরকার। ডাক্তার যখন বলছে...

ঘুম, শুধু ঘুম প্রয়োজন, ডাক্তার বলেছে। হঠাৎ একটা আতঙ্কের দুনিয়ায় কয়েকটা মাস কাটিয়ে এসে কেমন যেন হয়ে গেছে মিনু। সব সময়ে বোকা বোকা চোখ মেলে কি যেন ভাবে। অকারণে ভয় পায়। অচেনা লোক দেখলে পালিয়ে আসে।

ডাক্তার বলেছে, ঘুম, শুধু ঘুম দরকার ওর। অথচ কিছুতেই ঘুমোতে চায় না মেয়েটা।

এদিকে ইস্কুলে আবার ভর্তি না হলে একটা বছর নষ্ট। বোঝে মনীষা, তবু কাছছাড়া করতে ভয় পায়।

পুটপুটি আর তুবলিরা অন্য ইস্কুলে পড়ে। তা না হলে কত সুবিধে হতো।

মিনুকে ঘুম পাড়িয়ে এসে নিরুপমের চেয়ারটার গা-ঘেঁষে দাঁড়ালো মনীষা।

—তখন কি যেন বলছিলে?

নিরুপম ধীরে ধীরে বললে, ডাক্তার সেন বলছিলেন, ওকে স্বাভাবিক হতে হবে, আগের মত যেন ইস্কুলে যাতায়াত শুরু করে।

মনীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।—তাই হবে। কিন্তু আর বাস নয়, আমি নিজে দিয়ে আসবো নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো।

—পারবে কেন। একদিন আদ্দিন তো নয়। নিরুপম বোঝাতে চাইলো।

আর মনীষা বলে বসলো, উপায় কি তা ছাড়া। পুটপুটি আর তুবলিদের মত গাড়ি তো নেই যে দিয়ে আসবে নিয়ে আসবে।

নিরুপম আঘাত পেল একটু। মনে হলো কথাটার আড়ালে মনীষা যেন ওকেই তাচ্ছিল্য করলো। পুটপুটি আর তুবলিদের মত নিজের গাড়ি তো নেই।

—পুটপুটির বাবা খুব ভালো মাইনে পায়, তাই না? মনীষা প্রশ্ন করলো।

আঘাতের স্ফুলিঙ্গ হয়ে ঠিকরে পড়লো নিরুপমের উত্তর।— মাইনে? ঘুষ বলো।

—ও একই কথা। মনীষা বললে।

নিরুপম স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, ঠিকাদারের কাজ না দেখেই ভালো রিপোর্ট দিয়ে দেয়। ঘুষ পাবে না?

মনীষা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তার পর বললে, সবাই তো নিচ্ছে, কে নেয় না?

—ঘুষ নিতে বলছো তুমি? ঘুষ?

মনীষা বিরক্ত গলায় বললে, অত আঁতকে ওঠার কি আছে শুনি। খেয়ে পরে এই বাজারে ভালভাবে থাকতে হলে—মিনুর কথাই ভাবো, যদি একটা গাড়ি থাকতো আমাদের...

চুপ করে গেল নিরুপম। একটাও কথা বলতে পারলো না। একবার লোভ হলো বলে, পকেটে দশখানা একশো টাকার নোট আছে রেখে দাও। কিংবা বলে, ঘুষ আমিও নিতে পারি, এই নাও টাকা।

কিন্তু সে-কথা বলতে পারলো না। মনে হলো পুটপুটির বাবার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ও নিজেই হয়তো মনীষার কাছে ছোট হয়ে যাবে।

তবে সত্যি, নিজেদের একখানা গাড়ি থাকলে মিনুকে নিয়ে এতখানি দুর্ভাবনা থাকতো না।

আপিসের ছুটির পর বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ভিড়েভরা বাস ছাড়তে ছাড়তে নিরুপমের মনে হলো, তার যদি গাড়ি থাকতো একখানা।

এই মুহূর্তে সে গাড়ি নিয়ে চলে যেতো...

প্রিয়ার কথা মনে পড়লো হঠাৎ। তা হলে কি তার কাছেই চলে যেতো ও এই মুহূর্তে?

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলো হয়তো, কি যেন ভাবলো। তারপরে অস্ফুটে বললে, ধুৎ।

বলেই একটা বাসের পা-দানিতে লাফিয়ে উঠে পড়লো।

এসে দাঁড়ালো সেই অপরিচিত গলির মোড়ে। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকালো ও। এই আবছা অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার জন্যে ব্যগ্র হলো।

ছায়া ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কামলুব্ধ পুরুষের আনাগোনা দেখলো নিরুপম। প্রতিটি মানুষ যেন আলোকে ভয় পেয়ে অন্ধকারে মুখ লুকোতে চাইছে। নিজেকে নিজেই ঘৃণা করছে যেন।

নিরুপমও কি নিজেকে ঘৃণা করছে? না। ওর একবারও মনে হলো না ও তলিয়ে যাচ্ছে। এখনো নিজেকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওর।

একদিন নারীর মনের কাঙাল ছিল সে, আজ শুধু নারীর শরীর তাকে বার বার হাতছানি দেয়।

একটি বাড়ি থেকে আরেকটি বাড়িতে কি এক নেশা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। শুধু নারীর শরীর নয়, রূপ নয়। কি, তা নিরুপম নিজেও বুঝতে পারে না।

হয়তো সুমিতার সেই কিশোরী রূপকে খুঁজছে সে। একটি নিষ্পাপ স্মিতহাস মুখ। একটি হারানো সুন্দর মুখ। সেই চপল মাধুর্যকে খুঁজছে।

নিরুপমের মনে হলো সুমিতা হারিয়ে গেছে। চাঁপামাটির সেই দিনগুলির মতই সুমিতার কিশোরী রূপকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুমিতার সঙ্গে মুখোমুখি বসেছে, হেসেছে, কথা বলেছে। কিন্তু এত কাছে থেকেও মনে হয়েছে ওরা পরস্পর থেকে অনেক দূরে। মোহমুগ্ধের মত সুমিতার চোখে চোখ রেখেছে নিরুপম, কিন্তু সেই পুরোনো দিনের দুটি নিস্তরঙ্গ দিঘির মধ্যে ডুব দিতে পারেনি।

সেই চোখ দুটিই কি খুঁজছে নিরুপম!

ধীরে ধীরে একটি বাড়িতে ঢুকলো ও। একে একে প্রতিটি নারীর শরীরের উপর দিয়ে ওর চোখ যেন একটি মন্থর সন্ধানী আলো ফেলে চলেছে।

সুবেশ সৌন্দর্যের কলহাস উঠছে থেকে থেকে। কোথাও বীভৎস কথালাপ।

নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ালো নিরুপম একটি ঘরের সামনে। চমকিত বিস্ময়ের মুগ্ধতায় তাকিয়ে রইলো। একটি নির্লিপ্ত কিশোরীর রূপ ওকে আকর্ষণ করলো।

বিছানার উপর একা নিঃসঙ্গ একটি তারুণ্য এক মনে নিজের সঙ্গেই তাস খেলে চলেছে। ড্রেসিং টেবিলের ঝকঝকে বড় আয়নাটায় তার প্রতিচ্ছবি।

—আসতে পারি? শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো নিরুপম।

—উঁহু। অসম্মতির একটি অস্ফুট জবাব শোনা গেল। মাথা তুললো না মেয়েটি।

নিরুপম বুঝলো, কারো জন্যে অপেক্ষা করছে মেয়েটি। তাই এক মনে পেশেন্স খেলে চলেছে।

এরা সবাই বুঝি নিজের সঙ্গে নিজে তাস খেলে চলেছে শুধু। ধৈর্যের খেলায় সময় কাটিয়ে চলেছে। আর কোন পথ নেই, উদ্দেশ্য নেই।

নিরুপম আরো কি যেন প্রশ্ন করলো।

মুখ না তুলেই উপেক্ষার উত্তর দিলো মেয়েটি।

তবু কি এক আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে নিরুপম। আরো কত কত নারীর উৎসুক আহ্বানকে তুচ্ছ করে এসেছে সে। আজ প্রথম একটি তাচ্ছিল্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় বেশী তুচ্ছ মনে হলো।

আবার হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল নিরুপম, তার আগেই কাঁধের ওপর একটি ভারী হাতের স্পর্শে চমকে উঠলো ও।

ফিরে তাকিয়ে এক পলকের জন্যে অপ্রতিভ বোধ করছিল নিরুপম। তারপর দুজনেই সশব্দে হেসে উঠলো।

১২

ভোরবেলায় উঠেই বাড়ি থেকে পালাবে ভেবেছিল সুমিতা। কোথায় আর পালাবে? এ-সময়ে কোথাও যাবার জায়গা আছে নাকি। এক শুধু মমিদের বাড়ি। মমতাদের বাড়ি। আর তো সকলেই কাজে ব্যস্ত, সুমিতার মত অফুরন্ত অবসর আর কার আছে। সকালে বাজার, আপিসের রান্না, ছেলে-মেয়েদের স্কুল—পাড়ার সবাই এখন ব্যস্ত। দুদণ্ড বসে কথা বলা দূরের কথা, গেলে বিরক্ত হয়।

মমিদের বাড়িই যাবে, ভাবলো সুমিতা। না গিয়ে উপায় নেই। শ্রীনাথ যখন বলে গেছে, তখন নিশ্চয় সকাল বেলাতেই এসে হাজির হবে। ওকে এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে। নাম শুনলেই যাকে অসহ্য লাগে, তার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার মত অস্বস্তি আর নেই। অথচ তার কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না ও। ধূমকেতুর মত মাঝে মাঝে এসে হাজির হতো আগে, আজকাল ঘন ঘন আসে। সুমিতা বেশ বুঝতে পারে শ্রীনাথ ওর গতিবিধির ওপর একটি অদৃশ্য মানুষের মত কি ভাবে যেন লক্ষ রাখে। ও যেন সব জানে, সব বোঝে। শ্রীনাথের মুচকি হাসিটা দেখলেই কেমন ভয় ভয় করে সুমিতার। প্রথম প্রথম শুধুই দশ পঁচিশটা টাকা ধার চাইতো, দিতো সুমিতা। ভাবতো এভাবেই পরিত্রাণ পাবে।

আনন্দময়ী ঠিকই বলেন। সুমিতা নিজেই তো সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে শ্রীনাথের। বিপদ তাড়াতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে।

শ্রীনাথ একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, দুহাতে রোজগার করছো, দাও না বাবা দু' পঁচশো। নতুন করে ঠিকাদারী শুরু করি। কথাটার মধ্যে লুকোনো ইঙ্গিতটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠেছিল সুমিতার।

রেগে গিয়ে বলেছিল, রোজগার যদি করি নিজের জন্যেই করছি। তোমার মত একটা অপদার্থের জন্যে নয়।

শুনে ফ্যাক ফ্যাক করে হেসেছিল শ্রীনাথ। কোন উত্তর দেয়নি।

আর সুমিতা নিজের মুখের কথাটা শুনে নিজেই চমকে উঠেছিল। সত্যি, এ জীবন যখন বেছে নিয়েছে ও, তখন স্বার্থপরের মত নিজেই শুধু আনন্দ লুটে নেবে না কেন?

সুমিতা নিজে বাঁচতে চায়, নিজে জীবন উপভোগ করতে চায়। তার জন্যে তলিয়ে যেতে ভয় পায় না। শ্রীনাথ ওকে যে অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথ দেখিয়ে নিজে বাঁচতে চেয়েছিল, ক্রোধে আর হতাশায় সেখান থেকে পালিয়ে এসে সেই সুড়ঙ্গেরই অন্য মুখে ও যদি দাঁড়িয়ে থাকে, কোন অন্যায় করেনি। এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি নিতে পারতো ও।

কিন্তু শুধু রেহাই পাবার জন্যেই কি শ্রীনাথ চাইলে পাঁচ-দশটা টাকা এখনো দেয় সুমিতা?

কোনরকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে স্লিপারে পা গলিয়েছে সুমিতা; কাশীবাবু দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, কোথায় যাবি রে সুমি?

সুমিতা হেসে বললে, তোমারই কাজে বাবা।

মা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বলা যাবে না, মমতাদের বাড়ি যাচ্ছি। মমতা মা'র দু' চোখের বিষ, নাম শুনলেও জ্বলে ওঠে। বলে, ওই মেয়েটার সঙ্গে মিশবি নে তুই, ও খারাপ মেয়ে।

শুনে মনে মনে হাসে সুমিতা। মমি হঠাৎ কেন আসা বন্ধ করলো তাদের বাড়িতে, তাও অজানা নেই তার। মা যা-মুখে আসে বলে বিদেয় করেছিলেন তাকে। তারপর থেকে মমতা আর আসে না। বাইরে বাইরে দেখাসাক্ষাৎ, বন্ধুত্ব। মাকে বলে, ওর সঙ্গে আজকাল তো আমার দেখাই হয় না।

রাস্তায় একদিন মমির সঙ্গে সান্ত্বনার নাকি দেখা হয়েছিল। সে কথা শুনে আনন্দময়ী কর্কশ গলায় বলে উঠেছিলেন, ওর সঙ্গে দেখা হলেই তুই কথা বলবি নে সান্তু।

কথাটা হয়তো সুমিতাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিলেন।

কিন্তু না, আর দেরী করলে শ্রীনাথ এসে পড়তে পারে। সে এক যন্ত্রণা। শুধু টাকা নয়, কিংবা টাকাটা নেহাৎই একটা ছুতো। ইদানীং সুমিতা বেশ বুঝতে পারে শ্রীনাথ আরো কিছু চায়। ওর চোখের দৃষ্টিটা ক্লেদাক্ত আর ঘৃণ্য লাগে। দুটো চোখ যেন সুমিতার শরীরটাকে শুষে নিতে চায়।

—তোমারই কাজে বাবা। সুমিতা বললে।

—তোমার কাজে? হাসছেন কাশীবাবু।—বেশ বেশ, ইদানীং আর তেমন অর্ডার-টর্ডার সত্যি আসছে না।

সুমিতা হাসলো।—কেন আসবে না, আমি যে যেতে পারি না সব সময় তাই। আজ একটা আপিসের বড়বাবুর সঙ্গে...

—নিয়ে যাবি কিছু?

সুমিতা ঘাড় নাড়লো।—দাও গোটা কয়েক প্যাকেট। তাড়াতাড়ি না গেলে আবার আপিস বেরিয়ে যাবেন।

কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা প্যাকেটের ভারে ঝুলে পড়লো।

শুধু বের হওয়ার সময় ফিরে তাকিয়ে সুমিতা দেখলো আনন্দময়ী মুখ

বাঁকালেন। নিজের মনেই ফিক করে হেসে ফেলে ও বেরিয়ে এলো।

অলিগলি পার হয়ে এঁকেবেঁকে একেবারে বড় রাস্তার ধারে। রাস্তার ধারেই একটা কাঁচা নালা, নোংরা কালো জল থকথক করছে। বিদ্ঘুটে গন্ধ।

এপাশ ওপাশ ফিরে তাকালো সুমিতা। না, কেউ দেখছে না। এত সকালে কে আর দেখবে। লোকজন কম, যাও বা দু'চারজন যাতায়াত করছে তারা কেউ ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে না।

কালির প্যাকেটটা নালার ওপর ফেলতেই থপ্ করে একটা কাদাজলের শব্দ হলো। তারপর খুব আস্তে আস্তে, তিল তিল করে সেটা ডুবে গেল।

নিজের মনেই কৌতুক বোধ করলো সুমিতা। এটুকু লুকোচুরি না করেই বা উপায় কি। সান্ত্বনা পায়, পাড়ার লোকের কাছে বাবার আত্মসম্মান বজায় থাকে! শুধু সুমিতার রোজগারে সংসার চলে এ-কথাটা সুমিতাই কি বলতে পারতো।

পাশের বাড়ির জ্যোৎস্নাকে একদিন বলেছিল, বাবার কালির ব্যবসা না থাকলে কি খেতে পরতে পেতাম। আমি আর কত পাই, থিয়েটারের নেশা আমার তাই...

সুমিতার মাঝে মাঝে নিজেকেই বড় আশ্চর্য লাগে। ওর জীবনটা যেন শুধুই লুকোচুরি। সমস্তটুকু? একজন মানুষও নেই যার কাছে ও সবকিছু প্রকাশ করে বলতে পারে। সকলের কাছেই ওর একটা দিক, একটা রূপ আড়ালে না রেখে উপায় নেই।

মমতা ছিল। ভেবেছিল, একমাত্র ওর কাছেই লুকোবার কিছু নেই। কিন্তু তার কাছ থেকেও তো নিরুপমকে আড়াল করে রাখতে হলো। নিরুপমের তাচ্ছিল্য ওকে মমতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে বাধ্য করেছে।

এখন হাসি পায়। ভুল ভেবেছিল সুমিতা। ভুল ভেঙে গেছে এখন। কিন্তু যার সম্পর্কে দিনে দিনে একটু একটু করে মমতার সামনে একটি আদর্শ নিষ্পাপ শুভ্র মূর্তি গড়ে তুলেছিল, তার তাচ্ছিল্য শুধু কি সুমিতাকেই আঘাত দিয়েছিল সেদিন!

মমতা শুনে হয়তো হেসে লুটিয়ে পড়তো।—সে কি রে, এই সেই! ও তো ভাল করে কথাই বললো না।

ছি ছি, তা হলে কি লজ্জায় যে পড়তো সুমিতা। বাবার কাছেই কি কম অস্বস্তিতে পড়বে, যদি জানতে পারেন তাঁর সব অর্ডার এই নালায়, ডাস্টবিনে, পথের ধারে লুটোপুটি খায়। যদি জানতে পারেন, এতকাল সুমিতার উপার্জনকেই নিজের উপার্জন ভেবে এসেছেন।

প্যাকেটটা নালার জলে অদৃশ্য হতেই ফিরে দাঁড়ালো সুমিতা, মমিদের গলির দিকে পা বাড়ালো। আর সঙ্গে সঙ্গে দূরের লোকটির দিকে চোখ পড়লো।

সুমিতার গায়ের লোম মুহূর্তে সজারুর কাঁটার মত কঠিন হয়ে উঠলো। বিষিয়ে উঠলো সারা মন।

শ্রীনাথ আসছে। ওঃ, পয়সার মুখ দেখছে লোকটা। ভালো দোকানের প্যান্ট পরেছে বোধ হয়। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলো সুমিতা। পোষাক বদল হলেই কি মানুষ বদল হয়?

পালাবার চেষ্টা করলো, পারলো না। চোখাচোখি হয়ে গেল শ্রীনাথের সঙ্গে।

ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে শ্রীনাথ। হাসতে হাসতেই কাছে এসে দাঁড়ালো।

—কাল বাবা হাঁটুতে বাত ধরিয়ে দিয়েছিলে, সে কত রাত অবধি যে দাঁড়িয়ে-

ছিলাম।

সুমিতার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠলো।—দাঁড়িয়ে থাকার তো প্রয়োজন ছিল না।

—এই দ্যাখো। হাসলো শ্রীনাথ।—দরকার তোমার কেন হবে, আমার।

কঠিন হয়ে উঠলো সুমিতার চোখের দৃষ্টি। বললে, আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

—কি যে বলো। বিশ্রী হাসলো শ্রীনাথ। বললে, সিঁথির সিঁদুরটা যখন আছে, তখন আমিও আছি।

নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো।

সুমিতা নিস্তার পাবার জন্যে ছটফট করলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কেউ ওদের লক্ষ করছে কিনা। না, কেউ নেই কাছে-পিঠে।

সুমিতা স্পষ্ট চোখে তাকালো শ্রীনাথের দিকে। চোখ নামিয়ে নিলো। একটা লোভী শ্বাপদের মত সুমিতার শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে শ্রীনাথ। তার সমস্ত দেহের ভাঁজে ভাঁজে যেন একজোড়া কামলুব্ধ চোখের রুক্ষ স্পর্শ অনুভব করলো সুমিতা। একটা অসীম অস্বস্তি অনুভব করলো। সর্বাঙ্গে ঘৃণিত ক্ষত নিয়ে কেউ যেন আলিঙ্গন করতে চায়।

সুমিতা প্রায় কান্নার সুরে বললে, সিঁদুরটা মুছে দিলে রেহাই দেবে আমাকে?

সুমিতা ব্লাউজের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট ব্যাগটি বের করলো। তা থেকে পাঁচ টাকার একটি নোট বের করে শ্রীনাথের হাতে দিয়ে বললে, এ-পথ দিয়ে কাজে যাচ্ছিলে, এই তো? হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে ব্যাগটা নেই, এই তো? ভাবলে ক'টা টাকা ধার নিয়ে যাই, এই তো? এই নাও। এবার বিদেয় হও তুমি।

শ্রীনাথ হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলো না, হাসলো, তারপর বললে, বলছিলাম কি, কাল অত রাত অবধি রইলাম, তোমার মা একবার বললে না, থাকো। জামাই তো বাপু।

সুমিতা কোন উত্তর দিলে না। নোটখানা মুঠোর মধ্যে দুমড়ে মুড়ে পালা-বার জন্যে পা বাড়ালো।

আর সঙ্গে সঙ্গে খপ করে সুমিতার হাতখানা ধরে ফেললো শ্রীনাথ।

হেসে বললে, রাগছো কেন? কি এনেছি দ্যাখো। বলে পকেট থেকে একটা লাল ভেলভেটের বাক্স বের করে মেলে ধরলো। একজোড়া সোনার দুল। মুক্তো বসানো।

বিস্মিত বিরাগের দৃষ্টিতে একবার সেদিকে একবার শ্রীনাথের মুখের দিকে তাকালো সুমিতা!

শ্রীনাথ বললে।—কপাল ফিরছে এবার, ঠিকাদারী করে। যা নিয়েছিলাম তখন, তার থেকে বেশী দেবো একে একে।

বোকা, বোকা। উপহাসের তাচ্ছিল্যের ম্লান হাসিটা সুমিতার ঠোঁটের গোড়ায় চমকে উঠে মিলিয়ে গেল। যা নিয়েছে তা কি সত্যিই ফিরিয়ে দেওয়া যায়? যা হারিয়ে গেছে তা' কি কোনদিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে!

শ্রীনাথ আবার অনুনয়ের চোখে তাকালো সুমিতার দিকে। তার ছাড়িয়ে নেওয়া হাতখানা আবার ধরলো। বললে—একটা দিন, মাইরী একটা দিন থাকি না শ্বশুর-বাড়িতে?

এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে মমিদের গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো

সুমিতা। এক ছুটে মমিদের বাড়ির ভিতর।

এখন আর এখানে আসার প্রয়োজন নেই। না কি এখনই তার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মমিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে মমতার ঘরে ঢুকলো সুমিতা।

—কি ব্যাপার, এত সকালে?

সুমিতা মমির খাটের পাশে ধুপ করে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, সেই শয়তানটা!

মমি হাসলো।—শয়তান কে নয়? সব পুরুষই শয়তান। সব সব।

সুমিতা মৃদুস্বরে বললে, একজন নয়, নিরুপম।

১৩

অরুণ বক্সীর সঙ্গেই কিনা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো নিরুপম। এত লোক থাকতে অরুণ বক্সীর সঙ্গে। নিরুপম নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

তবে কি অন্যায়ের বন্ধন আরো সুদৃঢ়!

আপিসের অনেকেই তো ওকে পছন্দ করতো। করবে না কেন। অমন চমৎকার চেহারা, চটপটে স্বভাব, একটা ফুর্তির জলোচ্ছ্বাস। ওর কথা শুনে নিরুপম নিজেও কখনো কখনো না হেসে পারেনি। হাসে, হাসায়, একটা প্রাণোচ্ছল জীবন্ত ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়ায় এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে।

তবু ওর ভাবভঙ্গী, অশালীন কথাবার্তা ঠিক যেন পছন্দ করতে পারতো না নিরুপম।

একটু একটু করে নীতিতে বিশ্বাস হারিয়েছে নিরুপম, কিন্তু রীতিতে আচারে নয়। বাইরের চেহারায় ও এখনো মার্জিত, ভদ্র।

অরুণ বক্সী একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, তুমি হলে চরমহংস, জলে কাদায় সাঁতার দিয়ে এসে ডানা ঝাড়া দিয়ে উঠলে, আবার সেই ফুটফুটে সাদা। আমাদের ভাই ডানায় একটু কাদা লেগেই থাকে।

শুনে হাসে নিরুপম। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবে কি করে ও এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো সেই মানুষটির সঙ্গে। যাকে চিরকাল অপছন্দ করে এসেছে তার সঙ্গে।

সততা, নীতিবোধ, ভদ্রতা—এসব ভালো ভালো বইয়ে পড়া গুণগুলো বোধহয় মানুষের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এমনভাবে এক হয়ে যেতে দেয় না। কিন্তু অন্যায় আর অনাচারের পথ শীর্ণ বলেই হয়তো পরস্পরকে এক কাছে এনে দেয়। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

বারবনিতা। কথাটা মনে পড়লেই হাসি পায় নিরুপমের। কি বিশ্রী একটা জীবনের কি শুদ্ধ সুন্দর নাম। ঠিক নিরুপমের শুদ্ধ সদাচারী পোশাকটার মত। অরুণ বক্সী হয়তো সেইজন্যেই ওকে দেখেও হাসে।

কিন্তু গণিকাদের মধ্যেও তো মানবিক সব গুণই দেখেছে ও। আব সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে কি অদ্ভুত একটা বন্ধন। তা হোক, ওদের দুঃখের জীবন কল্পনা করে একদিন সহানুভূতি জাগতো নিরুপমের। আজ আর তার এতটুকু অবশিষ্ট

নেই। দয়া নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই। শুধু একটা নেশা। সেই নেশার আকর্ষণেই ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। এ এক বিচিত্র সম্পর্ক।

ঘৃণা? হয়তো তাই। হয়তো ঘৃণার মধ্যেও একটা অসীম চুম্বকি শক্তি আছে।

একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়লো।

একটি ছোট্ট গলির মোড়ে দেখেছিল সে। নীচু শ্রেণীর একটি পুরুষ। নীচু শ্রেণী? নিরুপম এখনো নিজেকে উপরতলার মর্যাদা দিতে চায় নাকি?

নিজের মনেই হাসলো নিরুপম। টেবিলের ওপর দু' কনুই রেখে দু'হাতের জোড়া পাতায় থুতনি নামানো অরুণ বক্সীর মাথাটাকে পিরামিডের মত প্রাচীন মনে হচ্ছে। পিরামিডের মতই বহুকাল ধরে ওরা শুনেই আসছে, দেখে আসছে!

নিরুপম হাসলো অকারণে।—একটা ছোটলোক। লোকটা বেরিয়ে এলো বোধহয় মেয়েটির ঘর থেকে। পিছনে পিছনে মেয়েটি।

—তারপর? অরুণ বক্সীর চোখ দুটো কৌতুকে উৎসুক।

—রাস্তায় নেমেই পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালো লোকটা। আর কয়েক মিনিট আগের সেই রুগ্ন কুৎসিত শরীরসঙ্গিনী...

নিজেই হেসে ফেললো নিরুপম। ঘটনাটা আজ ওর কাছেও বুঝি কৌতুক মনে হচ্ছে।

অরুণ বক্সী উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন করলো।—বিড়িটা কেড়ে নিলো নাকি?

নিরুপম হাসলো।—না। কুৎসিত মেয়েটার পক্ষে যতটা মধুর হাসি হাসা সম্ভব তেমনি হেসে বললে, একটা বিড়ি দিয়ে যাও না!

—এই! হতাশ হলো যেন অরুণ বক্সী।

নিরুপম এবার আর হাসলো না। বললে, একটা সামান্য বিড়ি চাইলো মেয়েটি। আর সংগে সংগে লোকটা মুখেচোখে ঘৃণা ফুটিয়ে এমনভাবে 'ধোৎ' করে উঠলো . অথচ ভেবে দেখো, তার দু' মিনিট আগে মেয়েটার জন্যে ক'টা টাকা খরচ করতে তার বাধেনি।

অরুণ বক্সী হো হো করে হেসে উঠলো।—গুলি মারো তোমার ওসবে। ফুর্তি করতে এসেছি, ফুর্তির কথা বলো।

নিরুপমও হেসে উঠলো। সিনেমার একটা করুণ দৃশ্য যেন মুহূর্তে সরে গেল। গ্লাসটা তুলে ধরে এক চুমুকে শেষটুকু শুষে নিলো ও।

সত্যিই তো, এই হোটেলটায় ফুর্তির খোঁজেই তো এসেছে ওরা।

অরুণ বক্সী বেয়ারাটাকে ডাকলো।—ইব্রাহিম, আর কতক্ষণ কড়িকাঠ গুনবো বাবা।

ইব্রাহিম হাসলো।—এক্ষুনি এসে পড়বে বাবু। বলেই চলে গেল।

অরুণ বক্সী গ্লাসে বোতলের তলানিটুকু ঢেলে নিলো এবার। চোখ দুটো নেশায় জুলজুল করছে তার।—যুগ পালটে গেছে হে, ভ্যালুজ বদলে গেছে। ওসব ব্রহ্মচর্য সতীত্ব ওসবের কোন দাম নেই। পুরোনো কথাগুলো পচে গেছে। ফুর্তি করো, ফুর্তিই সার সত্য।

শুনে হাসলো নিরুপম। ঠিকই তো! ক্ষণিকের জন্যে সেদিনের সেই মেয়েটিকে মনে পড়লো নিরুপমের। নিজের মনে একা একা তাস খেলছিল সে। অরুণ বক্সী পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত রেখে হেসে উঠেছিল সেদিন।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই কি একটি অন্যায়ের দিক আছে! হয়তো। ছোট

আর বড়। কোন্‌টা ছোট আর কোনটা বড়, কে বিচার করবে। অভ্যাসের দামে বিবেক বিক্রী হয়ে গেছে সকলের। কই নিরুপমের তো একবারও মনে হয় না, ও কোন অন্যায় করছে। কেন মনে হবে। ভ্যালুজ বদলে গেছে না?

একই অপরাধ, এক ক্ষুদ্রতা, একই পাপ মানুষে মানুষে বন্ধন সৃষ্টি করে। ন্যায় নীতি সততা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। আত্মীয়স্বজনের চেয়ে বন্ধুর চেয়ে সেখানে বিবেক বড় হয়ে ওঠে। বিবেক শুধু নিঃসঙ্গতা ডেকে আনে।

নিরুপমের মনে হলো, বিবেক শুধু একটা মদমত্ত অহঙ্কার।

—কি ভাবছো নিরুপম? হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো অরুণ বক্সী। নেশার ঘোর লেগেছে ওর কথায়।

নিরুপম ভাবছে এই নতুন পৃথিবীর কথা। একটি বিপরীত পৃথিবীকে এতদিন দেখে এসেছে সে। একটি বিপরীত সমাজ।

আজ অরুণ বক্সীর হাত ধরে আরেকটি নতুন পৃথিবীর পরিচয় জানতে এসেছে। এখানে সবই স্বাভাবিক। নিরুপমের মত, অরুণ বক্সীর মত এরাও সমাজের মানুষ।

অরুণ বক্সীর নেশায় কথা জড়িয়ে আসছে। অনর্গল কথা বলতে শুরু করেছে।

—ভগবান মরে ভূত হয়ে গেছে নিরুপম।

নিরুপম শুধু হাসলো।

অরুণ বক্সী হঠাৎ নিরুপমের হাতখানা ধরলো খপ্‌ করে! বললে, বীলিভ মি। কেন ফূর্তি করবো না আমরা। দু'হাতে টাকা রোজগার করছি...

নিরুপম কপট প্রতিবাদে বললো, রোজগার? নিজেও হাসলো ও।

—হ্যাঁ, রোজগার। কে নেয় না ঘুষ? কেন নেবো না? সাঠে কোম্পানীর প্রফিট আরো পাঁচশো টাকা বেশী হলে কার কি লাভ হতো?

নিরুপম কোন উত্তর দিলো না।

অরুণ বক্সী টলছে। সোডার বোতল খোলার মত ভুসভুস করে কথা বের হয়ে আসছে।

—আমি ব্যাচেলার মানুষ। বাবা মা ভাইবোনের বিরাট সংসারের মুখ চেয়ে বিয়ে করতে সাহস পাইনি।

অরুণ বক্সী হাসলো।—ঘুষ নিতে শুরু করেছিলাম সংসার চলে না বলে, কিন্তু জানো নিরুপম, ওর কেউ আমার দিকে তাকালো না।

একটু থেমে বললে, একটি মেয়েকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম, বাজে দেখতে হে, তবু মেয়েটা রেগে গেল। এখন পঁচিশ টাকায় তার চেয়ে অনেক সুন্দর মেয়ে পাওয়া যায়। ওয়েট অ্যান্ড সী। এখনই দেখতে পাবে, আসছে।

নিরুপম হাসলো।—প্রতিশোধ নিচ্ছ বুঝি সেই মেয়েটির ওপর?

অরুণ বক্সী প্রতিবাদ করে উঠলো, কক্ষনো না। জীবন উপভোগের রাস্তা খুঁজছি। রোজগার করে কি করবো? সংসারের হাতে যতই দাও চলবে না তাদের, আর ইউ উইল রিমেন দি সেম। তেমনি একা একা।

নিরুপমের হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগলো যেন। তবে কি নিরুপমও সেইজন্যেই এসেছে, আসে? নেশা নয়?

টাকা। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী টাকা।

নিরুপমের মনে পড়লো, প্রথম যেদিন ঘুষ নিয়েছিল ও, বুকপকেটে নোট

ক'খানার স্পর্শ বুকের মধ্যে কি অস্বস্তি জাগিয়েছিল।

—পঞ্চাশটা টাকা কম কেন রে খোকা? ত্রিদিববাবু প্রশ্ন করেছিলেন একদিন।

পঞ্চাশটা টাকা বেশী কেন সে-প্রশ্ন করতেও বাধতো না তাঁর। আর মনীষা? একখানা গাড়ির কাঙাল ও এখন। আরে ধুৎ, তাহলে নিরুপমই ফুর্তি করে নেবে না কেন!

নিরুপম হাসলো। কি সব আজেবাজে কথার মধ্যে ডুবে গেছে ও।

কি বলতে যাচ্ছিল ও। ইব্রাহিম এসে দাঁড়ালো। বললে, এসে গেছে বাবু।

নেশা জড়ানো গলায় অরুণ বক্সী বললে, আনকোরা নতুন তো? তা নইলো কিন্তু...

ইব্রাহিম ঘাড় নাড়লো শান্ত গাম্ভীর্যে।

একখানা ঘর দেখিয়ে দিলো ইশারায়। তারপর হোটেলের খাতাখানা এনে হাজির করলো।

১৪

আনন্দময়ী ভেবেছিলেন, মেয়ে-জামাইয়ের মনোমালিন্য। দু' দিন বাদেই মিটে যাবে। কথা কাটাকাটি ঝগড়া কোন্ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে না হয়, রাগ পড়ে গেলে তাদের নিজেদেরই লজ্জা হয়। সংসারে আবার শ্রী-শান্তি ফিরে আসে।

কিন্তু শেষ অবধি তেমন কোন সম্ভাবনাই দেখতে পেলেন না। শ্রীনাথের কথা জিগ্যেস করলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে সুমিতা।— ওর নাম তুমি আমার কাছে করো না মা, বলছি না, ও মরে গেছে।

—ছি ছি, কি অলক্ষুনে কথা। মেয়ের ওপরই আনন্দময়ী রেগে গেছেন।

কিন্তু সুমিতা রাগ বাড়িয়ে দিয়েছে, স্বগতভাবে বলেছে, সত্যি সত্যি বিধবা হলেও তো বাঁচতাম।

আনন্দময়ী চুপ করে গেছেন। ভেবেছেন, দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে, আজকালকার মেয়েদের মন বোঝাও ভার। এমন কি ব্যাপার ঘটতে পারে, যার জন্যে সুমিতা স্বামীর মৃত্যু কামনা করে, আনন্দময়ী বুঝতে পারতেন না।

কিন্তু একটু একটু করে দিনে দিনে, সব কথাই শুনলেন, বুঝলেন। অদৃষ্টকে দোষ দিলেন। তাছাড়া আর কীই বা করবেন। মেয়েকে সারাজীবন চোখে চোখে রাখলেন, শাসনে বশ করলেন, সে তো শুধু মেয়ের মঙ্গল-অমঙ্গল ভেবে। মেয়ের ভালোই তো চেয়েছিলেন। অথচ কি হতে কি হয়ে গেল।

প্রথমটা স্বামীর দোষ ধরেছিলেন। কখনো চাঁপামাটির প্রতিবেশী সেই পরিবারকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন—যারা পাত্রের খবর দিয়েছিল। তারপর নিজেকেই। কাশীবাবুকে—ও'র মত মানুষকে কিনা পাঠিয়েছিলেন পাত্রটির খবরাখবর নিতে। কিন্তু বিয়ের রাতে শ্রীনাথকে দেখে আনন্দময়ী নিজেই কি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন? পাড়াপড়শি অনেকের মত তিনি নিজেও তো চেহারা দেখে খুশীই হয়েছিলেন।

তারপর সব শুনলেন একে একে।

সুমিতা প্রশ্ন করেছিল, এর পরও তুমি আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে

বলো?

আনন্দময়ী কোন জবাব দিতে পারেননি। শুধু নিজের মনকেই যেন বলেছিলেন, আমাদেরও তো এই অবস্থা!

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

বাড়ির অবস্থা কি সুমিতাই টের পায়নি? সেই প্রথম যেদিন বাবার সংগে ইছাপুর ছেড়ে শহরতলীর এই ছোট দু' কুঠরী বাড়িতে এসে উঠেছিল, সেদিনই বুঝতে বাকী থাকেনি। নোংরা চট ঝোলানো বে-দরজা কল-পায়খানা পাশাপাশি তিনটি পরিবারের জন্যে। ঘৃণায় সংকোচে মরে গিয়েছিল সুমিতা।

বাবা খেতে বসেছিল। পাশে বাচ্চু।

বাচ্চু যখন ওকে জড়িয়ে ধরেছিল আনন্দে, তখন সুমিতা বলেছিল, হ্যাঁরে, এ কি প্যাঁকাটির মত চেহারা হয়েছে তোর!

সুমিতার নিজের চেহারার কি হাল হয়েছে বাচ্চু মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আমি তো রোগাই ছিলাম, আর তুমি?

সুমিতা কোন জবাব দেয়নি। কিন্তু মা ভাত বেড়ে দিয়ে যেতেই বাবার আর বাচ্চুর থালাটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারেনি ও।

—সে কি মা, বাবার খাওয়া এত কমে গেছে? আর বাচ্চু এই ক'টি ভাত খায়? তাই অমন চেহারা হচ্ছে।

বাচ্চু কোন কথা বলেনি। কাশীবাবু শুধু হেসে বলেছিলেন, এখানকার জল-হাওয়া ভাল নয় রে। খিদে হয় না। দারিদ্র্য ঢাকতে চেয়েছিলেন বাবা।

চাঁপামাটিতেও তো গরিবের সংসারই ছিল। নিরুপমদের বাড়ি, তাদের অবস্থা, বাণীর শাড়ী ব্লাউজ দেখে মনে মনে লোভও হতো। কিন্তু নিজেদের দারিদ্র্যের জন্যে এত লজ্জা ছিল না। জীবন এমন ছন্নছাড়া ছিল না।

এই সংসারে সুমিতা আবার একটা বাড়তি ভার হয়ে এসেছে জেনে ও নিজেও অস্বস্তি বোধ করলো। কিন্তু এ ছাড়া কীই বা করতে পারতো ও।

মাস কয়েক পরে যখন শ্রীনাথ হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলো ঠিকানা খুঁজে খুঁজে, তখন মুহূর্তের জন্যে ফিরে যাবার কথাও ভেবেছিল সুমিতা।

কপাটের আড়াল থেকে আনন্দময়ী উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনতে চেষ্টা করেছিলেন মেয়ে-জামাইয়ের কি কথা হয়।

মেয়ে ভিতরে আসতেই বলেছিলেন, শোন, রাগ করে লাভ নেই। নিতে এসেছে, চলে যা। তুই শক্ত হলে, ও ঠিক ভাল হয়ে উঠবে।

সুমিতা মা'র দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলেছিল, আমাকে নিতে ও আসেনি, টাকা নিতে এসেছিল।

টাকা? আনন্দময়ী আকাশ থেকে পড়েছিলেন।

শ্রীনাথকে কিছু শোনাবেন বলে চৌকাঠ ডিঙিয়েছিলেন। দেখলেন, শ্রীনাথ চলে যাচ্ছে।

সুমিতা শুধু হেসে বলেছিল, তাড়িয়ে দিয়েছি।

আনন্দময়ী কিছুই বলেননি তখন। কিন্তু মনে মনে হয়তো সুমিতার ওপরও চটে গিয়েছিলেন।

সুমিতা দুপুরে খেতে বসতেই মা সেদিন ওর সামনে ভাতের থালাটা ঠকাস করে নামিয়ে দিলেন। থালা নামানোর শব্দটার মধ্যেই যেন লাঞ্ছনা অনুভব করলো সুমিতা।

মুখের গ্রাস তুলতে গিয়ে চোখে জল এলো। মা'র কাছ থেকে এতখানি অবহেলা পাবে, তাও শুধু দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যে, সুমিতা ভাবতে পারেনি। এতকাল ধারণা ছিল, ওর কোন আশ্রয় না থাক, বাবা-মা আছে।

আশ্চর্য, তাও নেই ওর!

মুখ নীচু করে ভাতের গ্রাস কোনরকমে গিলেছিল সুমিতা। যেন অবহেলার অন্ন গলা দিয়ে নামতে চায় না।

আনন্দময়ীও সামনে বসে এনামেলের থালায় ভাত নিয়ে নিঃশব্দে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন, তিন মাস ভাড়া বাকী, বলছে, না দিলে মামলা করে উঠিয়ে দেব।

চমকে চোখ তুললে সুমিতা।—দিয়ে দাওনি কেন!

কি অবুঝের মত কথাটা বলে ফেলল সুমিতা। আর তাই আনন্দময়ী হয়তো আঘাত দেবার জন্যেই বললেন, তোর জন্যেই তো এই হাল আমাদের।

—আমার জন্যে? স্তম্ভিত হয়ে গেল সুমিতা। বললে, কতটুকুই বা খাই আমি! ক'মাস এসেছি!

—খাওয়ার খোঁটা দেব আমি তোকে? তুই ভাবলি কি করে?

তারপর নিজের মনেই গজগজ করলেন।—যা কিছু ছিল সব খরচ করে তোর বিয়ে দিলাম, ভাবলাম নির্ঝঞ্ঝাট হলাম। তবু যদি সুখী হতিস।

অর্থাৎ ওর বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন বলেই আজ সংসারের এই অবস্থা। সুমিতা নিজেই কি তা জানে না। কিন্তু মা'র মুখ থেকে সে-কথা শুনতে কারই বা ভাল লাগে।

অনুযোগের স্বরে বললে, আমাকে নিয়েই তো তোমাদের সব ঝঞ্ঝাট। বেশ, নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো।

নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো। রাগের মাথায় বলা যায়, কিন্তু ব্যবস্থা করা তো সহজ নয়।

সুমিতা কি আর করবে। গিয়ে কেঁদে পড়েছিলো মমতার কাছে।—এবার সত্যি সত্যি একটা উপায় করে দে মমি, এই এত অভাব অভাব আর দেখতে পারি না।

সেদিন সন্ধ্যার পর ফিরে এলো সুমিতা। মা'র হাতে কড়কড়ে পাঁচখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে, এই নাও টাকা।

বোকা বোকা চোখ মেলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আনন্দময়ী। —টাকা!

*

মমিদের স্বচ্ছল সংসারটা দেখে ভিতরে ভিতরে লোভ কম হতো না।

এ পাড়ায় বাপের বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে যেন ওরা বন্ধু হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝেই আসতো, গল্প করতো, রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করতো, কি রাঁধছেন মাসীমা।

আনন্দময়ী লুকোতে চেষ্টা করতেন। ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখতেন সব, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলতেন, রান্না আর কি করবো মা, কারো তো কিছু পেটে সয় না।

মমতাকে কিন্তু ভালবাসতেন আনন্দময়ী। মিশুকে, আর কি ভাল ব্যবহার। ঘরের লোকের মত।

একবার একখানা ভাল শাড়ি কিনে দিয়েছিল সুমিতাকে।—সুমিকে দিলাম মাসীমা। কেমন, ভাল না শাড়িটা? ভাবলাম নিজের জন্যে কিনছি, সুমির জন্যেও নিই একটা।

আনন্দময়ী খুশী হয়ে মমতার কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলেছিলেন, সুমিও আমার মেয়ে, মমিও আমার মেয়ে।

সুমিতা হেসেছিল মা'র কথা শুনে।

আর আনন্দময়ী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মমতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, থিয়েটারের কাজটা কেমন, কত টাকা পাওয়া যায়, সবাই পারে কিনা।

থিয়েটারে অভিনয় করে এ-কথাটা প্রথম যেদিন শুনেছিলেন, ভাল লাগেনি। কিন্তু একটু একটু করে মমতার ব্যবহার দেখে সব বিরুদ্ধ ভাব ঘুচে গিয়েছিল। —গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে এ তো অনেক ভাল কাজ—নিজেই বলতেন।

কিন্তু সুমিতাকে কোন দিন সে-কথা বলতে পারেননি।

সুমিতা নিজেও না। থিয়েটারে একরাশ লোকের সামনে অভিনয় করা! সে কি সহজ নাকি। সুমিতা শুধু বলেছে, আমাকে বরং একটা চাকরিবাকরি খুঁজে দে, মমি।

মমতা হেসেছে।—কি চাকরি পাবি তুই। ক' টাকাই বা পাবি!

সত্যিই তো, কি চাকরি পাবে ও। ইস্কুল থেকে জোর করে নামটা কাটিয়ে না দিলে হয়তো আজ ও কিছু জুটিয়ে নিতে পারতো।

মা'র ওপর মাঝে মাঝে তাই আক্রোশে জ্বলে উঠতো সুমিতা। মনে হতো, মা'র জন্যেই আজ ওর এই অসহায় অবস্থা।

মমতাকে দেখে কখনো কখনো হিংসে হতো। সায় দিতে ইচ্ছে হতো ওর কথায়।

মমতা বলতো, সব মিথ্যে রে, টাকাটাই আসল। তার জন্যে সব করতে রাজী আমি।

চোখ কপালে তুলে তাকাতো সুমিতা। তারপর কৌতুকের হাসি হেসে প্রশ্ন করতো, সব?

—হ্যাঁ, সব। ও সব ভগবান-টগবান বাজে কথা।

—সমাজ?

—সমাজ আবার কি? হাসতো মমতা, বলতো, সমাজ আমাকে খেতে দেবে?

তারপর একটু থেমে বলতো, আর সমাজের চোখে ধুলো দেওয়া তো সবচেয়ে সোজা রে!

সুমিতা শিউরে উঠতো ভিতরে ভিতরে।—মমি, সত্যি করে বল, তুই টাকার জন্যে...

—দূর। হেসে উঠতো মমতা।—থিয়েটার করেই যা পাই, যথেষ্ট। কিন্তু ধর যদি না পারতাম এ-সব কাজ, আমি কি না খেয়ে মরতুম? কক্ষনো না।

শুনে নিশ্চিন্ত হতো সুমিতা। আবার ভিতরে ভিতরে একটু সন্দেহ উঁকি দিতো। মনে হতো, মমি বুঝি অফুরন্ত টাকা রোজগারের সেই গোপন সুড়ঙ্গ-পথটা জানে।

কিন্তু শেষ অবধি আর পারলো না। মা'র কথা শুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল সুমিতা। শুধু কি মা! একটা উপায়হীন অসহায় বন্দী হঠাৎ যেন ভাঙা ভীমরুলের চাকের কাছে এসে পড়েছে। পালাবার পথ নেই। এক একসময় মাথা

গরম হয়ে যায়। পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। পাগল হয়ে গেলে মানুষ হয়তো সব দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পায়। সত্যি যদি সুমিতা পাগল হয়ে যেতে পারতো।

কিন্তু মাকে কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারে না সুমিতা। প্রতিটি কথার মধ্যে একটা লুকোনো হুল। এর চেয়ে মা যদি ওকে বেরিয়ে যেতে বলতো, যদি বলে দিতো ওর ভার নেওয়া সম্ভব নয়, তা হলেও শান্তি পেত সুমিতা। তার বদলে—মমি দ্যাখ কত কাজের মেয়ে—মেয়েরাও তো আজকাল দিব্যি চাকরি করছে।—মিত্তিরদের সন্ধ্যা গান শিখিয়ে কত টাকা পায়।

ওর এক একসময় ইচ্ছে হয় চিৎকার করে বলে ওঠে, তোমার, তোমার জন্যেই তো আজ এই অবস্থা। ইস্কুল কলেজে পড়িয়েছো আমাকে, যে চাকরি করবো? গান শিখিয়েছো? কখনো কারো সঙ্গে কথা বলতে দিয়েছো তুমি যে মমির মত থিয়েটার করবো!

কিন্তু শুধু তো মা নয়। সারা পৃথিবীই বুঝি ওকে পাগল করে দিতে চায়। বাবা কত ভালমানুষ, কখনো কারো ক্ষতি করেননি, কোন লাভ-লোকসানের হিসেব রাখেননি। অথচ তাঁর এই দারিদ্র্য... ফতুয়াটা একটু সেলাই করে দিবি মা...কোথায় সেলাই করবে সুমিতা...কাপড়টাই যে পচে গেছে!

শ্রীনাথের ওপর—নিজের ওপর মন বিষিয়ে ওঠে। কি ভুলই না করেছে ওই মানুষটাকে শুধরে দেবার আশায়—তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার আশায়। আজ যদি হাতে গলায় সামান্য সোনাটুকুও থাকতো, বাবার এই দুর্দশাটুকু ঘুচিয়ে দিতে পারতো। আর বাচ্চু! তার দিকে তাকাতেও ভয় হয়। কি চেহারা যে হচ্ছে দিনে দিনে। গলার হাড় বেরিয়ে গেছে। তবু মুখের হাসিটা যায়নি। সব অভাবের মধ্যেও হাসিটা ঠিক তেমনি আছে। শুধু একদিন—যেদিন মাইনের টাকা না দিলে ইস্কুল থেকে নাম কেটে দেবে বলেছিল—সেদিনই কেমন বোকা বোকা চোখ মেলে দিদির দিকে তাকিয়েছিল বাচ্চু।

সুমিতা কেন জানি বলেছিল, আর ক'টা দিন সময় চেয়ে নে বাচ্চু, আমি ঠিক টাকা জোগাড় করে দেবো তোকে।

কেন বলেছিল, কি আশা পেয়েছিল সুমিতা, কে জানে। কিন্তু তার পর থেকে বাচ্চু ওর দিকে তাকালেই ও একটা জলেডোবা মানুষের মত অসহায় বোধ করতো। কখনো কখনো নিজের ওপরেই চটে যেতো। কি প্রয়োজন ছিল ওকে মিথ্যে আশা দেওয়ার।

সান্তুর দিকে তাকালেও মায়া হয় সুমিতার। যৌবনের সিঁড়িতে পা দিয়ে থমকে আছে সান্ত্বনা। তার পুরনো রঙচটা শাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ওর এই আশ্চর্য মুহূর্তটুকু ও যদি রাঙিয়ে দিতে পারতো। সুমিতা জানে, শুধু মমি নয়, মা সান্ত্বনা আর সুমিতার মধ্যেও একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে রাখতে চায়। হয়তো মমির মতই সুমিতাকেও ভিতরে ভিতরে মা ভয় পায়।

মাঝে মাঝে তাই রাগও হয় মা'র ওপর। মা'র ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সান্ত্বনাকে—যাকে ও এত ভালবাসে, তাকেও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে ইচ্ছে হয়! ও নিজেকে যেভাবে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে।

এরই মধ্যে একদিন শ্রীনাথ এসে হাজির হয়েছিল।

রাগে সারা শরীর রী রী করে উঠেছিল সুমিতার। রাগ, না ঘৃণা!

—আবার এসেছো?

মুচকি মুচকি হেসেছে শ্রীনাথ—না এসে যে পারি না।

টাকা চাওয়াটা আসলে অজুহাত। সুমিতা শ্রীনাথের চোখের দৃষ্টিতে বুঝতে পারে সে কি চায়, কেন আসে।

কন্ট্রাকটারি করছি। এখন তো আর বেকার নই। শ্রীনাথ বলেছে। ইদানীং তার পোশাক-আশাক দেখে বিশ্বাসও হয়েছে সুমিতার।

কিন্তু তাই বলে শ্রীনাথকে ও ক্ষমা করবে?

এই বাড়ি, এই পরিবেশ থেকে পালাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কোথায় পালাবে ও? পাশের বাড়ির জ্যোৎস্না একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, ব্যাপারটা কি বলো তো ভাই, বাপের বাড়িতে গেড়ে বসেছো, বাচ্চাটাচ্চা হবে নাকি? মিত্তিরদের মাসীমা মা'র সঙ্গে গল্প করতে এসে ওকে বলেন, শুনেছি তো সব, তাই একটা চাকরিবাকরিই করো!

প্রশ্ন আর উপদেশ। সারা পৃথিবীটাই যেন ওর গার্জেন হয়ে উঠতে চায়। যেন সুমিতার নিজের কোনো বুদ্ধি নেই। যেন কি ভাল কি মন্দ ও জানে না। যেন বাপের বাড়ির দারিদ্র্য আর অভাব ওর চোখে পড়ছে না। যেন টাকা রোজগারের হাজারো পথ ওর চোখের সামনে খোলা, ও সে-পথে হাঁটতে রাজী নয়।

গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে এ তো অনেক ভালো কাজ! মমির প্রশংসা করতে গিয়ে মা একদিন বলেছিল। আর সুমিতার মনে হয়েছিল কথাটা মা ওকেই শোনালো। হ্যাঁ, তাই। সুমিতাকে মা গলগ্রহই তো ভাবছে আজকাল।

সেদিনই মনস্থির করে ফেলেছিল সুমিতা। কিন্তু শেষ অবধি সাহস হয়নি।

তবু সব সহ্যের সীমা পার হয়ে গেল একদিন।

মা বললে, যা কিছু ছিল সব খরচ করে তোর বিয়ে দিলাম, ভাবলাম নির্ঝঞ্ঝাট হলাম।

—নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো। সদম্ভে বলে বসলো সুমিতা।

ভাবলো, ভাবলো। সারাটা পথ কত কি ভাবলো সুমিতা, কিংবা কিছুই ভাবলো না। শুধু একটি চিন্তা। একটি স্বপ্ন। টাকা!

বাবার ক্লান্ত করুণ মুখখানা দেখলো হয়তো। বাচ্চুর আশাদীপ্ত নির্ভাবনার মুখখানা দেখলো হয়তো। রূঢ় তাচ্ছিল্যে ম্লান হয়ে যাওয়া মা'র মুখখানা।

এসে দাঁড়ালো মমতার সামনে।

মমতা তখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—কি বলছিস তুই?

—সব, সব কিছুতে আমি রাজী। শুধু উপায় বাতলে দে।

মমতা এক মুহূর্ত কি যেন দেখলো সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে, কি যেন ভাবলো।

তারপর ধীরে ধীরে বললো, আয় আমার সঙ্গে।

সেই প্রথম দিনটির কথা ভুলবে না সুমিতা। ওর সেদিন কোন ভয় ছিল না, কোন লজ্জা ছিল না। মমির হাতেই ও নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল।

গাড়িতে ও আর মমি। আর দুটি পুরুষ। ডায়মণ্ডহারবারের পথে ছুটেছিল গাড়িটা। একজনের পাশে ব'সছিল মমি, পিছনে সুমিতার পাশে অন্যজন। এক সময় ওর কাঁধের ওপর একখানা মুখর হাত নেমে এলো। একটি পুরুষের উত্তপ্ত স্পর্শ।

সামনে মমি, আর চালকের আসনে সেই লোকটি। কি অদ্ভুত স্বাভাবিক কথা বলছে মমি। দুজনে রসিকতা করছে। মমি তার গা ঘেঁষে বসেছে। নিজেই তার কাঁধে হাত দিয়েছে।

পাশের লোকটি কি একটা হাসির কথা বললো। হ্যাঁ, সুমিও হেসেছে তার কথা শুনে। সুমিও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

লোকটির বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল যেন টেলিগ্রাফের ভাষায় কি বলতে চায় সুমিতাকে।

সমস্ত লজ্জা ভয় দূর হয়ে গেছে সুমিতার। একটুও ভয় নেই, লজ্জা নেই।

হঠাৎ চেষ্টা করে সপ্রতিভ হয়ে উঠলো সুমিতা। ঘন হয়ে লোকটির কাছে বসলো। একটি উত্তপ্ত হাতের প্রগল্‌ভ আঙুলগুলিকে প্রশ্রয় দিলো সুমিতা।

কি আশ্চর্য, সব দ্বিধা সঙ্কোচ কখন মন থেকে দূর হয়ে গেছে। সব ভয়।

গুনে গুনে পাঁচটি দশ টাকার নোট নিয়ে ব্যাগে রেখেছিল সুমিতা। টাকাটা নিতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠেছিল একবার। অনুশোচনায় নয়, আনন্দে।

বাড়ি ফেরার পথে মমতা শুধু বলেছিল, চল এবার একদিন থিয়েটারেও নিয়ে যাবো।

টাকার নেশায় তখন বুঝি মাতাল হয়ে উঠেছে সুমিতা। টাকা, টাকা, ও আরো অনেক টাকা চায়। এতকাল নিজেকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখে এই প্রথম টাকার স্বাদ পেয়েছে। অনেক টাকা চায় সুমিতা, অনেক টাকা। ভোগের, প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়। বাবার কপালের কুঁচকে-যাওয়া রেখাগুলো মুছে দিতে চায়। বাচ্চুর ফ্যাকাশে মুখে রক্তের আভা ফোটাতে চায়। মা'র মুখের ওপর দিনের পর দিন টাকা ছুঁড়ে দিতে চায়। ঠিব যে-ভাবে দিনের পর দিন ওর মুখের ওপর বিষাক্ত কথার তীর ছুঁড়েছে মা।

থিয়েটার! পাগলের মত হেসে উঠলো সুমিতা, মমির কথা শুনে।—তিন মাস রিহার্সাল দিয়ে আশিটা টাকা? কি বলছিস মমি!

মমতা গম্ভীর শান্ত গলায় বললে, হ্যাঁ তাই।

—এত কম টাকায়?

কথাটা বলে ফেলে সুমিতার মনে হলো ওর নিজের কানেই যেন অদ্ভুত শোনালো। এত কম টাকায়? দু দিন আগে এই আশিটা টাকাই যে ওর কাছে স্বর্গ মনে হয়েছে, এই ক'টা টাকা রোজগার করার জন্যেই যে ও উন্মুখ হয়েছিল!

মমতা শান্ত গলায় বললে, একটা কথা ভুলিসনে সুমি। মেয়েদের রোজগারের প্রত্যেকটি টাকা এক একটা সন্দেহ।

সুমিতা হেসে উঠলো।—আমি আর কাউকেই ভয় পাই না, করুক সন্দেহ।

মমতা শান্ত গলায় বললে, তা হয় না সুমি, তুই জানিস না।

একে একে সব কথা শুনলো সুমিতা।—প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন। চারিদিক থেকে সকলেই প্রশ্নের চোখে তোর দিকে তাকাবে সুমি। মা, বাবা, বাচ্চু। পাড়ার জ্যোৎস্না, মিত্তিরদির মাসীমা।

কোথায় গিয়েছিলি রে সুমি?

কি করছিস তুই আজকাল?

এত টাকা কোথায় পাও গো সুমিদি?

এত সাজগোজ করে কোথায় যাস?

এত রাত্রে কোত্থেকে ফিরছো সুমিতা?

মমতা ধীরে ধীরে বললে, মাঝে মাঝে দু'একটা থিয়েটারের কার্ড দিবি,

পাড়াপড়শিদের সব মুখ চুপ হয়ে যাবে।

সুমিতার মনে তখনো একটা উদ্দাম নেশা। একটা অদ্ভুত আনন্দের শিহরণ। এই প্রথম যেন ও নিজেকে ভালবাসতে পেরেছে। নিজের ওপর বিশ্বাস এসেছে।

ওর চঞ্চল পা দুটো যেন নিজের খেয়ালে নেচে উঠতে চাইছে।

বাড়ি ফিরে মা'র হাতে পাঁচটা দশ টাকার নোটই তুলে দিলো সুমিতা।—এই নাও টাকা।

আনন্দময়ী স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে। হাত পেতে নিলেন টাকাগুলো, সন্ধানী চোখে কি যেন খুঁজলেন সুমিতার মুখে। কোন প্রশ্ন করতে পারলেন না।

কিন্তু রাত্রে, অনেক রাত্রে বিছানায় পড়ে পড়ে হঠাৎ অনুশোচনায় সারা মন ভরে গেল সুমিতার।

মনে হলো, জীবনের একটি দুর্মূল্য অলংকার যেন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। নিরুপমের দেওয়া সেই রুপোর ব্রোচটা হারিয়ে যাওয়ার মত একটা নিঃস্বতা যেন গ্রাস করলো সুমিতাকে।

ওর হঠাৎ মনে হলো, জীবনের অদৃশ্য সংগী নিরুপমকেও ও যেন চিরদিনের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে। নিরুপম হারিয়ে গেছে। সুমিতা হারিয়ে গেছে।

বালিশে মুখ গুঁজে নিরুপমের মুখখানা ভাবতে চেষ্টা করলো সুমিতা। ভাবতে চেষ্টা করলো। না, কিছুতেই সে মুখখানা মনে আনতে পারছে না সুমিতা। কিছুতেই সেই মুখের ছবিটা ফুটে উঠছে না।

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস রোধ করে রইলো ও।

১৫

আর কোনদিন রিহার্সাল দেখতে যায়নি নিরুপম। সেই একদিনই। জ্ঞানবাবু টানাটানি করেছেন, অরুণ বক্সী ডেকেছে, কারো কথায় কান দেয়নি ও।

অরুণ বক্সী বলেছে, আরে মক্ষিরানী ওই একটাই নয়, আরো আছে। আজ আসবে সব।

নিরুপম হেসেছে।—না ভাই, আমার ভাল লাগে না।

ভাল না লাগবারই কথা। সেদিন সুমিতাকে ওখানে দেখে সারাক্ষণ ওর বুকটা টনটন করেছিল। অরুণ বক্সী তো জানে না, সুমিতা কে, কি সম্পর্ক তার নিরুপমের সংগে। একটি নিষ্পাপ তাজা ফুলের মত যাকে বুকের কাছটিতে রাখতে চায়, হাটের মাঝে তাকে এ-ভাবে দেখতে চায় না ও। কষ্ট হয়। ওদের হাল্কা রসিকতাগুলো যেন নিরুপমের বুকে এসে বেঁধে।

অরুণ বক্সী বলেছিল, একদিনে ওদের ঠিক চেনা যায় না। কে যে সত্যি ভাল, আর কে যে একটা তুড়ির অপেক্ষায়, বুঝতে পারলাম না আজও।

শুনে খুশী হয়েছিল নিরুপম। ও নিজেও বিশ্বাস করেছিল, সুমিতার মধ্যে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই।

ভালমন্দ নিয়েই তো সংসার। ভাল আর মন্দ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে পাশাপাশি।

আরো যে-দুটি মেয়ে রিহার্সালে আসে, ছোটখাটো পার্ট করে, তাদের সম্পর্কে সুমিতাই কি কিছু জানে! তাই ওখানে একটি দুর্লভ মুগ্ধতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত সুমিতা।

অরুণ বক্সী আর আর-পাঁচজনের লুব্ধ দৃষ্টিকে কৌতুকের হাসিতে ম্লান করে দিয়েছে ও বারংবার। কিন্তু প্রতিদিনই ওই ছোট্ট ঘরখানিতে ঢুকে একটি মানুষকে খুঁজেছে। নিরুপমকে।

না, নিরুপমকে খুঁজে পায়নি।

মনে মনে খুশী হয়েছে সুমিতা। এখানে যারা আসে তাদের অনেকেরই চোখের ভাষা বুঝতে পারে ও। নিরুপম তাদের মধ্যে আরেকজন নয়। নিরুপম শুধু একজন, একটি নির্জন দ্বীপের মত, যার দিকে তাকিয়ে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াতে হয় না।

কিন্তু কই, নিরুপম তো দেখা করতে এলো না। এলে অস্বস্তি বোধ করতো ঠিকই। বাবাকে মাকে নিরুপমের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হাওয়ার কথা চেষ্টা করেও বলতে পারেনি ও। কেমন একটা সংকোচ এসে ওর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

তবু দেখা করতে ইচ্ছে হয়েছে বার বার। ইচ্ছে হয়েছে কৌতুকের স্বরে জ্ঞানবাবুকে প্রশ্ন করে, সেই নতুন অতিথিটি আসে না কেন!

কিন্তু তা হলেই হয়তো একটা অর্থপূর্ণ রসিকতায় ওকে অপ্রতিভ করে দেবে সকলে। হয়তো নিরুপমের কানে যাবে সে-কথা।

না, নিজেকে এভাবে নিরুপমের কাছে ছোট করতে পারবে না।

আজ কি রিহার্সাল দিতে যাবে সুমিতা? এক মুহূর্ত ভাবলো ও। না, যাবে না।

হাতের ঘড়িটা টেবিলের ওপর নামানো ছিল। দেখলো সুমিতা। এখন দুপুর দেড়টা। মমতা হয়তো অধৈর্য হয়ে এসে পড়বে।

ওই একটি ব্যাপারে শুধু মাকে ভয় পায়।—ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর না মিশলেই কি নয়! কিংবা—বলেছিলাম না তোকে, মমি যেন কোনদিন এ-বাড়িতে না আসে।

মা একদিন মমতার ওপর খুশী হয়ে বলেছিল, মমিও আমার মেয়ে, সুমিও আমার মেয়ে।

আর আজ! হাসি পায় সুমিতার। কোনদিন মুখ ফুটে মা বলেনি মমতার বিরুদ্ধে কি তার অভিযোগ। কিন্তু সুমি নিজেও কি বোঝেনি! সব বোঝে, সব। তাই হাসি পায়। সুমিকে নরকের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে মমতা, মা বেশ বুঝতে পারে। তাই মমতাকে সহ্য করতে পারে না। অথচ দিনের পর দিন নির্বিকার মুখে হাত পেতে সুমির কাছ থেকে টাকা নিতে এতটুকু বাধে না, লজ্জা হয় না।

বরং জ্যোৎস্না কিংবা মিত্তিরদের বউকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, থিয়েটারে আজকাল সুমির বেশ ডাক আসে, ভাল টাকা পায়।

বাবা শোনে, বিশ্বাস করে। আর সুমি জানে, মা বিশ্বাস করে না। মা সব জানে, বোঝে। কিন্তু ইচ্ছে করেই নিজেকে অন্ধকারে রাখতে চায়।

গালে পাউডার ঘষতে ঘষতে জানালার ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো সুমিতা। আঃ, এ সময়ে একটু বিছানায় গড়িয়ে নিতে পারলে কী আরাম। মা ঘুমোচ্ছে। পাশের বাড়ির জ্যোৎস্না বারান্দার রোদ্দুরে কাপড় শুকোতে দিয়ে বোধহয়

ঘুমোতে গেল।

যাক্ ঘুমোলেই ভাল। তা না হলে যাবার সময় আবার হয়তো প্রশ্ন ছুঁড়বে।
—কি ব্যাপার? দুপুরবেলায় কোথায় চললে সুমিতাদি?

আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো সুমিতা, চোখে ভুরুতে কাজল দিলো দেশ-লাইয়ের কাঠির রেখা টেনে। ঠোঁট রাঙালো। ঘড়িটা বাঁধলো হাতে।

আয়নায় আরেকবার সাজপোশাক দেখে নিয়ে হাতব্যাগে কি যেন খুঁজলো, খুঁজে পেয়ে সেটা আবার সেখানেই রেখে দিলো।

বেরুচ্ছিস!

বিরক্তি চেপে সুমিতা বললে, হ্যাঁ।

প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন।

পৃথিবীতে কেউ যেন কাউকে শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না। কেউ মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে, কেউ চোখের বিস্ময়ে। সুমিতা যেদিকেই পা বাড়াতে যাবে, ফণিমনসার কাঁটার মত প্রশ্ন আর প্রশ্ন এগিয়ে আসবে পায়ের তলায়।

মা আজকাল অবশ্য আর কোন প্রশ্ন করে না। কোথায়, কেন, কখন ফিরবি—এসব কথার কোন জবাব দিতে হয় না। মা জেনে গেছে এ-সব প্রশ্নের উত্তর নেই, তাই জিজ্ঞেস করে না।

চুলের ওপর চিরুণিটা আরেকবার বুলিয়ে নিয়ে খোঁপাটা আয়নায় ঘাড় হেলিয়ে দেখে নিল সুমিতা, তারপর চটিতে পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

গলিটা নোংরা, বাড়িটা আরো। একটাই কলঘর, দিনরাত দু'তিনটি পরিবারে ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। কখনো কখনো চিৎকার হট্টগোলও হয়। সুমিতার মা একদিন জল-কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছিল। তা দেখে কে যেন ঠাট্টা করে বলেছিল, মেয়ে নাটক করে বেড়ায়, মা তাই হাত-পা নেড়ে থিয়েটার করছে!

শুনে খুব খারাপ লেগেছিল সুমিতার। তবু মমতার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারেনি। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে দিনের পর দিন রিহার্সাল দেওয়া ভাল লাগে না। যায়ও না প্রায়ই। একটা না একটা অজুহাত দেয় পরের দিন, কিন্তু ওই মিথ্যার মুখোশ আছে বলেই না আরো কুৎসিত কথা শুনতে হয়নি।

টাকা, টাকা। অফুরন্ত টাকার কাঙাল হয়ে উঠেছে সুমিতা। ওর রূপ, ওর সাজপোশাকের সঙ্গে এ পাড়াটা, এ বাড়িটা একেবারেই বেমানান। কোলকাতার কোন ছিমছাম ফ্ল্যাটে উঠে যাবে সুমিতা, গাড়ি কিনবে, টাকার বিনিময়ে একটি একটি করে সুখ কিনে আনবে।

নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নাদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছিল, লক্ষ করেনি জ্যোৎস্না জানালায় দাঁড়িয়ে আছে।

—কোথায় চললে সুমিতাদি!

ঠিক যা আশঙ্কা করেছিল তাই। স্বামীকে আপিস পাঠিয়ে দিয়ে জানালার ধারে বসেছে একটা বই নিয়ে।

সুমিতা শুধু হাসলো ওর দিকে তাকিয়ে। প্রথমটা কোন জবাব দিলে না, তারপর কি মনে হতে বললে, তোমার মত সুখের জীবন তো আমার নয় ভাই।

—ইস্, কি সুখ! বদলাবদলি করে দেখবে?

হেসে ফেললো সুমিতা। ভারী অসভ্য মেয়েটা, সুমিতা ওর চেয়ে কত বড়, তবু এ-সব রসিকতা করতে ওর বাধে না। বদলাবদলি! জ্যোৎস্না তো জানে না

কি জীবন সুমিতার। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। জ্যোৎস্নার স্বামী ছেলে-মেয়ে—ছোট্ট সুখী সংসার দেখে ঈর্ষা হয় ঠিকই। কিন্তু সত্যই কি এখন আর বদলাবদলি করতে রাজী হবে সুমিতা? না, এই নতুন বিচিত্র নেশার জীবনকেই ভালবেসে ফেলেছে ও। এখন আর সেই দুঃসহ বন্ধনের মধ্যে ফিরে যেতে পারবে না।

শ্রীনাথের কথা মনে পড়লে এখন আর রাগ হয় না, হাসি পায়। সুমিতা বুঝতে পেরেছে কিসের টানে বার বার আসে শ্রীনাথ। টাকা? প্রথম প্রথম তাই ভাবতো সুমিতা। পোশাকে চেহারায় ধরা পড়েছে শ্রীনাথের সচ্ছলতা। সত্যিই ঠিকাদারী করছে হয়তো ছোটখাটো। দু-একদিন চেয়ে নিয়ে যাওয়া টাকা ফেরতও দিতে এসেছে, নেয়নি সুমিতা। বলেছে, ও টাকা আমার ছুঁতেও ঘেন্না। কিন্তু সুমিতা বুঝতে পেরেছে, টাকা ধার চাওয়াটা ওর একটা মিথ্যে অজুহাত। শ্রীনাথের চোখের দৃষ্টিতে অন্য কিছু দেখেছে ও; যা অনেক পুরুষের চোখে দেখেছে। সেই লোভী ক্ষুধার্ত চোখের উন্মাদ স্পর্শ।

মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে সুমিতা। এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি নিতে পারতো ও। সুমিতা জানে, শ্রীনাথ ওকে মাঝে মাঝে লক্ষ করে। ও কি করে,' কোথায় যায়, উপার্জনের গোপন পথ—সব জানা হয়ে গেছে শ্রীনাথের। কখনো কখনো তাকে দূর থেকে লক্ষ করতে দেখেছে সুমিত্রা।

আজও আছে নাকি? এপাশ-ওপাশ তাকাতেই চোখ পড়লো মমতার দিকে। দেরী দেখে বিরক্ত হয়েছে মমি।

—চল্।

বাসে উঠে অনেকখানি এসে মাঝপথে নামলো দু'জনেই। ট্যাক্সি ডাকলো।

ট্যাক্সিতে উঠেই হাত-ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করলো। কালো চশমাটা পরলো চোখে। কালো নয়, নীল। মমিও পরেছে। নীল কাচের চশমাটা পরার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী—বিষাক্ত বিক্ষুব্ধ পৃথিবী মুহূর্তে রঙিন হয়ে উঠলো।

চৌরঙ্গী পাড়ার দুপুরটা বড় সুন্দর লাগলো। রোদ্দুরের আলো আছে, তাপ নেই। তিনটি পাঞ্জাবী মেয়ে টানটান পোশাকে শরীরের প্রত্যেকটি রেখাকে শিল্পীর আঁকা ছবির মত ফুটিয়ে তুলে সোজা হয়ে হাঁটছে।

—কোথায় যাবি আগে? সুমিতা প্রশ্ন করলো।

প্রথম প্রথম কি অস্বস্তি না বোধ করতো ও। সরু গলির মধ্যে ফোটো তোলার অন্ধকার দোকানঘর, চশমার দোকান, তিন তলার নির্জন ফ্ল্যাট, অলিগলি রহস্যময় কয়েকটি হোটেল। এখন সব চেনা হয়ে গেছে তার, এখন আর কোথাও ভয় পায় না।

মমতা একটা হোটেলের নাম বললো।

ট্যাক্সি সে দিকেই মোড় নিলো।

পয়সা মিটিয়ে বিদ্যুৎগতিতে হোটেলটির ভিতরে ঢুকে গেল দু'জনে। বেয়ারা ম্যানেজার বয় কেউ কোন প্রশ্ন করলো না। একেবারে দোতলার ঘরটিতে চলে গেল ওরা।

ছোট্ট অপরিচ্ছন্ন একটি ঘব। সামান্য আসবাব। সামনে একফালি বারান্দা টিন আর পীসবোর্ড সেঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দু'এক জায়গায় টিন সরে গেছে। শুধু সেখানে চোখ রাখলে সামনের রাস্তাটা দেখা যায়।

সুমিতা এখন আর কোন কিছুতেই ভয় পায় না।

ভয় শুধু পুলিসের। আইন আর পুলিস—এ দুটোর কোন অর্থই খুঁজে পায় না সুমিতা। কি এমন অন্যায় করছে সে, কার ক্ষতি করছে? ওর কি দোষ, কি অপরাধ। ও কি স্বেচ্ছায় এ জীবন বেছে নিয়েছে? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোভী পুরুষ অন্যায় অর্থ নিয়ে অপেক্ষা করছে একদিকে। আর সুমিতারা একদিকে ক'টি টাকার কাঙাল হয়ে ঘুরছে দরজায় দরজায়।

যার যা আছে তার বিনিময়ে একটি সুখী জীবনের সম্ভাবনাকে কিনতে চায় মানুষ। সব মানুষ। সুমিতার কিছু নেই, শুধুই একটা শরীর। যে সমাজের কাছে একটা জীবনের দাম নেই, একটি শরীর সেখানে এত দুর্মূল্য! হাসি পায় সুমিতার।

অনেক পুরুষ দেখেছে সে। কত বিভিন্ন চরিত্র। কিন্তু সকলেই বুঝি এক। একটি চরিত্র। আশ্চর্য! রুগ্ন স্ত্রীর জন্যে একটি ওষুধ কিনতে যারা মিতব্যয়ী হয়ে ওঠে, শিশুর দুধ...তারাই কত অনায়াসে সুমিতার হাতে পঁচিশটা টাকা তুলে দেয়!

সব পুরুষই এক, সুমিতা ভাবলো। কৌতুক বোধ করলো। মনে হলো একটি নির্বোধের রাজ্যে বাস করছে ও। মনে হলো, সুমিতা সার সত্য বুঝে গেছে বলেই এই নির্বোধের রাজ্যে সম্রাজ্ঞী হয়ে আছে। তার চোখের চাতুর্য দিয়ে সমগ্র পুরুষের সমাজকে শাসন করছে।

—সুমি! সুমি!

মমতার ডাকে চমকে উঠলো সুমিতা। বারান্দার টিনের ছিদ্রে চোখ রেখে কি দেখছে মমি। হয়তো কোন তুচ্ছ কৌতুক!

পুরোনো পালিশহীন ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় খোঁপা ঠিক করতে করতে হঠাৎ নিরুপমের কথা মনে পড়লো। না, ওই একটি মানুষ বিশুদ্ধ নিষ্পাপ। তাকে চটুল চোখের মোহ দিয়ে শাসন করতে চায় না সুমিতা, শুধু মোহগ্রস্তের মত নিজেই তার গভীর দুটি চোখের মধ্যে ডুব দিতে চায়।

—সুমি! আবার চিৎকার করে উঠলো মমতা। চাপা গলায় বললে, শয়তানটা।

সুমিতা ছুটে গেল। বাইরের রাস্তার দিকে তাকালো সেও।

শ্রীনাথ।

হোটেলের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বার বার এদিকে তাকাচ্ছে। হয়তো ঢুকতে চায়।

সমস্ত শরীর রাগে রী রী করে উঠলো সুমিতার।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনাথ। হয়তো সাহস পাচ্ছে না। শ্বাসরোধ করে ফাঁকটা'র মধ্যে চোখ এঁটে অপেক্ষা করলো সুমিতা।

শ্রীনাথ পকেট থেকে কি যেন বের করছে। হ্যাঁ, টাকা। নোট ক'খানা গুনছে। দিনের পর দিন সুমিতার কাছেই হাত পেতে যে-টাকা নিয়েছে শ্রীনাথ, সেই নোট ক'খানা নিয়েই কি তার শরীরের দ্বারে প্রার্থনা জানাতে চায় সে?

সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো সুমিতার।

টাকা, টাকা, টাকা। টাকার কাছে নিজেকে এতকাল বিকিয়ে দিয়ে এসেছে সুমিতা। কিন্তু কোনদিন বুঝি নিজেকে এতখানি লাঞ্ছিত অপমানিত বোধ করেনি।

রাগে জ্বলে উঠে ভিতরের দিকে ছুটে এলো ও।

ডাকলো।—ইব্রাহিম!

বয়টাকে ডেকে এনে দেখালো সুস্মিতা—ওই যে কোটপ্যান্ট পরা—ওই লোক-টাকে ঢুকতে দিও না। ঘাড় ধরে বের করে দিও ওকে!

বলেই নিরুপায় হতাশায় খাটের একপ্রান্তে বসে পড়লো সুস্মিতা। আর মমি বিস্ময়ের চোখে সুস্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

১৬

বাসের টিকিটের উল্টো পিঠে লিখে দেওয়া ঠিকানাটা মনীষার বাঁধানো হিসেবের খাতার শেষ পৃষ্ঠায় টুকে রেখেছিল নিরুপম। শুধুই নামহীন ঠিকানা। মনীষার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।

—ঠিকনাটা কার বলো তো? চোখে পড়লে মনীষা হয়তো প্রশ্ন করতো।

মনে মনে একটা মিথ্যার উত্তর সাজিয়ে রেখেছিল সে-জন্যই। কিন্তু মনীষা কোনদিন প্রশ্ন করেনি। হয়তো চোখেই পড়েনি তার।

বিয়ের পর সেই মুগ্ধ মুহূর্তগুলিতে কত অকপটে বিগত জীবনের কথা, সুমিতার কথা মনীষাকে বলতে পেরেছিল ও। সুপ্ত বেদনাটুকুই ঢেকে রেখেছিল শুধু, সরল কৌতুকে যৌবনসন্ধির কাহিনীটাকে ছেলেমানুষির ভঙ্গিতে প্রকাশ করে দিয়েছিল। প্রকাশ করে শান্তি পেয়েছিল নিজের মনেই। নাকি সেই ক্ষণিক আনন্দের মুহূর্তে, মনীষার মধ্যে পরম বিশ্রামের সম্ভাবনায় বিগত ইতিহাস সত্যিই নিরুপমের কাছে নিছক ছেলেমানুষী মনে হয়েছিল!

কিন্তু তারপর কিভাবে যেন দিনে দিনে মনীষার কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে ও। আর ক্রমে ক্রমে সমস্ত জীবনটাকেই যেন একটি অন্ধকার গুপ্তকক্ষে টেনে নিয়ে চলেছে নিরুপম।

ভেবেছিল টাকার বিনিময়ে নিঃসঙ্গতা দূর করবে। নারীর দেহযৌবনে ডুব দিয়ে বুকের শূন্যতাটুকু ভরিয়ে দেবে। কিন্তু এও আর-এক ব্যর্থতা।

মনীষার পাশাপাশি শুয়ে থাকার মধ্যে, রাত্রির অন্তরঙ্গতায় তার শরীরের ওপর নিরুত্তাপ নির্বিকার হাতখানা নামিয়ে রেখে অনেক দূরের একটি স্বপ্নময় অনুভবের রাজ্যে সরে যাওয়ার মধ্যে তবু একটা মিথ্যা স্তোকের মত তৃপ্তি আছে।

একটি মনের সঙ্গে আরেকটি মনের স্পর্শই বুঝি মানুষকে সঙ্গ দিতে পারে। টাকা নয়, চাতুর্য নয়, ক্ষমতা নয়। এমন কি মনীষা আর নিরুপমের পরস্পর নির্ভরতাও নয়। শুধু একটি মনের বিনিময়েই আরেকটি মনের উত্তাপ পাওয়া যায়। একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর প্রাচীনতা নিয়ে এই পুরনো আর একঘেয়ে হাস্যকর কথাটা হঠাৎ এক নতুন বিস্ময়ে নিরুপমের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হলো। এর আগেও বহুবার সুমিতার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছে, অথচ অস্বস্তি আর সঙ্কোচ এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হোক, তবু নিজেকে সুখী বোধ করেছে ও। সুমিতা আছে, সুমিতার কাছে নিরুপম যে-কোন মুহূর্তে ছুটে যেতে পারে ; ছুটে গেলে সেই পুরনো দিনের সুমিতাকেই ফিরে পাবে, এই বিশ্বাসেই নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেছে নিরুপমের।

বিশ্বাসই একমাত্র নিঃসঙ্গতা দূরে করতে পারে। সুমিতা আছে, ঠিক তেমনি, পুরনো দিনের আলোয় আলোকিত। নিরুপমের একটি আহ্বানকেও সে প্রত্যা-

খ্যান করবে না, সুমিতার দিকে তাকিয়ে জেনে গেছে নিরুপম।

আজ তাই নতুন করে আবার তার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো।

একটি মুখ থেকে আরেকটি মুখে শান্তি খুঁজেছে নিরুপম, একটি দেহ থেকে আরেকটি দেহে। রূপ নয়, শরীর নয়, পরস্পর নির্ভরতার প্রতিজ্ঞা নয়। এরা কেউ শান্তি দেয় না, দিতে পারে না, উল্লাসের মধ্যেও আনন্দ নেই। তাই শুধু অসীম অতৃপ্তির নেশা ওকে আলেয়ার মত টেনে নিয়ে গেছে।

আর সুমিতা? সুমিতার কাছে পেয়েছে শুধু নীরব অভ্যর্থনা। ওরা দুজনে পরস্পরের কাছে কেউ কিছুই চায়নি। কেউ কিছুই চায় না। শুধু একটি অস্তিত্বের স্বাক্ষর লিখে দিয়ে গেছে পরস্পরকে। সেই চায়ের দোকানে বসে মাত্র কয়েকটি কথা, হাসি, অন্তরঙ্গতার মধ্যে ওরা দুজনেই সেই ফেলে আসা দিনগুলির স্পর্শ পেয়েছে। যে বিশ্বাসের মধ্যে কেউ কিছুই আশা করে না, কেউ কিছুই চায় না, শুধু সেই বিশ্বাসই হয়তো মানুষের নিঃসঙ্গতা দূর করে।

নিরুপমের মায়ের গীতাপাঠও হয়তো এই শান্তি দিতে পারেনি তাঁকে! সন্তানের মঙ্গলকামনা, মিনুর জন্যে মানত, স্বামীর কল্যাণ—ঈশ্বরের কাছে চাওয়ার বিরাম নেই বলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেও তিনি নিঃসঙ্গ। ভিন্ন জগতের মানুষ।

অতৃপ্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই সেই বিপরীত পৃথিবীতে ছুটে গিয়েছিল নিরুপম।

অরুণ বক্সী কপাট খুলে দিয়েছিল অন্য এক পৃথিবীর। স্বাভাবিক? নিজের মনকেই প্রশ্ন করে নিরুপম। ওই কুৎসিত পল্লীটাকেই অনেক বেশী স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওর। ওখানে গিয়ে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে হয় না। ওখানে কোন মিথ্যাচার নেই। পাপ আর অন্যায় ওখানে মুখ লুকিয়ে থাকে না। কিন্তু এই হোটেলটির রহস্যময় আনাগোনা, অট্টোল্লাস—এই আশ্চর্য গোপন পঙ্কিলতার ক্লেদ সমগ্র মানুষের ওপর থেকে তার বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে।

এখানেও তো দিনের পর দিন কত নতুন মুখ দেখেছে নিরুপম। বিধ্বস্ত ক্লান্তির মুখ নয়, তাজা ফুলের মত এক একটি শরীর। সারল্যের প্রতিমূর্তি যেন। অথচ কি নির্লজ্জ।

অরুণ বক্সী নেশার ঘোরে হেসে উঠেছিল ওর প্রশ্ন শুনে। নিরুপমের চোখেও ছিল উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গ।

গ্লাসের তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে অরুণ বক্সীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরুপম প্রশ্ন করেছিল।—কেন আসে ওরা? নেশায় চোখ আর কথা একই সঙ্গে জড়িয়ে আসছিল নিরুপমের। তবু টেনে টেনে বললে, কেন আসে? ঘর-সংসার স্বামীপুত্র সকলের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে কেন আসে?

—প্রবঞ্চনা! সশব্দে হেসে উঠেছিল অরুণ বক্সী। তারপর জড়ানো কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলেছিল, কেন আসবে না? ওরা আসে সহজে টাকা মেলে, তাই। আর আমরা? ক'টা টাকা দিলেই...

—সমাজ? সংসার?

—ফুঃ। অরুণ বক্সী ফুৎকার দিয়ে সব উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে নিরুপম, সারা পৃথিবী ছেয়ে যাবে। ও-সব কিছুই থাকবে না। কত সহজ রাস্তা জেনে গেছে ওরা। ওখানে যেতে হলে বাবা-মা সমাজ-সংসার সব

চিরকালের জন্যে ছেড়ে যেতে হতো নিরুপম। কয়েকটা টাকার লোভে কেই বা তা চায়? সমাজই ঠেলে পাঠাতো কয়েকজনকে। স্বেচ্ছায় কেউ যেত না, কেউ যেত না।

অনর্গল কথা বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে অরুণ বক্সী। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, গ্লাসের কানায় বুঝি কপালটা ঠুকে যাবে এখনই।

হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠল অরুণ বক্সী।—এখানে? কিছু ছাড়তে হয় না, স্রেফ ফান্। ফান অ্যান্ড মানি। অথচ সব যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

ঠিকই বলেছে অরুণ বক্সী। নেশার ঘোরেও বাবার কথাটা মনে পড়লো।—আইন করে অনাচার বন্ধ করা যায় না খোকা।

অরুণ বক্সী তখনও বকে চলেছে। জড়িয়ে আসা চোখ কোনরকমে মেলে রাখার চেষ্টা করে তর্জনী ঘুরিয়ে বাতাসের ওপর একটা বৃত্ত টানার ভঙ্গিতে বললে, সব ছড়িয়ে যাবে, দেখে রেখো, এই আমি, অরুণ বক্সী বলছি...

নিরুপমের নিজের চোখেও তখন নেশার ঘোর। তবু হাসি পেয়েছিল ওর।

অনুশোচনা জাগেনি, এতটুকু সহানুভূতি নয়। ও নিজেও তখন একটি অতৃপ্ত আত্মার মত শরীরী আসন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তারপর সেই সরল সুন্দর মুখটিকে কামনার অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

রুদ্ধদ্বার ঘরটির মধ্যে সেই সরল সৌন্দর্যও অলজ্জ ভঙ্গিমায় একটি একটি করে আবরণ উন্মুক্ত করে একটি নগ্নিকা অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠে নিরুপমকে দগ্ধ করতে চেয়েছে। হৃদয়ের সমস্ত অতৃপ্তি তার মধ্যে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে নিরুপম।

একটি একটি করে অনেক মুখ, অনেক শরীর।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা ঘোচেনি। তবে কি মনই শুধু নিঃসংগতা দূর করতে পারে? দেহ নয়, সঙ্গ নয়?

তাই নিরুপমের হঠাৎ মনে হয়েছে, বিশ্বাসই মানুষের একমাত্র সংগী। বিশ্বাস। যার মধ্যে কেউ কিছু আশা করে না, কেউ কিছু চায় না। শুধু পরস্পরকে সুখী করতে চায়।

সুমিতাকে একদিন অদৃশ্য আস্থার বিনিময়েই মনের কাছটিতে পেয়েছিল। কই, সেদিন তো এমন অতৃপ্ত চঞ্চল আত্মার মত ছুটে বেড়াতে হয়নি!

বিয়ের পর মনীষার মধ্যেও বুঝি এমনি এক বিশ্বাসকে সংগী পেয়েছিল। মনীষা আছে। একই ছাদের নীচে, মনীষার দু-একটি কথা, হাসি, তার আঁচলের বিদ্যুৎ, তার চুড়ির রিনঝিন। মনীষা আছে। চুপচাপ নিঃশব্দ নির্বাক্ প্রহরের মধ্যে একটি বিশ্বাস—মনীষা আছে।

মিনুকে হারিয়ে সেই বিশ্বাসকেই হারিয়ে ফেলেছিল নিরুপম। নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

আজ সুমিতার কাছে আবার নতুন করে মনের সঙ্গীকে খুঁজে পেতে চায় নিরুপম। সুমিতা আছে, ঠিক তেমনি—তার কল্পনার রঙে রাঙানো। সমস্ত দূরত্বের মধ্যেও সঙ্গ দিতে পারে একটি বিশ্বাস—সুমিতা আছে। তার কাছে ছুটে যেতে পারে, হাতে হাত রাখতে পারে, অনর্গল কথার মধ্যে কিংবা নিশ্চুপ গভীরতায় ডুবে যেতে পারে—শুধু এইটুকু বিশ্বাস ফিরে চায় ও। আর কিছু নয়।

তাই সুমিতার কাছে যাবার জন্যে হঠাৎ উৎসুক হয়ে উঠলো নিরুপম।

দেরাজ খুলে বাক্সে কাগজের জটলার ভেতর থেকে পুরনো হিসেবের খাতাটা খুঁজলো।

বাসের টিকিটের উল্টো পিঠে লেখা ঠিকানাটা একদিন সযত্নে হিসেবের খাতাটার পিছনে লিখে রেখেছিল। আজ আর খাতাটাই খুঁজে পাচ্ছে না।

ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠলো নিরুপম। অধীর আগ্রহে বিরক্তি চেপে খুঁজলো আর খুঁজলো। অকারণে মনীষার ওপর মন বিষিয়ে উঠলো। ভাবলে, মনীষাই হয়তো অপ্রয়োজনীয় ভেবে ফেলে দিয়েছে খাতাটা। ভাবতে পারেনি, হিসেবের খাতার শেষ পাতায় জীবনের সবচেয়ে বড় হিসেবটাই লিখেছিল নিরুপম।

—কি খুঁজছো? শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মনীষা।

নিরুপম বিরক্তির কণ্ঠে জবাব দিলো।—পুরনো সেই হিসেবের খাতাটা।

—কি হবে?

এক মুহূর্ত অপ্রভিত দেখালো নিরুপমকে। তারপর ও জবাব দিলো।—একটা ঠিকানা ছিল।

আশ্চর্য। কোন প্রশ্ন করলো না মনীষা, কার ঠিকানা জানতে চাইলো না। শুধু উত্তর দিলো, আছে, আমার কাছে আছে।

মনীষার ওপর যত রাগ আক্রোশ বিরক্তি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কী পরম বিশ্বাস রেখেছে মনীষা—নিরুপমের ওপর।

তবে কী মনীষা নিঃসঙ্গ নয়?

মনীষার কথা ভাববার অবকাশ নেই আর নিরুপমের। ও শুধু খুশী হলো ঠিকানাটা ফিরে পেয়ে। যেন জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান কোন স্বপ্নকেই ফিরিয়ে দিলো মনীষা।

তারপর।

নিরপম বাড়ি খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হলো।

সমস্ত অস্বস্তি আর সঙ্কোচ দূরে সরিয়ে কড়া নাড়লো দরজার।

নেই. সুমিতা নেই।

আনন্দময়ী দরজা খুলে প্রথম অপ্রতিভ হলেন, পরক্ষণেই হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। নাকি হতাশায় জোড়া কপাট বন্ধ করে দিলেন নিরুপমের মুখের ওপর!

—সুমিতা তো নেই।...কে, টোটন না? চিনতে পেরেই উৎফুল্ল হাসি ছড়িয়ে দিলেন আনন্দময়ী তাঁর মুখে চোখে।

চিৎকার করে কাশীবাবুকে ডাকলেন, কে এসেছে দেখে যাও!

প্রশ্ন প্রশ্ন। বিগত স্মৃতির রোমন্থন, কাশীবাবুর আপ্যায়ন, আনন্দময়ীর আন্তরিকতা। কিছুই ভাল লাগলো না নিরুপমের। ও শুধু শুনলো, সুমিতা নেই।

—ওর কি কোন ঠিক আছে বাবা, কখন থাকে কখন যায়।

বিদায় নিয়ে চলে এলো নিরুপম।

—আবার এসো। আনন্দময়ী তৃপ্তির চোখে তাকিয়ে রইলেন নিরুপমের চলার পথের দিকে।

একটা স্থির বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল নিরুপম। রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে অসীম

এক শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আবার। ও যেন একটি মৃত নির্লোক পৃথিবীর মাঝখানে একা, সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে আছে।

নিরূপম জীবনে কখনো বুঝি এমন অসহায় একাকীত্ব বোধ করেনি।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি ভাবলো ও। তারপর হঠাৎ একখানা ট্যাকসি থামিয়ে উঠে পড়লো।

সেই পুরনো হোটেলটায় আবার ফিরে এলো নিরূপম! যেখান থেকে পালাবে ভেবেছিল, পালাতে চেয়েছিল, যে অভ্যস্ত আকর্ষণ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল ও, সেই অতৃপ্তির কাছেই আবার ফিরে আসতে হলো ওকে।

লাউঞ্জের দিকে চোখ পড়তেই অরুণ বক্সীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। এক কোণে নির্জনে একা একা বসে আছে অরুণ বক্সী।

সুরার উষ্ণ উন্মাদনায় নিরূপমও নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়। সমস্ত হতাশা ধুয়ে মুছে দিতে চায়।

ইব্রাহিম এসে সেলাম করে দাঁড়ালো নিঃশব্দে।

নিরূপম আজ নিজেই বুঝি অরুণ বক্সীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দূরের টেবিলের লোকগুলি কি নিরূপমকে দেখেই হাসছে? সেই প্রথম দিন যেমন অরুণ বক্সীকে দেখে নিরূপম হেসেছিল?

ইব্রাহিম এসে আবার নিঃশব্দে সেলাম করে দাঁড়িয়েছে।

নেশার ঘোর লেগেছে নিরূপমের।—এ নিউ ফেস। নতুন মুখ। আছে?

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করলো ইব্রাহিম। তারপর একটি ঘরের দিকে ইশারা করলো।

কাঠের সিঁড়িতে পা টলছে নিরূপমের। পা টলছে।

অতৃপ্তির মধ্যেই ও আবার নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়, অসুখী একটি শরীরী নেশার মধ্যে।

টলতে টলতে নির্দিষ্ট ঘরের চৌকাঠ পার হলো নিরূপম, তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

নেশার চোখে প্রথমটা বুঝি চিনতে পারেনি।

মুখ নীচু করে বসেছিল মেয়েটি। নিরূপমের জুতোর শব্দে মুখ তুলে চাইলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালো সুমিতা।

মুহূর্তের অস্বস্তি মিলিয়ে গেল সুমিতার মুখের ওপর থেকে।

স্তম্ভিত আহত কণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠলো।—ছি ছি তুমি!

আহত নাগিনীর মতই যেন ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলে উঠলো তার দুটি চোখ। কোমল শান্ত দুটি চোখ তার অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলে উঠেছে। জ্বলছে, জ্বলছে।

সমস্ত জীবনের একটা মধুর স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছে নিরূপম। সমগ্র জীবনের হতাশা আর ধৈর্যের রঙে একটু একটু করে গড়ে তোলা সুন্দর ছবিখানা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে নিরূপম। সেই সুন্দর মোমবাতির শিখাটি হঠাৎ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে নিরূপম। স্বচ্ছ স্ফটিকের স্তম্ভটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সুমিতার জীবনের শেষ সম্বল, একমাত্র সম্বলটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

ঘৃণা। ঘৃণা। অসীম ঘৃণার চোখে নিরূপমের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রোধে কেঁপে কেঁপে উঠলো সুমিতা।

তার চোখের দৃষ্টি যেন স্তম্ভিত আহত একটি কণ্ঠের ধিক্কার হয়ে বলে

উঠলো বার বার—ছি ছি তুমি!

আর নিরুপম?

পা থেমে গিয়েছিল নিরুপমের। ওরা চোখ নেশা হারিয়েছে। জীবন হারিয়েছে একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র বিশ্বাস।

ওর বিস্মিত ক্রুদ্ধ চোখ জোড়াও যেন ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। ঘৃণায় জ্বলে উঠে বলতে চাইলো, ছি ছি, সুমিতা তুমি!

অন্ধ রাগে হতাশায় অপমানে থরথর করে কেঁপে উঠলো নিরুপম। অপমান। এ যেন সুমিতা নিরুপমকেই অপমান করেছে, তার বিশ্বাসকে।

হঠাৎ চিৎকার করে কি যেন বলে উঠলো নিরুপম।

টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে নিরুপম হয়তো সুমিতার মুখের ওপরই ছুঁড়ে মারতো।

তার আগেই সুমিতার কণ্ঠে সুস্পষ্ট ঘৃণা ফুটে উঠলো।—ছি, ছি, তুমি!

নিরুপমের অবশ্য হাতখানা ফুলদানিটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো।

স্তব্ধ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো নিরুপম, দাঁড়িয়ে রইলো সুমিতা। দু'জনের চোখেই পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

ঘৃণা, ঘৃণা।

একটি সদ্যমৃত প্রেমের দিকে, একটি হারানো বিশ্বাসের দিকে দুটি নিঃসঙ্গ মানুষ ঘৃণার চোখে তাকিয়ে রইলো স্থিরদৃষ্টিতে।

দুটি নিশ্চল মূর্তি দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর ধীরে ধীরে মোহগ্রস্তের মত মন্থর পদক্ষেপে দু'জনে দু'জনের কাছে এগিয়ে গেল।

সুমিতার চোখে জল, নিরুপমের চোখে জল। একটি বিশ্বাসের মৃত্যুর শোকে নিঃসঙ্গ দুটি মানুষ পরস্পরের কাঁধে মুখ লুকোলো।

হাজার হাজার বছরের কোন এক অজ্ঞাত অভিশাপ বুঝি বারংবার ঘৃণার সঙ্গে ঘৃণার সেতু বেঁধে চলেছে। ওরা পরস্পরকে ঘৃণা করবে, তবু পরস্পরের কাছে ছুটে যাবে। একটি অতৃপ্ত হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে।

বৃথাই।

খারিজ প্রথম প্রকাশ : শারদীয় দেশ ১৩৮১ [১৯৭৪] : প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বোদ্ধা পাঠকমহলে অভূতপূর্ব আলোড়ন। একটি মাসিকপত্রে বিশেষ প্রবন্ধের উক্তি 'ভরসা হ'ল আবার বোধহয় বাংলা উপন্যাসে পালাবদলের ইঙ্গিত আসছে'। কিন্তু শারদসাহিত্যের আলোচনায় রেডিও, টি ভি এবং অন্যান্য সাময়িকপত্রের কোথাও উপন্যাসটি বিন্দুমাত্র উল্লেখ পায় নি।

গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৪। দু' হাজার কপি বিক্রি হতে সময় লাগে ৬ বছর। দাম ছিল আট টাকা।

উৎসর্গপত্রে ছিল : পালান/তোরা যেদিন পড়তে শিখবি/ সেদিনের আশায়।

দিল্লির একটি ইংরেজী দৈনিকে উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা বের হয়। বেশ কিছুকাল পরে সাহিত্য আকাদেমীর এক তৎকালীন কর্মকর্তা এসে দেখা করে শুনিয়ে গেলেন. দিল্লির কাগজে প্রশংসা পড়েছিলাম, কিন্তু আকাদেমীর জন্যে একজন বুদ্ধিজীবীও তো আপনার বই সুপারিশ করেন নি। 'কি মুশকিল, আমার তো কোন হাত ছিল না, যেন প্রশংসা বের হওয়ার অপরাধটা আমারই।'

ইংরেজী অনুবাদ নাথিং বাট দি ট্রুথ। হার্ড কভার ও পেপার ব্যাক : বিকাশ, নয়াদিল্লি ১৯৭৮।

মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ধারাবাহিক প্রকাশ কেরলের 'কুঙ্কুম' পত্রিকায়।

হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয় নি।

দু'জন প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক ও একজন নবাগত উপন্যাসটির প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু নানাকারণে অগ্রসর হতে পারেন নি। শেষে বাংলায় প্রথম প্রকাশের আট বছর পরে মৃণাল সেন এটির চিত্ররূপ দেন ১৯৮১-তে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি সম্মানিত হয়।

কবি বিষ্ণু দে বিখিয়া থেকে 'খারিজ' পড়ে এক লাইন লিখে-ছিলেন : 'পুজোয় আপনার বড়গল্প বা উপন্যাসটি পড়ে বেশ লেগেছিল। আগে জানাইনি—সংকোচবশত।

সনমস্কার
বিষ্ণু দে'

'আমার খারিজ-এর প্রতিপাদ্য বিষয় অনেকেরই বোধগম্য হয় নি। কেউ ভেবেছেন এটি একটি বাচ্চা চাকরের গল্প, আবো ভাল মাইনে এবং শোয়ার ভাল বিছানা কিংবা খাওয়ার কথা বলেছি। কেউ ভেবে-ছেন আমরা মধ্যবিত্তরাও মানুষ, কিন্তু কি অসহায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। গোটা সমাজের সার্বিক বিশ্লেষণে ঘটনা এবং তার কার্যকারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে যূথবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের আকৃতি, প্রকৃতি এবং চরিত্র উদ্ঘাটন এবং তারই মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রকে চিরে চিরে দেখার আত্মসমালোচনাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এই জয়দীপ আমি এবং আপনি। এই সমাজ প্রধান অপরাধী, কিন্তু আমরাও সমান অপরাধী। এই সমাজটার দিকেও তাকিয়ে দেখুন...গ্রামের বৃদ্ধ বাপ ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন জোগাতে পারে না বলেই তার বালক পুত্রটিকে গৃহভৃত্য করে দিতে বাধ্য হয়, তাকে জিলিপি কিনে দিয়ে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে। একদিকে তার সান্ত্বনা ছেলে খেতে পাবে, অন্যদিকে লোভ সে নিজে কুড়িটি টাকা পাবে মাসে মাসে। সমবয়সী ছেলে

টুকাইকে ব্যাগ হাতে স্কুলবাসে পৌঁছে দিয়ে আসে পালান, যার নিজেরই সে বয়সে স্কুলে যাবার কথা। এর বিপরীতে জয়দীপ-এর পিছনে গোটা মধ্যবিত্ত সমাজ। থানার এস আই থেকে ডাক্তার, উকিল, প্রতিবেশী, বাড়িওয়ালা তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে চায়। স্বার্থের কারণে বাড়িওয়ালা তার পক্ষে আসে দৈনন্দিন কলহ সত্ত্বেও, অন্যেরা নিছক শ্রেণীস্বার্থে।...উপন্যাসটি লেখার পনেরো বছর আগে একবার সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ফায়ার ব্রিগেডের পিছনে করোনারের কোর্টে গিয়ে এক বালক ভৃত্যের আকস্মিক মৃত্যুর সাক্ষ্যপ্রমাণ ও করোনারের রিপোর্ট শুনেছিলাম। ব্যস। ঘটনাটি পনেরো বছর মাথার মধ্যে ছিল, ইচ্ছে ছিল নাটক লেখার। শেষ অবধি উপন্যাসই লিখে ফেললাম। লিখতে সময় লাগে পনেরো দিন। আমার অনেক গল্প-উপন্যাসেই প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার আছে, এর মধ্যেও। আমার যে কোন রচনার উত্তম-পুরুষ অর্থাৎ 'আমি' যে কোন বঙ্গসন্তানের চরিত্র। সে নিজের মানসিকতা সম্পর্কে সচেতন নয়, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যায় অবিচার নিয়ে সোচ্চার। সে অসহায় কিন্তু আরো অসহায়দের প্রতি তার সমবেদনা কম। শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলেই সে তার আপন শ্রেণীর অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্যও পায়। গ্রামের মানুষ একা নিঃসম্বল, দারিদ্র্যের ফলে নিজের ছেলেকেও সে এক্সপ্লয়েট করতে বাধ্য হয়, কিন্তু সন্তানস্নেহ মরে না। সে বুকফাটা আর্তনাদ দিয়ে কাঁদে, এবং ফিরে যায়। কোন প্রতিবাদ বা ধিক্কার দেবার কথা ভাবতেও পারে না। মধ্যবিত্ত মানুষ এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিজের অসহায়তাকে দায়ী করে। তখন আর তার গায়ে কোন দাগ লেগে থাকে না।'

লজ্জা প্রথম প্রকাশ : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮২ [১৯৭৫] গ্রন্থাকারে : প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৮৩। উৎসর্গ : বিমল কর বন্ধুবরেষু। "পুজো সংখ্যা আনন্দবাজারে ছাপা হওয়ার কিছুদিন পরে, মাসখানেক বা মাস দুই পরে, হঠাৎ একটা টেলিফোন এলো, 'আমি ঋত্বিক বলছি'। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকতেই হয়তো বুঝতে পারলেন যে বুঝতে পারি নি। পরক্ষণেই 'ঋত্বিক ঘটক।' কৌতূহল এবং বিস্ময়। 'বলুন', এ ছাড়া আর কি বলবো। ওপ্রান্ত থেকে সেই গভীর গাঢ় কণ্ঠস্বর : 'বলার বাইরে। দারুণ, দারুণ লিখেছেন—লজ্জা।' তারপরই 'খারিজ ভাল লেগেছিল, ডোফিনিটলি খুব ভাল লেখা, কিন্তু 'লজ্জা'র মধ্যে একটা ফাইনার ব্যাপার আছে।' একটু থেমে বললেন, 'ছবিটবি করা তো গয়া হয়ে গেছে, কিন্তু একটা স্ক্রিপ্ট করবো, চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে স্ক্রিপ্ট করতে বেশ মজা লাগে।' হাসতে হাসতে বললেন, 'না না বোতলামি করছি না, সত্যি ভাল লেগেছে।'

লোকপরম্পরায় পরে শুনেছিলাম ঋত্বিক ঘটক লজ্জা-র সত্যি সত্যি একটা চিত্রনাট্য করেছিলেন। আমার 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' উপন্যাস থেকে ছবি হয়েছিল অনেক বছর আগে, তারও চিত্রনাট্য করেছিলেন ঋত্বিক।"

'লজ্জা' হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন বিমল মিশ্র, গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল।

'উত্তমপুরুষে লেখা আমার কোন গল্প-উপন্যাসের 'আমি' আদৌ আমি নই। এটিও বানানো চরিত্র। আমার জীবনের কোন প্রকৃত ঘটনা নিয়ে আমি কখনও উত্তমপুরুষে কোন গল্প উপন্যাস লিখিনি। বরং থার্ড পার্সনে লেখা কিছু কিছু চরিত্রের মধ্যে ঈষৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উঁকি দিয়েছে। মজার ব্যাপার, আমার 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসের 'আমি' কিন্তু আমি নই, বরং তার নিরু

চরিত্রে বেশ কিছুটা আমাকে পাওয়া যাবে। যাদের জীবন বা ঘটনা নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছি, কখনও কখনও, তাঁরা যাতে আঘাত না পান, থার্ড পার্সনে লিখলে আঘাত পেতেন, সেজন্যেই সে কাহিনী উত্তমপুরুষে লিখেছি। আবার আত্মসমালোচনার জন্যে উত্তমপুরুষই শ্রেষ্ঠ। থার্ড পার্সনে লিখলে সাধারণ পাঠক মনে করেন অন্যের কথা বলা হয়েছে, আমি এ-রকম নই। উত্তমপুরুষে লিখলে তিনি কিছুটা সচেতন হন। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, উত্তমপুরুষে লেখা অনেক বেশি কঠিন, যদি না সেটি নিছক কাহিনী বা প্রেমের গল্প হয়। সাহিত্যের সামগ্রিক ব্যাপারটা সিনেমা তুলে ধরতে পারে না, সিনেমা বড় বেশি সোচ্চার, যে কথা উপন্যাসে নরম ভাবে বলা যায়, সিনেমা সেখানে স্বল্পবাক্ কিন্তু সরব। সিনেমা এক জায়গায় বড় দুর্বল, তার উত্তমপুরুষ নেই। তার অস্পষ্টতার মাধুর্য নেই। সিনেমায় সবই দেখতে পাই, নায়ক-নায়িকার চেহারাও, কল্পনা করতে হয় না, সিনেমা কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে পারে না। সিনেমায় আমরা শুধু দেখি এবং মুগ্ধ হই। সাহিত্যে আমরা আবিষ্কার করি এবং তন্ময় হই।'

'একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে এব কাহিনী, কিন্তু 'লজ্জা' আদৌ কোন পারিবারিক উপন্যাস নয়। এটি মানসিক ভারসাম্য হারানো মানুষের গল্পও নয়। আসলে মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্ত জীবনটাই যেন সবকিছু গোপন কবার চেষ্টায় অতিবাহিত হয়। তার অভাব অনটনই শুধু সে গোপন করে না। গোপন করতে চায় চরম দুঃখকেও। সবকিছুতেই তার লজ্জা। বিছানার চাদরটা নোংরা রাখায় তার লজ্জা নেই, বাইরেব কেউ দেখে ফেলবে, অতএব অতিথিকে দরজাব বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ঝটিতি সেটা বদলে ফেলা চাই। ছেলের রেজাল্ট, মেয়ের বযেস থেকে শুরু কবে জীবনের সর্বত্র শুধু গোপন করো আর গোপন করো।

আমার যাতায়াতের পথে একটি হাসপাতাল, মানসিক ভাবসাম্য হাবানো বোগীদেব। একদিন চোখে পড়লো কিশোরী সুশ্রী চেহারার একটি মেয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে উন্মাদের অর্থহীন দৃষ্টি, ধীরকণ্ঠে বারবার বলছে, 'দইওয়ালা, ও দইওয়ালা, একটু দই দিয়ে যাও না।' আবেকদিন চোখে পড়লো কয়েকজন আত্মীয় বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠছে, আর হাসপাতালের জানালায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উন্মাদিনীব মত একজন বিবাহিতা মহিলা বলছেন, বাবা, তুমি আমাকে পাগলাগারদে রেখে গেলে? মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাব স্বামী, তুমি আমাকে পাগলাগারদে রেখে যাচ্ছো? আমি পাগল নই, পাগল নই। পাগল তোমরা।' এই দুটি দৃশ্য বহুদিন স্মৃতির মধ্যে ঘুরেছে। এ দুটি দৃশ্যই উপন্যাসটি লিখতে বাধ্য করেছিল। না, সেই মহিলার বাবা এবং স্বামীর চোখে যে বিবক্তি এবং লজ্জা দেখেছিলাম, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম বলে, সেই বিবক্তি এবং লজ্জাই এ উপন্যাস লিখতে বাধ্য করেছিল।'

হৃদয় প্রথম প্রকাশ : শারদীয় দেশ ১৩৮৩ [১৯৭৬] গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭৬। উৎসর্গ পৃষ্ঠা : এখনো যাদের হৃদয় আছে।

'একদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। একেবারে প্রথম দিকে, তখন বয়েসে তরুণ, 'পূর্বাশা'র ছাপা একটি গল্প পড়ে তখনও আমি যাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র টেলিফোনে প্রশংসা পাঠিয়েছিলেন সম্পাদককে। আরো পরে প্রশংসা পেয়েছি অচিন্ত্য-কুমারের। 'দরবারী' পড়ে তারাশঙ্কর চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন

তাঁর আশীর্বাদ। এ-সবই যৌবনের কথা। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়েসে অভিভূত করেছিল আরেকজনের অপ্রত্যাশিত চিঠি। নীহাররঞ্জন রায়। আরো অপ্রত্যাশিত এ-কারণে যে তিনি তখন নয়া দিল্লিতে অতিব্যস্ততার মধ্যে স্থায়ী হয়ে আছেন।' চিঠির তারিখ 'নয়াদিল্লী, ২২ এপ্রিল, '৭৭।' আমি তখনও তাঁর কাছে চাক্ষুষ অপরিচিত।

'প্রিয়বরেষু,

আপনার 'হৃদয়' বইখানা যথাসময়েই আমার হাতে পেঁছে-ছিলো, এবং আমিও যথারীতি প্রথম অবসরেই বইখানা পড়ে ফেলে-ছিলাম—একটানা, একাসনে বসে। বোধহয়, প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে।

তা' সম্ভব হয়েছিলো শুধু বইটির গুণে। আপনার বিষয়াশ্রয়, বিন্যাসের পারিপাট্য, নির্মাণদক্ষতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীল গতি এবং জীবনের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সব কিছুকে আপনি একসঙ্গে বুনেছেন অপরিসীম নিপুণতায়। আপনার অনেক রচনাই আমি পড়েছি; বস্তুত, আমি আপনার অনেক অনুরক্ত পাঠকের অন্যতম। কিন্তু আপনার এ বইটির মতো এমন স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রাণময় গল্প-উপন্যাস আমি বহুকাল পড়িনি, এমন কি আপনার নিজের রচনা-সংগ্রহেও নয়।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বইখানার জন্য।

আশা করি, কুশলে আছেন। ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

নীহাররঞ্জন রায়।'

বীজ প্রথম প্রকাশ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৪ [১৯৭৭]। গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৮৫। উৎসর্গ পৃষ্ঠা : 'নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'।

গ্রন্থারম্ভে একটি শিলালিপির পাঠ দেওয়া ছিল :

"তাহার পর সেই জ্ঞানবৃদ্ধ রাজা দারায়ুসকে বলিলেন, স্বর্ণ এবং রৌপ্য অপহৃত হইলে তাহা পুনরায় অর্জন করা যায়।

যষ্টি মাটিতে ফেলিয়া সেই জ্ঞানবৃদ্ধ দারায়ুসকে আবার বলিলেন, পরাক্রমের দ্বারা হৃত সিংহাসন ফিরাইয়া আনা সম্ভব।

দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানবৃদ্ধ বিস্তাষ্পপুত্র দারায়ুসকে বলিলেন, ধনী ব্যক্তিদের বিনাশ ঘটিলে অপর ধনীদের উদ্ভব হয়। কিন্তু হে রাজন্, বিজ্ঞজনের অবলুপ্তি ঘটিলে অচিরে সাম্রাজ্যেরই ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে।

—প্রাচীন শিলালিপি"

'আমার একটি অনুল্লেখ্য উপন্যাস, 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর'-এ আমি আমার বর্ণনরীতির নাম দিয়েছিলাম 'মিশ্র তরঙ্গ', বিকাশ খারিজ-এর যে ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থাকারে বের করে তার একটি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ জানায়। সেই ভূমিকায় আমি এই রীতির নাম দিয়েছিলাম mixed waves। খারিজ এবং তার পরবর্তী প্রায় সব উপন্যাসেই আমি এই রীতি অনুসরণ করে আসছি। ঘটনার পরম্পরা না রেখে কখনও চলে যাই অতীতে, কখনো পরে যা ঘটার তা আগেই জানিয়ে দিই, কখনো বর্তমানের বিবরণ। কিন্তু তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা থাকে, ছন্দ থাকে। একেবারে অঙ্কের নিয়মে সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম আছড়ে পড়ে তীরের ওপর, তার একটা ছন্দ আছে, পরম্পরা আছে। চিরাচরিত উপন্যাস লেখার রীতি প্রায় সে-রকম, একটা ঢেউয়ের পর আরেকটা ঢেউ আসে সেখানে। কিন্তু একটা হঠাৎ ঝড়ের হাওয়া যখন সেই ঢেউয়ের ওপর আছড়ে

পড়ে, তখন আপাতদৃষ্টিতে ঢেউগুলো এলোমেলো হয়, নানাদিক থেকে ঢেউ এসে পরস্পরকে আঘাত করে। অথচ মিলিয়ে যাবার সময় তারও একটা নিজস্ব ছন্দ ফুটে ওঠে। আমার এই উপন্যাস-গুলিতেও সে-রকম অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমানের ঘটনা বা চিন্তা কোন পরম্পরা রক্ষা না করে এসেছে, কিন্তু সেই বিক্ষিপ্ত এলোমেলো চিন্তা ও ঘটনা ধীরে ধীরে একটা পরিষ্কার ছবি আনে, ছন্দ হয়ে ফুটে ওঠে। তবে সেগুলিকে এমনভাবে মেলানো এবং মেশানো যে এই রীতিটাকে কখনও পাঠকের চোখে প্রকট হতে দিই নি। কিন্তু এই রীতি উদ্ভাবন বা অনুসরণ অকারণে নয়। যাঁরা উপন্যাস লেখেন তাঁরাই জানেন অনেক সময়ে দুটি পরিচ্ছেদের মাঝখানে একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে দিতে হয় সামান্য একটি চারলাইনের ঘটনার কথা জানানোর প্রয়োজনে, অথবা টাইম-গ্যাপ অর্থাৎ কালক্ষেপের প্রয়োজনে। ফলে অপ্রাসঙ্গিক অবান্তর বাড়তি কথায় একটি পরিচ্ছেদ লিখতে হয়। সক্ষম লেখক সেই পরিচ্ছেদটিকেও পাঠযোগ্য করে তোলেন, পাঠক বুঝতে পারে না সেটি অবান্তর। আমার এই বর্ণনরীতিতে একটি প্রয়োজনীয় বাড়তি কথা লেখার প্রয়োজন হয় না। না, অভিনবত্ব দেখানোর জন্যে এই রীতিকে ডেকে আনি নি।'

'এ উপন্যাস লিখে মনে হয়েছিল, কার জন্যে লিখছি, কাদের জন্যে? এখন ভাবছি যা কিছু লিখেছি, যতগুলি উপন্যাস, তার মধ্যে এই বীজ' লিখতে পারার জন্যে আমি গর্বিত।

এ উপন্যাস কোন আদর্শবাদের গল্প নয়, আদর্শবাদের জয় তো নয়ই। বরং পরাজয়ের গল্প। চোখের সামনে কত দ্রুত এই সমাজটা বদলে গেল। শশাঙ্কশেখর দু' চারজন যাও বা আছেন, কি সাংঘাতিকভাবে তারা একা হয়ে গেছেন। সমাজের সর্বস্তরে। তাঁরা সকলেই শিকড় কিংবা বীজ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন না হয়তো কিন্তু তাঁরাই তো একটা দেশের, সংস্কৃতির বীজ, যত্ন করে যা বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আসলে শশাঙ্কশেখর এবং তাঁর অন্বেষণ এ উপন্যাসের প্রতীক। চারপাশের মানুষ এবং তাদের চাপে শশাঙ্ক-শেখর নিজস্ব গৃহকোণের নিজের পরিবারের মধ্যেও একা হয়ে যাচ্ছেন। একটি টাকা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি, হারিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্যে। অতীতের সঙ্গে সংযোগ রেখে যে মূল্য-বোধ বেঁচে থাকতে চেয়েছিল তা যেন অর্থহীন একাকিত্বের অভিমানে নিজেকে চিরদিনের জন্যে লুপ্ত করে দিল এক বৃষ্টির দিনে। বৃষ্টির জলে সেই বীজ কি কোথাও আবার অংকুরিত হবে? হয়তো এ আশাও ছিল লেখকের মনে। তা না হ'লে এ উপন্যাসের শুরুতে এবং শেষে এত বৃষ্টি কেন? বীজ' নামকরণের মধ্যেই উপন্যাসের বক্তব্য লুকিয়ে আছে। বর্তমানের ঘূর্ণিপাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষ মনে করে কি হবে অতীতকে জেনে। শশাঙ্কশেখরের ভাষায় অতীতকে জানার আরেক নাম পিতৃপরিচয়। এটি একজন হারানো মানুষের গল্প নয়, হারানো মূল্যবোধের গল্প। দামী মানুষদের মূল্যহ্রাসের গল্প। যতদিন তাঁরা আমাদের মধ্যে থাকেন, আমরা মূল্য বুঝি না, চলে যাওয়ার পর অনুভব করি বুকফাটা হাহাকার।

এ উপন্যাস এ কালের খুব কম পাঠকের কাছে মূল্য পাবে, জানি, কিন্তু এও জানি ভাবীকালে এটাই টিঁকে থাকবে।'

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

প্রথম প্রকাশ শারদীয় দেশ ১৩৭৯ [১৯৭২]। গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৭২। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছিল 'হলা পিয় সহি'। হে প্রিয় সখি। 'শকুন্তলা' নাটকের একটি সংলাপ।

'অনেকে এটিকে নিছক রোমান্টিক উপন্যাস ভেবেছেন, এবং সে-

কারণেই বোধহয় জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য আপত্তি নেই। রোমান্টিক উপন্যাস হলেই তাকে সাহিত্যে অনাদৃত করার আধুনিক রীতি হাস্যকর। সাহিত্যের ওপর কোন শর্ত চাপানো যায় না। শকুন্তলা নাটক যে আসলে রোমান্টিক নাটক, এবং শেক্সপীয়রের রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটও, সে-কথা মনে রাখলে অনেকেই নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্তি পাবেন। তবে আমার এই উপন্যাসটি রোমান্টিকধর্মী হলেও দুটি বিন্দুতে এর বক্তব্য স্থিরনিবদ্ধ রেখেছিলাম। প্রথমত বলতে চেয়েছি, প্রেম, ব্যর্থপ্রেমে যা আরো গভীর হয়ে ওঠে সেই প্রেমও যেমন সত্য, তেমনই তা ভেঙে যায় বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে। বাস্তবও সমান সত্য। নিরাপত্তা না থাকলে প্রেম নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আরেকটি দিক উন্মোচনের চেষ্টা ছিল। নিজেদের জীবনে যারা প্রেমকে সত্য ও গভীর বলে বিশ্বাস করে পরবর্তী প্রজন্মের জীবনে তা দেখতে পেলে বিভ্রান্ত হয়, সতর্ক হয়, কিন্তু বেদনা বোধ করে। অর্থাৎ প্রেমকে ভয় পায়। উপন্যাসটি নিছক অবাস্তব কল্পনার সৃষ্টি নয়।'

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। পরিচালক ছিলেন অগ্রগামী। কাবেরী বসুর শেষ অভিনয়। কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে স্মরণীয়।

উপন্যাসটি মালয়ালাম ভাষায় অনূদিত হয়।

ভিন্নভাষী ভারতীয়দের বাংলাভাষা শিক্ষণ সংস্থায় এ উপন্যাসটি পাঠ্যপুস্তক হয়েছিল।

আকাশবাণী কোলকাতা থেকে এর নাট্যরূপ প্রচারিত হয়েছিল। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র; শাঁওলী। এন বিশ্বনাথন এবং বসন্ত চৌধুরীও।

পরাজিত সম্রাট

প্রথম প্রকাশ · শারদীয় দেশ ১৩৭২ [১৯৬৫]। গ্রন্থাকারে প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৬৬। উৎসর্গ : সুরজিৎ দাশগুপ্ত বন্ধুবরেষু।

'রোগশয্যায় ছ' মাস কাটিয়ে তখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠি নি। তবু ডাক্তারের নির্দেশে কাজে যোগ দিয়েছি। লেখালিখির পাট প্রায় বন্ধ ছিল বহুকাল। ১৯৬১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলাম 'বনপলাশির পদাবলী', চার বছর কোন উপন্যাসেই হাত দিইনি। সাগরময় ঘোষ বললেন, পুজো সংখ্যা দেশ-এ উপন্যাস লিখতেই হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হ'ল। কিন্তু লিখতে গিয়ে মনে হ'ল কি করে উপন্যাস লিখতে হয় ভুলে গিয়েছি। তবু লিখতে হ'ল। কিন্তু বারবার বাধা পড়লো। তবু শেষ করলাম। মজার ব্যাপার, এ উপন্যাসের প্রথমে যে শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল, ভেবে রেখেছিলাম সে হারানো মেয়েই থেকে যাবে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু অসুস্থ লেখকের মনও হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ে, সে চেষ্টা করেও নির্মম হতে পারে না। ফলে, শিশুটিকে ফিরে পাওয়া গেল, এবং উপন্যাসের গন্তব্য গেল বদলে। এ উপন্যাসও অনেকের ভাল লেগেছিল, কিন্তু কোন উপন্যাস লিখে এতখানি অতৃপ্তিতে আমাকে কখনও ভুগতে হয় নি। আমি জানি এটি আমার দুর্বলতম রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম।' সে-বছর একই পুজো-সংখ্যায় সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'বিবর'।

'পরাজিত সম্রাট' গুজরাতি ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। একজন গুজরাতি লেখক, নাম ভুলে গিয়েছি, অনুবাদ পড়ে বইটির খুব সুখ্যাতি করে চিঠি লিখেছিলেন।

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

গ্রন্থের নাম	প্রকাশকের নাম	প্রথম প্রকাশের তারিখ (ইংরাজী)
প্রথম প্রহর	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৫৪
লালবাঈ	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৫৬
অরণ্যআদিম	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৫৭
দ্বীপের নাম টিয়ারঙ	আভেনির	১৯৫৭
এই পৃথিবীর পান্থনিবাস	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৬০
দুটি চোখ দুটি মন	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৬১
আরো একজন	ডি এম. লাইব্রেরী	১৯৬২
বনপলাশীর পদাবলী	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৬২
পরাজিত সম্রাট	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৬৬
জনৈক নায়কের জন্মান্তর	ডি এম. লাইব্রেরী	১৯৬৭
এখনই	ডি. এম. লাইব্রেরী	১৯৬৯
পিকনিক	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭০
যে যেখানে দাঁড়িয়ে	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭২
অ্যালবামে কয়েকটি ছবি	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭৩
সীমন্তীর গল্প	বিশ্ববাণী	১৯৭৩
খারিজ	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭৪
লজ্জা	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭৬
হৃদয়	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭৬
দ্বিতীয়া	দে'জ পাবলিশার্স	১৯৭৭
বীজ	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৭৮
রূপ	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮০
চড়াই	দে'জ পাবলিশার্স	১৯৮০
স্বজন	দে'জ পাবলিশার্স	১৯৮১
অভিমন্যু	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮২
বাহিরি	আনন্দ পাবলিশার্স	১৯৮৩